সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
মে, '৭৯

বিষয়সূচী

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।
* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের আহ্বান

এবছরটা অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে দেশে দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ শিশুর জন্য অনাহার, অশিক্ষা আর অপুষ্টি অপেক্ষা করছে সেখানে এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপন নিতান্তই নিয়মরক্ষার মত একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

তবুও হয়তো এই নিয়মরক্ষার তাগিদেই কিছু কথা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। আমাদের এই চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কেননা আমরা মূলত চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

স্বাধীনতা পেরিয়ে বত্রিশ বছরেও আমাদের দেশে ছোটদের জন্য ছবির ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি। যতটুকু হয়েছে যা কিছু হয়েছে সবই বড় বড় শহরে—এয়ার-কণ্ডিশনড্ সিনেমা হাউসে আইসক্রীম-পপকর্ণ ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের ছবি দেখা বা দেখানোর কচিৎ কদাচিৎ উৎসব জাতীয় অনুষ্ঠান।

বেশ কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছিল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠানটি যেন শ্বেত হস্তীর মত। এই সংস্থার উদ্যোগে কিছু কিছু ছবি তৈরী হলেও তা দেখানোর কোনো নেটওয়ার্ক নেই। বিদেশ থেকে যেসব ছবি আনা হয়েছে তার বেশীর ভাগই বাক্সবন্দী। আর পূর্বভারতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নেই বললেই চলে।

বরং কিছু কিছু বেসরকারী শিশু চলচ্চিত্র সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশংসনীয়ভাবে শিশু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন—শহর এবং শহরতলীর বহু স্কুলের ছেলেমেয়েরা এজাতীয় অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য এই উদ্যোগ ব্যাপক আন্দোলনের চেহারা নেয়নি কোনোদিন এবং এব্যাপারে সাধারণ ফিল্ম সোসাইটিগুলি এযাবতকাল বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আর এই সব শিশু চলচ্চিত্র সংগঠনের কার্যক্রমও সাম্প্রতিক ২-৩ বছরে বেশ কিছুটা স্তিমিত। প্রয়োজনীয় ছবির অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যাই সম্ভবত এর কারণ।

আর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এযাবতকাল শিশু চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যা দু-চারটি ছবি এখানে ওখানে তৈরী হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছবি শিশুচিত্র হিসেবে বিজ্ঞাপিত হলেও আসলে শিশু মানসের পরিপন্থী কাজ করেছে। একমাত্র ব্যবসায়িক ঝোঁকই এজাতীয় ছবি নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে।

আমাদের রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপনের কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ছবির ব্যাপারটাও এর মধ্যে রয়েছে। বেলেঘাটায় ওপেন-এয়ার শিশু চিত্রগৃহ নির্মাণ, আট-নটি শিশুচিত্র তৈরী এবং শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা চাইছি, একান্তভাবে চাইছি এই বছর শেষ হয়ে যাবার পরেও এজাতীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকুক। আর শুধু কলকাতা বা জেলা শহরগুলিতেই নয়, গ্রামবাংলার অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাচ্চাদের ভালোলাগার মত ছবি দেখানো হোক। এমন সব ছবি তৈরী করা হোক যাতে ছোটরা এখন থেকে দেশকে চিনতে পারে, পরিবেশকে চিনতে পারে, আগামী দিনের মোকাবিলায় নিজেদের তৈরী করে নিতে পারে। রাজ্যের প্রাইমারী সমেত সমস্ত স্কুলে এই ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কার্যক্রমকেও আরো ব্যাপক করে তুলতে হবে।

এছাড়া বছরে অন্তত দুটি রবিবার সকালে প্রতিটি চিত্রগৃহে, বাধ্যতামূলকভাবে নামমাত্র প্রবেশমূল্যে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হোক। এমনভাবে এই প্রদর্শনসূচী তৈরী করতে হবে যাতে অল্পসংখ্যক ছবি নিয়েও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিটি চিত্রগৃহে এজাতীয় প্রদর্শনী করা যায়।

আর এই পরিবেশনা প্রযোজনা ইত্যাদি গোটা কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই রাজ্যে একটি চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি গঠনের প্রশ্নটিও আজ অত্যন্ত জরুরী।

এদেশকে আগামী দিনের শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অঙ্গীভূত করে শিশু চলচ্চিত্রকে আরো প্রসারিত করা হোক আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ এই আহ্বানই জানাচ্ছে।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস,
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পাঁচশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন কি জনগণমুখী হবে, অথবা উচ্ছন্নে যাবে ?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

Objects of Federation of Film Societies of India—

(a) To promote the study of the film as an art and as **a social force**

—From the Memorandum of the Federation of Film Societies of India.

গত পঞ্চাশের দশক থেকে যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রায় ত্রিশ বছরের সময়কালের পথ পরিক্রমা করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সেই শিল্প-আন্দোলনের অগ্রগতির কোন সামগ্রিক রূপরেখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধটি নয়। বরং এই আন্দোলনের মূল দুর্বলতা সম্পর্কেই কিছু কথা এখানে বলার চেষ্টা করা হবে তৎসহ তা দূরীকরণের জন্য কিছু প্রস্তাব।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন যে একটা জায়গায় এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে—এতে কারুর কোন মিথ্যা সংশয় থাকার কথা নয়। এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সাধারণ সত্য অনুযায়ী কোন চলমান শক্তিই 'রুদ্ধ' হয়ে এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, হয় সে এগিয়ে যাবে, নয় বিকৃতির পথে শুরু হবে তার পশ্চাদ্‌গমন। এই দুটির মধ্যে এই আন্দোলনের ভাগ্যে কি আছে তা নির্ভর করছে আজকের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অংশভাগী মানুষদের ওপর, বিশেষ করে সুস্থ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ও চলচ্চিত্রবোধ সম্পন্ন তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বর্তমান রুদ্ধতার বা অবক্ষয়ের সম্পর্কে আদি স্রষ্টারা সহ আন্দোলনের তরুণ কর্মীরা সবাই নানা সময়ে নানান সমালোচনা করেছেন, কিন্তু যে আলোচনা আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে সেটি করেছেন এই আন্দোলনের আদি স্রষ্টাদের প্রধানতম ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়। আন্দোলনের আদি পিতৃসদৃশ ব্যক্তি বলে তাঁর সমালোচনাটি এমনিতেই মূল্যবান, কিন্তু শুধু সেই জন্যই নয়, তাঁর বক্তব্য তার গভীরতা ও তীব্রতার জন্যও চিন্তা উদ্রেককারী এবং এই সমালোচনাটি সত্যজিৎ রায় করেছেন তাঁর নিজস্ব অনুপম চলচ্চিত্রের ভাষায়, সেটি আছে তাঁর একটি প্রধান ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র একটি সিকোয়েন্সে। যা আমরা অনেকেই দেখেছি।

সেখানে আমরা দেখেছি, ছবির নায়ক সিদ্ধার্থর দুটি বন্ধুকে অবস্থা স্বচ্ছলতর থাকায় যারা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে পারছিল (এবং আর্থিক সংকটে দ্বিতীয় বর্ষে উঠেই সিদ্ধার্থকে পড়া ছেড়ে চাকরির সন্ধান করতে হচ্ছিল)। তাদের একজন 'রেডক্রসে'র বাক্স ভেঙে পয়সা চুরি করে সেই পয়সায় সিদ্ধার্থকে চীনা রেস্তোরাঁয় খাদ্য ও মদ্য পান করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'বেশ্যালয়ে'। অন্য বন্ধুটি সিদ্ধার্থকে নিয়ে গিয়েছিল কোন ফিল্ম সোসাইটির শো দেখতে। উদাসীন সিদ্ধার্থ যাবার আগে প্রশ্ন করেছিল সেখানে গিয়ে সে কি পাবে—উত্তরে শুনেছিল 'গরম' —অর্থাৎ এমন কিছু যৌনাত্মক রসদৃশ্য যা এদেশের সাধারণ দর্শক সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে পায়না। পরিচালক সেই 'শো'-এর কিছু অংশ দেখালেন, এবং যেহেতু তিনি রুচিবান মানুষ, তাই সেই সেই 'শো'-এর 'বেডরুম' দৃশ্যের সূচনায় ছবির সিকোয়েন্সে কাট্ করে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সভ্য কারা, তাঁদের চাহিদা কি, এত দ্রুত ফিল্ম সোসাইটিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির মূলে কী কী শক্তি কাজ করছে—এসবের সামগ্রিক মূল্যায়ন এই সিকোয়েন্সে অবশ্যই করা হয়নি—ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এইটুকুর মধ্যে তা করতে চাননি, করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু প্রৌঢ় পিতা যেমন নব্য পুত্রের চারিত্রিক গলদকে তুলে ধরে তিরস্কার করেন, অনেকটা তেমনি করেই এই আন্দোলনের একটা বৃহৎ অবক্ষয়কে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় নির্মমভাবে তুলে তিরস্কৃত করেছেন—এটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবার কাজ নয়। বস্তুত ওই সিকোয়েন্সে এক বন্ধুর সাক্ষাৎ বেশ্যালয়ে যাওয়া ও অন্য (কিছু ভদ্রতর স্বভাবের) বন্ধুটির ফিল্ম সোসাইটির শো দেখতে যাওয়া—এই 'বেশ্যালয়' ও 'ফিল্ম সোসাইটির শো' দুয়ের সমান্তরালতা এতই স্পষ্ট যে কষাঘাত আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছয়, যদি অনুভূতি বলে বা বিবেক বলে কিছু থাকে। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার যে অন্তরের জ্বালাটা আছে তাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না এবং তখনি বোঝা যায় আজ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুরবস্থা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতাকে কী দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে আমরা ওই সিকোয়েন্স তথা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি দেখেছি, এবং তারপরেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন চলছে, কোথাও 'ট্রাডিশন' ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে তো মনে হয় না। প্রশ্ন এইখানেই—এই গলদের মূলটা কোথায়, কীভাবে এই গলদ দানা বাঁধল, কেন বেশ্যালয় যাবার তাগিদেরই সমান্তরাল কিন্তু কিছুটা সূক্ষ্মতর বা ভদ্রতর (বা নিরীহ) তাগিদই আজ একদল তরুণকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের 'সামিল' করেছে (তথাকথিত ভাবেও), যে আন্দোলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ও লিখিত

ভাবে আজো আছে—চলচ্চিত্রকে গভীরভাবে দেখা শিল্প হিসেবে এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, গত দুই দশক ধরে এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যুক্ত থেকে, এবং পশ্চিমবাংলার একটি পশ্চাদপদ ও অবজ্ঞাত (যে রকম পশ্চাদপদ অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত আর কোন ফিল্ম সোসাইটি স্থাপিত হয়নি, যে সোসাইটি বর্তমানে মৃত *) কয়লাখনি অঞ্চলে একটি ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—এই সমগ্র আন্দোলনটি যে রোগে ভুগছে তাকে বলা উচিত 'শৈশবকালীন রোগ'। অর্থাৎ কিনা প্রায় শৈশবাস্থা থেকেই এই আন্দোলনটির মধ্যে একটি গলদ থেকে গেছে। এবং সেটি হচ্ছে, প্রথমাবধি এটিকে দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিশুদ্ধ মধ্যবিত্তভিত্তিক কিছু 'বিদগ্ধ' সংখ্যালঘিষ্ঠ শহুরে মানুষের অতৃপ্ত চলচ্চিত্রীয় ক্ষুধার তৃপ্তি সাধনের আন্দোলন হিসেবেই গণ্য করে আসা। সেই গলদটি আদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও ছিল। অন্ততঃ একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ফিল্ম সোসাইটিগুলির 'লক্ষ্য' বলতে যে চলচ্চিত্রকে 'সামাজিক শক্তি হিসেবে' দেখার কথাটা তাঁদের সংবিধানে ছিল—যা পালন করতে গেলে সোসাইটিগুলির কিছু 'সামাজিক দায়িত্বে'র কথা আসা অনিবার্য সেই সামাজিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রকে দেখা ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক দায়িত্ব পালন—এগুলিকে বরাবরই গৌণ স্থান দিয়ে আসা হয়েছে। মুখ্য স্থান পেয়েছে, আঙ্গিককলায় উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি দেখার ব্যাপারটি, চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝার ব্যাপারটি এবং দেশীয় অসুস্থ তথাকথিত 'কমার্শিয়াল' ছবির বিকল্প কিছু তথাকথিত 'সুস্থ আনন্দের' ছবি যাতে কিছু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মানুষ ঘরের কাছে কম অর্থব্যয়ে উপভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। প্রথমাবধি এই আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে এটা কেউ ধরে নেননি যে, যেহেতু বিপুল প্রভাবশালী চলচ্চিত্র একটি গণমাধ্যম, সুতরাং আন্দোলনকে এভাবে চালিত করা উচিত যাতে—শুরুতে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক হলেও ক্রমশঃ তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে যে বিপুল জনগণ আছেন, তাঁদের কাছে আসতে পারা যাবে। এটা প্রথমাবধি কেউ ধরে নেননি যে, অন্য একধরণের চলচ্চিত্র যা বিপুল সংখ্যায় জনগণ দেখে থাকেন, সেই জনগণ দর্শনধন্য ছবির প্রভাবের মধ্যে পড়ে আছে যে সাধারণ দর্শক শ্রেণী—তাঁদের কাছেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কোন 'সামাজিক' মূল্য থাকবে! অথচ এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ফলে কী হয়েছে? ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন হয়ে গেছে একটি 'স্যাটারডে ক্লাব' বা 'ডাইনার্স ক্লাব' গোছের ক্লাবের তৎপরতা, যেখানে গেলে প্রচলিত মোটা ভাত ডালের বদলে কিছু ফরাসী বা চেক বা রুশ বা জার্মান ইত্যাদি কিছু তথাকথিত 'সুখাদ্য' পাওয়া যাবে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মধ্যে যে আমোদদানের ব্যাপারটা আছে যা একধরণের ম্যাজিকের মত আমাদের মনের মধ্যে কাজ করে, যার প্রভাবে আমরা 'ববি' 'মুকদ্দর কা সিকন্দার' বা 'ধনরাজ তামাং' দেখার জন্য দীর্ঘ লাইন দিই (এবং প্রকাশ্যে নিন্দাও করি), সেই প্রমোদলাভের গূঢ় ইচ্ছাটাই শুধুমাত্র আরো একটু সূক্ষ্ম 'বিদগ্ধ' ও 'সৌখিন' চেহারায় আমাদের মধ্যে কাজ করে যখন আমরা ফিল্ম সোসাইটিগুলির এক একে পত্তন করি। আমরা সেই অনন্তকালের সবচেয়ে গালভরা মহান শব্দটি যখন উচ্চারণ করি—যার নাম শিল্প—তখনো তাকে 'উপভোগ্য বস্তু' ছাড়া আর কিছু ভাবিনা।

একজন বালকও জানে শিল্পে 'উপভোগের' ব্যাপারটা একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাকে তুচ্ছ করা মানে শিল্পের প্রাণ সত্তার একটি মূল স্থানে আঘাত করা। কিন্তু এটা কি সবাই অনুভব করেন যে, শিল্পে 'উপভোগে'র ব্যাপারটাকেই শেষ কথা ধরলেও শিল্পের প্রাণে আঘাত করা হয়, উপভোগ্য বস্তু হয়েই শিল্প আরো অনেক কিছু—তার উপভোগ্য বস্তুসত্তাকে জড়িয়েই এবং উপভোগের স্তরকে ছাড়িয়ে আসে শিল্পের এক 'আলোকোজ্জ্বল বস্তুসত্তা', যার জন্য শিল্প শুধুমাত্র আমাদের আরাম ও উপভোগের আনন্দই দেয় না, আমাদের নিজেদের চারিদিকের বাস্তবতাকে চিনতে শেখায়, এই মানব সমাজকে, তার শক্তিগুলিকে, এমনকি আমাদের নিজেদের সত্তাকেও—শিল্পের এই সত্তা আমাদের ভিতরের সৃজনী শক্তিকে উদ্বোধিত করে, যে সৃজনীশক্তি শুধু নূতনতর শিল্প সৃষ্টিই করে না, আমাদের চারিপাশের বাস্তবতার মধ্যে যা কিছু অমানবিক তার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বস্তুতঃ শিল্পের মহত্বের পরিচয় আসলে এইখানেই। মহৎ আলোকোজ্জ্বল শিল্প উপভোগ্য শিল্প হয়েই তাই এত মহত্বের পদবাচ্য। এই জন্যই টলস্টয়কে আমরা সমারসেট মমের চেয়েও মহত্তর স্রষ্টা বলে থাকি, বা কবি বোদলেয়রের চেয়ে (যাঁর কবিতার শৈল্পিক কারুকাজ নাকি তুলনাহীন, পন্ডিতেরা বলেন) কবি গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথকে। হিচকক একজন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী, তুলনাহীন তাঁর শৈল্পিক কাজ এবং তাঁর ছবির উপভোগ্যতা প্রায় সর্বজনীন, কিন্তু তবুও সারা পৃথিবীর গুণী মানুষ স্বীকার করবেন আইনজনস্টাইন বা রেনোয়াঁ মহত্তর শিল্পী। শুধুমাত্র উপভোগ্য শিল্পের চেয়ে এই আলোকোজ্জ্বল মহৎ শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের

* বর্তমানে মৃত।

আরো বড় প্রমাণ এই মহৎ শিল্প তার পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে বিভিন্ন বিচিত্র পথে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। সেক্সপীয়ার পড়ে শুধু যে কাব্য ও নাট্যরসের উপভোগের পরম আনন্দই পাওয়া যায় তা নয়, একজন অর্থনীতিবিদকেও চিনতে শেখায় মানুষের সমাজে অর্থশক্তি বা সম্পদ (সোনা) কিভাবে কাজ করে। জাজ্বল্যমান উদাহরণ ঃ সম্পদ শক্তির চরিত্র বোঝার জন্য তরুণ কার্ল মার্ক্সের কাছে সেক্সপীয়ারের 'টিমন অব্ এথেন্সে'র অমর লাইনগুলি আলোকবর্তিকার মত কাজ করেছে। (দ্রষ্টব্য মার্ক্সের ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, মস্কো প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৩২) রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সমঝদারিরর পরম উপভোগের অফুরান উৎস, কিন্তু শুধুমাত্র যদি তাই হত, তাহলে তা কি এমন মহত্ত্বের পদবাচ্য হয়! এই সঙ্গীত আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে, কর্মে উৎসবে, দুঃখে, শোকে অফুরান আলোর ঝর্ণার প্রেরণায় স্নাত করছে।*

বস্তুতঃ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে যা ঘটেছে তা হচ্ছে—আমরা প্রথম থেকেই (১) চলচ্চিত্রকে শুধু 'শিল্প' হিসেবেই দেখে এসেছি, কিন্তু তার সঙ্গে (সোসাইটির লক্ষ্য বলে সংবিধানে উল্লেখিত হলেও) চলচ্চিত্রকে 'সামাজিক শক্তি' হিসেবে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইনি। বস্তুতঃ এই 'সামাজিক শক্তি' শব্দটা একটা কাগুজে শব্দ হয়েই সোসাইটির মেমোর‍্যাণ্ডামের পাতায় 'মৃত' হয়েই রয়ে গেছে। এবং একথা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার সময় এসে গেছে যে, যখনই কোন ক্ষেত্রে শিল্পকে সামাজিক শক্তি হিসেবে না-দেখার প্রবণতা দানা বাঁধে তখনই তা হয়ে ওঠে তথাকথিত 'বিশুদ্ধ শিল্প'—একেবারে বুর্জোয়া মতেই বিশুদ্ধ। এবং তারপরই বর্তমান চলতি সামাজিক ব্যবস্থার পাকশালায় এই 'বিশুদ্ধ শিল্প'টি হয়ে ওঠে শুধুমাত্র 'উপভোগ্য বস্তু'। অথবা আরো পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, তখন এই 'বিশুদ্ধ শিল্প'টি হয়ে ওঠে একটি 'সুন্দর' বর্ণোজ্জ্বল হৃষ্টপুষ্ট মোরগ যার অনিবার্য নিয়তি কোন একদল সৌখিন ভোজন-বিলাসী বুর্জোয়ার ধবধবে খাবার টেবিলে পরম 'উপভোগ্য বস্তু'-তে রূপান্তরিত হওয়া। একমাত্র শিল্পের সামাজিক শক্তির সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই এই জঘন্য পরিণতি থেকে শিল্পকে পারে বাঁচাতে। এই কথাটাই আমরা যদি মর্মে মর্মে উপলব্ধি না করি, কোন শিল্প আন্দোলন—তা চলচ্চিত্র বা সাহিত্য বা নাটক যাই হোক না কেন—তাকে সার্থক করতে পারব না।

কেন এই সামাজিক সচেতনতা এত জরুরি তা কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। আমরা অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন কয়েকটি ভ্রান্ত ভাবধারার মধ্যে, ভ্রান্ত শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এতদিন মানুষ হয়ে এসেছি (আজো হচ্ছি), যে ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে মানুষকে পরিণত করা প্রধানতঃ 'খাদক প্রাণী' হিসেবে। পুঁজিবাদী সভ্যতার এটাই সবচেয়ে বড় কীর্তি—মানুষ, যা কিনা এরিস্টটলের কাছে ছিল 'বুদ্ধিমান প্রাণী', পরে কার্ল মার্ক্সের কাছে ছিল 'মহান রাজনৈতিক প্রাণী'—পুঁজিবাদী সভ্যতা তার দেহের ও মনের ভোগ ক্ষমতাকে বিজ্ঞাপন ও ভ্রান্ত মতাদর্শগত প্ররোচনায় তীব্র থেকে তীব্রতর বাড়িয়ে এবং ভোগ্যবস্তুর নিত্য নূতন সরঞ্জাম উপকরণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে, সেই মানুষকে এক লোভী উপভোক্তা বা খাদক প্রাণী করে তুলেছে—যার কাছে ভোগ করাটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। মানুষের এই 'লোভ' রিপুটিকে এই সভ্যতা যেভাবে ভয়ংকর সর্বনাশা পথে চালিত করছে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের অনেক স্মরণীয় শিক্ষকরা আমাদের সাবধান করে এসেছেন, কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতার ভয়ানক শক্তির কাছে এঁদের উপদেশ কার্যকরী হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'বণিক সভ্যতার কু-ফল', বলেছিলেন যখন থেকে এল টাকার ক্ষমতার দাপট তখন থেকেই এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব—সেই কুফলটির সম্পর্কে মহাকবি গ্যেটে একটি অসাধারণ মূল্যায়ন করেছিলেন ইউরোপের পুঁজিবাদের আদি যুগে একই কুফলকে প্রত্যক্ষ করে। গ্যেটে তাঁর নায়ক Wilheim Meister-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "A bourgeois can make a profit and with some difficulty even develop his mind ; but he will lose his individuality, do what he will. He may not ask, "what are you ?" but only "what do you have ?" অর্থাৎ পুঁজিবাদের যুগে মানুষের পরিচয়—তার নিজের পরিচয়ে নয়,

---

* আমার বিনীত ধারণা, শিল্পে বিশুদ্ধ উপভোগের ব্যাপারটা গৌরবান্বিত করা হয়েছে সামন্ত যুগ থেকে বিশেষ করে, যখন পরোপজীবী নিষ্কর্মা অজস্র আরাম ও অবসর ভোগী জমিদার ও নৃপতির একটা অংশ তাদের 'অনন্ত' অবসরকে উপভোগ্য করার জন্য শিল্প উপভোগ, যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নাচ ইত্যাদি উপভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য যেহেতু এই সব শিল্প শুধুমাত্র উপভোগ্য বস্তুই ছিলনা, এর অন্য মানবিক বস্তুসত্তা ছিল, তাই দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে এই জমিদার নৃপতিদের একটা অংশে সৃজনশীলতার চিহ্ন দেখা গেছে, যেমন চীনে কবি-নৃপতি, এদেশে সংগীত স্রষ্টা নবাব ইত্যাদি। যেটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, সেই সময় তারা শিল্পের বিশুদ্ধ উপভোগের স্তর থেকে শিল্পের উন্নত স্তরে যেতে পেরেছিলেন বলেই সৃষ্টিকর্মে রত হতে পেরেছিলেন। যাঁরা পারেন নি, তাঁদের কাছে পরিবেশিত ঠুংরী বা খেয়াল, তাঁদের হাতের সুরাপাত্রের সুরার বেশি কিছু ছিলনা।

তার কি কি আছে তার পরিচয়ে, অর্থাৎ তার কত টাকা, চাকরিতে কত বড় পদ, তার কতটা ক্ষমতা, তার ভোগ্যবস্তুর ঐশ্বর্য কতটা—বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য মাত্র যে, এই ব্যাপারটি পুঁজিবাদের পক্ষে চরম প্রয়োজনীয়, কেননা আমি যত আমার সম্পত্তিকে বাড়াতে চাইব ততই পুঁজিবাদের দাসে পরিণত হব, এবং আমার এই সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী, চাকরিতে উচ্চতর পদলোভ বাড়াবার সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি হচ্ছে আমার 'লোভ' ও 'ভোগ' করার উদগ্র নেশা। উনবিংশ শতাব্দীর আগমনের প্রাক্কালে মহাকবি গ্যেটেও কল্পনাই করতে পারেন নি, বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদের মুখে পুঁজিবাদী সভ্যতা তার বিজ্ঞাপন শক্তির কি যাদু সৃষ্টি করবে—যা এখন করছে। যা কিছু নির্মিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে—তাকেই ফেলা হচ্ছে আমাদের ভোগ বৃত্তির কাছে তার 'রমণীয়' চেহারায়—আমাদের ভোগ করার প্রবৃত্তিকে প্রতিদিন তীব্রতর করা হচ্ছে। এই যখন অবস্থা তখন শিল্পের কী অবস্থা হতে পারে? স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়ায় আমরা শিল্পকেও ভোগ্য বা 'উপভোগ্য বস্তু'তে পরিণত করব। এটাই স্বাভাবিক, এটাই এই সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক নীট ফল। এবং এর প্রমাণ পদে পদে। আমরা যদি আজকালকার মধ্যবিত্ত বালক বা কিশোরদের খবর রাখি দেখব, তারা আর 'ঠাকুরমার ঝুলি', ছোটদের রামায়ণ মহাভারত, সুকুমার রায়ের লেখায় তৃপ্ত নয়, তারা চাইছে কমিকস্ যার মধ্যে থ্রিলারের গন্ধ আছে, চাইছে খুনখারাবি রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘনঘটা যা মনের মধ্যে নেশার মত ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দের সঙ্গে যা দেয় শিক্ষা তার চেয়ে যা শুধু দেয় 'রোমাঞ্চ'—তার চাহিদা ক্রমশঃ উঠেছে বেড়ে। একটু বড় হয়ে এই সব কিশোর শুধু পড়বে হেডলী চেজ, এলস্টার ম্যাকলীন, স্ট্যানলী গার্ডনার বা বড় জোর আগাথা ক্রিস্টি। এই জন্যেই 'জন অরণ্য' ছবির সুকুমার সোমনাথকে বলেছিলেন, "তুমি শালা রামায়ণ পড়েছো?" (অনবদ্য এই সংলাপ, একেবারে সঠিক সত্য।) এরই সঙ্গে ক্রমশঃ মার্কিনী পেপার ব্যাক যৌনানন্দ দেওয়া পুস্তকের ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ—এর উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমস্ত ব্যাপারটা ওই একই প্রক্রিয়ার ফল, সাহিত্যকে শুধু 'উপভোগ্য বস্তু'তে পরিণত করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বা টলস্টয় আর কে পড়ে! চলচ্চিত্রে সেই একই ব্যাপার। একদিকে আমাদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ ছুটছে হিন্দি খুনখারাবি ছবির উন্মাদনার নেশায়, আর তথাকথিত বিদগ্ধ শিক্ষিত মানুষ দলে দলে ভিড় বাড়াচ্ছে ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ 'রস' উপভোগ করতে—এর মধ্যে পড়ে শৈল্পিক কারুকাজের ভালো রস থেকে নগ্ন নারীদেহ দেখার রস, সব।

অর্থাৎ আদিতে ছিল লক্ষ্য—to study the film as an art and as a social force. সেখান থেকে আদি স্রষ্টারা 'film as a social force'-কে অবহেলা করলেন, রইল শুধু শিল্প—'বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র।' তারপর যে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার কথা বলা হ'ল, সেই 'অমোঘ' প্রক্রিয়ায় আজকে দাঁড়িয়েছে "শুধু উপভোগ্য বস্তু হিসেবে চলচ্চিত্র।' ফলে হাঙ্গেরীর অন্য ছবি দেখতে ভিড় হয় না, কিন্তু 'ইলেক্‌ট্রার' মত সুন্দর ছবিতে ভিড় বাড়ে—ছবির বক্তব্যের টানে নয়, নগ্ন নারী দেহ দৃশ্য আছে বলে। বুলগেরিয়ার অতি উৎকৃষ্ট ছবির চেয়ে ভীড় বাড়ে 'গোটস্ হর্ন' দেখার জন্য, একটি মর্মান্তিক দুঃসহ 'রেপ্ সীন' আছে বলে। পৃথিবীর অমর ছবি 'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' দেখান হলে হলের তিন চতুর্থাংশ হয়ে যায় খালি। ফ্যাস্‌বিণ্ডারের "পেড্‌লার অব ফোর সীজনস্' দেখালে সভ্যরা সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন, আর তাঁরই 'গডস অব প্লেগ' এর মত গভীর ছবি দেখালে কর্তৃপক্ষের কপালে জোটে বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য। সম্প্রতি কোন কোন ফিল্ম সোসাইটিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবি বেশি দেখান হয় বলে একদল সভ্য ভয়ানক বিরক্তি প্রকাশ করে চলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনজেনস্টাইন-এর 'ইভান দ্য টেরিবল' ছবি বেশির ভাগ সভ্য নিতে পারবে না বলে, তার বদলে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হয় কোন ফরাসী প্রেমেরছবি দেখাবার কথা। সম্প্রতি এমন খবরও আছে যে, কোন মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিতে একদল সভ্য খোলাখুলি ইস্‌তেহার বিলি করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তাঁরা বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের জন্য নাকি দর্শনীয় ছবির মধ্যে যৌন দৃশ্য থাকা ছবিকে সেন্‌সর করছে! এর সঙ্গে হলিউড ছবি না দেখাবার জন্য অভিযোগ তো আছেই।

আর ছবি যখন শুধু 'উপভোগ্য বস্তু', তখন সেমিনার 'আলোচনা-সভা'—এসব আর কে করে! সুতরাং যে সোসাইটির সভ্য সংখ্যা সাতশ, একটা সেমিনার ডাকলে তাতে তিরিশ জনও উপস্থিত থাকেন না। কোন কোন সোসাইটি জোর করে সভ্যদের আলোচনা শোনাবার জন্য শো দেখাবার আগে আধ ঘণ্টায় আলোচনা সেরে 'শো' শুরু করে দিতে বাধ্য হন। এবং সেসব সেমিনারেও 'চলচ্চিত্রকে সামাজিক শক্তি' হিসেবে আলোচনা কদাচিৎ স্থান পায়। এবং অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, আন্দোলনের আদি পথিকৃত নিজেই আজকাল 'সামাজিক শক্তি' হিসেবে চলচ্চিত্রকে প্রায়শঃই ভুলে যান। সমস্ত অবস্থাটাকে যা আরো ঘোরালো করে তোলে।*

* 'অরণ্যের দিন রাত্রি'—বিদেশী কিছু সমালোচকদের মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবির একটি, কত অসংখ্য স্তরের ছবি, কত বিভিন্ন থীমের, অনবদ্য সাঙ্গীতিক পঠনের ছবি, এতে ভারতের

(পরের পৃষ্ঠায়)

তাই আজকের এই আন্দোলনের অধঃপতনের গতি রোধ করা একমাত্র সেই সব সৎ ও সাহসী সামাজিকভাবে সচেতন তরুণদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা আন্দোলনের 'পথ প্রদর্শকদের ভুল'কে (Sin of the pioneers) সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, এদেশে সামাজিক শক্তি বিন্যাসকে সঠিক অবধান করে, চলচ্চিত্রের সামাজিক শক্তিকে তার শিল্পরূপের মতই মর্য্যাদা দিয়ে বলিষ্ঠ হাতে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এই সংগে স্মর্তব্য, আন্দোলনের পথ প্রদর্শকরা যে সদাত্মক অবদান রেখেছেন তারও, সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন দরকার, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের। চলচ্চিত্রকে সামাজিক শক্তি হিসেবে দেখাবার ব্যাপারে তাঁর ইদানিংকার অনীহাকে স্মরণে রেখেই একথা স্বীকার করা দরকার যে, সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের পিছনে তাঁর মহৎ ও সদাত্মক অবদান তাঁর 'ভুল'-এর চেয়ে অনেক বড়। যে কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, 'পথিকৃতদের ভুল'কে সংশোধন করার দরকার পড়ে, এক্ষেত্রেও সেটা দরকার, এবং তার মানে পথিকৃতদের সামগ্রিক সদাত্মক অবদান, যার ভিত্তির ওপর আন্দোলন দাঁড়িয়ে, সেই ভিত্তিকে ভেঙ্গে ফেলার উগ্রতা নয়।*

এই বিষয়ে কিছু কিছু কার্যক্রম আমাদের ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোক্তারা এখনই নিতে পারেন, কম বা বেশি সাধ্য অনুযায়ী। এ সম্পর্কে আমার সীমিত অভিজ্ঞতা ও ধারণা অনুযায়ী কিছু কার্যক্রমের কথা নিবেদন করছি। বন্ধুজন, যাঁরা আজকের ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের অবক্ষয়ের কথায় চিন্তিত, তাঁরা যদি এর মুক্তির কথা ভেবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, আলোচনা সভায়, এমনকি আড্ডাতেও নিষ্ঠার সঙ্গে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করেন, তাহলে আরো ভালো সমাধানের পথ আমরা বার করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার প্রস্তাবগুলিও তাঁরা যেন দয়া করে বিচার করেন।

(১) প্রস্তাব ঃ আমার মতে যা সর্বপ্রথম করণীয়, তা হচ্ছে —এই ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের তুমুল ও গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণে নেমে পড়া।

(২) ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব নিয়ে যাওয়া, বিশেষত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর কাছাকাছি। এবং যেহেতু খুব সঙ্গত কারণেই ঐসব মানুষ এই সব আন্দোলনকে 'একদল সৌখিন মানুষের আন্দোলন' বলেই জেনে এসেছেন, তাই এক্ষেত্রে মহম্মাদেরই যাওয়া উচিত পর্বতের কাছে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে আমাদেরই ছবি নিয়ে, ১৬ঃ মিঃ মিঃ প্রজেক্টার নিয়ে যাওয়া উচিত কাছাকাছি কোন ট্রেড ইউনিয়নের আসরে, কোন শ্রমিক বা কৃষক অধ্যুষিত অঞ্চলে। এটা আরো ভালোভাবে সম্ভব মফঃস্বলের সোসাইটিগুলির পক্ষে। উপযুক্ত ছবি নিয়ে, কোন গ্রামের স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবি দেখান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা—এগুলি যতটা দুঃসাধ্য ভাবা হয় তত দুঃসাধ্য নয়। কলকাতায় 'সিনে সেন্ট্রাল' বা 'সিনে ক্লাব' এধরণের কাজ কিছু করেছেন। কিন্তু এগুলি মেদিনীপুর, বা আসানসোলের সোসাইটিই বা পারবেন না কেন? স্মর্তব্য, এর দ্বারা আমাদেরও চরিত্র সংশোধন হয়।

(৩) আলোচনা সভা ঃ ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের বোঝান যে শুধু ভাল ছবির 'শিল্প উপভোগের' জন্যই তাঁকে সভ্য করা হয়নি, বা সোসাইটির পত্তন করা হয়নি। সেমিনার বা আলোচনা সভাগুলিতে তাঁদের সহযোগিতাও আবশ্যক। আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আইন করে একটা নিয়ম চালু করার কথা ভাবা দরকার, যাতে করে প্রত্যেক সভ্য অন্ততঃ বছরে এতগুলি ন্যূনতম আলোচনা সভায় যোগ দেন, নাহলে তাঁর সদস্যপত্র খারিজ হতে পারে। চাঁদা দেবার মতই এটিকে বাধ্যতামূলক করা দরকার। ফেডারেশনেরও উচিত আইন করে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে বাধ্য করা যে বছরে অন্ততঃ এতগুলি (ন্যূনতম) সেমিনার তাদের ডাকতেই হবে।

(৪) অনুষ্ঠিত সেমিনারের চরিত্র বদল করারও প্রয়োজন প্রচণ্ড। সেমিনারের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সোসাইটির শোতে দেখান

সুন্দরী রমণীরা আছে, ভারতের সুন্দর অরণ্য আছে—অথচ 'Certain western sensibility informs its structure and form', একদিক থেকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলে এর স্বাদ চেখভীয়, অন্যদিক দেকে এর স্বাদ মোৎজার্টীয়—অথচ এমন ছবি বাঙালীরা নিল না বলে—সমস্ত অবস্থাটা সত্যজিৎ রায়ের কাছে মনে হচ্ছে 'নৈরাশ্যসূচক।' (Sight & Sound, Spring, 1977, pp-94-98) অর্থাৎ একবারো তিনি এটা ভেবে দেখার প্রয়োজনও অনুভব করলেন না যে, ছবিটি সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বদেশে কি ভূমিকা পালন করেছে, এই ভূমিকার নঙাত্মক দিকটির জন্যই বাঙালীরা ছবিটিকে গ্রহণ করে নি। ছবিটির শৈল্পিক ঐশ্বর্যের পরিচয় জেনেও। একথাটার সত্যতা তিনি যাচাই করতেও চান না।

---

* সত্যজিৎ রায়কে বাদ দিয়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কোন ভবিষ্যত এই মুহূর্তে আছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর ইদানিংকালের অন্তর্বিরোধগুলি সম্পর্কে অবহিত থেকে তাঁর যা শ্রেষ্ঠ বস্তু—যা এখনো ফুরিয়ে যায়নি—সেগুলিকে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। কেননা একথা ভোলা সম্ভব নয়, যে তিনিই একটা নূতন চলচ্চিত্রীয় যুগের সৃষ্টি করেছেন ও সেই যুগের মধ্যেই এখনো আমাদের অবস্থান।

চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, যে সব ছবি সত্যকার জনগণ দেখছেন, সেই জনগণ দর্শনধন্য হিন্দি বা আঞ্চলিক ছবিগুলিকেও আলোচনায় আনা দরকার। এবং দরকার আলোচনাকে গণমুখী করা, যাতে সীমাবদ্ধ সভ্য ছাড়াও অন্যান্যরাও তার সুযোগ নিতে পারেন। যে সব ছবি শতকরা এক ভাগ মানুষ দেখেন, তার চেয়ে যে সব ছবি স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অগণ্য সাধারণ মানুষকে দিনে তিন বার করে অপসংস্কৃতির আফিম গিলিয়েছে—সেগুলির আলোচনা আরো জরুরি। এটা এতদিন হয়নি বলেই অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলি 'এ্যাকাডেমিক' বা সৌখিন হয়ে অসার মনে হয়, এবং সেজন্যও অনেক সদস্য সেমিনারে আসেন না। এতদিন সোসাইটিগুলি যে কৃত্রিম কাঁচের ঘরে বন্দী হয়ে সৌখিন ও সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতার রোগে ভুগে এসেছেন, স্বদেশের অগণ্য মানুষের দর্শনধন্য ছবিগুলির পরাক্রান্ত শক্তিকে না বুঝতে পেরে, বিশুদ্ধ কিছু গালাগালি ছুঁড়ে—ফিল্ম সোসাইটির কাঁচের ঘরের মধ্যে কিছু সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণালের বা কিছু গোদার রেনোয়াঁ ফ্যাসবিণ্ডারের ছবি দেখে মিথ্যা গৌরবে 'মাথাভারি' করে চলে আসেন ও সাধারণ দর্শক শ্রেণীর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরিণামে ফিল্ম সোসাইটিগুলিও যে আর এক ধরণের অপসংস্কৃতিরই বীজাণু বহন করতে শুরু করেছে (যার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে কষাঘাত)—এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ফিল্ম সোসাইটিতে সত্যকার শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ মানুষকে নেমে আসতে হবে সাধারণ দর্শক শ্রেণী যে চলচ্চিত্রের আওতার মধ্যে পড়ে আছেন—সেই সাধারণ দর্শক শ্রেণীর জগতে, তাঁদের কাছে তাঁদের মত করে খুলে ধরতে তাঁদের দর্শনধন্য হিন্দী ছবিগুলির আসল চরিত্র, এগুলির পিছনে কোন শক্তির কী ভয়ংকর চাতুরিপূর্ণ খেলা চলছে। এগুলি কি ভাবে করা যায়, তার চমৎকার উদাহরণ আছে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত বামপন্থী চলচ্চিত্র পত্রিকা 'সিনেয়াস্ত'য়ে প্রকাশিত, 'এন্টার দ্য ড্রাগন', 'এক্স্‌সরসিস্ট' ছবির আলোচনায়।

(৪) সোসাইটিগুলি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র পত্রিকা—এক্ষেত্রেও ঠিক আগের কথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃ এই পত্রিকাগুলির প্রতিটি সংখ্যায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকা দরকার যেখানে জনগণ দর্শনধন্য ছবির নিপুণ বিশ্লেষণ থাকবে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে সাধারণতঃ যা ভাবা হয়ে থাকে যে 'ববি' বা 'মকদ্দর কা সিকান্দার' বা 'ঘরৌন্দা' (এই শেষোক্ত ছবিগুলি আরো বিপদজনক কেননা এখানে চাতুরিটা এমন যে অনেক বুদ্ধিমান দর্শকও এসব ছবিকে ভাল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন) ইত্যাদি আফিম চলচ্চিত্র নিয়ে গভীর আলোচনা সম্ভব নয়—একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। বরং এই সব আফিম চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে এর স্রষ্টারা ও তাদের মদতদাতারা যে নিপুণ বুদ্ধির খেলা দেখায়, তাকে তুলে ধরাটা কম চিন্তাকর্ষক নয়। মূলতঃ এগুলির পিছনে বুর্জোয়া বুদ্ধির যে চাতুর্যপূর্ণ খেলা আছে সেটা অবশ্যই দুর্বুদ্ধি কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় এরা প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের চেয়ে কম নয়, নিজেদের লাইনে এরা আরো পারদর্শী।* এই সব ছবিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এতকাল আমরা বোকা বনেছি, আর নয়, এরপর এদের শক্তির সম্যক পরিচয় জেনেই এদের মোকাবিলা করা দরকার—এবং এবিষয়ে ফিল্ম সোসাইটির পত্র পত্রিকার একটা দায়িত্ব আছে। এর দ্বারাই একটা 'চিত্রবীক্ষণ' বা 'চিত্রকল্প' বা 'চিত্রভাষ' ইত্যাদি সত্যকার জনগণের কাছে পাঠ্য হবে, নাহলে শুধু কিছু সৌখিন নাকউঁচুদের হাতে ঘুরে এদের কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটবে।

(৫) যে সব প্রগতিশীল সৎ চলচ্চিত্রকারের ছবি প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে বা তাদের দ্বারা 'কণ্ডিশনড্' সাধারণ দর্শকদের নতন কিছু নেওয়ার অসাড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে টি কতে চায়, সেই সব ছবির স্বপক্ষে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কর্তব্য আছে। তাদের জন্য প্রচারে নামতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালে 'কলকাতা ৭১'-এর স্বপক্ষে নেমেছিল সিনে সেন্ট্রাল, এবং বর্তমানে 'মুক্তিচাই' বা 'দৌড়' ছবির স্বপক্ষে নেমেছেন কলকাতা সিনে ক্লাব—ঠিক সেইভাবে—বরং আরো জোরালভাবে। অন্যদিকে মৃণাল সেনের 'কোরাস' ছবি নিয়ে একটি ফিল্ম সোসাইটির বিদ্রূপ ও অপপ্রচার একটি জঘন্য ইতিহাস হয়ে আছে।

(৫) চলচ্চিত্র নিয়ে নূতন যে সব মানুষ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করছেন—তার গুরুত্ব অনুযায়ী, প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির কিছু উদ্যোগ নেওয়া কর্তব্য। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে (যা অনেকেরই আছে) নতুন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়া উচিত, অন্ততঃ পক্ষে আর্থিক সাহায্য দেওয়া কর্তব্য—যদিও দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটী ফিল্ম সোসাইটিই (কলকাতা সিনে ক্লাব) একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

(৬) ফিল্ম সোসাইটিগুলির নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণ, এটি এদেশে এই মুহূর্তে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব না হলেও

* এবিষয়ে যাঁদের এখনো সন্দেহ আছে তাঁদের সিনেয়াস্ত পত্রিকার উক্ত দুটি আলোচনা এবং বর্তমান লেখকের 'চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি' নিবন্ধ (শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' গ্রন্থ, এ, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৫৪ দ্রষ্টব্য এবং 'গণ দর্শনধন্য ছবি প্রসঙ্গে' (নন্দন, পৌষ সংখ্যা ১৯৭৯) নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তরুণ যে সাহসী দু চারজন নূতন চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন, যদি তাঁদের ছবির সুস্থ সমাজমুখী প্রবণতা থাকে, তাহলে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা কর্তব্য।

(৭) নূতন সভ্য গ্রহণ করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে সব মানুষের সমাজ সচেতনতা আছে তাঁদের কী করে বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করা যায়। যদি সম্ভব হয়, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সদস্যদের কিছু সুবিধা দেওয়া উচিত। পূর্বোক্ত আলোচনা সভা ও পত্রিকা বা ইস্‌তেহারের মাধ্যমে সেই সব তরুণকে, শ্রমিক ও কৃষককে (শিল্পাঞ্চলের বা মফঃস্বল অঞ্চলে এদের মধ্য থেকে কিছু সদস্য যে করা যায়, তা কয়লাখনি অঞ্চলে ফিল্ম সোসাইটি করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি এবং সেটা ১৯৭১-৭২ সালে, এখন সেটা আরো বেশি সম্ভব।) ক্রমাগত উৎসাহিত করা, যাঁদের আছে দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠতা ও সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্থ ধারণা—যাঁরা একদিন এই শ্লথ বিশুদ্ধ প্রমোদমুখী মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক আন্দোলনকে সত্যকার জনগণের চাহিদা পূরণের পথে নিয়ে যাবেন। একে বলা যেতে পারে, আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র বদলের সুস্থ প্রচেষ্টা। বলাবাহুল্য মাত্র, বাবুকেন্দ্রিক কলকাতার চেয়ে এ ব্যাপারে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির সুযোগ বেশি।

(৮) উল্লেখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা তার পূর্ণতর বিকাশ দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূল ফেডারেশন এত বেশি কলকাতাকেন্দ্রিক যে মফঃস্বল সোসাইটিগুলি যথেষ্ট অবহেলিত। কিছুটা কলকাতাকেন্দ্রিকতা বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিবার্য, কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা এখন যে চেহারা নিয়েছে, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক ফেডারেশনের কর্মী সমিতি নির্বাচনে—তা দুঃখজনক শুধু নয়, রীতিমত লজ্জাজনক! ফলাফল বিশ্লেষণ করে এমন ধারণা হয় যে, যেখানে মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা কলকাতার সোসাইটিগুলির নির্বাচনপ্রার্থীর বেশির ভাগকে ভোট দিয়েছেন, সেখানে কলকাতায় প্রতিনিধিরা মফঃস্বলের সোসাইটির নির্বাচনপ্রার্থীকে প্রায়শঃই ভোট দেননি—ফলে একজন ছাড়া মফঃস্বল সোসাইটিগুলির কোন নির্বাচন প্রার্থীই কর্মসমিতিতে স্থান পান নি; তাও তিনি নৈহাটির নির্বাচনপ্রার্থী—যে নৈহাটি কলকাতার কাছেই। বলাবাহুল্য, এরকম কলকাতাকেন্দ্রিকতা সেই গোষ্ঠীবদ্ধতারই নামান্তর—যা আজ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুরবস্থার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে এই স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির প্রতিনিধিত্বকে সংরক্ষিত করার জন্য ফেডারেশনের এখনই উপযুক্ত বিধি নিয়ম রচনা করা উচিত, নতুবা এই আন্দোলনে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলি তাদের অবদান রাখার ব্যাপারে নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে পড়বে—এবং পূর্বোক্ত পরিকল্পনার একটিরও রূপায়ণ সম্ভব হবে না। পুনশ্চ স্মর্তব্য, মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলিই আন্দোলনের ভবিষ্যত। ফিল্ম সোসাইটির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিকতার কাঁচের ঘর যেখানেই প্রথম ভাঙার সম্ভবনা যদি মূল নেতৃত্ব তা চান!

(৯) প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকা উচিত, যেখানে গ্রন্থ পত্রিকা শুধু আলমারিতে 'কেউ খোলে না পাতা' হয়ে বিরাজ করবে না (এখন যা ঘটে), বরং যা উৎসাহীদের হাতে পড়বে এবং পাঠচক্র তৈরী করাবে। অবশ্যই গ্রন্থ সংরক্ষণেরও জন্য সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিধি নিয়ম দরকার, কেননা এ দেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক বিদেশী গ্রন্থ বারবার বাজারে লভ্য নয়। কিন্তু বই হারাবার ভয়েই কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না—এটাও কোন যুক্তি হতে পারে না।

(১০) সবচেয়ে যেটা জরুরি তা হচ্ছে, প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব একটি পরিষ্কার শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং উদারতর অর্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে—যার ভিত্তি হবে প্রশস্ত (broad based), এবং তার পূর্ণ মূল্যায়ণ অবশ্যই চলবে গণতান্ত্রিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু নির্দিষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ণের মতই, সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা গ্রাহ্য মতাদর্শগত (idcological) কাঠামো রাখতেই হবে; যেখানে চলচ্চিত্রকে শুধু শিল্প হিসেবেই নয় সামাজিক শক্তি হিসেবেই দেখা হবে। এবং এর প্রধানতম কাজ হবে ফিল্ম সোসাইটিকে ক্রমশঃ গণমুখী করে তোলা।

বলাবাহুল্য মাত্র, এখানে কোন দলীয় রাজনৈতিক মতদর্শের কথা বলা হচ্ছে না।

আমার মনে হয়, আমরা যদি শুধু এইটুকু দিয়েই, এবং তাও যতটা সাধ্য, শুরু করি আমাদের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন একদিকে পথপ্রদর্শকদের সদাত্মক অবদানকে গ্রহণ করে অথচ তাদের 'ভুল' এবং আবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকার 'আন্দোলন' হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত আন্দোলন বলে যা বলা হয় সেটা হচ্ছে নিজেকে ভোলান, কেননা যে আন্দোলনের সঙ্গে এমন কি দূর ভবিষ্যতেও জনগণের কোন সংযোগের সম্ভাবনা নেই, তাকে আন্দোলন বলা উচিত নয়।

'সব শিল্পর মধ্যে চলচ্চিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' আসুন, লেনিনের এই ভবিষ্যৎ বাণীকে, সার্থক করার জন্য আমরা যথা সাধ্য করি।

অথবা

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন জনগণ বিচ্ছিন্ন একটি সৌখিন কাগুজে আন্দোলন মাত্র হয়ে ক্রমশঃ বিকৃত ও জীর্ণ হয়ে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হোক।

এবং

নূতন কিছুর জন্ম হোক।

সত্যজিৎ রায়ের জগৎ

চলচ্চিত্র-শিল্পকে যাঁরা চারুকলার স্তরে তুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁদেরই একজন। এখানে তিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণ সম্পর্কে লেখক জোসেফাস ড্যানিয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৯২১ সালের ২রা মে, একটি প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী পরিবারে। ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এই মানুষটি এমনিতে প্রশান্ত, কিন্তু চলচ্চিত্রে বাস্তবতা সম্বন্ধে বলতে বলতে তিনি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিতে তিনি যে তিনটি ছবি তুলেছিলেন, তাদের প্রথমটি 'পথের পাঁচালী'। এটিই তাঁর জীবনে প্রথম তোলা ছবি। তিনি নিজেই এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন, তারপর মূলধন যোগাতে কাউকে রাজি করাতে না পেরে নিজেই কষ্টে সৃষ্টে তেইশ হাজার টাকা জমিয়ে নিয়ে ছুটির দিনে আর সপ্তাহান্তে ছবি তোলা শুরু করেছিলেন। মোট মাত্র সত্তর দিন ছবি তোলা হলেও এটি সম্পূর্ণ করতে তিন বছর লাগে। ১৯৫৫ সালে ভারতে মুক্তি পেয়েই 'পথের পাঁচালী' বুদ্ধিজীবী সমাজে সাড়া জাগায়। তারপর ছবিটি যায় ভারতের বাইরে, সর্বত্রই দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল ছবিটির নায়ক শিশু অপু। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্‌সের ক্যান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি 'মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ' বিবেচিত হয়ে পুরস্কার পায়। পরের বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান পুরস্কার পায়—অপুকে নিয়ে রায়ের দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত'।

অপুত্রয়ীর তৃতীয় ছবি 'অপুর সংসার'। তিনটি ছবিতে বলা হয়েছে বাংলা দেশে বাল্য, যৌবন আর পূর্ণ বয়সের একটি কাহিনী। ছবি তিনটি ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। লন্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা লেখেন: "অপুর জীবন কাহিনী নিয়ে রায়ের তিনখানা ছবি যে মাত্রা, প্রসার এবং অবিচ্ছিন্ন সাফল্যের দিক দিয়ে অদ্বিতীয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।" শিল্পের মাধ্যমে মানবিক যোগাযোগে সহায়তা করেছেন বলে ১৯৬৭ সালে রায় র‍্যামন ম্যাগ্‌সেসে পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র-নির্মাতা এবং সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত বলেছেন, রায় "একটি ব্যতিক্রম, একটি বিস্ময়, কোনারকের মন্দির এবং বারাণসীর বয়নশিল্পের মতোই ভারতের গর্বের বস্তু।"

প্রশ্ন: 'পথের পাঁচালী' ছবি তুলবার প্রেরণা আপনি পেয়েছিলেন কিভাবে?

সত্যজিৎ রায়: একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের শিল্প-নির্দেশক রূপে ছয় মাস লণ্ডনে অবস্থান কালে প্রায় রোজই সিনেমায় যেতাম. সেখানকার চিত্র জগতের অনেক তাত্ত্বিক আর সমালোচকের সঙ্গে আলোচনাও হত। ভিত্তরিও দে সিকা-র 'বাইসিক্‌ল্‌ থীফ' ছবিটি তখনই দেখি। তার আগেই আমি 'পথের পাঁচালী' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, কিন্তু অপেশাদার, অখ্যাত অভিনেতা আর কর্মীদল নিয়ে কাজ করা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলাম। 'বাইসিক্‌ল্‌ থীফ' আমার অনেক ধারণা পাল্টে দিল। ভারতে ফিরবার পথে জাহাজেই 'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি লিখে ফেললাম।

প্রশ্ন: আপনি অপেশাদারদের কথা ভাবছিলেন কেন?

সত্যজিৎ রায়: আমি নিজেই যে তখন অপেশাদার। জানতাম ছবি তুলতে সাধারণতঃ যাঁরা টাকা দেন, আমাকে তাঁরা টাকা দেবেন না। পেশাদারদের নিয়ে কাজ করাও শক্ত হত। আমার মতলব ছিল অপেশাদারদের নিয়ে একটি ছোট্ট গোষ্ঠী তৈরী ক'রে নিজেই নিজের কর্তা হবো। যাঁরা বলতেন পেশাদারদের না নিলে চলবে না, তাঁদের কথা কান পেতে শুনতাম বটে, কিন্তু ঠিক করেই রেখেছিলাম আমি আমার নিজের মতেই চলব।

প্রশ্ন: এখনও আপনার অনেক শিল্পী অপেশাদার, তাদের খোঁজ পান কিভাবে?

সত্যজিৎ রায়: একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অপুকে নিয়ে দ্বিতীয় ছবিটির জন্য আমি একটি দশ বছরের ছেলে খুঁজছিলাম। প্রথম ছবিতে অপুর বয়স ছিল ছয়। দ্বিতীয় ছবির কাহিনী শুরু তার চার বছর পরে। তাই আমি চাইছিলাম এমন একটি দশ বছরের ছেলে, যার থাকবে ঐ ছয় বছরের ছেলেটির মতো স্বপ্নালু দৃষ্টি, মুখের আদল আর গায়ের রঙ্‌। একদিন বাসে চড়ে সেই ছেলেকে মুখোমুখি দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম, সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম আমার ছবিতে সে অভিনয় করবে কিনা। সে বলল, "কেন করব না?"

প্রশ্ন: আপনার খ্যাতি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু পেশাদারদের নিয়েই আপনি ছবি করতে পারেন। তবু অপেশাদার শিল্পী নেন কেন?

সত্যজিৎ রায়: ভারতে পেশাদার অভিনেতার সংখ্যা তেমন বেশী নেই। তাছাড়া, একই শিল্পী নিয়ে আমি বার বার ছবি করতে চাই না। যখনই চরিত্রের খসড়া করি, তখনই মনে মনে তার একটা স্পষ্ট চেহারা খাড়া করে নিই। তারপর সেই

চেহারার মানুষ খুঁজে বেড়াই। পেশাদার কাউকে না পেলে অপেশাদারের খোঁজ করি।

প্রশ্ন ঃ কোথায় খোঁজ করেন ?

সত্যজিৎ রায় ঃ কখনো কখনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। যারা সাড়া দেয় তাদের প্রত্যেককে ডেকে দেখি। কখনো বা রাস্তায় মুখ দেখে বেড়াই। দরকার মতো চেহারা মিললে কথা বলিয়ে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখি কাজ চলবে কিনা, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাসের ছেলেটিকে। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমার তিনটি ছবির প্রায় সবগুলি ভূমিকার জন্যই শিল্পী ঠিক করেছিলাম ঐভাবে। একজন অভিনেত্রী ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিতা বন্ধুপত্নী, যিনি আগে কোনো ছবিতে অভিনয় করেননি। একটি বৃদ্ধকে পাই বারাণসীতে নদীর ধারে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর, অপু-ত্রয়ীর দ্বিতীয় ছবিতে যিনি অভিনয় করেছেন। এই ছবিটির চিত্রনাট্য আমি লিখি বারাণসীতেই, এবং ছবির অনেক দৃশ্যেই ছিল ঐ ঘাটের সিঁড়িগুলি। কত মানুষের মনে যে এই অভিনয়-পিপাসা রয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একবার বললেই এঁরা রাজি হয়ে যান। অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু আপনারা যা ধারণা করেন তার চাইতে অনেক বেশী।

প্রশ্ন ঃ যাঁদের অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই, তাঁদের ভেতর থেকে অভিনয় বার করে আনেন কি করে ?

সত্যজিৎ রায় ঃ অভিনয় করবার আর ক্যামেরার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে থাকলেই হয়, বাকিটা তখন সহজ। তখন যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি অভিনয় করিয়ে নেওয়া সর্বদাই সম্ভব। অবশ্য একজন পেশাদারকে সামান্য একটু নির্দেশ দিয়েই খুব অল্প সময়ে যা করিয়ে নেওয়া যায়, একজন অপেশাদারকে দিয়ে তা করাতে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে। কিন্তু ছোট ছোট ভূমিকায়, অথবা যাতে বেশী সংলাপ নেই সেই রকম ভূমিকায়, অপেশাদারদের দিয়ে খুব ভালো কাজ হয়। তাদের 'অভিনয়'-হীন অভিনয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের মতো স্বাভাবিক আচরণ আর কথাবার্তা চমৎকার রসসৃষ্টি করতে পারে। আমার রচিত সংলাপ মঞ্চঘেঁষা বা সাহিত্যঘেঁষা নয়, সরাসরি বাস্তব জীবন থেকেই নেওয়া কিন্তু বাস্তব জীবনের বাহুল্য বর্জিত। ছায়া-ছবিতে চাই প্রায় বাস্তব জীবনের কথাবার্তার মতো সংলাপ, সাহিত্যগন্ধী বা থিয়েটারী সংলাপ নয়। "প্রায়" বলছি এই কারণে যে, আমার ছবির সংলাপের চাইতে বাস্তব জীবনে লোকে অনেক বেশী কথা বলে, বাস্তব জীবনের কথাবার্তায় ফাঁক আর বিরতি অনেক বেশী। আমি আমার ছবির সংলাপে বাস্তব জীবনের ঐ সব ফাঁক, বিরতি, আর বাড়তি কথাগুলো ছেঁটে ফেলি। আমার সংলাপ অপেশাদাররাও সহজেই বলতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার ছবিগুলির আর্থিক দিকের সঙ্গেও জড়িত ?

সত্যজিৎ রায় ঃ আর্থিক ব্যাপারে আমি ভীষণ আনাড়ী। তাই ওদিকটা দেখেন আমার একজন প্রডাকশন ম্যানেজার। অন্য লোক টাকা যোগান, আমি তাঁদের জন্য ছবি করি। আমি কাজের জন্য দক্ষিণা নিই, ছবির মুনাফা তাঁরা পান। আমার ছবি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, বিশেষ করে সে ছবি দেশের বাইরে যাবার সময়, আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই না, কারণ তাতে অফিস, ফাইল আর হিসেব রাখার অনেক হাঙ্গামা। কোন ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তার জন্যে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে পরের ছবির দিকে এগোই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার ছবির দৃশ্যগুলো অনেকবার করে তোলেন ?

সত্যজিৎ রায় ঃ না, সাধারণতঃ দু-তিন বারের বেশী না। প্রথম বারেরটাই সাধারণতঃ সব চেয়ে ভালো হয়, কখনও কখনও দ্বিতীয় বারেরটা। সামঞ্জস্য বিধানের জটিলতা না থাকলে তিন বারের বেশী কোনো দৃশ্য বড় একটা তুলি না। যেমন ধরুন, একটি দৃশ্য ছিল, তিনটি ছেলে মেয়ে ছুটবে আর একটি কুকুর ছুটবে তাদের পিছনে পিছনে। আমরা ছবি তুলছিলাম এক পাড়াগাঁয়ে, আর কুকুরটা ছিল একটা বেওয়ারিস গেঁয়ো কুকুর। দৃশ্যটি ঠিক মতো পাবার জন্য আমাকে এগারোবার ছবি তুলতে হয়েছিল। একটি দৃশ্য এতবার আর কখনও তুলিনি। আমাকে খুব হিসেবী হতে হয়, কারণ আমি অল্পবাজেটের বাংলা ছবি তুলি। ভারতের অল্প সংখ্যক লোকই বাংলা বোঝেন। আমি টিঁকে আছি আমার ছবি বিদেশেও চলে বলে। তাই প্রযোজকদের আমার ওপর এই আস্থা আছে যে, তাঁদের লগ্নী টাকা আমি তাঁদের এনে দিতে পারব।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছবিগুলিতে কি কোনো বাণী থাকে, না তাদের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দদান ?

সত্যজিৎ রায় ঃ প্রথম চারবারে আমি তিন রকমের ছবি করেছিলাম। তারপর কয়েকটি ছবিতে আমি বিশেষ বিশেষ সময়ের রূপ ফুটিয়ে তুলেছি। সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ এবং তার নানা সমস্যার কাহিনী এঁকেছি। পাশাপাশি থেকে পুরাতন এবং নূতনের যে দ্বন্দ্ব চলে সেই দ্বন্দ্বই আমার ছবির বিষয়বস্তু। এই বিষয়টিই ঘুরে ফিরে আমার সব ছবিতেই এসে পড়ে, যদিও সচেতনভাবে নয়। আমার প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যটি ছিল দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেছে, এমন একটি অভিজাত পরিবারকে নিয়ে। একজন সেকেলেপন্থী, কর্তৃত্বপ্রিয় পিতার হুকুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর একেলে তরুণ-তরুণী ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহ করলে কি রকম পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে, আমার চিত্রনাট্যে

তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। যা দেখতে মাথা খাটাতে হয় না, ভারতীয় দর্শক সেই ধরণের ছবি দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আমার ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়, তলিয়ে বুঝতে হয়, প্রতিটি শব্দ কান পেতে শুনতে হয়, প্রতিটি ঘটনার ওপর নজর রাখতে হয়। আমার ছবিতে এমন কি পটভূমিকারও গুরুত্ব আছে। প্রত্যেকটি বস্তুই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে। আপনি অনুভব করবেন ওটি ওখানে থেকে ওর নিজস্ব কাহিনী বলছে। এই জন্যেই আমার ছবি যিনি প্রথমবার দেখবেন, তিনি তেমন উৎসাহিত নাও বোধ করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে তাঁর ভালো লাগতে শুরু করবে। তারপর তিনি সেটি তৃতীয়বার দেখবেন।

প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে কি আপনার নজর থাকে?

সত্যজিৎ রায় ঃ আমি নিজেকে বাঙালী বলে ভাবি; আমার ছবির প্রধান লক্ষ্য বাঙালী দর্শক। আমি আগে জানতে পারিনা ছবিটা ভারতের বাইরে জনপ্রিয় হবে কিনা, কারণ অন্য দেশের রুচি আমার জানা নেই। ভারতের কোন অংশ বা ভারত-সম্পর্কিত কোন্ বিষয়ে অভারতীয়দের আগ্রহ, আমি তা বুঝতে পারি নি। যাই হোক, দেখতে পাচ্ছি বিশেষ বিশেষ সময়ের জীবন বা গ্রাম্য কাহিনী নিয়ে তোলা আমার ছবিগুলি বিদেশে সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ভারত বা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাবধারার মিশ্রণে তোলা আমার ছবি আন্তর্জাতিক বাজারে তেমন সফল হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছবির সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিত্বও বদলায়?

সত্যজিৎ রায় ঃ বিষাদ-গম্ভীর ছবি তুলবার সময় কিছুদিন মনটা ভারী থাকে বটে, কিন্তু ছবির কাজ শেষ হলেই আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাই। বিভিন্ন রকমের মেজাজ নিয়ে আমি ছবি করেছি। অর্থাৎ একটা কমেডির পর যে ট্র্যাজিডিই করব, তা নয়। হয়তো চলে যাব একশ বছর পিছিয়ে, করব তৎকালীন ছবি। ভারতের ঐতিহাসিক আর ভৌগোলিক দিকটি এখন পর্যন্ত বহুলাংশে চলচ্চিত্রে অনাবিষ্কৃত রয়েছে। এদিক দিয়ে অনেক কিছু করবার আছে। তাছাড়া, আন্তোনিয়োনি যেমন বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে পর পর ছয়টি ছবি করেছেন, সেভাবে নিজেরই পুনরাবৃত্তি করার কোন মানে হয় না। এ রকম করা মানে সময়ের ভীষণ অপচয়। বহু বিভিন্ন ধরনের ছবি করবার আমার যে সুযোগ, তার পুরো সদ্ব্যবহার না করা আমার পক্ষে বোকামি হবে।

প্রশ্ন ঃ এখানকার অনেক আন্তর্জাতিক ছবিতে যে নগ্নতা এবং প্রকাশ্য যৌন আবেদন দেখা যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ ওতে একটু বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। শোবার ঘরের একটি জোরালো দৃশ্য থাকলে টিকিট বিক্রির দিক দিয়ে ছবিটি নিরাপদ, এটা বোঝা শক্ত নয়। ছবি আমি অনেক দেখি; তাদের বেশির ভাগই মনে হয় নিতান্তই বাজে, অসংলগ্ন, আনাড়ী আর ভাঁওতায় ভরা। এমনিতে সে সব ছবি দর্শকরা পয়সা দিয়ে দেখতে আসত না, কিন্তু এই ধরনের ছবির নির্মাতারা আত্মরক্ষা করেন ছবির ভেতর এমন কিছু কিছু বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে যাতে টিকিট ভাল বিক্রি হয়। শোবার ঘরের দৃশ্যগুলি যাতে বাজে না হয়, সেদিকে নির্মাতারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁরা খুবই দক্ষ, বাজে হয় শুধু ছবির বাকি সবটাই।

প্রশ্ন ঃ চলচ্চিত্রে অন্যান্য পরিচালকরা যা করেছেন, তার প্রভাব আপনার ওপর পড়ে কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ শুধু এই মাত্র যে মাঝে মাঝে আমার ভাবনা হয় আমার ছবিগুলিকে বড় বেশী সাদামাটা বা নীরস মনে করে পাশ্চাত্য দেশের কেউ কেউ বলবেন কিনা যে 'এগুলো কিছুই হয়নি'। বস্তুতঃ একজন সমালোচক—বোধহয় কেনেথ টাইন্যান—তাঁর একটি লেখায় আমার শ্রেষ্ঠ ছবি 'চারুলতা'-র সমালোচনা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর একটি বুদ্ধিজীবী পরিবার নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কাহিনীকে ভিত্তি করে ওই ছবিটি তৈরী। নায়িকা চারুলতা তার এক দেওরের প্রেমে পড়েছিল। টাইন্যান প্রশ্ন করেছিলেন, তারা চুম্বন করেনি কেন, বাস্তবকে আড়ালে লুকিয়ে না রেখে তাদের চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেখানো হয় নি কেন। কিন্তু এসব ব্যাপার পাশ্চাত্য দেশে বা এমন কি প্রাচ্যেও এখন যত সহজে বা যত তাড়াতাড়ি হতে পারে, আমাদের দেশে ঐ সময়ে তা হওয়া সম্ভব ছিলনা। এখনও কলকাতার রাস্তায় ছেলেমেয়েরা চুম্বন তো দূরের কথা, হাত ধরাধরিও করে না। কোনো বিশেষ সময়ের ছবিতে তাই দেখান উচিত, যা সে সত্যিই ছিল বা হত।

প্রশ্ন ঃ আপনার সর্বশেষ ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র কি রকম সমালোচনা হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় ঃ অনেক সমালোচক বলেছেন, ছবিটি তাৎপর্যহীন, অবান্তর। সব চেয়ে ভালো সমালোচনায় বলা হয়েছিল, ছবিটি জায়গায় জায়গায় চমৎকার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত তা হয়ে ওঠে নি। জানি না তাঁদের ওকথার অর্থ কি। আমার মনে হয় ছবিটি দেখে বেশ খুশী হওয়ার মতো। আমার তো এ ছবি খুবই ভালো লেগেছে, এবং এ পর্যন্ত ছয় সাত বার দেখেছি। মেজাজের দিক দিয়ে ছবিটি খুবই সমকালীন। এতে রোমান্স আছে, আর আছে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র, যাদের মূল্যবোধও বিভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ ছবিটির বিষয়বস্তু কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ ছবিটি কয়েকটি মানুষ সম্বন্ধে। চারটি

বন্ধু থাকত কলকাতায়, নানা বিধিনিষেধ দিয়ে ঘেরা পরিবেশে। তারা চাইল সপ্তাহান্তে কিছু সময়ের জন্য বাধাহীন জীবনের স্বাদ পেয়ে আসতে। এদের একজন দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, ক্রিকেট খেলোয়াড়। তার দেখা হল তারই মতো চট্‌পটে, দুর্দান্ত প্রকৃতির একটি মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু তারপর মেয়েটির কোনো ছাপ রইল না তার মনে। দ্বিতীয় ছেলেটির কোনো রকম উদ্বেগ বা ব্যর্থতাবোধ নেই, জন্ম থেকেই সে পরগাছার মতো। কিন্তু ভারি রসিক আর স্ফূর্তিবাজ বলে তার সঙ্গ সবাই পছন্দ করে। কোন মেয়ের সঙ্গে তার ভাব নেই। মেলায় গিয়ে সে জুয়ার আড্ডায় মেতে রইল। বাকি দুজন গভীরভাবেই ঘটনা স্রোতে জড়িয়ে পড়ল। এদের একজন একটু ভীরু প্রকৃতির, তার মনে নানারকম বিধিনিষেধের বাধা। সে একটি কারখানার লেবার অফিসার। একটি বিধবা তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল, কিন্তু তার পরিণাম হল মর্মান্তিক। কারণ, মেয়েটির প্রেমে সাড়া দিতে সে নিজের মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না। চতুর্থ ছেলেটিও নিজেকে গুরুতরভাবে জড়িয়ে ফেলল। কাহিনীটি বেশ জটিল, সংলাপও সরল নয়। সব সময় বুদ্ধি সজাগ রেখে ছবিটি দেখতে হবে। ছবিটি কোন একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নয়, প্রতিটি চরিত্রের আছে নিজস্ব গুরুত্ব। ছবিটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সমালোচকরা ছবির আসল বিষয়টাই ধরতে পারেন নি। সমালোচকদের বেশীর ভাগই তো বেশী বয়সের মানুষ।

এই সাক্ষাৎকারটি বেশ কয়েক বছর আগে 'স্প্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ এবং প্রসঙ্গত

ধ্রুব ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত যেকোন শিল্পকলার অন্তরালেই এক মূল সুরের কাজ করে। সঙ্গীত যেমন বিমূর্ত ধ্বনির বিস্তার তেমন কথা আর সুরের মনিকাঞ্চন যোগও। এক্ষেত্রে এই বিস্তারের সাথে মানুষের আবেগ ও ভাবপ্রকাশের সথে সংযোগও যথেষ্ট। এবং সঙ্গীতের এই প্রকাশ এত সুক্ষ্মভাবে জাগতিক ঘটনাগুলির সাথে জড়িত যে তার প্রয়োগ সঠিক ভাবে হলে শিল্পের মূল কথা—আবেগ সুসংবদ্ধ প্রকাশকে আরো শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এর প্রধান কারণ সঙ্গীত মানুষের প্রাচীনতম শিল্প। চার্চে এবং মন্দিরে সঙ্গীতকে মুক্তির মাধ্যম বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। ওঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন তাল, লয়, মানুষের বোধকে এমন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছে দিতে পারে যার কোন তুলনা নেই। দ্বিতীয়ত সাঙ্গীতিক মূর্ছনার ব্যবহার এবং তার বৃত্ত এক বিরাট জায়গা জুড়ে অবস্থিত। আমাদের রাগ সঙ্গীতে যে কোন মূল রাগ ধরে যেমন ভৈরব, খাম্বাজ বা মল্লারকে অনুসরণ করেও গড়ে উঠেছে আরো নানান ধরণের লব্ধ রাগ। এক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট—সঙ্গীতের প্রকাশে মূল হিসাবে কাজ করে গতি (movement) এবং ছন্দ (rhythm) এর সঠিক ব্যবহার। সমস্ত মহাবিশ্বের চাল চলন এবং ঘটনার ঘনঘটা এই দুই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা যেতে পারে গতি এবং ছন্দের বিস্তারের উপর নির্ভর করেই এই চলমান মহাবিশ্বের সূচনা এবং অন্তিম গতি।

এক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রকাশের যন্ত্রগুলিতে ছন্দ এবং গতি পদার্থ-বিদ্যার সূত্র দ্বারা এমন ভাবে গ্রথিত যে ছন্দের বিস্তার, গতির উপর নির্ভরশীল এবং গতির প্রকাশ ছন্দের উপর নির্ভরশীল। সে ক্ষেত্রে কথার প্রবেশ যখন আসে তখন ঐ কথাকে এমন ভাবে সাজিয়ে নিতে হয় বা ভেঙ্গে নিতে হয় যা মূল সুরের বিস্তারের উপর নির্ভরশীল হয় এবং যখন তা সবচেয়ে শ্রুতিমধুর হিসেবে সাজান হয় তখনই তাই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। মূল সুর সা—রে—গা—মা ইত্যাদিকে ভেঙ্গে সাজিয়ে ছন্দের বিস্তারকে বলে আলাপ এবং যখন কথাকে ছন্দে গ্রথিত করে গতিতে বিস্তার হয়, তখন তাকে বলে খেয়াল এবং ধ্রুপদ শ্রেণীভুক্ত। যেমন "শবরী সুবাসে দেখ ওয়াকি" এই কথাকে খাম্বাজ রাগে গ্রথিত করে বিস্তার করেছেন মথুরার মাধোজি। এই ছন্দের বিস্তার সূর্য্য, চন্দ্রের অবস্থানের উপর, আকাশের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেমন ভোর বেলা সূর্য্য আকাশে উঠে যাচ্ছে তখন ভৈরব সুরের বিস্তার হয় আবার আকাশে মেঘ এসেছে ঘনঘটা হয়ে তখন গীত হয় মেঘমল্লার রাগিনী। সুর হিসাবে মেঘমল্লারের স্ত্রী চরিত্র তাই রাগিনী।

রাগের স্ত্রী এবং পুরুষ চরিত্র নির্ভর করে উদ্দিষ্ট পার্থিব যোগাযোগের চরিত্রের উপর। বিদেশী সঙ্গীতেও এমন ধারণার সাথে আমরা পরিচিত যেমন Sunset of the Rhine অথবা Moonlight sonata ইত্যাদি। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের যোগাযোগ

তার জন্মলগ্নেই। ছবিতে কথা এসেছে অনেক পরে প্রায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর। কিন্তু সঙ্গীতের সাথে যোগাযোগ ছিল প্রায় প্রথম দিককার ছবিতেই। যেমন প্রথম আক্ষরিক অর্থেই silent-films গুলোতে ছবি চলাকালীন তার পাশে concert বাজান হত। এর প্রথম কারণ ছিল ছবি কি আকার নেবে দর্শকের মনে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় সঙ্গীত মাঝখানের এই শূন্য স্থানকে পূরণ করতে পারে এমনতরো ধারণা এবং সঙ্গীত যে সব সময়েই এক ধরণের "musical relief" হিসাবে কাজ করে তা তখনকার নির্মাতারা জানতেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ল্যুমেয়ার ব্রাদার্সের ছবি উদ্বোধনের সময়ও পিয়ানোতে জনপ্রিয় সুর বাজান হয়েছিল। এরপর প্রায় প্রত্যেক সিনেমা হলই নিজেদের পছন্দ মতো "অর্কেস্ট্রা দল" রাখতে শুরু করলেন। সেক্ষেত্রে একই সিনেমার ভাগ্যে নানান স্থানে নানান সুরের আবহ সঙ্গীত জুটত। এরপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন কম্পানী ছবির সাথে সাথে নির্দিষ্ট সঙ্গীত লিখতে শুরু করলেন। অর্থাৎ কোথায় পিয়ানো বাজবে, কোথায় বেহালা বাজবে, তাদের কি সুর হবে তা তারা ঠিক করে দিতে লাগলেন। এই নজরটা এসে যাওয়ার সাথে সাথেই ছবিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ অনেক বেশী সুসংবদ্ধ হয়ে গেল। যেমন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেইন্ট-সায়েন্স প্রথম "Film d' Art" হিসাবে বিজ্ঞাপিত "The Assassination of the due of guise" ছবির অসাধারণ সুর সংযোজনা করলেন। এর এই সুর সংযোজনার নাম অপিয়াস ১২৮। যাতে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, স্ট্রিং, পিয়ানো, হারমোনিয়াম। ছবির মূল চরিত্রের সাথে সঙ্গীতের যোগাযোগ খুব সঠিক ভাবে করা হয়েছিল। এমন করা হয়েছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ছবি "আরা-না-পগ্", ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ছবি "বিচার্ড-ওয়ার্গনারে।"

এখন এ কথা প্রায় সমস্ত চিত্ররসিকই জেনে গেছেন ছবির জগতে এক বিরাট step ছিল গ্রিফিথের "বার্থ অব এ নেশন"। এ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা এই শতাব্দী জুড়ে হয়েছে। এই ছবির সুর রচনাও কার্য্যকরী ভাবে প্রথম সোপান তুলে ধরেছিল। ভিক্টোরিয়ান এজের সাহিত্য ও শিল্পে বিদগ্ধ গ্রিফিথ সুর রচনার ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীদের সাহায্য নেন। লোক গাথা এবং সিম্ফনি এবং অন্যান্য অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে গ্রিফিথ ও জোসেফ কার্ল ব্রেইন নির্বাচন করেন In the Hall of the Mountain King" প্রভৃতি সঙ্গীত এবং বিটোভেন, সেইকোভস্কি, লিজস্ট, রসিনি, ভার্দি প্রভৃতির সুর রচনা থেকে। এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গীতের সঞ্চার ও বিস্তারকে কাজে লাগান হয় ছবির যুদ্ধকালীন পটভূমিকায়, প্রেমের দৃশ্য, নিগ্রোদের উপর অত্যাচার দেখানোর সময়। যে কাজটি গ্রিফিথ করেছিলেন তাহল সঙ্গীতের সঞ্চারের মধ্যে অবস্থিত আবেগাত্মক দৃশ্যগত ঘটনার সাথে এমন ভাবে মিশিয়ে দিতে যার ফলে ছবির চিত্রগ্রাহ্যতা আরো বেড়ে যায়।

গ্রিফিথ যেমন প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ সঙ্গীতকে ছবিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন, ছবি নির্মাণ করার সময় সোভিয়েত দেশের পরিচালকদের পরিচালক আইজেনস্টাইন ছবির দৃশ্য সংগঠনের প্রয়োজনে ছবির জন্য অসাধারণ সুর রচনা করালেন এডমাণ্ড মাইসেলের সঙ্গীত পরিচালনায়। "ব্যাটেলশিপ পটেমকিন" ছবির জগতে দৃশ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে এক স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব আনে। ছবির দৃশ্য সংযোজনের এই নূতন ব্যাকরণ সংঘটিত হয়েছিল বিপ্লব থেকে উদ্ভূত জনচিত্তের সাথে শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিমূর্ত সূত্রগুলির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ফলে। ছবিতে সুর রচনা করেছিলেন এডমাউণ্ড মাইসেল। তাদের সঙ্গীতের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যুরি ডেভিডভের "The October Revolution and the Arts" বইতে পড়েছিলাম,

"They tried to give pride, of place to rhythm and not melody ; to a simultaneous harmony of musical themes instead of to their gradual development in the time plane. In general the chief priority became music's structural links, not its temporal ones, a principle which we have found to be characteristic of the montage method and which constitutes its back bone."

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঙ্গীতের বিস্তার ছিল দৃশ্যগত মন্তাজের পরিপূরক, 'মন্তাজ' শব্দটি ফরাসী যার অর্থ সংযোজন। কিন্তু রাশিয়ার চলচ্চিত্রে দেখা গেল সম্পাদনার সময় ক দৃশ্য ও খ দৃশ্যের সংযোজন শুধুমাত্র পাণিতিক যোগ না হয়ে তা এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করল যাকে আইজেনস্টাইন বলেছেন "সংঘাত" অর্থাৎ প্রতিটি সেলুলয়েডের মধ্যেকার দৃশ্যের সংযোজন এভাবে হবে যাকে চৈতন্য দিয়ে দেখতে হবে, শুধু মাত্র খালি চোখের দেখা নয়। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের এই নূতন ব্যাকরণ এর সাথে সঙ্গীতের সংযোজন এমন ভাবে করা হল যাতে যে আদর্শভাবের সৃষ্টির কথা ভাবা হচ্ছে তা সার্থক হয়। চলচ্চিত্রে ব্যাটেলশিপ্ পটেমকিনের সঙ্গীত রচনা এমন সার্থক ও অর্থবহ হয়েছিল যে ধনতান্ত্রিক দেশে ছবি চলতে দেওয়া হলেও তার সঙ্গীত banned করে দেওয়া হয়েছিল। জার্মানীতে সঙ্গীত বন্ধ করার ব্যাপারে বলা হয়েছিল "dangerous to the state".

সঙ্গীতের এই সংযোজন এর সার্থক কারণ হিসাবে আইজেনস্টাইনের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, কেউ কাঁদে তার কারণ এই নয় তারা দুঃখিত বরং তারা দুঃখিত বলেই কাঁদে

(জেমসের সাইকোলজিক্যাল সূত্র)। এই বয়ানে যেমন এক ধরণের aesthetic paradox রয়েছে, তেমন রয়েছে যে আমাদের মধ্যবর্তী নিজস্ব অভিব্যক্তিই তার পরিপূরক অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। কোন চরিত্রের আবেগের প্রকাশের জন্য ছবিতে যেমন চরিত্রের গতিশীলতার দরকার হতে পারে, তেমন প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় তার অঙ্গভঙ্গী (gesture) এই চরিত্রের গতিশীলতা এবং অঙ্গভঙ্গীও নির্ভর করে চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতা, অবস্থান, সময়-অসময় এবং তার ব্যক্তি চরিত্রের ব্যতিক্রমের উপর। অর্থাৎ কোন চরিত্রের সঠিক সংযোজনের সময় সঙ্গীতের ব্যবহার হবে তার চারিত্রিক, মানসিক, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর। রাত্রির অন্ধকারে কোন গরীব বাচ্চা ছেলে রাস্তায় এক টাকা কুড়িয়ে পেল, তার মুখ আনন্দে উপ্‌চে পড়ছে, এমন সময় কেউ ভৈরব রাগ বাজিয়ে দিলেন আবহসঙ্গীত হিসাবে, সেক্ষেত্রে ভুল হবে এই সঙ্গীতের প্রধান সময়কাল ভোরবেলাকে অস্বীকার করা। ফলে সেই সঙ্গীত নির্বাচন কোন অর্থেই সার্থক সঙ্গীত নির্দেশনা বলা চলে না।

এক্ষেত্রে আরেকজনের ক্ষেত্রে সুর রচনা হত অসাধারণ। উনি চার্লস চ্যাপলিন। 'লাইম লাইট'-এর সুর রচনায় সঙ্গীতের নৈপুণ্য এবং অপরিসীম জ্ঞান ছবির মতোই অসাধারণ উঁচু স্তরে ছিলো। "The Kid" ছবিতেও স্বপ্নদৃশ্যে সঙ্গীতের রূপান্তর-গুলি ছিলো উঁচু মানের। এক্ষেত্রে এখনো প্রবীণ পরিচালকদের মধ্যে অনেক আছেন যাদের ছবিতে সঙ্গীতের স্থান অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। যেমন ক্রফো এবং গদারের ছবিতে। ফেলিনির "I Remember" ছবিটিতেও সঙ্গীতের ব্যবহার অন্যদের তুলনায় বেশী।

সাইলেন্ট ছবির সময়কাল এখনকার ছবির সময়কাল থেকে সাধারণতঃ কম ছিল। এবং ঘটনার প্রকাশেও সে সময় পরিচালকদের লক্ষ্য করতে হত চরিত্রের গতিশীলতার উপর। কারণ সংলাপের সুযোগ নিয়ে একটানা "relax scene" তৈরী করা সে সময় সম্ভব ছিল না। ফলে রূপের দিক দিয়ে সঙ্গীতের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হলেও তা নির্বাচিত হত যত্ন সহকারে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাধারণ চলচ্চিত্রের অবস্থা খুব কাহিল। এখানে কথাপ্রধান সঙ্গীতের ব্যবহার এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যা সঙ্গীতের আদর্শকেও ব্যাঘাত করেছে এবং anatomy গঠনে কোন রকম কার্যকরী হচ্ছে না। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার চলচ্চিত্র একটা গতিশীল শিল্প আবার গতির সাথে সঙ্গীতের যোগাযোগ অসাধারণ তাই সঙ্গীতের সাথে চলচ্চিত্রের যোগ হবে সেখানেই যেখানে তাদের মৌলিক ধর্ম একত্রিত হয়।

ছবিতে সংলাপ আসার পর অর্থাৎ শব্দ আসার পরেও চলচ্চিত্রের ধর্মের দিক থেকে পরিচালকরা বুঝতে পেরেছিলেন, সংলাপের আধিক্য হলে চলচ্চিত্র হয়ে পড়ে বর্ণনামূলক যা আদৌ শিল্পচিত্রের অন্যতম ধর্ম হতে পারে না। তাই আবেগের প্রকাশে তারা আরো বেশী যত্নবান রইলেন সঙ্গীতের ব্যবহারের উপর। শব্দ আসার পর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন গ্রেট বৃটেনের উইলিয়াম এল্‌উয়ন, আর্থার বেঞ্জামিন, আর্থার ব্লিস, ফ্রান্সের আর্থার হোনেগার, মউরিস জুর্বার, ডেরিয়াস মিলাউড ইত্যাদিরা। রাশিয়াতে ছবিতে শব্দ আসলো ১৯৩১ সালে। প্রথম দিককার ছবিতেই তরুণ সঙ্গীত পরিচালক ডিমিট্রি মস্তাকোভিচ অসাধারণ সঙ্গীত নির্দেশনা করলেন, 'অ্যালোন, গোল্ডেন মাউন্টেন' ছবিতে। উনি সঙ্গীতের টুকরো টুকরো, কথা, ভাঙা সংলাপ জুড়ে এমন এক নাটকীয় একত্রতা তৈরি করলেন যা চলচ্চিত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়ে রইল। আর তারই সাথে প্রবীন প্রকোবাইভ সঙ্গীত পরি-চালনা করলেন 'আলেকজেণ্ডার নেভস্কি' এবং 'ইভান দ্য টেরিবল' এর দুটি পর্ব-যার উত্থান, পতন, স্তব্ধতা, এখনো অসাধারণ বলে চিহ্নিত।

এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিচালকরা বুঝতে পারছিলেন সঙ্গীত নিজেই একটা পূর্ণ মাধ্যম এবং শিল্পে তার একার প্রবেশ নিশ্চিত। কিন্তু শব্দ-ছবিতেও চিত্রময়তা বা visual-ই হল চলচ্চিত্রের প্রধান গুণ। সেক্ষেত্রে চিত্রে দর্শনগ্রাহ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে সঙ্গীত। সঙ্গীত ছাড়াও চিত্র সম্ভব কিন্তু তার সম্পূর্ণতায় একটা ফাঁক থাকে, তা হল তাতে গতির সঞ্চার চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা যায় না। এক্ষেত্রে সঙ্গীত কাজ করে "servant art" হিসাবে। (কোন সঙ্গীত রসিক যেন এই বক্তব্যে দুঃখিত না হন) সঙ্গীতের এই ব্যবহার অপেরা বা যাত্রা অথবা নাটকে অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রে এই ব্যবহার যত কার্যকরী হল অন্যান্য মাধ্যম ততখানি যেতে পারে নি।

ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার কী পরিমাণে হবে তা নির্ভর করে চলচ্চিত্রের চরিত্রের উপর। প্রথমতঃ এখনকার শহরের ছবিতে যেখানে সঙ্গীত জীবনের চলাফেরায় আস্তে আস্তে কমে আসছে এবং তা দখল করে নিচ্ছে নানান ধরণের যান্ত্রিক শব্দ সেখানে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যবহারও প্রয়োজন মত না হলে যথেচ্ছাচার। egg-head intellectuals-রা প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু তাহলে ছবিতে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধরা যাক যেখানে হাল চাষ হচ্ছে, গরুর সাথে কথা বলছে চাষী এক অপূর্ব ভাষায় সেটা নিশ্চয়ই ট্রাকটার দেখাবার সময় সম্ভব নয়। এখানে এমন কথা বলা হচ্ছে না ট্রাকটার চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগান হবে না। বরং দেখান হচ্ছে artistic quantities এর রূপও তার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। কনে নিয়ে পাল্কী চলেছে "হুকুম্বা হুকুম্বা" করতে করতে এই কথা বা শব্দ-গুলো এক অদ্ভুত লোকসুরে বাঁধা কিন্তু সে ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হয়ে গ্রামেও কনে যাচ্ছে রিক্সায় বা ট্যাক্সিতে। ছন্দটা দূরে চলে যাচ্ছে এবং তা পরিবর্তিত হয়ে আসছে যান্ত্রিক শব্দ। পাখীর সংখ্যাও কমে আসছে।

এর ফলে sound films-এর ক্ষেত্রে বিদেশে (এবং এদেশেও) electronic music direction, কম্পুটার কর্তৃক সঙ্গীত পরিচালনা এবং অদ্ভুত সব শব্দকে সঙ্গীতের আকার দেওয়া হচ্ছে। আবার অবশ্যই এর quality নির্ভর করবে রচয়িতার পারদর্শিতার উপর। সেক্ষেত্রে শিল্পের ভেতরকার ধারক গুণাগুণ থেকে যাওয়ার সাথেসাথেই লক্ষ্য করা যায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত জাগরণকে। অবশ্য এর সাথে এটাও আজ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এখনকার সময় কোন এক বিশেষ মুহূর্তের দিকে ধাবমান হতে পারে নি। এই সময়কে বলা যেতে পারে নানান ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নানান বিপরীতার্থক সময়ের যোগফল। তবুও জীবনের সংজ্ঞা হিসেবে শিল্পীদের গ্রহণযোগ্য হল, an emotional link with others এবং তাও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু দিয়ে। সেক্ষেত্রে এরই প্রতিফলন চলচ্চিত্রে আসার সময় পরিচালকদের লক্ষ্য রাখা দরকার, শিল্পের নন্দনতত্বের প্রসার হয় উদার অনুভবের প্রসন্নতায়। সঙ্গীতের মূলগত ধর্মও তাই। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গেলেও বাকী থাকে মাধর্য্য, বিশুদ্ধ মাধুর্য্য।

উপরের এই ধ্যান ধারণাকে চলচ্চিত্রে আমাদের দেশে সঞ্চারিত করেন সত্যজিৎ রায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, পেশাদার শিল্পীর মতোই পিয়ানো বাজাতে পারেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'র সুর ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম সার্থক সঙ্গীত রচনা। টিন, বাক্স, পেয়ালা, পাখীদের কিচির মিচির, তার সানাইয়ের ব্যবহার এভাবে মিশে গিয়েছিল যার তুলনা নেই। সর্বজয়ার কান্নার সাথে তার সানাইয়ের ব্যবহার এবং ইন্দির ঠাকরুণ দাওয়ায় বসে খালি গলায় "হরি দিন তো গেল, বেলা তো হল" এমন একটা effect সৃষ্টি করেছেন যা আগামী দিনের lesson হিসেবে নিতে হবে এবং হচ্ছে।

'জলসাঘর' ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এক অভিজাত মানুষকে নিয়ে, ছবিতে সঙ্গীত নির্দেশনা করেছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, এক্ষেত্রে সঙ্গীতের দায়িত্ব ছিল অসাধারণ। ছবির কেন্দ্র চরিত্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই বেঁচে আছেন, তাঁর চরিত্র এবং প্রকাশ সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা উম্মাসিক flash আছে। মন্তাজের টেকনিক দুটি মাত্র মূল shot নিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছিল 'জলসাঘর'-এ। ওস্তাদ গান ধরেছেন, ইন্টারকাট করে দেখান হল বাইরে প্রসন্ন আকাশ, আবার ঘোড়ার হ্রেষার সাথে সানাই এর সুর মূর্ছনা যোগ করে দেওয়া হয়েছিল অতীতের জীবনকে ধরার জন্য।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিতেও আবহ সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুর ছিল অসাধারণ। বিদেশী সঙ্গীত যন্ত্র, যেমন যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝান হয়েছে ড্রাম বাজিয়ে ও ভারতীয় সঙ্গীতযন্ত্রকে মিশিয়ে তোলা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ' (প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে বলি আইজেনস্টাইনের ও অন্যান্যদের টাইপেজের উপর লেখা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ' চিত্রটি আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি টাইপেজের ফিল্মের একটি, অন্য ছবির নাম 'অক্টোবর')। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তেও তাই। সেখানে দার্জিলিং এর পারিপার্শ্বিক শব্দগুলির সাথে ছবিকে এক করে দেওয়া হয়েছে। যেমন গীর্জার ঘন্টা, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, পাখীর ডাককে আবহ সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করেছেন তারই সাথে লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) "নিজ বাসভূমে" গানটির একটা অংশ গাইছেন। 'অভিযান'-এ সত্যজিৎ রায় আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। আবহ সঙ্গীতে দেশওয়ালিদের টুকরো গান, গুলাবীর মুখে গান ইত্যাদি ভেঙ্গে জুড়ে এক বিরাট সম্পদে পরিণত করেছিলেন।

তারপর 'চারুলতা'য় আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা। মোজার্টের রেকর্ড সত্যজিৎ রায়ের খুব প্রিয় ছিল আগে থেকেই। তার থেকে সঙ্গীত নিলেন এবং তারই সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভেঙ্গে এমন এক সঙ্গীতের হাট তৈরী করলেন যার তুলনীয় ব্যাপার এখনো ভারতীয় ছবিতে আসে নি। এ ছবিতে চারিটি সাঙ্গীতিক মোটিভ আছে, একটা 'চারুলতা'র নিঃসঙ্গতা বোঝাবার জন্য, দ্বিতীয়টি অমলের কাছে চারুর ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য, তৃতীয়টি ক্ষচ সুরের অবলম্বনে এবং চতুর্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুসারে। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এগার মিনিট।

সঙ্গীতের ব্যবহারকে আরেকবার অসাধারণ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সে ছবি ছিল 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'। ওই ছবির প্রত্যেকটি গান উনি রচনা করেছেন। সাদামাটা কথাতে অসাধারণ সুর ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে কথা আর সুরের এমন ব্যবহার আর হয় নি। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় কি পরিমাণ দখল রাখেন তাও এই চিত্রে দেখা গেল। প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহ ফিল্মে আসার পর দিনের পর দিন বাড়ছিলো। সেই আগ্রহকে উনি কাজে লাগালেন এই ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি বাদেও ভারতীয় চলচ্চিত্রে আরো সুন্দর সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছে। যেমন এম. এস. সথ্যুর 'গরম হাওয়া' শ্যাম বেনেগালের 'অঙ্কুর' (যার শেষ দৃশ্যে সঙ্গীতের বিস্তার নিঃসন্দেহে অসাধারণ), মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় চিত্র পরিচালকের। কারণ শেষপর্যন্ত ওনার হাতেই film-এর ভাগ্য নির্ভর করে। ভারতীয় চিত্রে এমন অনেক সঙ্গীত পরিচালক আছেন যাদের সংগীত সম্পর্কে ধ্যান ধারণার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেমন কুমার শ্রীশচিন দেববর্মন, মদন মোহন (বেশী দিন হয় নি মারা গেছেন), ইত্যাদিরা। এদের potentiality-কে কাজে লাগাবার মতো চিত্র পরিচালক না থাকাতেই তাঁদের অসাধারণত্ব ধরা পড়ল না।

"পড়োসান" বলে এক অত্যন্ত খেলো ছবিতে আলাদাভাবে দেখলে রাহুল দেববর্মন উঁচু দরের উত্তর এবং দক্ষিণী ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ছবির নিছক দৃশ্য সংগঠনগুলির সাথে আদৌ উন্নত ধরণের সঙ্গীতের প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্যন্ত তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় নির্মিত হয়, পেটেন্ট মিউজিক। হলিউডের সৃষ্টি এই ধরণের মিউজিক প্রেম পর্যায়. action দৃশ্য ইত্যাদির জন্য যথাক্রমে রাখা থাকে stock সঙ্গীত। গানের ব্যাপারেও নায়ক, নায়িকাদের পছন্দমত গায়ক, গায়িকা থাকে। সাধারণ ভাবে এর জন্য মহৎ সঙ্গীতের প্রভাবও ভীষণ ভাবে কমে আসছে, ভারতীয় ছবিতে।

তাছাড়া উন্নততর পরিচালকদেরও সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে এদেশে ভীষণ সচেতনতা দরকার। ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এবং লোক সঙ্গীতের span অত্যন্ত বেশী। এদেশের যে কোন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে অসাধারণ সব সঙ্গীত। বৈষ্ণব সঙ্গীত, শাক্ত সঙ্গীত ইত্যাদি ধর্মীয় সঙ্গীতের সাথে অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত সঙ্গীত, প্রাচীন সঙ্গীত, অন্য সব বাদ্য যন্ত্র তো আছেই। এছাড়া নদীর পাড়ে পাড়ে জন্ম নিয়েছে গ্রামীণ সঙ্গীত। ত্রিপুরায় থাকাকালীন দেখেছিলাম, ওখানকার সঙ্গীত কি ব্যাপক। উপজাতিদের গলাই সঙ্গীতের গলার খুব কাছাকাছি। ওদের প্রায় প্রত্যেকেই গান গায়। উৎসবের শ্রোতারাও এক সময় গানে জড়িয়ে পড়েন। আবার এমন অনেক শ্রমিক আছেন যাদের রাত্রিবেলা বিশ্রাম হয় খোল, করতালের মধ্য দিয়ে। এই বিপুল সঙ্গীতের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সঙ্গীত বেছে চলচ্চিত্রে ব্যবহার যেমন অসাধারণ কাজ, তেমন পরিশ্রমসাধ্যও। সত্যজিৎ রায়ের মতন পরিশ্রম করেই আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকরাও যেন এই কঠিন কাজটি করেন।

চিত্রবীক্ষণে
লেখা পাঠান।
চলচ্চিত্র বিষয়ক
যে কোনো লেখা।
চিত্রবীক্ষণ আপনার
লেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

"PHOTOGRAPHY" is said to have been invented in the year 1839. It came into commercial use in 1840 when Bournes, who were probably operating as Artists in Calcutta, started a photographic studio. A few years later, Mr. Bourne went into partnership with Mr. Shepherd, a reputed photographer based in Simla.

At that time, the studio served mainly the Europeans in India, the Governor Generals and Viceroys, and also the Indian Princes and Zamindars. While visiting their clients, Bourne and Shepherd took a vast photographic record monuments, festivals, industries and people, many of which still form a part of Bourne and Shepherd's Library.

Bourne and Shepherd have had for over a century many talented photographers whose creativity kept the studio in the forefront of photographic development. Their incessant drive and energy made this studio one of the most well-known and respected in the field of professional photography. Among their contributions to archives are the famous photographic coverages of Prince of Wales' visit in 1876 and of Delhi Durbars of 1903 and 1911.

Bourne and Shepherd today still carry the vast tradition in classical portraiture. But a new dimension has been added with their branching out in applied photography with emphasis on Advertising and Industrial aspects.

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—৩৯

স্থান—অনিরুদ্ধর ধানক্ষেত এবং পাশের রাস্তা।

সময়—জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। শীতকাল।

শীতের শুরু। মাঠের ধান পাকতে শুরু করেছে।

দুর্গা : উঁই মা!

লোটন : কি হল?

দুর্গা : কাঁটা।

কাট টু।

ছিরু ও গড়াই ধানক্ষেত থেকে সব দেখে।

লোটন : (off voice) কি গ্যাচে?

কাট টু।

দুর্গা পায়ের কাঁটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে।

দুর্গা : হাঁ, চলো!

ওরা চলতে শুরু করে, দুর্গা গুনগুন্ করে গায়

দুর্গা : পায়ের কাঁটা না হয়ে সই
বুকের কাঁটা হলে পরে
বুকের মধু পান করিতে
হুল বসায়ে, হুল বসায়ে, হুল বসায়ে····

ধীরে ধীরে অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেলে ফোর গ্রাউণ্ডে ছিরু

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

দুর্গা (সন্ধ্যা রায়)
ছবি : ধীরেন দেব

পদ্মবৌ (মাধবী চক্রবর্তী)
ছবি : ধীরেন দেব

একবোঝা বাসন নিয়ে ঘরের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে পদ্ম। পুকুরের সামনে দাঁড়ায়। ওপারে ছিরু পালের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে শাপান্ত করতে শুরু করে।

পদ্ম : কুঠে হবে, হাতে কুঠে হবে! যে হাতে আমার জমির ধান কেটেছে—সে হাত খসে খসে পড়বে, ...চোখ দুটো গলে গলে পড়বে! · শ্যাল কুকুরে ঠুকরে ঠুকরে খাবে এই বলে দিলাম!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪২

স্থান—ছিরু পালের ঘরের বাহির অংশ এবং বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল বারান্দায় বসে হুঁকো টানতে টানতে হিসাবের খাতা দেখছে। পদ্মর গালাগালি সে যেন বেশ উপভোগ করছে। বৌ লক্ষ্মীমণি এক বাটি জল নিয়ে আসে। ছিরু পাল অভ্যাস মত ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। লক্ষ্মীমণি সেই জল নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। পদ্মর গালাগালিটা শোনে।

পদ্ম : (off voice) শ্মশানে ঠাঁই হবে না! সব্বশ্ব যাবে! কুড়ে কুড়ে খাবে ঐ বাকুড়ি ধানের চাল! ঐ চালে কলেরা হবে! শিবরাত্রির সলতে ঐ ব্যাটা ধড়ফড়্ ধড়ফড়্ করে মরবে।

ইতিমধ্যে ছিরু পালের মা একগোছা শুকনো তালপাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢোকে।

পদ্ম : (off voice) নিজে মরবে না,—বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে হবে! চোখের সামনে বৌ, ব্যাটা, মা....

ছিরুর মা : কে রে?..কে?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৩

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

পদ্ম খিড়কি পুকুরে নামে। বাসন মাজতে শুরু করে এবং বলে চলে—

পদ্ম : নিব্বংশ...নিব্বংশ হবে সব! একটার পর একটা প্যাট্ প্যাট্ প্যাট্ প্যাট্ করে মাও মাও—

হঠাৎ পদ্মর গলা ছাপিয়ে শোনা যায় ছিরুর মা'র গলা। তিনি পুকুরের উল্টো পারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ছিরুর মা : কেনে রে?....কেনে? হাপরমুখীর এত ফোঁস-ফোঁসানী কেনে?

কাট্ টু।

পুকুরের পাড়ে বসে থাকা এক ঝাঁক কাক তাঁর চীৎকার শুনে উড়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম।

পদ্ম : (আরও গলা চড়িয়ে) বুঝতে লারছে! আবাগীর বেটী চুন্নী মাগী বুঝতে লারছে....

ছিরুর মা : যে বলে, মরবে সে! মইরবে তার সাধের বারো ভাতার, মইরবে তার ঢলানি গতরের চুলবুলানি ....শুঁটকি হয়ে...চিমসে হয়ে....

পদ্ম : শুঁটকি হবে তোর গভ্ভের ঝাড়! তাকা কেনে? নাতি-পুতি-ব্যাটার-বৌয়ের দিকে তাকা কেনে রে খালভরি....

পাড়া প্রতিবেশীরা আশ-পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দুজনের ঝগড়া শোনে।

ছিরুর মা : আলো, অ শতেকখোয়ারী! কি তোর ঐ ডাঁসা গতরের ভ্যাজও কমল বলে! আহা-হা পচানী ধইলো বলে! গন্ধে মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ কইলো বলে—

পদ্ম : মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করুক বুড়ি শকুনির মুখে! ওপরে যদি ভগ্মান থাকে তো

ছিরুর মা : হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগমান আছে! আছে রে ঘাটকুড়ির বেটী পাটকুড়ি! নৈলে গভ্ভে হাজা লেগে বাঁজা হবি কেনে? এই বয়সে কোল খালি থাকবে কেনে?

কাট্ টু।

পদ্ম আঘাত পায়। নিষ্ঠুর সত্য কথাটি শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। পদ্ম উঠে দাঁড়ায়। চোখে মুখে তার পরাজয়ের ছাপ।

ছিরুর মা : (off voice) "বাঁজা মাগীর কোল খালি
বংশের গুড়ে পইলো বালি"
নিব্বংশ হবিরে মাগী, নিব্বংশ হবি। এই বলে দিলাম।

পদ্ম বাসনপত্রগুলো জড়ো করে তাড়াতাড়ি করে পেছনের দরজা দিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতরের অংশ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পদ্ম ভেতরে ঢোকে। ভাঙ্গাচোরা কামারশালাটা পেরিয়ে বারান্দায় বাসনগুলো রাখে। উত্তেজনা প্রশমিত করতে সে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়ায়।

দেখা যায় অনিরুদ্ধ বারান্দা থেকে জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে উঠোনে নেমে আসছে।

অনিরুদ্ধ : শালার গুষ্ঠীর আমি যদি ষষ্ঠীপুজো না করেছি তো—

পদ্ম : (তাড়াতাড়ি এগিয়ে অনিরুদ্ধর পথ আগলে দাঁড়ায়) না না, আর ঝন্‌ঝোটে কাজ নেই, শোন—

অনিরুদ্ধ : পথ ছাড়্। ওখানে যেছি না।

পদ্ম : তবে ?

অনিরুদ্ধ : থানায় ? ও শালা ছিরে পালের ভিটেয় আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৫

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা, ডিসপেনসারির সামনে।

সময়—দিন।

গাঁয়ের নাপিত তারা জগন ডাক্তারের দাড়ি কামাচ্ছে।

তারা : বলেন কি ?

জগন : (উত্তেজিত ভঙ্গিতে) তবে ? সব পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দিয়েছি। থানায় গিয়ে শুধু ওগরাবে, আর এই (হাতকড়া পরানোর ভঙ্গি করে) ছিরে শালার হাতে।

তারা : নড়বেন না।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও উঠোন।

সময়—দিন।

পদ্ম : তুমি কি ক্ষেপেছ ?

অনিরুদ্ধ : কেনে ?

পদ্ম : ছিরুর সঙ্গে ছোট দারোগার সাঁটের কথা জানো না ?....একসঙ্গে নেশা-ভাং করে দুজন !

অনিরুদ্ধ : তাই বলে লাথি হজম করব !

অনিরুদ্ধ দরজার দিকে ছুটে যায়।

পদ্ম : (পিছু পিছু গিয়ে) উ কি ?.. কোথা চল্লে ?

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যায়।

পদ্ম : (দরজার কাছে পৌঁছে) শোনো....যেয়ো না—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পদ্ম দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে জোরে বলে—

পদ্ম : শোন, যেয়ো না—

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না।

পদ্ম : থানা পুলিশ করছ, এরপর হাঙ্গামা হবে কিন্তুক—

অনিরুদ্ধ এগিয়েই যায়।

পদ্ম : আমাদের ঘরও তল্লাশী করবে—

অনিরুদ্ধ শুনেও যেন শোনে না।

পদ্ম : আমায় শুদ্দু নিয়ে টানাটানি করবে, এজলাসে ওঠাবে—এই বলে দিলাম।

অনিরুদ্ধ এবার থামে। বিচলিত চোখে তাকায়। পদ্মর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

পদ্ম : (হাসতে হাসতে) পেছু ডাকছি। এট্টু খেয়ে যাও !

অনিরুদ্ধ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। তারপর পদ্মর সামনে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং সজোরে তার গালে চড় মারে।

পদ্ম : বাপ্ রে !

অনিরুদ্ধ : ডাকবি ? ডাকবি আর পেছু ?

পদ্ম হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে। কাঁধটা কাঁপতে থাকে। বোঝা যায় সে কাঁদছে।

অনিরুদ্ধকে বিচলিত মনে হয়।

কাট্ টু।

পদ্মর ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : এই !.. এই !....এই পদ্ম !....কি হয়েছে ?

পদ্ম উত্তর দেয় না। অনিরুদ্ধ পাশে বসে তার হাত দুটো মুখ থেকে সরাতে চেষ্টা করে।

অনিরুদ্ধ : দেখি, দেখি—আহা দেখি না ! ঐ ভাখো ? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে....আরে, বলছি তো

যাবো না। এই ভাখ্, জামা খুলে রাখছি···
হল তো?

হঠাৎ পদ্ম অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। তার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

পদ্ম : হি হি হি,···সত্যি?

অনিরুদ্ধ পদ্মর এমন ব্যবহারে আঘাত পায়। চকিতে উঠে দাঁড়ায় সে।

পদ্মও দাঁড়িয়ে পড়ে।

পদ্ম : সত্যি, যাবে না বলো।

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। এমন সময় বাইরে থেকে জগন ডাক্তারের গলা শোনা যায়।

জগন : (off voice) কৈ—রে—! অনিরুদ্ধ—!···
ও—ই—!

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় জগন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে তারা নাপিত।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তারের গলা শুনে অনিরুদ্ধ বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ভেতরে আসে ও দরজার আড়ালে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা রয়েছে পেছনে। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ঢুকতেই

জগন : একি!···এখনো যাস্‌নি?

অনিরুদ্ধ : আজ্ঞে···

জগন : পৈ পৈ করে বলে দিলাম সকাল আটটার মধ্যে গিয়ে ধরবি! ঠিক আছে, যা যা, এই সাইকেলটা নিয়ে যা। জলদি!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যেন বিপদের আঁচ পায়। সে দরজার শেকলটি নাড়ে অনিরুদ্ধর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫১

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : কিন্তু ইদিকে যে সবাই বুলছে—

জগন : কি বুলছে?

অনিরুদ্ধ : বুলছে যে, থানা পুলিশ···হাঙ্গামা···ঘরের মেয়ো-ছেলেকে যদি জড়িয়ে দেয়—

জগন : এঁ:—! জড়িয়ে দিলেই হল,—না! বাবার বাবা নেই? থানার ওপর পুলিশ-সাহেব নেই···ম্যাস্টেট নেই···কমিশনার নেই?

অনিরুদ্ধ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়ে।

জগন : তবে? তার ওপর ছোট লাট্···বড় লাট্···তেমন হলে আমায় এসে বলবি!···একটা দরখাস্ত ঠুকব···বাপ্ বাপ্ বলে সবশুদ্ধ্ এসে পড়বে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম আবার দরজার শেকল নাড়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

কয়েক মুহূর্ত অনিরুদ্ধ জগনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যেন হঠাৎই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে

অনিরুদ্ধ : তাহলে এই আমি চললাম।

জগনের কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে অনিরুদ্ধ চলতে শুরু করে।

জগন : চুরি করেছে বলবি না—বলবি আক্রোশে ক্ষেতি করবার জন্ত কেটেছে—

অনিরুদ্ধ : (হাত নেড়ে) আচ্ছা—

অনিরুদ্ধ সাইকেলে চেপে চলে যায়। জগন ডাক্তারকে বেশ খুশি খুশি লাগে। জগন ও তারা দুজনেই চলে যায়।

জগন : চল্ মন নিজ নিকেতনে—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম অসহায়ভাবে দরজার আড়াল থেকে অনিরুদ্ধকে জগনের সাইকেলে চেপে চলে যেতে দেখে আর দরজার শেকল নাড়ে। কোন উপায় না দেখে উঠোন পেরিয়ে বাইরে বেরোতে যায়। কিন্তু হঠাৎ থেমে যায় পদ্ম।

কাট্ টু।

দরজার পেছনে কার শাড়ির কিছু অংশ যেন দেখা যায়। কে লুকিয়ে আছে সেখানে।

কাট্ টু।

পদ্ম : (দু পা এগিয়ে এসে) কে? কে ওখানে?

কাট্ টু।

দরজার পেছন থেকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে লক্ষ্মীমণি বেরিয়ে আসে। কোলে তার ছেলে।

লক্ষ্মী : আমি কামার বৌ।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—পদ্মর মুখ রাগে শক্ত হয়ে যায়।

কাট্ টু।

লক্ষ্মী : তোমার পায়ে ধত্তে এসেছি ভাই।

সত্যিই সে পদ্মর পা ধরতে হুইয়ে পড়ে।

পদ্ম : (পিছিয়ে এসে) না না, এ কি?

লক্ষ্মী : আমার ছেলেটাকে তোমরা গাল দিও না! যে করেছে তাকে দাও,...কি বলব তাতে?

ক্লোজ শট্—পদ্ম বিস্মিত হয়। লক্ষ্মীমণি শাড়ির খুঁট খুলে টাকা বার করে।

লক্ষ্মী : তোমাদের অনেক ক্ষেতি করেছে। চাষীর মেয়ে ...আমি জানি এ ক'টা...না না, রাখো এ তোমাকে রাখতে হবে।

দুটো দশ টাকার নোট সে পদ্মর হাতে গুঁজে দেয়।

লক্ষ্মী : শুধু একে একটু আশীর্ব্বাদ করো ভাই!

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—লক্ষ্মীমণি আর কোলের বাচ্চাটা

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—লক্ষ্মীমণি।

কাট্ টু।

পদ্ম কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে এগিয়ে আসে লক্ষ্মীমণির দিকে। এবং বাচ্চাটির মাথায় হাত দেয়।

কাট্ টু।

আবেগে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল্ করে ওঠে। সে বলে—

লক্ষ্মী : লুকিয়ে এসেছি। জানতে পারলে আর ঘরে রাখবে না।

তাড়াতাড়ি সে খিড়কির দরজা দিয়ে চলে যেতে গিয়েও থামে এবং মুখ ফেরায়

লক্ষ্মী : ভগমান তোমার ভালো করুন।

লক্ষ্মীমণি এবার চলে যায়। ক্যামেরা চার্জ করে পদ্মকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৫

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার খালি পায়ে হেঁটে চলেছে। একটা বাঁকের কাছে এসে বিপরীত দিক থেকে আসা দুর্গার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে আর কি!

দুর্গা : হাই মা!...আপনার পাও গাড়ী?

জগন : থানায়?

দুর্গা : এঁ্যা!

জগন : থানায় থানায়,...তোর দাদা কোথায় রে?

দুর্গা : কে জানে বাপু! সাত সকালে বুনো শোরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ কত্তে কত্তে কুথাকে যেন বেরয়ে গেল!

জগন : গ্যাছে!...ঠিক জানিস?

দুর্গা : কেনে?

জগন : ভূমিকম্প!

দুর্গা : এঁ্যা?

উৎফুল্ল মনে জগন ডাক্তার ঘুরতে শুরু করে আর গুনগুন্ করে গায়—

জগন : "তুকি নাচন নাচবে যখন আপন ভুলে,
ছিরু পাল, হে ছিরু পাল, ধুতির বাঁধন পড়বে খুলে,
তুকি নাচন!"

দুর্গা : (বিস্মিত হয়ে) এঁ্যা!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৬

স্থান—জমিদারের কাছারী বাড়ীর বারান্দা ও বাগান।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ক্ষত-বিক্ষত পাতু বায়েনের পিঠের ওপর থেকে ট্রাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় পাতু হাত জোড় করে বারান্দায় বসে। কঙ্কনার নতুন তরুণ জমিদার আরাম কেদারায় তাঁর সামনে বসে।

জমিদার : হুঁ....গোমস্তা মশাই।

প্রধান গোমস্তা দাসজী এগিয়ে আসেন।

জমিদার : Who is this ছিরু পাল ?

গোমস্তা : আজ্ঞে ঐ শিবানীপুরের....পুরনো প্রজা....কর্তা-মশাই বেঁচে থাকতে—

সে জমিদারের কানে কানে কি যেন নীচু স্বরে বলে।

জমিদার : I see !....তা এরকম ঝনঝাট্ বাধায় কেন ?

পাতু : এঁজ্ঞে ঝনঝাট্ কি বলছেন হুজুর ! কাল যেতে আরো কি করেছে জানেন ?....উদিকে দেখেন গা ....এতক্ষণে থানা....পুলিশ—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৭

স্থান—গাঁয়ের অন্য রাস্তা।

সময়—দিন।

ট্রলি শট্। একদল পুলিশ একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে গ্রামে ঢুকছে। অনিরুদ্ধ জগন ডাক্তারের সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ওদের নিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৮

স্থান—ছিরুর বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পালের হাতে একটা বড় রুই মাছ। মাছটা তুলে সে ঝুড়ি ভর্তি তরকারীর ওপর রাখে। ক্যামেরা টিল্ট্-আপ করলে দেখা যায় গড়াই সামনের দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকছে।

গড়াই : মিতে ! এসে গ্যাছে।

ছিরু : ছোট,....না বড় ?

গড়াই : ছোট দারোগা।

ছিরু : (অন্যমনস্কভাবে গড়াই-এর হাতে ঝুড়িটা তুলে দিয়ে) খিড়কি বাগান থেকে দুটো ফুলকপি তুলে দিস।

গড়াই মাথা নেড়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

স্কুল চলছে। হঠাৎ দেবু পণ্ডিত ও ছাত্ররা কোলাহল শুনতে পেয়ে উৎসুক চোখে উঠে দাঁড়ায়।

সাব ইন্সপেক্টর ও অনিরুদ্ধ সহ পুলিশের দল এগিয়ে আসছে। পেছনে একদল গাঁয়ের লোক—ভবেশ, হরিশ, হরেন, মুকুন্দ, বৃন্দাবন, মথুর সবাই চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। উত্তেজনা বেড়ে ওঠে।

অনিরুদ্ধ : (সাইকেলটা গিরীশের হাতে দিয়ে, ছিরুর বাড়ীর পথ দেখিয়ে) আসেন, আসেন ইদিকে....

এস-আই : দাঁড়া, তল্লাশীর আগে দু-একজন সাক্ষী তো চাই ! ....আপনারা দু-একজন আসুনতো।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ-এর দলের কম্পোজিট শট্।

ভবেশ : এই রয়েছে !

এস-আই : কি হল ?....আসুন !

ভবেশ : আমি....(হরিশকে) যাও না হে....

হরিশ : কেনে ?....তুমি যাও না !

হরেন ইতিমধ্যে ঝুপ্ করে লুকিয়ে পড়ে এবং অলক্ষ্যে সরে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬০

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেনসারির সামনে ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্ করে জগন ডাক্তারের সঙ্গে গিরীশকেও ধরে। গিরীশ এসেছে সাইকেলটা ফেরত দিতে।

জগন : কোন শালা যাবে না !....মুখে বলবে 'ছি হরি' 'ছি হরি'—ওখানে স-ব ব্যাটা ধরহরি !

দৃশ্য—৬১

স্থান—গাঁয়ের রাস্তা—সজনেতলা।

সময়—দিন।

তারা নাপিত একটা তেঁতুল গাছের তলায় বসে আছে। হরেন ছুটতে ছুটতে এসে তার সামনে বসে।

হরেন : এই ! কুইক্ !

তারা : কি হল ?

হরেন : চুল....দাড়ি....গোঁফ....! টেক্ টাইম....টেক্ টাইম !....লং টাইম !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬২

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

আরো লোক ভিড় করে আসে। সাব ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধকে বলে—

এস-আই : কৈ হে, একটু নড়েচড়ে ছাখো!

অনিরুদ্ধ দেবু পণ্ডিতের কাছে এগিয়ে আসে। মুহূর্তে দ্বিধা ঝেড়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : দেবু-ভাই!....একবার আসবে আমার সঙ্গে?

মথুর : এখন 'ভাই'!...কে 'ভাই?'

অনিরুদ্ধ : (কড়া স্বরে) তোমার সঙ্গে কথা কইছি না!.... ...দেবুভাই আমার পাঠশালার বন্ধু! (দেবুকে) দেবু-ভাই!

দেবু পণ্ডিত কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। তারপর অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় বলে—

দেবু : না অনিরুদ্ধ! সে পাঠশালা যেখানে বসত, কাল সেখানে তুমি থুতু ফেলে চলে গ্যাছো!

অনিরুদ্ধ থমকে যায়। সাব ইন্সপেক্টর এগিয়ে আসেন।

এস-আই : বুঝলে বাবা অপ-কম্মকার! যা মনে হচ্ছে, পালে তোমার বাতাস নেই। চলো, এমনি তাহলে দেখে আসি।

দৃশ্য—৬৩

স্থান—ছিরু পালের বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

একটা থালি মরাই-এর দরজার ওপর থেকে ক্যামেরা জুম্ ব্যাক করলে দেখা যায় গোলাঘরের সামনে সাব ইন্সপেক্টরের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে ছিরু পাল। কয়েকটা কনস্টেবল এদিক-ওদিক ঘুরছে।

মরাই-এর মধ্য থেকে তিনজন কনস্টেবল বেরিয়ে আসে। এস-আই তাদের দিকে এগিয়ে যায়।

এস-আই : কি রে? কিছু পেলি?

কনস্টেবল : এজ্ঞে—না, শুধু একটা চামচিকে!

কনষ্টেবলটি কথা বলতে বলতে মাথা নাড়ে এবং হাতের মুঠো খুলতেই ভুষি ধুলো পড়ে আর একটা চামচিকে উড়ে যায়।

মথুর : শালার কম্মকার! মিছমিছি মোড়লের মাথা হেঁট করলে! ই শুধু তোমার মাথা হেঁট নয় মোড়ল—ই গাঁয়ে যত সদগোপ আছে—এ আমাদের সক্কলের অপমান।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৪

স্থান—পুরোন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্যামেরা অনিরুদ্ধের ভিউ পয়েন্ট থেকে ভবেশ, হরিশ, দেবু পণ্ডিত, মুকুন্দ, বৃন্দাবন, মথুরের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা সবাই যেন বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে ক্যামেরা সাইড ট্রলি করে। ছিরু পালের গোলাঘর থেকে সে বেরিয়ে আসছে, পরাজিত, বিধ্বস্ত চেহারা।

কাট্ টু।

এস-আই : তাহলে আর কি! (কনষ্টেবলদের) চল্‌রে!

হঠাৎ তাঁরা অফ্ ভয়েস-এ চীৎকার শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হরেন : (off) স্টপ! স্টপ!

হরেনকে দেখা যায়। নিজের কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা। তারার গলায় গামছা জড়িয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে হরেন।

হরেন : কাম্ হেয়ার! কাম্—কাম্—ইউ নরসুন্দর।

এস-আই : একি? ব্যাপার কি?

হরেন : ব্যাপার!....এ্যারেস্ট হিম্। উইথ ডিউ রেসপেক্ট এণ্ড হাম্বল্ সাবমিশন্ এ্যারেস্ট হিম্।

এস-আই : এঁ্যা?

হরেন : ইয়েস! হি ইজ এ হারামজাদা, বজ্জাৎ। (এস-আইকে) লুক্ এ্যাট্ দিস্....লুক্ এ্যাট্ দিস্ ....এণ্ড লুক্ এ্যাট্ দিস্....

বলেই সে মাথার কাপড় তুলে আধেক কামানো দাড়ি-গোঁফ ও চুল দেখায়।

কাট্ টু।

ভিড়ের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেরা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

কাট্ টু।

হরেন : (চীৎকার করে) শাট্ আ—প—!

এস-আই : মাই গড্!...একি?

তারা : (হাত জোড় করে) এজ্ঞে আমার কি দোষ বলেন?

হরেন : হোয়া—ট—!!

তারা : এজ্ঞে, আমায় এসে বল্লেন চুল-দাড়ি কাটবেন। তা আমি বল্লাম, কাটেন—সে খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার মজুরীটা নগদা—

হরেন : ইয়েস-ইয়েস হাউ ক্যাশ! তা দেব না বলেছি আমি!

তারা : কিন্তু দিলেন কোথায় বলেন?

হরেন : আজ দিই নাই—কিন্তু বলেছি তো কাল দেবো!

তারা : আজ্ঞে, তাতে যদি বলে থাকি বাকিটাও তাহলে কাল কামাবো—

হরেন : হো—য়া—ট্—!!

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু।

হরিশ : (মথুরকে তিরস্কার করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে) হাসিস না, হাসিস না—এতে হাসবার কি আছে!

হঠাৎ তারাকে টানতে টানতে আবার হরেন চলতে থাকে।

হরেন : অ-ল্—রাইট!·· আয়! আয় আমার সঙ্গে! আই শ্যাল ক্যাশ ইউ।···নগদাই দিব তোকে—!

কাট টু।

ভবেশ, হরিশ ও সবাই ওদের যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে।

কাট্ টু।

এস-আই : (কনষ্টেবলদের) চল্‌রে!

হরেন : জোক্? বাউনের সঙ্গে ঠাট্টা! আয়! আয় ইদিক! আয়!

ওরা ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

ভবেশ : হরিশের দল।

হরিশ : ছি ছি ছি···কি হচ্ছে এসব বলো তো?

মুকুন্দ : ব্যাঙের লাথি, বুঝলে—ব্যাঙের লাথি!

ভবেশ : (দেবুর কাছে এসে) সব ঐ কম্মকারের হাওয়া! সাপের পাঁচ পা দেখেছে হারামজাদারা—

দেবু ভবেশের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে।

দেবু : (ম্লান হেসে) হুঁ ··কাল রাতে ছিরু যখন চৌধুরী মশাইকে অমন করে অপমান করল—তখন তো কেউ ব্যাঙের লাথির কথা ভাবেননি?····নাকি, ওর টাকা আছে বলে?

দেবুর কথায় ভবেশ ও সবাই থমকে যায়।

দেবু বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলে হঠাৎ তার চোখ পড়ে

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। মন্দিরের চাতালের পাথরে লেখা "যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী।"

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। সেই পাথর, সঙ্গে বাজনা শোনা যায়।

কাট্ টু।

দেবু ধীরে ধীরে পাথর থেকে মুখ তুলে তাকায়।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ, মুকুন্দ ও বৃন্দাবনদের দল।

কাট্ টু।

দেবু : (স্বর বদলে) যদি বিচার কত্তে চান, নেহ্য বিচার করেন! ছিরু, জগন—সবার আগে এদের ডেকে বোঝান—যারা ওপর থেকে ভাঙছে!··· নৈলে, বজ্র আঁটুনি····ফস্কা গেরো!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

ক্যামেরা ভবেশ, হরিশদের দলটার ওপর চার্জ করে। তারা যেন সন্দিগ্ধ, বিচলিত।

কাট্ টু।

দেবু ক্যামেরা থেকে দূরে চলে যায়।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ, বৃন্দাবনরা পরস্পরের দিকে তাকায়, অবশেষে বৃন্দাবন এগিয়ে আসে।

বৃন্দাবন : পণ্ডিত শোনো!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৫

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

সভাস্থলের ওপরে জ্বলছে আলো। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করলে দেখা যায় মিটিং শুরু হচ্ছে। চারদিক থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে।

—আবার কিসের তলব পড়ল গো, এঁ্যা?

—আসেন আসেন ঠাকুরমশাই····

—বলি জগনকে খপর দিতে গেইছে কেউ?

দেখা যায় দেবু পণ্ডিত বৃদ্ধ চৌধুরীমশাইকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছে।

সবাই : আরে, আসেন····আসেন····

দেবু : আমি কিন্তু আপনার ছুয়ে কথা দিয়ে এসেছি,.... ছিরু কালকের ব্যাপারে—

চৌধুরী : আহা, ঠিক আছে···ঠিক আছে····

দৃশ্য—৬৬

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। ছিরু দাসজীর সামনা সামনি বসে আছে। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে সামনে। দুজনেই মদ খাচ্ছে আর একটা ডিস থেকে পেঁয়াজি তুলে নিয়ে চিবোচ্ছে।

ছিরু : বটে!

দাসজী : বাঃ! নৈলে শুদু শুদু দৌড়ে-ঝাবড়ে খপরটা দিতে এলাম?

ক্লোজ-আপ। ছিরু পাল।

ছিরু : শা-লা পা-তু বা-য়ে-ন··!

দাসজী : মুড়িয়ে দাও, বুঝলে,—যেখানে যত বেসুরো ঢোলের ঢপ্ঢপানি আছে, এই বেলা সব মুড়িয়ে দাও!····কত্তারা দেখেও দেখবে না···

ছিরু : কেনে?

দাসজী : খুলে ত্যাখো—

এই বলে সে একটি পুরনো গয়নার বাক্স ছিরু পালের হাতে তুলে দেয়।

দাসজী : আটশো'····হাজার····যা পারো আজ রাতেই চাই—

ছিরু পাল বাক্সটি খুলে চমকে ওঠে।

ছিরু : এ কি!

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। গয়নার বাক্সে একটি পুরনো দামী গয়না।

ছিরু : (দাসজীর দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে) এ তো····

দাসজী : হেঃ হেঃ হেঃ····লক্ষ্মীর আসনে ইঁদুরের গত্ত!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৭

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

গাঁয়ের রাখাল বুড়ো ছুটতে ছুটতে এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়ায়।

হরেন : বিচোর, আই ওয়ান্ট বিচের। মাই মোস্ট ভ্যালুয়েবল্ গোঁফ হাজ বিন্ কাট্।

মুড়ো : শুনেন গো,—ডাক্তারবাবু বুল্লে,—সি আসবে না ক'!

ভবেশ : কেনে? আসবে না কেনে?

মুড়ো : বুল্লে, মজলিশে গিয়ে বল্ গা,—যদি ছিরু পালের পাছায় পঁচিশ ঘা বেঁত লাগাতে পারে—তাহলে যাবো!

ভবেশ : (হতচকিত হয়ে) আর ছিরু?

মুড়ো : সি-ও আসবে না ক'!·· বেজায় জ্বর! তার মা বুল্লে, ভেতর বাড়ীতে কেঁথামুরি দিয়ে শুঁয়ে আছে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৮

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। চটিপরা একজোড়া পা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আকন্দ ঝোপের কাছে দাঁড়ায়। পা জোড়ার মালিক ছিরু পাল। সে তখন বিড়ি খাচ্ছে।

একটু দূরে একদল লোকের বচসা শোনা যায়। ছিরু পাল সেদিকে তাকায়।

—পঞ্চায়েতের পাঁচজন যা বিচের করবে তুকে তা মানতে হবে।

কাট্ টু।

একটু দূরে ধর্মরাজতলায় বাউড়িরা নিজেদের পঞ্চায়েত বসিয়েছে।

ঈশান : বল্, বল্ তবে তু পতিত হবি না কেনে? তোর বুনের লেগে যে আমাদের সকলের মুখে চুণকালি পইড়লো!

পাতু : তার লেগে আমায় দুষ্ছ কেনে—

হঠাৎই পাতু বায়েন বারান্দায় ছুটে গিয়ে দুর্গার চুল ধরে টানতে আরম্ভ করে।

পাতু : হারামজাদী!····আয়!·· আয় ইদিক!····আয়—

দুর্গা : ছাড়্!···এই দাদা!·· ছেড়ে দে বুলছি···

পাতু : শোনো!····ভালো করে কান খুলে শোনো তুমরা! ····আজ থেকে বুনের সঙ্গে আমার কুনো সম্পক্ক নাই! আজ থেকে আমি 'পেথকান্ন।'

দুর্গা : (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) এঁ—পেথকান্ন! বলি, কুন বাপের জন্মে তুর অন্ন আমি খাই রে?

পাতু : কি বুল্লি?

সবাই : আহা ছাড়্ ছাড়্—

পাতুর মা : অ বাবা পাতু—

পাতু : এই তুই !····তুই শিয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছিস্ নিজের গতভ্তের মেয়্যার গতর খাটানো পয়সা ভা-রী মিষ্টি, লয় ?····ভা-রী মিষ্টি !

পাতুর মা : হায় আমার নেকন রে—এখন কেন্দে কি হবে—কেন্দে ?

দুর্গা : এ্যাঁ—! ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোসাই !

পাতু : মারব এক চড়···

দুর্গা : (গর্বের সঙ্গে) বেশ কইরবে আইসবে !····যে খুশি আইসবে আমার ঘরে ! তাতে কার কি ? এ ঘর আমার নিজের রোজগারে গড়েছি—

দুর্গা ছুটে নিজের ঘরের বারান্দায় চলে যায়। পাতু বায়েনও ছুটে গিয়ে একটা কাটারি নিয়ে আসে।

পাতু : তবে শুনে রাখ্ ! ফের যদি কুনোদিন উ শালার ছিরে পাল আসে—তবে ভাগাড়ের গরুর মতো ছাল ছাড়াবো তবে আমার নাম পাতু বায়েন—

কাট্ টু।

ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছিরু পালের চোখ প্রতিশোধের ইচ্ছায় জল্‌জল্ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি বিড়িতে অনেকগুলো টান দেয় এবং চারদিক দেখে নেয়। পাতু বায়েনের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের পেছন দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেই আধ-পোড়া বিড়িটা খড়ের চালে গুঁজে দেয়।

তারপর ছুটে পালাতে শুরু করে। অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা কতগুলো মাটির ঘড়ার সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খায় ছিরু পালের পা। ঘড়াগুলো গড়াতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৯

স্থান—বায়েনপাড়ার ঝোপঝাড় ও সরু গলি পথ।

কয়েকটা নেড়ি কুকুর ঝোপের পাশে বসে নোংরা খাচ্ছে। ছিরু পালকে তারা দেখে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল পালাচ্ছে।

কাট্ টু।

কুকুরগুলো তার পেছন পেছন দৌড়তে শুরু করে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল পড়ে যায়। এক পায়ের চটি খুলে পড়ে। ছিরু পাল চটিটা কুড়োতে যাবে।

কাট্ টু।

কুকুরগুলো তাড়া করে আসে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল চটিটা ফেলেই পালিয়ে যায়

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম বারান্দার এক কোণে বসে রান্না করছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

মাতাল অনিরুদ্ধ উঠোনে ঢুকছে। হাতে তার একটি বোতল।

অনিরুদ্ধ : তুমি ভব বিরিঞ্চি বিষ্ণুরূপ জগৎজীব পালিনী—

কাট্ টু।

পদ্ম : (উঠে দাঁড়িয়ে) হেই মা !

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ধপাস্ করে বারান্দার এক কোণে বসে পড়ে।

পদ্ম : (কাছে গিয়ে) ফের গিলেছ ?

অনিরুদ্ধ : আজ কিছু বুলিস না রে পদ্ম ! (বুকে হাত রেখে) ইখানটা একেবারে—

পদ্ম : কেনে ? তোমার পুলিশ কিছু কল্লে না ?

অনিরুদ্ধ : হাঁ, কল্লে !····একবার সাপের মুখে চুমু খেলে····একবার ব্যাঙের মুখে চুমু খেলে····আমায় বুল্লে 'উহুঁ'····উদিকে শালা ছিরেকেও ধারেধোরে বুল্লে 'হুঁ হুঁ'····

হঠাৎ পদ্ম দূরে কোন কিছুর শব্দ শুনে চমকে যায়, অন্যমনস্ক হয়।

পদ্ম : উ কি ?···শুনছ !···উ কি গো ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭১

স্থান—গ্রামের স্কাইলাইন।

সময়—রাত্রি।

দূরে দেখা যায় আকাশ অব্দি লক্‌লক্ করে উঠছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম অনিরুদ্ধকে ঠেলে তোলে। দরজার কাছে এলে দূরে আগুন দেখতে পায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৩

স্থান—গাঁয়ের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

গাঁয়ের লোকেরা ছুটোছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৪

স্থান—গাঁয়ের অন্য রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

আর একদল গাঁয়ের লোক ছোটাছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

দৃশ্য—৭৫

স্থান—গাঁয়ের অন্য আরেক রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

আর একদল গাঁয়ের লোক ছোটাছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৬

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

চণ্ডীমণ্ডপের লোকরা হঠাৎ দূরে আগুন দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সবাই-ই ছুটতে থাকে বায়েনপাড়ার দিকে।

হরেন : লুক্....ফায়ার!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৭

স্থান—গাঁয়ের স্কাই লাইন।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা জুম্ করলে দেখা যায় বাউড়িপাড়ার সারা আকাশে আগুন। জ্বলছে বাউড়িপাড়া।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৮

স্থান—জগন ডাক্তারের বাড়ীর বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। তাঁর চশমার কাঁচে বাউড়িপাড়ার আগুনের ঝিলিক দেখা যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৯

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

বাউড়িপাড়ার আগুনের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে যায়। চারিদিকে আতঙ্কের ছায়া। লোকরা সবদিকে ছুটোছুটি করে এক প্যান্ডিমোনিয়াম সৃষ্টি করেছে।

কে একজন হাঁসের খাঁচা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে প্রাণীগুলি বেরিয়ে পড়ে।

দুর্গা তাদের গরুগুলোকে নিরাপদ জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাতু বায়েন এবং অন্যান্যরা বাঁশ দিয়ে একটা আগুন-ধরা জ্বলন্ত বাঁশের কাঠামো ভাঙছে।

জগন ডাক্তার বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেখানে হাজির হয়। চীৎকার করে বলে—

জগন : হট্ যাও—! হট্ যাও—! জল্ লাও!—জল্!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮০

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশের ঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। কাদায় ভরা একটা ডোবা। অনেকগুলো হাত। বালতি, কলসী বিভিন্ন জিনিষ দিয়ে ডোবার জল তোলা হচ্ছে।

কাট্ টু।

বাঁশ ঝাড়। একদল লোক চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ছুটে আসছে। ফ্রেম থেকে চকিতে বেরিয়ে যায়।

হরেন একটু পিছিয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে কি দেখে যেন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

হরেনের ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যায় পাতু বায়েনের বৌ জল ভরা কলসী নিয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঁড়ে ঘরের দিকে। তার চলার তালে কোমর দুলছে।

কাট্ টু।

হরেনের কামার্ত মুখের ওপর ক্যামেরা জুম্ করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার তাঁর বাঁশি বাজিয়ে চীৎকার করে।

জগন : উ—ধা—র—!

সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। আগুনের শিখার ওপর ক্যামেরা কিছুক্ষণ স্থির থাকে। লোকরা চারদিকে ছুটছে।

পাতু বায়েন খালি কলসী নিয়ে ফ্রেমে ঢোকে, উল্টোদিক থেকে পাতুর বৌ জল ভরা কলসী তার হাতে তুলে দেয় এবং ছুটে আবার ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। জগন ডাক্তার আগুনে জল ঢালে।

কাট্ টু।

অন্যান্য বাউড়িরাও আগুনে জল ঢালে।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার সবাইকে নির্দেশ দেয়।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত একটু দূর থেকে জগন ডাক্তারের কাজ দেখে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮২

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশ ঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পাতুর বৌ ছুটে খালি কলসী ভরতে পুকুরে যায়। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে দেখায় হরেন তাকে লক্ষ্য করছে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ জল ভরছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৩

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার বাঁশি বাজিয়ে চীৎকার করছে।

কাট টু।

দুর্গা আগুন থেকে একটা বাচ্চাকে উদ্ধার করে আনে।

কাট্ টু।

একটা জলন্ত কুঁড়েঘর ভেঙে পড়ে।

কাট্ টু।

লোকরা চারদিকে ছুটছে। সম্পূর্ণ দিশেহারা ভাব।

কাট্ টু।

ধর্মরাজতলার গাছে আগুন ধরেছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা মাটির তৈরী ঘোড়াগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৪

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

একদল বাউড়ি মেয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। পাতুর বৌ সম্পূর্ণ ভিজে শরীরে জল নিয়ে আসছে কয়েক গজ পেছনে। একা। ক্যামেরার ফ্রেম পেরিয়ে যাবার ঠিক মুহূর্তে চক্চকে আধুলি ধরা একটা হাত তার সামনে ঝুলতে থাকে।

পাতুর বৌ বিস্মিত হয়।

কাট্ টু।

হরেন আধুলিটা ধরে আছে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ হতচকিত।

কাট্ টু।

হরেন হাসে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। আধুলি।

কাট্ টু।

হরেন চোখ টিপে ইঙ্গিত করে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ। হতচকিত ভাব কাটিয়ে সে এখন ধাঁধাঁয় পড়ে।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে মৃদু লয়ে টাকার ঝনঝন্ শব্দ শোনা যায়, আস্তে আস্তে শব্দ বাড়তে থাকে, একসময় চারদিকের কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে টাকার ঝনঝনানি।

হরেন ও পাতুর বৌ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন মোহিত হয়ে পড়েছে দুজনে। ক্যামেরা কোণাকুণি হয়ে ট্রলি করে দুজনের শরীরের মাঝখানটাকে দেখায়। দেখা যায় পাতুর মা আসছে। হঠাৎ সে থেমে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখে। তারপর পা টিপে টিপে এসে ডাইনীর মত ফিস্ ফিস্ করে বলে

পাতুর মা: বাউন নারায়ণ!···যাঃ! যা কেনে!

সঙ্গে সঙ্গে আধুলিটা কেড়ে নেয় পাতুর মা।

দৃশ্য স্থির হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে চারদিকের কোলাহল আবার শুনতে পাওয়া যায় এবং শব্দের পীচ্ বাড়তে বাড়তে ক্লাইমেক্সে পৌঁছয়।

মিক্স ইন্টু।

দৃশ্য—৮৫

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

পূব আকাশের সামনে একটা পোড়া কুঁড়ে ঘরের কাঠামো।

একটা মোরগ আউট ফ্রেম থেকে এসে একটা খুঁটির ওপর বসে 'কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ' করে ডাকতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৬

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

ক্যামেরা পোড়া ছাই হয়ে যাওয়া বায়েনপাড়াকে দেখায়। বাউড়ি ও বাউড়ি মেয়েরা পোড়া ছাইগাদা থেকে যা পাচ্ছে কুড়োচ্ছে। দুর্গা বারান্দা ঝাঁট দেয়। পাতুর বৌ বিলাপরত।

জগন ডাক্তার একখানা নোটবুক আর পেন্সিল হাতে সামনে হাজির হয়।

জগন : এ ঘর কার?

নারান : আজ্ঞে আথ্নার।

জগন : আথনা?

নারান : আজ্ঞে আথোহরি—

জগন : ও! রাথোহরি!....মোট ৪৩...

জগন ডাক্তার বাইরে চলে যেতেই ক্যামেরা প্যান্ করে। পাতু বায়েনকে দেখা যায় পোড়া ঢাকটা নিয়ে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বসে আছে বারান্দায়।

পাতু ঢাকটাকে আদর করে। তার চোখে কোন বক্তব্য নেই। ধীরে ধীরে সাউণ্ডট্র্যাকে বোধনের বাজনা বেজে উঠতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৭

স্থান—দুর্গাপূজা মণ্ডপ।

সময়—দিন। আশ্বিনের শেষ।

ক্যামেরা দুর্গা মূর্তির মুখের ওপর থেকে জুম্ ব্যাক করে দেখায় পাতু বায়েন অতি উৎসাহে নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে।

এরপর কয়েকটি কাটা কাটা ক্লোজ-আপ।

(১) একটু বাঁকা ফ্রেমিং-য়ে তরোয়াল সহ দুর্গার ডান হাত।

(২) বর্শা ধরা দুর্গার হাতের ক্লোজ শট্।

(৩) দুর্গার হাতে ধনুক।

(৪) দুর্গার হাতে কুঠার।

(৫) ডানদিক থেকে দুর্গা মূর্তির ক্লোজ-আপ।

(৬) বিগ্ ক্লোজ-আপ—অসুর।

(৭) বাঁ দিক থেকে দুর্গা মূর্তির ক্লোজ শট্।

(৮) সিংহের মুখের ক্লোজ শট্।

(৯) সোজাসুজি দুর্গার মুখের বিগ্ ক্লোজ শট্।

(১০) ক্লোজ শট্—দুর্গার মুখ।

(১১) ক্লোজ শট্—দুর্গা।

(১২) ক্লোজ শট্—ঢাল হাতে দুর্গা।

(১৩) মিড শট্—লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দুর্গা।

(১৪) মিড শট্—সম্পূর্ণ দুর্গা মূর্তি।

(১৫) মিড শট্—দুর্গা প্রতিমাকে ধরে নামানো হচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৮

স্থান—দুর্গা পূজার ভাসান।

সময়—দিন।

ঢাকের ওপর থেকে ক্যামেরা টিল্ট-আপ্ করে দেখানো হয় দুর্গা মূর্তি এবং সামনে চলছে লাঠিখেলা।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় দুর্গা প্রতিমাকে বাঁশের মাথায় করে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাতু বায়েন ঢাক বাজাচ্ছে।

বিসর্জনের মিছিল চলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৯

স্থান—কালী পূজা।

সময়—রাত্রি। কার্তিক মাস।

ক্যামেরা উদ্যত খড়্গ থেকে জুম্ ব্যাক করে দেখায় বলির প্রস্তুতি চলছে। পাতু বায়েন ঢাক বাজায়।

—মা....মা....জয় মা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯০

স্থান—গাজন।

সময়—দিন, চৈত্র সংক্রান্তি।

গাজনের নাচের দৃশ্য থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে দেখায় পাতু বায়েনও নাচতে নাচতে ঢাক বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

পাতু বায়েন এখনও ঢাকটা কোলে নিয়ে বসে আছে। জগন ডাক্তারের কথায় পাতুর ধ্যান ভাঙে।

জগন : (off voice) এ্যাই পাতু!....পাতু!

পাতু জগন ডাক্তার ও অন্যান্য বাউড়িদের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

জগন : শোন্, এদের বলেছি—তুইও যাবি, বুঝলি! সাহায্যের জন্য দরখাস্ত লিখছি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে,—ওব্‌লা গিয়ে টিপছাপ দিয়ে আসবি।

ইতিমধ্যে ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় দুর্গা এক ঝুড়ি ছাই-নোংরা নিয়ে ঢুকছে। পাশের নর্দমায় সেগুলো ফেলতে গিয়ে সে হঠাৎ থেমে যায়।

কাট্ টু।

ছিরু পালের পরিত্যক্ত একপাটি চটি।

কাট্ টু।

দুর্গা।

কাট্ টু।

ছিরু পালের পরিত্যক্ত চটি।

কাট্ টু।

দুর্গা চটিটা কুড়িয়ে নেয়। তার চোখে চিন্তার ছায়া।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯২

স্থান—বাঁশের ঝাড়ের পাশে গাঁয়ের পথ।

সময়—দিন।

পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিরু পাল গুটি গুটি পায়ে বাঁশ ঝাড়ের কাছে দাঁড়ায় এবং উঁকি মারে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৩

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

একদল বাউড়ি জগন ডাক্তারের বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৪

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

বিগ ক্লোজ শট্। একটি দরখাস্ত। কয়েকজন টিপছাপ লাগায়।

জগন : (off voice) ঈশেন বাউড়ি....এ্যাঃ এ্যাঃ এ্যাঃ

কাট্ টু।

মিড্ লং শটে দেখা যায় একদল বাউড়ি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

জগন : নরহরি! নরহরি দে—দে এইখানে....এ্যা এ্যাঃ...! ভ্যাকা...ভ্যাকা আছিস নাকি রে?

হঠাৎ সে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দুর্গাকে দেখতে পায় এবং চীৎকার করে

জগন : এ্যাই,—এ্যাই দুগ্‌গা!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৫

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

দুর্গা একটা ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে বাঁশ ঝাড়ের দিকে যাচ্ছিল। জগন ডাক্তারের গলা শুনে সে ওদিক ফেরে—

দুর্গা : কি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৬

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : টিপছাপ দিয়ে যা!

দৃশ্য—৯৭

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি

সময়—দিন।

দুর্গা : আমার সময় নাই—

সে চলতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৮

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : নৈলে কিছু পাবি না বললাম—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৯

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি

সময়—দিন।

দুর্গা কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চলতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০০

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : ভ্যাকা বাউড়ি—

কাট্ টু।

(চলবে)

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowrin
Road Calcutta-13 Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRA

প্রবীক্ষণ

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
নবম সংখ্যা
জুন, '৭৯

চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : 'ক্রুদ্ধ গোলক' (বুলগেরিয়া)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।
* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক:

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ও বামফ্রন্ট সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর আগে এই রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এ জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজন আমরা দেখিনি, একথা অকপটে বলা যায়। এবং এভাবে সরকারী সহযোগিতায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রত্যাশিত কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক জনমানসে জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সপক্ষে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে অগ্রণী হয়ে উঠবে এ আশা প্রকাশ করা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না।

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। রাজ্য চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদে ফিল্ম সোসাইটি প্রতিনিধিদের মনোনয়ন, সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার সহযোগিতায় কিউবান চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি এই সহযোগিতামূলক মনোভাবেরই ফলশ্রুতি। ফিল্ম সোসাইটির ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া এই রাজ্যে এই সরকারই প্রথম করেছেন। সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা এর মধ্যেই একটি ছবি করেছেন, পিপলস্ সিনে সোসাইটি ও ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিকেও দুটি ছবির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এছাড়া সরকার ফিল্ম সোসাইটি সমূহের দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী কলকাতায় একটি আর্ট থিয়েটার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সভাপতি সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যে কমিটির মধ্যে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিও আছেন।

বামফ্রন্ট সরকার ফিল্ম সোসাইটি সমূহের কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজকে বিগত আর্থিক বছরে সাড়ে আঠারো হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছেন। ফেডারেশন এই অনুদান নিয়ে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এক বিশাল সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

এই সমস্ত ঘটনা এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে। গত দু-বছরে এ রাজ্যে প্রায় কুড়িটি নতুন ফিল্ম সোসাইটি কাজ শুরু করেছে। একটি বা দুটি ছাড়া এই নতুন সোসাইটিগুলির সব কটিই মফঃস্বলে—বিভিন্ন জেলাশহর বা মহকুমা শহরে।

১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৭৭—এই পাঁচ-ছ বছরে মফঃস্বলের বেশ কিছু ফিল্ম সোসাইটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছবি পাবার এবং সাংগঠনিক সমস্যা ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক নামাবলী জড়ানো গুণ্ডাদের হামলাবাজী ও আক্রমণেও কিছু কিছু ফিল্ম সোসাইটি এই সময়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। গত দু-বছরে সেই সব অঞ্চলেও সেই সব সোসাইটি আবার নতুন করে কাজকর্ম শুরু করেছে।

কাজেই এই গোটা ব্যাপারটা ক্রমশঃই একটা আশাপ্রদ চেহারা নিচ্ছে। দেশের অন্যান্য অংশের ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সমস্যাগুলো অবশ্য এ প্রদেশেও প্রবলভাবে বিদ্যমান। মূল্য সমস্যা ছবির। বিদেশী দূতাবাস-গুলির দাক্ষিণ্য ছাড়া ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন বা ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে ছবি পাবার কোনো বিকল্প সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি।

সাধারণ এইসব সমস্যা ছাড়াও যেটা আরো বেশী প্রকট আরো বেশী বাস্তব, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা হল ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রম কোনোভাবেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হিসেবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, জীবনবিরোধী পচা-গলা চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক শোষণের প্রতিবাদে এবং জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সপক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছেনা। ব্যাপক গণ-উদ্যোগময় সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে এযাবত্‌-কাল ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিযুক্তিই বৃহত্তর জনমানসে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের শারীরিক অনুপস্থিতির মূল কারণ। শুধুমাত্র বিদেশী ছবি দেখানো বা তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি মনস্কতাকে শাণ দিতে পারে কিন্তু তা কখনোই ফিল্ম সোসাইটি আন্দো-লনকে আমাদের মত দেশে অবাধ সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় দাঁড় করাতে পারে না।

একমাত্র সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটাই কেন্দ্রীয় সংগঠনের সমস্ত ব্লকেড, সমস্ত হুকুমনামা চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সংগঠন, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ভালো সুস্থ জীবনধর্মী ছবির ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন সেই ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে মোটামুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে—সমস্ত প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে। গজদন্ত মিনারের অধিবাসী ফিল্ম সোসাইটিওয়ালা সৌখীন বাবুর দল সেদিন গেল-গেল বলে প্রচণ্ড রব তুলেছিলেন। এই কার্যক্রমে ছবি সেন্সর করে নিতে হয় বলে এইসব বাবুরা ফিল্ম সোসাইটির জাত গেল বলে আওয়াজ তুলেছিলেন—বহু রথী-মহারথীর কাছে দৌড়ো-দৌড়ি করেছিলেন যাতে এজাতীয় কার্যক্রম বন্ধ করা যায়। বহু দরবার

বহু তদ্বির বহু তদারকি এবং হুমকি আমরা কিছু দিন আগেও লক্ষ্য করেছি। আনন্দের কথা সেইসব গজদন্ত মিনারের অধিবাসীরাও এখন জনগণের জন্য চলচ্চিত্র, জনগণের জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ইত্যাদির কথা বলছেন। তাঁদের চৈতন্যোদয় হয়ে থাকলে আমরা সাধুবাদ জানাবো।

আমরা এটাও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখছি যা আমাদের গভীর আস্থা এবং প্রত্যয় জোগাচ্ছে তাহল পশ্চিমবাংলার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আগের কূপমণ্ডুকতা কাটিয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামিল হতে চাইছে। অন্তত এব্যাপারে বিক্ষিপ্ত বা ইতস্তত প্রচেষ্টা ক্রমশঃই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে সংগঠিত ও সংহত করে আগামী দিনে এক-যৌথ কার্যক্রম উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং এই কর্মসূচীকে গতিশীল করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে ফেডারেশনকে আর্থিক অনুদান দেয়া নয়—বিশেষ করে কলকাতার বাইরের মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। এটা ফেডারেশনের মাধ্যমে করতে গেলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হবে। কেননা এরাজ্যের বেশীরভাগ ফিল্ম সোসাইটিই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয়। দু-তিন বছর ধরে কাজ করে চললেও বহু ফিল্ম সোসাইটি এখনো ফেডারেশনের অনুমোদন পাইনি। এই অনুদান দিতে হবে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে—সেমিনার অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পাঠাগার ইত্যাদির জন্য। এছাড়া রবীন্দ্র ভবন এবং আঞ্চলিক সরকারী প্রেক্ষাগৃহগুলিকে ছবি দেখানোর উপযোগী করে তুলতে হবে প্রোজেক্টর ইত্যাদি দিয়ে। এবং এইসব হলে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে নামমাত্র ভাড়ায় ছবি দেখানোর সুযোগ করে দিতে হবে। এ ছাড়া এইসব হলে নিয়মিতভাবে কিভাবে সপ্তাহে দু-দিন বা তিনদিন ছবি দেখানো যায় সেই বিষয়ে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটি, জেলা পরিষদ বা অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গণসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এগোতে পারেন। এভাবে ব্যবসায়িক চিত্রগৃহ ছাড়াও একটা রিলিজ চেন তৈরী যায় যার মধ্য দিয়ে ভালো ছবির দর্শক তৈরী করার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

এ ছাড়া রাজ্য সরকার পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ভালো বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছবি, শিশু চলচ্চিত্র ইত্যাদির নন কমার্শিয়াল রাইট নিয়ে একটি করে প্রিন্ট ক্রয় করতে পারেন। এই ছবিগুলি এবং সরকারী উদ্যোগে যেসব তথ্যচিত্র, শিশুচিত্র বা কাহিনীচিত্র তৈরী হচ্ছে সেগুলি নিয়ে একটি রাজ্য ফিল্ম লাইব্রেরী তৈরী করা যেতে পারে। সেই লাইব্রেরী থেকে ঐসব আঞ্চলিক প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত ছবির যোগান দেয়া সম্ভব। সরকার মোবাইল ফিল্ম ইউনিট গঠন করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই ছবিগুলির প্রদর্শনীর নিয়মিত আয়োজন করতে পারেন। পঞ্চায়েত বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সংগঠন এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলিও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

পশ্চিমবাংলার প্রায় চল্লিশটি ফিল্ম সোসাইটির ওপর এক বিশাল দায়িত্ব এসে পড়েছে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একাত্ম হয়ে দেশীয় সুস্থ জীবনধর্মী শিল্প সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকারকেও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে।

সংলাপের যে শব্দ ঃ বাংলা চলচ্চিত্রে

বিভাবসু দত্ত

চলচ্চিত্র জন্মের শুরুতে লুমিয়েরের স্টেশনমুখী ট্রেনের ছবি কিম্বা পোর্টারের 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' চলচ্চিত্রের ভিতর শিল্পের যে বীজ উপ্ত ছিল, ডি. ডাব্লু গ্রীফিত, চার্লি চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন প্রমুখের শুশ্রূষায় সেই চলচ্চিত্র শাণিত-লাবণ্য লাভ করল। গ্রীফিতের ১৯১৫ ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তোলা ছবি 'বার্থ অফ এ নেশন' ও 'ইনটলারেন্স' ছবি দুটির মধ্যেই পাওয়া গেল চলচ্চিত্র শিল্পের মূল সূত্র এবং এখান থেকেই শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। এরই পাশাপাশি আমরা পেলাম চার্লি চ্যাপলিনের মতো একজন রসিক পরিচালক, যার হাতে পূর্ণাঙ্গভাবে জন্ম নিল কমেডি চলচ্চিত্রের একটা ধারা—যাকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন পরিচালকই অতিক্রম করতে পারেন নি। আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন্ জন্ম দিলেন 'সোভিয়েত রিয়ালিজ্‌ম' নামে এক বাস্তব সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস চেতনামূলক একধারা। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন্' কিম্বা পুদোভকিনের 'মাদার' সেই চেতনারই ফসল এবং এই সব চলচ্চিত্রে সম্পাদনা এবং মন্তাজের মতো বিভিন্ন কৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্যণীয়। এদের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাবনা চিন্তা নির্বাক চলচ্চিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠলেও চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োজনের তাগিদ এরা ভিতরে ভিতরে অনুভব করেছিলেন. তাই আইজেনস্টাইনকে জার্মান সুরকার মাইজেলকে দিয়ে 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন'-এর জন্য আবহসঙ্গীত নির্মাণ করাতে হয়েছিল এবং শব্দের ভিতর যে অমোঘ শক্তি লুকিয়ে আছে তা জার্মানীতে প্রদর্শনকালেই বোঝা গিয়েছিল। নির্বাক চলচ্চিত্রের দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে আমেরিকান চলচ্চিত্র পরিচালক কোরসল্যাণ্ডের হাতেই নির্বাক চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘটল, জন্ম নিল প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'দি জ্যাজ সিঙ্গার' (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে)। চলচ্চিত্রের কুশীলবেরা হঠাৎ জাদুস্পর্শে কথা বলে উঠল, আবেগে গান গেয়ে উঠল। সবাক চলচ্চিত্রের জন্ম কিন্তু নির্বাক চলচ্চিত্রের আধুনিক সংস্করণ নয়, এই উত্তরণ এক ভিন্ন শিল্পমাধ্যম সূচিত করল; অবশ্য সবাক চলচ্চিত্র এক ভিন্ন মাধ্যম হলেও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্বাক চলচ্চিত্রের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়ে গেলাম। সত্যজিৎ রায় তাঁর এক প্রবন্ধে এই ভিন্নতার কথা আমাদের জানিয়েছিলেন. "আমার বিশ্বাস নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ পৃথক দুই শিল্প মাধ্যম।"(১) ঋত্বিক ঘটকের, 'নিঃশব্দ ছবি' হচ্ছে একেবারে আলাদা শিল্প মাধ্যম। (২) এই বক্তব্যে সত্যজিত রায়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। শুধু সত্যজিত ঋত্বিক নয় পৃথিবীর যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। রেনে ক্লেয়ার, আলফ্রেড হিচকক, ফ্রাঙ্ক কাপরা, অরসন ওয়েলস, ডেভিড লীন, ক্যারল রিড, রোসেলিনি, ডি-সিকা, ভিসকন্তি, ফেলেনি, মুঙ্ক, গদার, শ্যাবরল প্রমুখের মতো প্রতিভাবান পরিচালকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছে পঞ্চাশ বছরের সবাক চলচ্চিত্রের এই আধুনিক শরীর। সাতান্ন বিদেশের মাটিতে সবাক চলচ্চিত্র ভূমিষ্ঠ হলেও আমাদের দেশে তার বার্তা এসে পৌঁছতে কেটে গেল আরো কয়েক বছর, বাংলা ছবির আঙিনায় প্রথম ধ্বনির পদসঞ্চারণ শুনতে পাওয়া গেল অমর চৌধুরীর 'জামাই ষষ্ঠী' চলচ্চিত্রে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ক্রাউন সিনেমায় এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায়)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম সবাক কাহিনী চিত্র হলেও শব্দ ভাবনা এর কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল যার ফলশ্রুতি প্রসিদ্ধ গায়িকা মুন্নী বাঈয়ের ছবির সঙ্গে তাঁর গান, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান, 'আলমগীর' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর অংশ বিশেষের চলচ্চিত্রায়ণ। বাংলা সবাক চলচ্চিত্র, যার প্রবর্তনা প্রথমেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর হাতে, দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর অতিক্রম করে বর্তমানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন কিম্বা তারও পরবর্তী পার্থপ্রতিম চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিমল ভৌমিক, সৈকত ভট্টাচার্যে দাঁড়িয়ে বাংলা ছবি এক নিজস্ব শিল্প-প্রতিমা লাভ করলেও সবাক চলচ্চিত্রের আঙিনায় মাত্র দু'পা এগোতে পেরেছে।

॥ ২ ॥

বয়সের তুলনায় বাংলা চলচ্চিত্র এখনো সাবালকত্ব অর্জন করতে পারেনি, বিদেশের মাটিতে যে প্রতিনিয়ত ভাবনা-চিন্তা চলেছে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে সে রকম লক্ষ্য করা যায় নি, দু'একজন পরিচালক একক ভাবে শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমগ্র বাংলা চলচ্চিত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাংলা চলচ্চিত্রে শব্দ সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে কিছুদিন আগে জনপ্রিয় এক সাপ্তাহিকে এক নবীন সমালোচক দর্শক এবং চলচ্চিত্র সমালোচকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন, যেহেতু বিষয়টি বাংলা চলচ্চিত্রের শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত যেহেতু অভিযোগটিকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে অভিযোগ জানিয়েছেন কেন দর্শকরা চলচ্চিত্রের 'আঙ্গিক-প্রাসঙ্গিক ভাবনার সব দায়িত্ব এড়িয়ে যান।' বিষয়টি যত অনায়াসে উচ্চারিত, প্রকৃত সত্যতা তত সরল নয়, অনেক গভীরে এর শিকড় নিহিত। পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৩৮০টি (এর মধ্যে শহর কলকাতায় ৮৫টি এবং অবশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ২৯৫টি), কিন্তু সারা কলকাতায় বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় মাত্র ১৫টি হলে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ২০৯টি, এদের বেশীর ভাগ হলে বাংলা ছবির কোনঠাসা অবস্থা। ফলে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ খুবই সীমিত। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে গত চার বছর তিয়াত্তর থেকে ছিয়াত্তর বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে যথাক্রমে ৩২, ৩০, ২৫ এবং ২৮টি, সাতাত্তর এবং আটাত্তরের অবস্থা তথৈবচ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের ভিতর ভাল ছবির সংখ্যা নগণ্য—বছরে পাঁচটাও ভালো ছবি পাওয়া যায় না। 'ভালো ছবি' বলতে আমি কেবলমাত্র 'আর্ট ফিল্ম'কেই বোঝাচ্ছিনা, সেই অর্থবোধকে আরো একটু প্রসারিত করে বলা চলে—সুস্থভাবে এবং স্বস্তির সংগে যে ছবি আড়াই ঘন্টা ধরে দেখা যায়। 'ভালো ছবি'র জন্য যে দর্শক পাওয়া যায় তার এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মোটা দাগের বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শকদের অধিকাংশই আড়াই ঘন্টা সময় কাটাতে যান, মফঃস্বল ও গ্রাম অঞ্চলে এদের বেশীর ভাগই গৃহস্থ মহিলা. অবশিষ্টাংশ দায়বদ্ধ সমালোচক এবং গবেষক। এই সব মনোরঞ্জনপিয়াসী দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্র সচেতনতা দাবী করা অর্থহীন, সমালোচক প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ এনেছেন। আর ভালো ছবির ক্ষেত্রে যেখানে দর্শকদের মান উঁচু সেখানে ছবির এ্যানাটমি বিচার হয়, প্রসঙ্গতঃ অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের 'জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে লেখার কথা মনে পড়ছে। তাঁর লেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি অসাধারণ শব্দ সচেতনতা, ছোট একটি দৃশ্যের শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি শব্দ-সচেতনতা প্রমাণ করে।"......আরো আপাত চটুল মুহূর্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে ধনদুলালী ছদ্মজননীর বৈঠকখানায়ঃ হঠাৎ ঠুনকো সিগারেটের কৌটো খুলতে গেলেই তার ভিতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঠোভেনের চিৎকারের সেই সুর যাকে ভিস্কন্তি 'ভেনিসের মৃত্যু' (টোমাস মান) ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন।"৩ আমাদের সমালোচক শব্দ নিয়ে আলোচনা করে চলচ্চিত্র সমালোচকদের দায়ী করেছেন, প্রকৃত পক্ষে শব্দ চিন্তা প্রসঙ্গে সমালোচকদের সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বছরে যে কটা বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তার নিরানব্বই শতাংশ ছবিতেই গতানুগতিক 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক' ছাড়া আর কিছুই থাকে না, ফলে ঐ বিষয় অনালোচিত থাকলেও আক্ষেপের খুব বেশী কারণ দেখা যায় না, তবে ব্যতিক্রম চিত্র সমালোচকদের নিশ্চিতভাবেই বেশ কিছুটা ভাবায় এবং মননের নিকট আবেদন রাখে। সংলাপ এবং আবহসঙ্গীত ছাড়া আর কোন শব্দ চলচ্চিত্রে না থাকায় যদি সমালোচকেরা প্রতিনিয়ত 'সাউণ্ডট্রাক নীরব' বলে ধ্বনি তোলেন, তবে পরিচালকেরা বিশেষ বিচলিত হবেন বলে বোধ হয় না। সমালোচকদের কথায় পরিচালকরা যদি বিশেষ ভাবিত হতেন, তবে তীব্র সমালোচনার পরও দিনের পর দিন মোটা দাগের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হত না। চলচ্চিত্রে শব্দ প্রয়োগে সমালোচকদের দায়িত্ব সম্পর্কে যখন কথা উঠল, তখন প্রাসঙ্গিক একটা ঘটনা যা সামান্য হলেও আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে তার উল্লেখ করা যেতে পারে, চিদানন্দ দাসগুপ্ত একদা তাঁর লেখায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'টকী অব্ টকীজ' ছবিতে গরুর গলায় ঘন্টা না বাজায় আক্ষেপ করেছিলেন এরপর বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত কিন্তু এখনো পরিচালকেরা চলচ্চিত্রে শব্দ সচেতনতা দেখাননি। এখন অবশ্য ছবিতে গলায় ঘন্টা বাঁধা গরু কদাচিৎ চোখে পড়ে, তার পরিবর্তে ছবিতে গাড়ী কিম্বা জুতো পরা মানুষকেও হাঁটতে দেখা যায়, কিন্তু কদাচিৎ তাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ব্যতিক্রম ছবি নিয়ে আলোচনা করতে সমালোচকেরা প্রস্তুত এরকম প্রমাণ তারা দিয়েছেন। আমার বক্তব্য, অভিযোগ দর্শক এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে না করে সরাসরি পরিচালকদের বিরুদ্ধেই করা উচিত, কারণ একমাত্র পরিচালকরাই সচেতন দর্শক তৈরী করতে পারেন। বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার এই স্বীকারোক্তি করেছেন ঃ "ভালো ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে একমাত্র ভাল দর্শক, আবার সেই ভাল দর্শক তৈরী করার ভারও আমাদেরই অর্থাৎ পরিচালকদের।"৪ ফলে চিত্র পরিচালকদের শব্দ সম্পর্কে সচেতনতার প্রথমেই প্রয়োজন এবং এই সচেতনতা আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে আধুনিকতার দ্বারে।

॥ ৩ ॥

সবাক চলচ্চিত্রের শব্দের ক্ষিতেটাকে বিশ্লিষ্ট করলে আমরা যে উপাদানগুলি পেয়ে যাই সেগুলি যথাক্রমে ঃ সংলাপ, সঙ্গীত, দৃশ্যের পরিপূরক শব্দ এবং দ্যোতনাময় শব্দ; এরই পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটক নৈঃশব্দকে শব্দের অন্যতম উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।৫ চলচ্চিত্রে নৈঃশব্দের যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে তা হাজার শব্দের থেকেও বেশী বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এরকম উদাহরণ পৃথিবীর নানা চলচ্চিত্রে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

চলচ্চিত্রে শব্দের যে উপাদানগুলো আমরা পাই, 'সংলাপ' তারই প্রথম এবং প্রধানতম উপাদান ; একটু এগিয়ে বলা যায় সংলাপ চলচ্চিত্রের আদিমতম উপাদান। নির্বাক চলচ্চিত্রে যখন সংলাপ উচ্চারিত হত না, তখন পরিচালককে সাব-টাইটেলের আশ্রয় নিতে হত; সবাক চলচ্চিত্রে তা লেখার গণ্ডী থেকে লোকের মুখের ভাষায় মুক্তি পেল। সংলাপ চলচ্চিত্রের দুর্বলতম মাধ্যম(৬) হলেও প্রত্যেক চলচ্চিত্রেই তার নিজস্ব একটা কাহিনী আছে, সে কাহিনী যতই 'পথের পাঁচালী'-র মতো নিটোল অথবা 'লা দলচে ভিতা'-র মতো ভাঙাচোরা হোক তা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সংলাপ। বৃটিশ চলচ্চিত্র পরিচালক ক্যারল রীড তাঁর 'থার্ড ম্যান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, একজন পরিচালকের কাজ হল সরল ভাবে গল্প কথন এবং তাঁর অন্যতম হাতিয়ার মাইক্রোফোন।৭ দর্শকের সঙ্গে যেহেতু প্রতিটি পরিচালক সাযুজ্যে (Communication) দায়বদ্ধ, সেহেতু সংলাপের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। চলচ্চিত্রে সংলাপের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনাকালে কাহিনী এবং পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ব্যক্ত করা—এই দু'রকম কাজের কথা সত্যজিৎ রায় উল্লেখ করেছেন।৮

আজকে আমরা চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝাচ্ছি তার জন্ম নাটক থেকেই, অন্ততঃ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র ভাবনা থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। ফলে চলচ্চিত্রের সংলাপ বিষয়ক আলোচনাকালে নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে পড়ে। আমাদের দেশের সংস্কৃত নাট্যধারা লক্ষ্য করলে দেখবো খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে (সময় কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে) শুদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে প্রথম আমরা দেখলাম সমাজের সাধারণ এবং অসামাজিক ব্যক্তি নাটকের অঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত বারবণিতা বসন্তসেনার সঙ্গে সৎব্রাহ্মণ চারু দত্তের প্রণয় কাহিনী সংস্কৃত নাটকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করল, এরই ভিতর লক্ষ্য করলাম গণঅভ্যুথান। সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই নাটক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত শ-কারের অমার্জিত মুখের ভাষা। বিদেশী নাটকের সংলাপের ভিতর যে বাস্তবতার বীজ সুপ্ত ছিল ইবসেনে এসে তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করলাম। বাংলা নাটকের প্রাঙ্গনে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন'-এর নাম যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত, তার একমাত্র কারণ নিচু-শ্রেণীর লোকেদের বাস্তবমুখী সংলাপ যদিও কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই সংলাপের ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন।৯ রবীন্দ্রনাটকে আমরা এর বিপরীত সুর শুনলাম, তাঁর প্রতিটি নাটকের সংলাপই নির্মাণ সাপেক্ষ—চরিত্রগুলির মধ্যে ভাষারীতিতে কোন প্রভেদ নেই। নাটকের চরিত্রগুলিকে আমরা কখনোই সংলাপের সাহায্যে সনাক্ত করতে পারি না ; 'রক্ত করবী' নাটকে খোদাইকারের স্ত্রী চন্দ্রাও বলে ওঠে ঃ "বিশু বেয়াই দেখো দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ? ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন একটুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।" নব-নাট্য আন্দোলন আমাদের নাটকে প্রচলিত রীতিকে ভেঙে দিয়ে নতুন সুর শোনাল, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সেই আন্দোলনেরই শ্রেষ্ঠ ফসল।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এক মৌল পার্থক্য আছে ; সংলাপ নাটকের একমাত্র হাতিয়ার কিন্তু চলচ্চিত্রে সংলাপ এবং ছবি দুই মিলে এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে, যেহেতু চলচ্চিত্রে ছবির সাহায্যে অনেক কিছু বলা সম্ভব সেহেতু সংলাপের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ লক্ষ্যণীয়। কেবলমাত্র যখন ছবি দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না, তখনই ব্যবহার করতে হয় সংলাপের। নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ভেদরেখা টানতে গিয়ে প্রখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক বেলা বালাজ বলেছিলেন ঃ "নাটক শুধু সংলাপের সমষ্টি, আর বিশেষ কিছু নয়।....কিন্তু চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও শ্রুত সব কিছু একই স্তরে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়, আর পর্দায় প্রতিফলিত নর-নারীর সঙ্গে অন্যান্য বস্তু ও চিত্রের একটা সংহত মূর্তিতে ধরা দেয়।"১০ নাটক এবং চলচ্চিত্রের ভিতর একটা ভেদচিহ্ন থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালকই ভুলে যান এই দুই শিল্পের গঠনশৈলী ভিন্ন আকৃতির, তাদের কাছে চলচ্চিত্র হলো চিত্রায়িত নাটক। ফলে নিউ থিয়েটার্সের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই নাটকীয় সংলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই সব সংলাপ গিরিশচন্দ্রের নাটকের মতো মোটা দাগের এবং সমতল ; তীক্ষ্ণতার কোন চিহ্ন এই সব চলচ্চিত্রের সংলাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছিলেন ঃ "বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এধরণের সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকে মানায় বেশী। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়.... আমাদের দেশের চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ই এই পার্থক্যটি মনে রাখেন না। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার মুখে যে সব কথা প্রয়োগ করা হয়, তাতে বাক্-চাতুর্য তাদের সকলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।"১১ ফলে বাস্তব থেকে বহু যোজন দূরে এই সমস্ত সংলাপের বিচরণ ভূমি। পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের মতো কয়েকজন তরুণ পরিচালকের হাতে বাংলা চলচ্চিত্র যে অন্যতর রূপ পেল, তাদের হাতেই দেখি সংলাপের বাস্তবতার রূপ, যদিও ঋত্বিকের অতি-নাটকের দিকে ঝোঁক চিরকালের। সত্যজিৎ-এর 'পথের পাঁচালি' থেকে শুরু করে 'জন অরণ্য' পর্যন্ত

যে দীর্ঘ বাইশ বছরের চলচ্চিত্র পরিক্রমা, তার কেন্দ্রবিন্দুই হলো বাস্তবতা ; সংলাপ এবং ডিটেলের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। তাঁর প্রতিটি সংলাপই চলচ্চিত্র নামে যে স্বতন্ত্র শিল্প তার জন্য নিমিত এবং এদের চরিত্রানুযায়ী, কোন রকম অতি-নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সংলাপের প্রয়োগ করেছেন। ফলে সংলাপগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত, আমাদের চোখে দেখা রক্ত-মাংসের মানুষ। প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটা চলচ্চিত্রের সংলাপের উদাহরণ মনে করা যেতে পারে। যে গ্রাম সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রের প্রিয় বিষয়, সেই গ্রামের সরল ব্রাহ্মণ এবং তার স্ত্রীর কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করছি ('অশনি সংকেত' চলচ্চিত্র থেকে), যার ভিতর স্ত্রীর সরল বিশ্বাস এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা, এদের প্রতিটি সংলাপের ভিতর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক এবং অশ্চর্য স্নিগ্ধতা বিচরণ করছে ঃ

"রাত। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে গঙ্গাচরণ বেশ তৃপ্তি সহকারে ভাত খাচ্ছে, অনঙ্গ পাখা হাতে তার সামনে বসে।

গঙ্গা ।। একদিন তুমি যখন রাঁধবে না ?—আমি বসে বসে দেখব।

অনঙ্গ ।। রান্না শেখার সখ হয়েছে বুঝি ?

গঙ্গা ।। তোমার রান্নায় এত সোয়াদ হয় কি করে সেটা দেখব। এই পেঁপের ডালনা রেঁধেছে—এতে কী কী দিলে, কেমন করে দিলে, সেটা একটু বল দিকি।

অনঙ্গ ।। কেন বলব ? তুমি তো অনেক কিছুই জান বাপু, এটা না হয় নাই জানলে।

গঙ্গা ।। আর জেনেই বা কী হবে বল। চালের দাম যদি সত্যি বাড়ে তা'হলে ত এসব ভালো ভালো রান্নার কথা ভুলেই যেতে হবে।

অনঙ্গ ।। সত্যিই বাড়বে ? তুমি যে বলছিলে বুড়ো বানিয়ে বলেছে ?

গঙ্গা ।। যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা ঠিক। আর যুদ্ধ হলে তখন কী হয় সে কেউ বলতে পারে ?

অনঙ্গ ।। কার সঙ্গে কার যুদ্ধু হচ্ছে গো।

গঙ্গা ।। আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানী আর জাপানীর। মাথার উপর দিয়ে এরোপেলেন যায় দেখনি ?

অনঙ্গ ।। হ্যাঁ ! কী সুন্দর লাগে দেখতে।

গঙ্গা ।। এই সব এরোপেলেন যায় যুদ্ধু করতে।

অনঙ্গ ।। আচ্ছা কি করে ওড়ে বলত ?

গঙ্গা ।। এরোপেলেন ?

অনঙ্গ ।। হ্যাঁ—

গঙ্গা ।। ওসব কলকব্জার ব্যাপার। (কথাটা বলে বুঝল যথেষ্ট বলা হয়নি)।

গঙ্গা ।। আকাশে খুব হাওয়া ত, যত উপুরের দিকে যাবে তত বেশী হাওয়া। ঘুড়ি ওড়ে দেখনি ? অনঙ্গ বুঝেছে, সে মাথা নেড়ে বলে ঃ ও।"

এরই পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে 'সীমাবদ্ধ'—চলচ্চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর কাথাপকথন। এদের সম্পর্ক গঙ্গাচরণ অনঙ্গের মতো মধুর হলেও কথাবার্তায় একেবারেই ভিন্ন মেরুর, নগর জীবনে উচ্চবিত্ত পরিবারে যেমন দেখা যায়। পরিচালক এর ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিক আভিজাত্যকে মূর্ত করে তোলেন দর্শকদের সামনে ঃ

"ড্রেসিং টেবিলে একটা চিঠি পড়ে আছে, শ্যামলেন্দু তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে, তার ছেলে রাজার চিঠি। পড়া শেষ করে সে চিঠিটা ভাঁজ করে আবার রেখে দেয়।

দোলন ।। (off screen) চিঠিটা পড়েছো ?

শ্যামলেন্দু ।। রাজার—

দোলন ।। রাজার কেন ? তোমার শালীর। তোমার শালী আসছে।

শ্যামলেন্দু ।। (o. s) কে টুটুল !

দোলন ।। হ্যাঁ, সেই জন্যই ত আমি গেস্টরুম গুছোচ্ছিলাম—

শ্যামলেন্দু ।। কবে আসছে ?

দোলন ।। কাল সকালে—দিল্লী Express-এ, আটটা সাড়ে আটটার সময় আসবে।

শ্যামলেন্দু ।। কাল সকালে !

দোলন ।। বেচারা ! ওর কোন দোষ নেই জানো। দেখনা। 1st চিঠি পোস্ট করেছে আজ 5th এসে পৌঁছুলো—কাল তো আবার শনিবার। তোমার অফিস যেতে হবে না তো।

শ্যামলেন্দু ।। হ্যাঁ—একবার ঢুঁ মারতে হবে।

দোলন ।। কি যে ভালো লাগছে—সেই কবে এসেছিল ও। সেই '63-তে আমাদের এই flat-টা তো দেখেইনি।"

সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রকীর্তি পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে নানাশ্রেণীর অসংখ্য চরিত্রের বাস এই অঙ্গনে এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব প্রতিটি চরিত্রকেই সংলাপ এবং আচরণের সাহায্যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সূত্রে একটা ছোট চরিত্রের উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'নায়ক' চলচ্চিত্রে আমরা এক রিটায়ার্ড রক্ষণশীল মনোভাবের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের

(অঘোর চাটুজ্যে) সাক্ষাৎ পাই যিনি সিনেমা দেখার ঘোর বিরোধী এবং সমাজের অন্যায় দেখে 'স্টেটস্‌ম্যান'-পত্রিকায় চিঠি লেখেন চলচ্চিত্রের নায়ক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঐ চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঃ

"উপেন (কনডাকটর গার্ড) আজ্ঞে ইনিই হচ্ছেন মিস্টার মুখার্জী।

অঘোর ॥ অ। আপনি বায়স্কোপে অভিনয় করেন ?

অরিন্দম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঘোর ॥ অ। আমি বায়স্কোপ দেখিনা On principle. একবার এক কলীগের পাল্লায় পড়ে গেছিলাম—In 1942—How Green was My valley.

অরিন্দম ॥ সে ত ভাল ছবি।

অঘোর ॥ But as a rule films are bad.

অরিন্দম ॥ কিন্তু ফিল্ম এ্যাক্টর কী দোষ করল দাদু ?

অঘোর ॥ আপনি মদ্যপান করেন ?

অরিন্দম ॥ তা একটু করি—

অঘোর ॥ All flim actors drink as a rule. It shousalack of restraint, and a lack of discipline. আপনি কি জানির মধ্যে মদ্যপান করবেন।

অরিন্দম ॥ সেকেণ্ড নেচার দাদু, বোঝেনই তো।

অঘোর ॥ তাহলে আপনাকে আমার জানানো কর্তব্য—অ্যালকহলের গন্ধে আমার nausea হয় and I am seventy one. As such I expect some consideration from my fellow passenger."

বাংলা চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের সংলাপ লক্ষ্যনীয়। তাঁর চলচ্চিত্রের বারো আনা অংশ জুড়ে আছে পূর্ববাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত জনগণ এবং এদের ব্যবহৃত সংলাপের মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ বিদ্যমান, প্রতিটি চরিত্রই স্বাভাবিক সংলাপ উচ্চারণ করেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র প্রথম দৃশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"ভোর বেলা। কলোনীর মুদির দোকান। মুদি হঠাৎ যেন কাকে দেখে ডেকে বলে ঃ দিদি ঠাইরেণ, ও দিদি ঠাইরেণ।

মেয়েটি (নীতা) মুদির দোকানের দিকে এগিয়ে আসে।

মুদি ॥ আর তো সয়না। তোমার বাপরে গিয়া কইও এই মাসকাবারে তিন মাস হইলো।

নীতা ॥ কমুওনে।"

আবার যিনি শিক্ষিত বাঙাল, পেশায় শিক্ষক—তার সংলাপ নিশ্চয় মুদির সংলাপের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়া সম্ভবপর নয়, ঋত্বিক সংলাপের এই ভেদ চিহ্নটা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলেন দর্শকদের সামনে ঃ

"স্বামী ॥ কলো মাইয়া, What does it mean? বর্ণের pigment টা একটু dark এই তো........

স্ত্রী ॥ আর প্যাচাল পাইড়ো না। ভুলে যাও।

স্বামী ॥ আমার Point হইল গিয়া ফট কইরা যদি সে আইসা পড়ে টিউশান সাইরা তো কর্ণে শুনলে ব্যথা পাইব। কী রকম responsible এম এ ক্লাস কইরা দুই দুইটা tution সাইরা মাসন্তে সে forty rupees earn করে উপরন্তু—

স্ত্রী ॥ তবু বক্‌বক্ করে—

স্বামী ॥ না—মানে খবর তো রাখনা—কাল কমিটি মিটিং-এ শুনলাম আবার নাকি উচ্ছেদের হিড়িক বেড়েছে। ইস্কুলের grant তো বন্ধ হবার মতলব। দেখ কাণ্ড........।"

তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-তে আমরা বঙ্গবালার মতো বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত চরিত্র পাই, যার সংলাপে চরিত্রের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করা সম্ভব, এখানেই পরিচালকের বাস্তবতা বোধ। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর 'লাইম লাইট' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সনাক্ত করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র সংলাপের সাহায্যে এবং এটাই মহৎ পরিচালকের লক্ষণ, কিন্তু আমাদের দেশের পরিচালকদের ছবিতে কদাচিৎ এই সমাজ সচেতনতা চোখে পড়ে।

'সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন' চলচ্চিত্রের এক প্রধান অসুবিধা,১২ এবং চলচ্চিত্রে তা প্রকাশ করতে পরিচালকরা ঈষৎ অস্বস্তিবোধ করেন, তখন তাদের সাহায্য নিতে হয় আত্মকথন কিম্বা 'সাব টাইটেলে'র। যে আত্মকথনের সাহায্য তাঁরা নেন, তার ভাষা কাব্যিক হতে বাধ্য। আমাদের চলচ্চিত্রে এই আত্মকথন প্রায়ই শোনা যায়, তাদের বেশীর ভাগই অতি-নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত হাস্যকর ; কিন্তু দু'একটা বাংলা চলচ্চিত্র পাওয়া যাবে যেখানে আত্মকথন দর্শকদের চোখের সামনে একটা ছবি মূর্ত করে তোলে ঋত্বিক ঘটক থেকেই আমরা খুঁজে নেব সমর্থনের উপাদান ঃ

'উমার ঘর। রাত্রি বেলা। রামু ॥ কি ভাবছিলে ?

উমা ॥ (মৃদু হেসে) ভাবনার কি অন্ত আছে ?

রামু ॥ হুঁ (বাইরের দিকে চোখ করে) আমিও ভাবছিলাম।

উমা ॥ কি ?

রামু ॥ ভাবছিলাম ধূধূ একটা মাঠ সামনে অশ্বত্থ গাছের ঠাণ্ডা ছায়া....পায়ে চলার পথটা উধাও হয়ে গিয়েছে। মাঠের শেষে লাল টালির বাড়ী।

আমার ক্যালেণ্ডারের মতন........" ('নাগরিক' চলচ্চিত্র)

সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় যুব সমাজ নিয়ে ছবি করার রেওয়াজ চালু হয়েছে, 'আপনজন', 'রাজা', 'আঠারোর দিন পরে', 'এপার ওপার' প্রভৃতির মতো চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে যুবকদের সমস্যা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এদের চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এরা প্রত্যেকেই সমাজের অন্ধকার দিকের বাসিন্দা, চলতি বাংলায় যাকে 'মস্তান' বলা হয়। এ'প্রবন্ধ যেহেতু সমাজ বিজ্ঞান ও বিষয়বস্তুর বাস্তবতার মূল্যায়ণ নয়, তাই আমরা শুধুমাত্র সংলাপের দিকে দৃষ্টি দেব—অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে যেটুকু সমাজ বিজ্ঞান এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাকে স্বীকার করে নিয়ে। যুবসমাজ নিয়ে যে সমস্ত ছবি আমরা পেয়েছি, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের মুখের সংলাপগুলো মামুলি ধরণের কৃত্রিম। 'শালা'—ইত্যাদির মতো দু'একটা প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করে যুবক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সংলাপকে বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হলে শিকড় আরো গভীরে চালিয়ে দিতে হবে। এই সব যুবকদের নিজস্ব কিছু ভাষা আছে যাকে 'কোড টার্ম' বলা হয়, এই সমস্ত শব্দ তাদের সংলাপে ব্যবহার করার প্রয়োজন। সমাজে আর এক শ্রেণীর যুবক আছে যাদের বাস অন্ধকার জগতে নয়, তাদের সংলাপ বিষয়েও ভাবার প্রয়োজন। এই সমস্ত যুবকদের সংলাপ সামাজিক এবং পারিবারিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, ফলে সংলাপের ক্ষেত্রে একজনের থেকে অন্যজনের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। সত্যজিৎ রায় তার 'জন অরণ্য' ছবিতে সোমনাথ ও সুকুমার চরিত্রের ভিতর এই পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে এই দুই চরিত্রের সংলাপ লক্ষ্য করি তবে দেখব সুকুমার কিছুটা অমার্জিত এবং কর্কশ, তুলনায় সোমনাথ ভদ্র এমং মিষ্টভাষী। এর পিছনে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব মানসিক গঠন ছাড়াও পারিবারিক প্রভাব বিস্তার করে। সোমনাথের বাবা যেখানে মার্জিত, মিষ্টভাষী সুকুমারের বাবা সেখানে কর্কশ এবং অমার্জিত,১৩ তাই সুকুমার বোনকে : "কিরে ক্যাবারে দেখানো হচ্ছে ?-র মতো কর্কশ সংলাপ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে। ফলে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এ'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্রে সংলাপ রচনার পূর্বে পরিচালককে খুব ভাল করে চরিত্রগুলিকে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন যে তারা কোন্ শ্রেণীর এবং কোন্ অঞ্চলের। শ্রেণী ভেদে যেমন ভাষায় পরিবর্তন ঘটে, তেমনই অঞ্চল ভেদেও ভাষার পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিম বঙ্গে (হুগলী অঞ্চলে) যেখানে চাকর, বাড়ী, ঢাক, ধান—বলি সেখানে পূর্ববঙ্গের লোকেরা (বরিশাল) উচ্চারণ করে চাহর, বারী, ডাক, দা'ন। ১৪ আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষারীতি ও উচ্চারণরীতি বিভিন্ন রকমের। আমরা যেখানে (কলকাতার লোকেরা) খোন, বোন, লোম, উচ্চারণ করি মেদিনীপুরের লোকেরা সেখানে খন, বন, মন, লন উচ্চারণ করে। তাদের উচ্চারণরীতিতে দেখি নোটিশের জায়গায় লোটিস, লুটিশ ; বিয়ে কিম্বা বে-র স্থানে উচ্চারিত হয় বিয়া কিম্বা ব্যা, 'সেয়ানা' মেদনীপুরে সিয়ানা, সিয়ান উচ্চারিত হয়। ১৫ উচ্চারণ রীতি বিষয়ক আলোচনা কালে আমাদের উচ্চারণের টানের উপর দৃষ্টি দেওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন, যেমন মেদনীপুর অঞ্চলে 'বটে' কিম্বা বীরভূম অঞ্চলে 'ক্যানে'র ব্যবহার লক্ষ্য করি। আবার লুম, লেম ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সত্যজিৎ রায় তার 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রামের মেয়ের কথার ভিতর 'লুম' অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন, বিনি (গ্রামের মেয়ে) সর্বজয়াকে এক ঝুড়ি সবজী এনে বলেছে : "মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এই খেনে রাখলুম।" এটা কি পরিচালকের অসঙ্গতি নয় ? কলকাতারও এক নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ঠ্য আছে যা বর্তমানে লুপ্ত হলেও চলচ্চিত্রের চরিত্রের প্রয়োজনে এই ভাষারীতি প্রয়োগ করা দরকার, যেমন উচ্চারণের শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণবর্ণগুলি অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণ করার প্রবণতাঃ মুখ-মুক্, দেখতে-দেক্তে, রথযাত্রা-রতযাত্রা, মাথা-মাতা ইত্যাদি ; আবার 'পরিষ্কার' কে উচ্চারণ করা হয় পাস্কের, পোশ্‌কের, খরিদ্দারকে খদ্দের। প্রমথ চৌধুরী যাকে বলেছেন উচ্চারণের ঠোঁটকাটা ভাব'—সে রকম উচ্চারণও এই ভাষায় দেখা যায় : অাঁব, বে ক্যাওলা ইত্যাদি। ১৬ 'বাবু মশাই'-এর মতো পুরোন কলকাতাকে নিয়েও ছবি বাংলা ভাষায় নির্মিত হয় কিন্তু ভাষারীতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবো সেখানে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নেই—চরিত্রগুলির আচার ব্যবহারের সঙ্গে ভাষাও আধুনিক। এরই পাশাপাশি আছে মিশ্র ভাষা, যেমন বর্তমান কলকাতায় হিন্দি, উর্দু ও বাংলা সব মিলে এক জগাখিচুড়ি হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ১৭ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বসবাসের ফলে যে মিশ্রভাষা সৃষ্টি হয় সত্যজিৎ রায় তার 'জন অরণ্য' ছবিতে বিশুদার মুখে তার যথার্থ ব্যবহার দেখিয়েছেন। উচ্চারণরীতির সঙ্গে সঙ্গে আবার অঞ্চলভেদে শব্দরীতিতেও পার্থক্য দেখা যায়, যদি কলকাতার কোন বৃদ্ধা তার পুত্র বধূকে বলেন : "বৌমা, ঘোমটা দাও," বীরভূমের কোন বৃদ্ধা সেই কথাকেই বলবেন : "বৌমা, শান করো।" এরকম পার্থক্যের দিকে পরিচালককে সদাসতর্ক থেকে সংলাপ রচনা করতে হবে।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্প সর্ত অনুসরণের পাশাপাশি সংলাপ

রচনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্রের সংলাপ মর্যাদার আসন অধিকার করে নেবে।

১। চলচ্চিত্র চিন্তা ঃ সত্যজিৎ রায়।
২। ছবিতে শব্দ ঃ ঋত্বিক কুমার ঘটক।
৩। স্বরিত অঙ্গীকার ঃ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।
৪। ভবিষ্যতের সেই দিনগুলির জন্য ঃ তরুণ মজুমদার।
৫। ছবিতে শব্দ ঃ ঋত্বিক কুমার ঘটক।
৬। সত্যজিৎ রায় তাঁর রঙীন ছবি শীর্ষক প্রবন্ধে এরকম কথাই বলেছিলেন ঃ "চিত্রপরিচালকদের হাতে তথা পরিবেশনের যত রকম উপায় আছে, তার মধ্যে দুর্বলতম হল কথা (বিষয় চলচ্চিত্র/পৃ ঃ ৭৫)।

"A Film director's job is quite simply to tell a story. For this he must use actors, and places, and cameras and microphones. But first and foremost he is story teller, like a novelist or a dramatist" 'The third Man : Carot Reed talks to Roger Menvell. গ্রন্থ : The cinema 1952, Edited by Roger Menvell.

৮। চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দুটি কাজ। এক, কাহিনীকে ব্যক্ত করা, দুই পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে কাজ হয়।" চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে (বিষয় চলচ্চিত্র/পৃঃ ৩০)।
৯। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'নীলদর্পন' গ্রন্থের 'সংলাপে ব্যবহৃত ভাষার ত্রুটী ২ শীর্ষক রচনায়-এ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে/পৃঃ ১৪৯—১৫১।
১০। Bela Belars : 'theory of Film' গ্রন্থের 'The seript' পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য।
১১। চলচ্চিত্রে সংলাপ প্রসঙ্গে। গ্রন্থ ঃ বিষয় চলচ্চিত্র/পৃঃ ৩০।
১২। চিদানন্দ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন' চলচ্চিত্রের সব চেয়ে বড় সমস্যা।" চলচ্চিত্রের শিল্প প্রকৃতি।
১৩। সোমানাথ ঃ একী আপনার কাপড়—
সুকুমার ঃ আবার পড়লে নাকি !
সুকুমারের বাবা ঃ ঃ রাস্তা খুঁড়ে রেখেছে বাঞ্চৎরা আজ একমাস ধরে—"সুকুমারের বাবার এই সংলাপ লক্ষ্যনীয়। তাই আমরা দেখি সুকুমারেরও বাবা সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা নেই ঃ চ, বাইরে চ', ফিরে এসেই আবার sympathy টানার চেষ্টা করবে।
১৪। ভাষার ইতিবৃত্ত ।। সুকুমার সেন। পৃঃ ৪—৫।
১৫। বাগর্থ ।। বিজন বিহারী ভট্টাচার্য। পৃঃ ৮৯—৯০।
১৬। কলকাতার ভাষা ।। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
১৭। তদেব।

মনটাজের স্রষ্টা লিয়েভ্ কুলেশভ্

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৬২ সালে পারীতে UNESCO-র আমন্ত্রণে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন Lev Kuleshov। তখন তিনি এক বয়স্ক শিক্ষক। রুশিয়ার State Institute of Cinematographyতে শিক্ষকতা করেন, ছবি আর করেন না। চলচ্চিত্রের জগতে, এখনকার মতোই, তখনই তাঁর আকাশ জোড়া নাম।

প্রশ্ন করলেন সমবেত সাংবাদিকরা—সত্যি সত্যি Montageটা কার সৃষ্টি?—Larry Griffith-এর না আপনার? মৃদু হাসলেন Kuleshov। বললেন, "historically, 'Birth of Nation' ও 'Intolerance'-এই প্রথম montage এর শুরু। কিন্তু, ওই ছবিগুলোতে সেই প্রয়োগ করেছেন Larry নিতান্তই অজান্তে। অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে বা পরিকল্পনা কিংবা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন কিছুর প্রয়োগ তিনি করেননি। নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা হিসেবেই ইতিহাসে ওঁর স্থান রয়েছে। কিন্তু montage এর প্রথম theoryর প্রবর্তন করি আমিই—১৯১৭ সালে, Tsar এর আমলে প্রায় তৈরী 'The Project of Engineer Prite' ছবিটিতে।" Kuleshov, montageএর অসাধারণ cinematic ভাষা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেন ছবিটির নানা অঙ্গের Shooting এর সময়। এক জায়গায় নায়কের দৃষ্টির Shooting করে, অন্য এক পৃথক স্থানে তার objectটি চিত্রায়ণ করেন। Cinematic action, time ও place এক নতুন ভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। একে নাম দেন Kuleshov, Cinematic reality! এটাই পরে Kuleshov Effect নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

১৭ বছর বয়সেই চলচ্চিত্রের অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে, গা ঢেলে তাঁর অসাধারণ গবেষণা চালিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন ছবি তৈরী করতে পারেন নি, তখনই ছিল তাঁর সুবর্ণ সুযোগ। কাটতে বসতেন পুরানো ছবিগুলোকে আবার নতুন করে—নতুন রূপে। অভিনেতা Mosjoukin কে কখনও বসাতেন dining table এর ধারে, কখনও grave yardএ আবার কখনও বা drawing roomএর hearth এর পাশে রাখা আরাম কেদারায়। Montageএর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, তাঁর কাছে আরও নানারূপে প্রতিভাত হতে লাগল।

Kuleshov এর আর একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি সেই Cinema Woman, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া বহু মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গেই, বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর Cinema Woman এর সত্যিকারের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। একজন মহিলার মুখ, হাত, পা, অন্য আর একজনের চুল, আঙুল, মোজা, চুলবাঁধা ও কাপড় পরার সঙ্গে এমন অনুপম ছন্দে ও শৃঙ্খলায় তিনি সম্পাদনা করে montage সৃষ্টি করেছিলেন যে, বোঝারই উপায় ছিল না, সেটা বিভিন্ন মহিলার বিভিন্ন অঙ্গের ছবির সমষ্টি—এক-জনের নয়। ছবিতে পুরো ছবিটা, একটি মহিলার চিত্রায়ণ রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেই তাঁর montage এর চমৎকারিত্ব!

সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ হলেও, Kuleshov মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর montage সম্বন্ধে তিনটি মন্তব্যের প্রথমটি থেকেই। তিনি বলেছেন, "আমার montage theory রচনার পেছনে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে David Wark Griffith-এর ছবি। তাঁর Close up ও parallel action এর dimension ও juxtaposition পর্য্যবেক্ষণ করেই, আমার montage সৃষ্টি অনেকাংশে সফল হয়েছে।" এরপর আর যাঁরা দু'জন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনেই হলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। একজন লিও টলস্টয় আর অন্যজন হলেন কবি পুশকিন্। টলস্টয়, চলচ্চিত্রে montageএ সৃষ্টির বহু আগেই, সাহিত্যে montage-এর প্রয়োগ করে, এর কথা বলে গেছেন। আর পুশকিনের কবিতায় montage-এর প্রয়োগ কি অসাধারণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তা যে কোন চলচ্চিত্রে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

এই বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র গবেষকের সম্বন্ধে, যাঁর হাতে নয়া রাশিয়ার অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ পরিচালক শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরই অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র Pudovkin বলেন, যখন তাঁকে France এর Sorborne University্র এক সভায় Chairman—montage-এর জনকরূপে পরিচয় করিয়ে দেন, "না, আমি নই—montage-এর প্রকৃত জনক আমার ও Sergei Eisenstein-এর গুরু শ্রদ্ধেয় Lev Kuleshov।"

প্রায় ১৩টি ছবি ও বহু মননশীল চলচ্চিত্র গবেষণার জনক Lev Kuleshovকে, আজ চলচ্চিত্রের এই বেসাতির যুগে, বড় বেশী করে মনে পড়ে।

চলচ্চিত্র দর্শক এবং সমালোচক

অরুণকুমার রায়

চলচ্চিত্রের বয়স যত বাড়ছে, চলচ্চিত্র যত জনপ্রিয় হচ্ছে, তেমন পরিমাণে কি চলচ্চিত্র-বোদ্ধা দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে এ প্রশ্ন অনেকেরই। চলচ্চিত্র আর দর্শক, মাঝখানে রয়েছে সমালোচক। পরিচালক নিজের আনন্দে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে খালাস। কিন্তু তা কি ভাবে কত পরিমাণে শিল্পসম্মত, তার রসাস্বাদন কিভাবে করা যাবে, তার কলাকৌশল সমালোচক দর্শকদের জানিয়ে দেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকদের মধ্যে কি ঐক্যের সেতু বাঁধা সম্ভব নয়? পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মতই চলচ্চিত্রও কি তার নিজস্ব সীমাবদ্ধ গণ্ডী মেনে নেবে ইত্যাদি প্রশ্ন অনেক-দিনই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে সদুত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। চলচ্চিত্রের শিল্পমাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন এসে যায় দর্শকরা কি এখন চলচ্চিত্র দেখার সময়ে শিল্পমাধ্যমের সত্তাকে গুরুত্ব দেন না অন্য কিছু?—এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের অনেকগুলি স্তরের মানুষ এবং তাঁদের চিন্তা ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এঁরা হলেন সমালোচক, দর্শক, চলচ্চিত্র পরিচালক ইত্যাদি।

প্রথমে আসা যাক সমালোচকের কথায়। সমালোচক এসেছেন চলচ্চিত্রের জন্মের পরে। সমালোচককে বলা যেতে পারে বোদ্ধা দর্শক। দর্শকের নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে প্রকাশ করার চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমালোচনা নামক ইচ্ছা। ভালো লাগা বা মন্দ লাগাকে খেয়াল খুশি মত প্রকাশ করলেই হলো না। অথচ আমরা তাই করে থাকি। দর্শকের অধিকাংশই কয়েকটি বাঁধাধরা কথার মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেন। যেমন—বোর ছবি, সো-সো, খুব ভাল নয়, গতানুগতিক ইত্যাদি। মত প্রকাশেরও কতকগুলি রীতিনীতি আছে যার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এস্থেটিক্সের প্রশ্ন জড়িত। সমালোচকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়—"সমালোচক কাজের মত কাজ করেন তখনই যখন তিনি পরিচালক ও দর্শকের মাঝখানে একটি সেতু স্থাপন করতে সক্ষম হন।" এই সেতু বাঁধতে গেলে প্রথমেই সমালোচককে কতগুলি গুণের অধিকারী হতে হয়। চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে আগাগোড়া বোঝার ব্যাপার আছে। চলচ্চিত্রের টেকনোলজির খুঁটিনাটি দিকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব (Aesthatic) তাঁর আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্প যৌথভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের সংযুক্তির দ্বারা আর এক নতুন রস পরিবেশন করে। সেই জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের মতই ধাপে ধাপে চলচ্চিত্রের বিচার পদ্ধতি হওয়া উচিত। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, সম্পাদনা, অভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে চলচ্চিত্র সমালোচনা সহজসাধ্য হয় না। যদিও আজকালকার অনেক সমালোচকই সমস্ত দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন না। চিত্রনাট্য পরিচালকের বক্তব্য যথার্থভাবে প্রকাশ করছে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং কোনো অংশে চিত্রনাট্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা কিংবা কোন চরিত্র চিত্রনাট্যে সমান মনোযোগ পায়নি ইত্যাদিও দেখা প্রয়োজন। যেহেতু চলচ্চিত্রের সকল চরিত্র চলচ্চিত্রের মধ্যেই জন্মায় এবং মরে তাই সমস্ত চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন এবং চরিত্রের পরিণতি, স্থান, কাল, ঘটনাকালের বিস্তার ইত্যাদি দেখাও সমালোচকের কর্তব্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে পারদর্শী হওয়া সমালোচকের বিশেষ গুণ। নির্বাক যুগে আবহসঙ্গীত অনেক সাহায্য করেছে। সবাক যুগে কথা এসে সঙ্গীতের দায়িত্ব কিছুটা লাঘব করেছে, তবু সঙ্গীত পরিবেশ, আবহাওয়া, সময় (Period), মানসিক অবস্থা যেমনভাবে প্রকাশ করে তা কি অন্য মাধ্যমের দ্বারা ভাবা যায়? আমাদের সকলের দেখা দুর্গার মৃত্যুর খবর যেভাবে হৃদয়ে ঝংকার তোলে তা সঙ্গীতের যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিত্রনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় অনুধাবন সমালোচকের কর্তব্য। চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যের সঙ্গে প্রায় সম্পৃক্ত আর একটি দিক হলো সম্পাদনা। সম্পাদনার ফলে চিত্রনাট্যের দাবি যথার্থ মিটেছে কিনা কিংবা সম্পাদনা কোথায় যথার্থ হয়নি যার ফলে কোন ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘায়িত মনে হয়েছে কিংবা কোন ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর দায়িত্ব সমালোচকের। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, পরিচালক চিত্রনাট্যের চাহিদা অনুযায়ী, চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা, অভিনেত্রী ঠিক করেন। তাঁদের নির্বাচন চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে কিনা কিংবা তাঁরা পরিচালকের দাবি ঠিকভাবে মেটাতে পেরেছেন কিনা দেখা সমালোচকের কর্তব্য। এছাড়া চলচ্চিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয়ের ধরন, বাচনভঙ্গী, প্রকাশ কৌশল, রূপসজ্জা, মেক-আপ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সমালোচকের দায়িত্ব।

সমালোচকের উচিত কখনই গল্পটি পুরোপুরি না বলা। চিন্তাশীল এবং সত্যকার শিল্প সমালোচক শিল্পকর্মটি ভেঙে ভেঙে অতীত এবং বর্তমানের পটভূমিকায় এর বিচার ও মূল্যায়ন করেন। মতামত প্রকাশের বেলায় ব্যক্তিগত মতামত না পরিবেশন করাই ভালো। সমালোচক শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে, পরিচালকের স্টাইল কৌশল এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দর্শকদের সচেতন করবেন। অর্থাৎ সমালোচকের কাঁধে দর্শকদের খোঁজ খবর দেওয়ার দায়িত্ব চাপছে।

বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য হয় স্টাইলে। অর্থাৎ কেমনভাবে প্রকাশ করছেন তার উপর। ভাষা, কৌতুকপ্রিয়তা, প্রকাশের স্বচ্ছতা, যুক্তি নির্ভরতা—এইগুলি মিলেই সমালোচকের লেখার স্টাইল গড়ে ওঠে। অন্যান্য সমালোচনার মত চলচ্চিত্র সমালোচনায়ও "কি ভাবে বক্তব্য বলা হচ্ছে" তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ "কি বলা হচ্ছে।" অন্যান্য মাধ্যম যেমন মুদ্রিত বই বার বার পড়া যায়, ছবি বার বার দেখা যায় কিন্তু চলচ্চিত্র গতির উপর নির্ভরশীল একটা দেখতে না দেখতে আর একটা এসে পড়ে সেইজন্য কোন চলচ্চিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে গেলে বেশ কয়েকবার সেই চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক চলচ্চিত্রের নিজস্ব বক্তব্য আছে। ছবির প্রতিটি ফ্রেমের জন্য পরিচালককে চিন্তা করতে হয়, কোথায় ক্যামেরা থাকবে, কিভাবে থাকবে, অভিনেতারা কিভাবে তাঁদের অভিনয় ফুটিয়ে তুলবেন ইত্যাদিও পরিচালকের নির্দেশের মধ্যেই থাকে। সেইজন্য ছবির প্রতিটি দৃশ্যের জন্য পরিচালকের যে চিন্তা তার সঠিকত্বের উপরই নির্ভর করে তার চলচ্চিত্র গুণ। ক্যামেরার অবস্থান, অভিনেতাদের চলাফেরা প্রভৃতিও চলচ্চিত্রের বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে তাই অনভ্যস্ত হাতে ছবির চলচ্চিত্রসম্মত অর্থ পাল্টে যায়।

প্রত্যেক দেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বা ঢঙ সেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। পৃথিবীর সর্বত্র সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রগুলিকে অবশ্য এই ধরনের তকমা দিয়ে আলাদা করা যায় না তবু এটুকু বলা যায় এইগুলির গায়েও তাদের দেশের মাটির গন্ধ আছে। বৈশিষ্ট্য বা ঢঙ বোঝাতে আমি ঐ দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকার যে স্টাইলে ছবি করেন তাই বোঝাতে চাইছি। এই বৈশিষ্ট্যে আধুনিক ফরাসী ছবি, আধুনিক সুইডিশ ছবি, আধুনিক জার্মান ছবি, যে যার নিজের বৈশিষ্ট্যের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা।

প্রত্যেক দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায় বা পিরিয়ড। প্রত্যেকটি পর্যায়ের পিছনেই কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। এইগুলি নির্ণয় করে দেয় কি ধরনের চলচ্চিত্র সেই দেশে বেশি করে তৈরী হবে। উদাহরণ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি থেকে কিছুদিন ভাল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা পৃথিবীকে জানিয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের ক্ষমতা কতদূর, শিখিয়েছে চলচ্চিত্রকে সত্যকার গণমাধ্যম হিসেবে ভাবতে। কিন্তু আজ সপ্তম দশকে নির্মিত সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে কি তেমন কোন শিক্ষা পাই? দ্বিতীয় দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির উপজীব্য কাহিনী ছিল সদ্য সমাপ্ত বিপ্লব বা বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অবস্থা। কিন্তু সপ্তম দশকের চলচ্চিত্রের কাহিনী হল আধুনিক রাশিয়া। এই দুই দশকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের উপর দুই সময়ের চলচ্চিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্যই এই পরিবর্তন বক্তব্যের দিক থেকে। বর্তমানে অনেক দেশেই আধুনিক চলচ্চিত্র টেকনোলজির দিক থেকে অনেক উন্নত। এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সম্ভব হয়েছে সেইজন্যে আজ ত্রি-মাত্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে এবং পরীক্ষা চলেছে।

চলচ্চিত্র সম্মিলিত (Composite) সৃষ্টি বলে দর্শকের দায়িত্ব নেই তা নয়। ভাল দর্শকই ভাল চলচ্চিত্রের জন্মদাতা। কার জন্য সৃষ্টি, শুধু কি গুটিকয়েক সমালোচকের জন্য? নিশ্চয়ই নয়। বৃহৎ দর্শকসমগুলী বোদ্ধা না হয়ে উঠলে যথার্থ ভাল চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবে না। দর্শকমণ্ডলীর একটা বৃহৎ অংশ চলচ্চিত্র দেখতে যান কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য। ভাল চলচ্চিত্রের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা যেমন আছে তেমনি সঙ্গে আছে শিল্পসম্মত গুণ। মনোরঞ্জনের ক্ষমতা দিয়ে অনেক দর্শককে আকৃষ্ট করা যায়। যায় না শিল্পগুণ দিয়ে। চলচ্চিত্র শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য দর্শককে শিক্ষিত হতে হয়। এই শিক্ষা চলচ্চিত্র ভাষা শিক্ষা। অর্থাৎ চলচ্চিত্র বোঝার জন্য দর্শককেও কিছুটা চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষিত হতে হয়।

দর্শককে শিক্ষিত করার জন্য চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। কোন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে চলচ্চিত্রের মধ্যে কিভাবে পর পর ফ্রেমগুলি এসেছে, চরিত্রগুলি কে কোন অবস্থান থেকে কি বলছে, কখন বলছে, সঙ্গে কি সঙ্গীত আছে, ক্যামেরার অবস্থান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটাই মাথায় রেখে আলোচনা করতে হয়।

আমাদের বাংলা দেশের দর্শকদের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যাবে, একদল দর্শক কেবলমাত্র হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক। কোন ছবিই প্রায় বাদ পড়ে না। এই দলে অবাঙালীর সংখ্যাধিক্য। অবশ্য সদ্যসমাপ্ত স্কুলের ছাত্র কিংবা সদ্য প্রবেশলব্ধ কলেজের ছাত্ররাও অনেক পরিমাণে এই দলে আছেন। অবশ্য আর একদল শুধুমাত্র ইংরাজী ছবি দেখেন। অবশ্য ভাল হিন্দি বা বাংলা ছবিও দেখেন। বাংলা ছবি দেখে এমন দর্শকের সংখ্যা আজকাল অনেক কমে গেছে।

দর্শকদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা যথেষ্ট থাকলেও তাঁরা চলচ্চিত্র দেখতে যান প্রধানতঃ মনোরঞ্জনের জন্য। ফিল্ম ক্লাবের কিছু সভ্যা ছাড়া সাধারণ ভাবে আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত সচেতনতা নেই। ছুটির দিন কিংবা কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় আনন্দে কাটাবার

ইচ্ছায় তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে ঢোকেন। তাই সকল ধরণের চলচ্চিত্রই অধিকাংশের কাছে ভাল লাগে। অবাস্তবতা, বাড়াবাড়ি, অতি-অভিনয়ও সাদরে প্রশ্রয় পায়।

* * * *

দর্শকের সাথে পরিচালকের পরিচয় ঘটান সমালোচক। এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কারণ চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পমাধ্যম চিত্রকলা, মুদ্রিত পুস্তক বা থিয়েটার নয় বলে এর সমালোচনা একবারই হবে এবং তারই উপর নির্ভর করছে পরিচালক বাঁচবেন না মরবেন। অন্যান্য মাধ্যমের মত পুনরায় বিচার করার উপায় নেই বলেই ভুল সমালোচনা পরিচালকের জীবন শেষ করে দিতে পারে। এক একজন পরিচালকের এক একটি চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্যের জন্য কত বছরের চিন্তা ভাবনা থাকে সমালোচক এক কলমের খোঁচায় হয়ত তা ধুলায় মিশিয়ে দেন। এইজন্য সমালোচককে সহানুভূতিশীল হতে হয়।

প্রত্যেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সম্বন্ধে দর্শকদের ওয়াকিবহাল রাখা সমালোচকের কাজ। আমাদের মত দেশ বলেই একথা বলছি। আমাদের দেশে দর্শকরা ছবি দেখার আগে বিচার করেন কোন পরিচালকের ছবি তাই দিয়ে নয়, কোন দেশের ছবি তাই দেখে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। কিছুদিন আগে হাওড়ার একটি প্রেক্ষাগৃহে লিণ্ডসে এ্যান্ডারসনের 'ইফ্' চলছিল। সন্ধ্যার শো শুরু হবার সময়েই প্রায় পৌঁছে টিকিট কেটে হলে ঢুকে দেখি সামনে একদম ফাঁকা, মানে অল্প কিছু, আর পিছনে আরো কিছু মানুষ। বোধহয় সবশুদ্ধ জনা পঞ্চাশ হবে। এই বলে কি মনে করতে হবে হাওড়ায় উৎসাহী লোক নেই, তা নয় আসলে সাধারণ লোকের কাছে ভাল ভাল ছবি এবং তাদের নির্মাতাদের সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করে রাখতে হবে। এই দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচকের।

এই প্রসঙ্গে মনে হয় পরিচালকদের নিজেদের দায়িত্ব আছে। যদিও মাঝে মাঝে তাঁরা ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য রাখেন তবু বলা যায় এ ধরনের আলোচনা থেকে পরিচালকের চিন্তা সবসময়ে বিশদ-ভাবে লাভ করা যায় না। পরিচালক যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সৃষ্ট কর্মে যে চিন্তা ফুটে উঠে অনেক সময় সমালোচক নিজের চিন্তা দিয়ে হয়ত তার নতুন ব্যাখ্যা করেন যা পরিচালকের চিন্তায় ছিল না। এই ক্ষেত্রে মনে হয় সমালোচকই যথার্থ, কারণ তিনি যদি যুক্তি এবং ব্যাখ্যার দ্বারা সমগ্র শিল্পকর্মকেই একটি ব্যাখ্যায় দাঁড় করাতে পারেন তাহলেই তিনি সমালোচক হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবেন। অনেকসময় এমনও হয় পরিচালকের চিন্তায় যা ছিল না, সমালোচক তাঁর ছবি থেকে তা উদ্ধার করে নতুন ব্যাখ্যা দেন। পরিচালকেরা যদি তাঁদের নিজেদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেখেন তাহলে সমালোচক এবং দর্শক উভয়েরই সুবিধা হয়। বিদেশে অনেক পরিচালকই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সাথে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কিছু কিছু লিখেছেন। আমাদের দেশে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তবে এর বিস্তার ও ব্যাপকতা দেশের চাহিদার তুলনায় এত কম যে সমালোচনা ব্যাপারটা গড়ে ওঠার পিছনে পরিচালকের সক্রিয় সহযোগিতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে না।

চলচ্চিত্র আর দর্শকের মাঝে সমালোচক রয়েছেন। সমালোচকের বক্তব্য দর্শক জানতে পারেন চলচ্চিত্র সংক্রান্ত লেখা পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে সমালোচনা লেখা ব্যাপারটা খুবই অবহেলিত। খবরের কাগজগুলি সপ্তাহে একদিন করে চলচ্চিত্রসংক্রান্ত ব্যাপারে কাগজের একটি করে পাতা বরাদ্দ করেন বটে কিন্তু দেখা যায় পাতার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, বাংলা খবরের কাগজগুলির সমালোচনার ধরণ একঘেয়ে এবং বাঁধাবুলির মত সব কিছু একটু একটু করে ছুঁয়ে চলে। ব্যতিক্রম দেখা যায় ভাল পরিচালকের ছবির সমালোচনায়। তখন এঁদেরই হঠাৎ নতুন চেহারা! বেল্ট কষে, টুপী ঠিক করে বন্দুক বাগিয়ে বসেন। তুলনামূলক ভাবে ইংরাজী কাগজ-গুলিতে সমালোচনায় নতুনত্ব আছে এবং সমালোচনাগুলি তুলনামূলকভাবে অর্থপূর্ণ হয়। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ সমালোচনার পরিসর অত্যন্ত অল্প।

কতকগুলি শুধুমাত্র সিনেমারই সাপ্তাহিক কাগজ আছে। বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষায়। এর মধ্যে ইংরাজী কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে ভাল সমালোচনা বেরোয় অন্য সময় গতানুগতিক। সুটিং-এর খবর, চলচ্চিত্রের ছবি, নানারকম কেচ্ছাকাহিনী, মনগড়া গল্পে ভর্তি থাকে। কতকগুলি ইংরাজী ও হিন্দি পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকা রয়েছে যেগুলি বেশির ভাগ খবরের কাগজের গ্রুপের পত্রিকা তাই ব্যবসাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। এগুলির মধ্যে নানারকম কাণাঘুষা, কে কি করছে, কাকে কোথায় দেখা গেছে, কার পা বাঁকা, কার কোথায় তিল আছে ইত্যাদি খবরে পূর্ণ থাকে। বাংলা 'আনন্দলোক' এর ব্যতিক্রম নয়।

খবরের কাগজ ছাড়া রয়েছে ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্র। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক ক্লাবেরই একটি বা দুটি করে মুখপত্র রয়েছে। এইগুলি হলো সিনে ক্লাব অফ্ ক্যালকাটার বাংলা মুখপত্র 'চিত্রকল্প' (ত্রৈমাসিক) এবং ইংরাজী 'কিনো'। সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মাসিক বাংলা মুখপত্র 'চিত্রবীক্ষণ'। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির বাংলা মুখপত্র 'চিত্রভাষ', ফিল্ম সোসাইটির 'চিত্রপট', সিনে ইনস্টিটিউটের মাসিক 'চলচ্চিন্তা' এবং ত্রৈমাসিক 'মুক্তি মনতাজ'। নৈহাটি সিনে ক্লাবের 'দৃশ্য' এবং ফেডারেশন অফ্ ফিল্ম সোসাইটিজের ইংরাজী মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার'। ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্রগুলির প্রধান অসুবিধা হলো এর প্রকাশ অনিয়মিত।

প্রত্যেক মাসে একটি করে নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকা নেই। তাই যখন কোনো চলচ্চিত্রের ওপর আলোচনা প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই চলচ্চিত্র দেখানোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। উপরে উল্লিখিত পত্রিকাগুলিতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা থাকে। সমকালীন চলচ্চিত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি খবরের কাগজের মতোই ভাল পরিচালকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ভাবে লেখা হয়। ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্রে যে ভাবে বিশ্লেষণ আশা করা যায়, সমালোচনাগুলি তেমনভাবে লিখিত হয় না। বেশীর ভাগ লেখার মধ্যেই সাহিত্য-গুণ চলচ্চিত্র কৌশলগত আলোচনার দিককে আচ্ছন্ন করে রাখে। তবে এ'কথা স্বীকার করতেই হবে চলচ্চিত্রের যথোপযুক্ত আলোচনা যা হওয়া উচিত তা যতটুকু প্রকাশিত হয় তা কেবলমাত্র এই পত্রিকাগুলির পাতাতেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যই যে মুখপত্রগুলি কেনেন তা নয়, তার ফলে এই সকল পত্রিকাগুলির সাকু্লেশন খুব বেশী বাড়েনি এবং অন্যান্য পত্রিকার মত আর্থিক সংকটও রয়েছে। প্রত্যেক ক্লাবের উচিত কেন তাদের মুখপত্রগুলির প্রচার এবং বিক্রি বাড়ছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া এবং মাসিক মুখপত্র হিসেবে বের করা। তা না হলে প্রত্যেক ক্লাবের মধ্যে আলোচনা করে এক একমাসে যাতে কেবলমাত্র এক একটি ক্লাবের মুখপত্র বেরোয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবে ভালো চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সাথে সুস্থ আলোচনাও শুরু হোক। সমস্ত ক্লাবগুলি যৌথভাবে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই পত্রিকার দামও কম থাকবে। আসল উদ্দেশ্য বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করে তোলা, সেইজন্য চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকার মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বছরে কয়েকটি ছবি করমুক্ত করে দিলেই সব শেষ হয়ে যায় না। ভাল ছবির প্রদর্শনের কোনো প্রেক্ষাগৃহ নেই। সরকার যদি একটা বা দুটো প্রেক্ষাগৃহ অধিগ্রহণ করে সেই প্রেক্ষাগৃহে শুধুমাত্র ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন প্রযোজিত ছবিগুলি যা ব্যবসায়িকভাবে মুক্তি লাভ করেনি, বা বিদেশী ভাল ছবি কিংবা ফিল্ম আর্কাইভসের অন্তর্গত নির্বাক যুগের সেরা ফসলগুলির ধারাবাহিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ চলচ্চিত্রগুলির উপর আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন তবে দর্শকের রুচির পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। বর্তমানে আমরা দর্শকদের ভাল রুচির অভাবের জন্য দায়ী করি কিন্তু সাধারণ দর্শকের সামনে সারা বছর ধরে ভাল রুচির ছবি কটি থাকে? হাত গুনে বলা যায় চার থেকে পাঁচ। এতো গেল রুচির দিক।

দর্শককে চলচ্চিত্রে অনুরাগী করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র সম্বন্ধে পড়াশুনা এবং যাঁরা চলচ্চিত্র নিয়ে কাজকর্ম করতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। সরকারী তত্ত্বাবধানে ভাল ভাল চলচ্চিত্র সাংবাদিক, পরিচালক, কলাকুশলী দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থা গড়ে উঠুক। স্টুডিও পাড়ায় এই সংস্থা হলে সব থেকে সুবিধা। বর্তমানে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রসার এবং খ্যাতি দুইই বেড়েছে কিন্তু এই সংস্থায় অধ্যয়নের মতো আর্থিক সংস্থান অধিকাংশ লোকেরই নেই তাই যদি কোনো সংস্থা গড়ে ওঠে তাতে যেন প্রবেশ করার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিও সাধারণ মানুষের থাকে।

আর একটি ব্যবস্থা করা যায় যার দ্বারা দর্শকের চলচ্চিত্র ভাষা বোঝার সাহায্য হয় সেটি হ'লো কোনো চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষ হলে সেই চলচ্চিত্রের পরিচালককে স্টেজে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সদ্য দেখা চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা সকলের চিন্তায় থাকবে তাই এই ধরণের প্রচেষ্টায় অধিক সংখ্যক দর্শক অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই ধরণের প্রচেষ্টা সরকার পরিচালিত প্রেক্ষাগৃহেই সম্ভব। আশা করবো জনপ্রিয় সরকার এই দিকে দৃষ্টি দেবেন।

এ ছাড়া দর্শককে শিক্ষিত করার জন্য ভাল চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশের দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। প্রথমেই যদি সরকারী তরফে চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনো নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে অসুবিধা থাকে তো সরকারী তরফে ফিল্মক্লাব গুলির মুখপত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। এই মুখপত্রগুলির নিয়মিত প্রকাশ হলে চলচ্চিত্র বিষয়ক সুস্থ আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠবে।

জনপ্রিয় সরকারের কাছে আর একটি প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। বিদেশের মত যদি চলচ্চিত্রকে পড়াশুনার অঙ্গ করে নেওয়া যায় অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। তাহলে নিশ্চয়ই সবদিক দিয়েই চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এর সম্বন্ধে সকলকেই আগ্রহী করে তুলবে।

শিল্প জীবন ঃ ঋত্বিক ঘটক ঃ একটি অন্বেষণ

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটকই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন এই উক্তি যে, 'জন্মই জীবন, শিল্প জীবন'। অবশ্য এই সংজ্ঞা অত্যন্ত সহজ বলেই আবার তা জটিল। কেননা জন্ম কাকে বলে, জীবনই বা কী, শিল্প জীবন কেমন ভাবে সম্ভব, এই সব গূঢ়তর চিন্তা যতক্ষণ না একজন মানুষ কিংবা শিল্পী, পাঠক বা সমালোচকের ধারণায় স্পষ্ট এক সূর্যময় ধারণায় পৌঁছবে, ততক্ষণ এই উক্তির শিল্পের দুয়ারের রহস্য কিছুমাত্র উন্মোচিত হয় না। বস্তুত মনেই হয় না যে, এই অপৃথক যন্ত্রজাত এক গভীর ছন্দময় শব্দের স্বতন্ত্র বিচার ভাবনা কোনো ক্রমেই সম্ভব। প্রাত্যহিকের সঙ্গে নিযুক্ত এই জীবন এই শব্দ কি রেখে যায় কোনো ভিন্নতা? তবে কি ভিন্নতা থেকে যায় জীবনের সেই সংলগ্নতায়। সঞ্চার করে দেয় কি সেই "যত ক্লেদাক্ত বিষাক্ত অভিশাপের ভিতর দিয়ে আমাদের বেরুতে হবে, শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।" এই অন্তর্লীন রহস্যে ভরা ভিতর অস্তিত্বের হিসাব নিকাশ।

জনজীবনের নানাস্তরে বাংলা চলচ্চিত্র কিংবা একটু এগিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুক্তি কামনা ক্রমপ্রসূত হয়ে চলে যায় একটা ঝলমলে নিকানো নিটোল সাজানো গোছানো বাস্তবতার মুখোমুখী পরিবেশে, ঠিক তখনই হঠাৎ অযান্ত্রিক নিয়ে এই চলচ্চিত্রকার প্রত্যাবর্তন করেন, ব্যাখ্যা করেন দুঃসহ জলন্ত বাস্তবতায় যান্ত্রিক বস্তু সভ্যতায় মানুষের নিষ্ঠুরতা, তার ক্লেদাক্ত অসহায় পরাজয়, চঞ্চল জীবন প্রবাহে আনন্দময় জীবনকেই। ঠিক এই একটি মাত্র ছবিই, সমস্ত সভ্যতার অবয়বের সঙ্গে জড়িত রূপে, ছন্দে, ভাষায় অবিচ্ছেদ্য জীবন অংশ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই কি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক আধুনিক কাল ভূমিকায় এক জটিল অন্তঃময় সংঘাতের নিজের মধ্যে অসতর্ক শিথিলতা আত্মসাৎ করে নেন। এই ভাবেই কি জীবনের সমভূমি থেকে উত্তোলিত করে নেয় আত্মিক ভূমাহীন এক ভূমিতে।

স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, হয়তো শিল্পী জীবনের চেতনায় তাঁর স্পর্ধা ছিল, সেই নিষ্ঠুর বাস্তবকে কোনো রাঙানো নয়, সভ্যতার আগুনে ঝলসে দেওয়াতেই, তাঁর সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা, তিতাস, মুক্তি তকো, এই সব রূপের রূপপ্রকৃতির মধ্যে কি সেই সাবীমূলের সর্বাধিক গুরুত্বময় আদর্শ বোধের জগতে পৌঁছে দেয়নি! কিন্তু সভ্যতাকে কেবলি অন্তর্লীন অন্ধকারায় ধরে নিয়ে যায় সব জীবনের গানকেই। বস্তুত মুক্তিপ্রাপ্ত সবকটি ছবিতেই সুবর্ণরেখায় ধারে নতুন বাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন শিল্পী, যেখানে জীবন ফুলের মতোই ফুটে উঠবে, থাকবেনা অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ততা, মানুষ মানুষকেই ভালোবেসে বিশ্বাসে ত্বরান্বিত করে তুলবে নতুন সুন্দর এক প্রজন্মে।

এই সব চিন্তা জীবনগত শিল্প চেতনায় যখনই গৃহস্থালি ভূমিকা নেয় তখনই আপোষের প্রসঙ্গে আর তিনি ধরে রাখতে পারেন না। তাঁর আক্রমণ তাই ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিন হয়, কিন্তু এই কঠিনতার কথা রূঢ়তার বা ক্ষোভের কথা বলতে বসে মনে রাখতে হবে শিল্পী স্বয়ং নিজস্ব এই আক্রমণের সুযোগ যেমন খুলে দিয়েছেন, তেমনিই সাবধানতা নিয়ে তাঁর কোনই ছিলনা ভাবনা, ভাবনা ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের ফর্মকে কিংবা তার আঙ্গিক সর্বস্বতাকেই ভেঙ্গে দিলেই পাবেন সেই মুক্তির জগতে পৌঁছতে। তাই অবশ্যই প্রত্যেকটি নিজস্ব জগত নিয়েই এসে যায় এই শিল্পকর্মগুলি, যাতে ভাবনা জগতের অন্তর্বর্তী দেশকে রূপায়িত করে দেয়, আবার ভিন্ন ভাবে এই চলচ্চিত্র শিল্প যে ক্রমশঃই পৌঁছে দিতে চায় এবং পৌঁছতে চায় একটি কাব্যিক ছন্দময় রচনার দিকেই, তাকেই খুলে দিতে চেয়েছেন। একথা কিন্তু সর্বত্র সত্য নয়, যে জীবন অনুষঙ্গ যখনই বেঁচে থাকার নানান তলকে কেবলি মুখোমুখি এনে দিতে চেয়েছে একই সঙ্গে, তখনই কি সেই সত্যের পথ চলনে স্পর্শ করাতে চায় সেই গভীর যন্ত্রণায় উপলব্ধির তীব্র কবিতাকে।

আমরা তো চেয়েইছি, দৃশ্যমান শিল্প তার আলোছায়ায়, শব্দ, নিঃশব্দে, চলায়, থামায়, তার সামগ্রিক সঞ্চরমান জীবনের সঙ্গেই জড়িত কেবলি খুলে খুলে দিক সেই মহৎ সৌন্দর্যের খনিকে। এইভাবেই তো আমরা আমাদেরই অজ্ঞাতে ঢুকে পড়ি সেই সৌন্দর্যের সভ্যতায়, যা আমাদের সমস্ত দুর্বলতম ক্লীব ইচ্ছাগুলোকে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়ে দেবে প্রাচীন ঐতিহ্যময় এবং সঞ্চরমান নিজস্ব অনুভবের উপলব্ধির জগতে।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব আঙ্গিককে খুলে দিতে চেয়েছেন বারবার ঋত্বিক। তাই তাঁকে চলচ্চিত্রের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে দর্শকদের কাছে সেই শব্দ সেই ভাষাকে নিয়ত একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তিনি বুঝেছেন "ভাষা", এইটিই চলচ্চিত্রের নিজস্বতা, উপন্যাসের ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা নয়। আবার এই "ভাষা থাকলেই তার একটা ব্যাকরণ থেকে যায়, একটা সংঘবদ্ধ রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাকে পার হতে হয়। তেমনি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই একটি ভাষা তার রূপ পরিগ্রহ করে।" সঙ্গে নিয়ে আসে তার নিজস্ব মুক্তিকেও। ভাষা এবং শব্দ। ভাষার পরেই এসে যায় শব্দ। ভাষার বিকাশের জন্য এলো শব্দ। সঙ্গীত

সংলাপ, বিভিন্ন শব্দ, নিঃশব্দতা এইসব এবং আরো সব উপাদানগুলি মিলে মিশে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই স্পষ্টতার দিকেই। ভাষা আর শব্দ এক নয়। ভাষার মধ্যেই আছে শব্দ। আবার এই দুজনের বিবাহিত শয্যায় শব্দ-ব্যক্তিত্ব জন্ম নিচ্ছে। আবার এই শব্দকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ছন্দের অক্লান্ত অন্বেষণে চলেছে এই আগ্রহ। কিন্তু সেই ছন্দ কোন্ ছন্দ? সেই ছন্দই, সমস্ত সামগ্রিকতার পরস্পর গ্রন্থন এবং বিন্যাসের এক অমোঘ লীলায় সেই অশ্রুত এক ঝঙ্কার ধ্বনি বেজে ওঠে, প্রবেশ করায় সেই অন্তর্লীন রহস্যে ভরা মানুষকেই বোঝবার বোঝাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সংবদ্ধ অথচ বৈচিত্র্যের ছন্দের তরঙ্গের মধ্যে এক মুক্তির সন্ধানে হাতছানি দেয়। জীবনকে ধরিয়ে দেবার আগ্রহ হয়ে ওঠে প্রবল। ক্রতই দর্শকমনের জীবন অনুসন্ধকেই যেন ছুঁতে পারা যায়। ছন্দ যেমন কোনো ক্ষেত্রে কবিতার হয়ে ওঠে এক দুর্বোধ্য আড়াল, বিপরীতে এই ছন্দই আবার দৃশ্যমান শিল্পে খুলে দেয় জীবন প্রসঙ্গে আলোচনায়।

কিন্তু ভাবলে মনে হবে, হয়তো নিতান্তই এইটা একটা মাত্রার সংযোজন। কেননা, এই সবের সৌষ্ঠবেই কি শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়বে আমাদের চলন। এইটাকে বলি গভীর শিল্প, ওইটাকে শিল্পহীনতা, এইসব হয়তো নমনীয়ভাবেও কি মনে আসবে, এই সব ভ্রান্তিমূলক আকর্ষণ। কিন্তু তা নয়। এই গভীর জীবনের ভাষায় পৌঁছতেই চায় শিল্পমনস্কতা। কারণ এতেই আছে বর্তমান প্রজন্মের মুক্তির পথের ইশারা। তাই এই ছন্দ, ভাষার চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে, ভিতর দিকে আরো ভিতর দিকে পেনিট্রেট করে দেয়, ইনার রিয়ালিটির গভীরতাকেই ছুঁয়ে দিতে চায় এই প্রবহমান ছন্দের মাত্রা। সারফেসকে ছেড়ে এই দৃশ্যমান চিত্রময়তা কেবলি ঘুরে ফেরে সেই গভীর গভীরতর সুড়ঙ্গের পথ ধরে। বিশৃঙ্খলার সুযোগ কখনই যেন না এসে সমস্যা তৈরী করে রাখে। তাই একটি স্থির নির্দেশের অবয়বের দ্বারা, বহির্বিচারে যা মুক্ত অন্তর থেকে সুশৃঙ্খল করে নেওয়া যায়, তাতেই জীবনকে ধরতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক।

এই ভাষা, এই শব্দ, এই ছন্দ, যতখানি উপকারী হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের শিল্প দৃশ্যমানতায়, তেমনিই আবার প্রবল বাধাও হয়ে দাঁড়ায়, যাতে বহিঃঅবয়বে থমকেও দাঁড়াতে পারে। তাই এই ভয় থাকার জন্যই বারবার কবিতাকেও তিনি ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়েছেন। যেমন 'সুবর্ণরেখা'য় পরিত্যক্ত এরোড্রোমে সীতা আর অভিরামের দৃশ্যটি। দুই নিষ্পাপ শিশুমন খেলে বেড়ায় একদা যুদ্ধের জন্যই ব্যবহৃত আজকের এই পরিত্যক্ত এরোড্রোমে। অথচ তারা সেই শিশুমনের চঞ্চল সজীবতায় জানেই না, এই জান্তব-পাশব-পাষাণ এরোড্রোমটি কত মানুষের মৃত্যুর ঘোষণার জন্যই ব্যবহৃত। সেই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ক্লাব ঘর, যেখানে সীতা-অভিরাম খেলেছে, এইটিই ব্যবহার হতো সেই জন্যই। যেখানে ঘরে বসেই সেই সব মহাযোদ্ধারা, মানুষ হত্যাকারীরা হত্যার পর হৈ হল্লা করত মানুষ মারার তীব্র উল্লাসে, বা মানুষকে মৃত্যু দেবার ক্লান্তি থেকে জেগে ওঠার জন্য। ঋত্বিক এই দৃশ্যে সমগ্র ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ দিয়ে রচনা করেন সেই সর্বনেশে কবিতায়, তার মধ্যে ঢুকিয়েও, তছনছ করে, জনজীবনের জীবনঘনিষ্ঠ উত্তরও তিনি রেখে যান, পটভূমিকায় বিলীয়মান স্মৃতিকে সজীব রেখে চিরন্তন মানবিক সমস্যার লক্ষ্যেও ফিরিয়ে দিতে ভয়াবহ তীব্র চীৎকারে।

এই ভাষা এই শব্দের, এই সঞ্চরমান ছন্দ আমাদের আরো গভীর সেই লুকোনো সত্য রহস্যের দিকে পৌঁছে দেবার জন্যেই এসে যায় প্রতীক। প্রতীকের নিজস্ব শক্তিই হচ্ছে দূরে আরো দূরের গভীরে সে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। একটা নিবিড় নিটোল অর্থের মধ্যে দিয়ে একটি তীব্র আকাঙ্খাকে জন্ম দেয়। এই আপাত নিরর্থক বোবা অথচ ইঙ্গিতময় অর্থের দিকেই তার নিরন্তর যাত্রা। এই প্রতীকের গভীরতর তাৎপর্য্যময় ব্যঞ্জনা সূর্যের মতোই বিকীর্ণ হতে থাকে। এই বিকীর্ণতা শতধারায়। কারণ, প্রতীক এক বিশেষ অর্থের মাত্র প্রতিনিধিত্বই করে না। ঋত্বিক এই প্রতীকতা নিয়ে কেবলই ভাবনায় চিন্তায় আরো গভীরভাবে সেই আবেগের কাছে হাত রাখতে চেয়েছেন। সেই আবেগের কাছে অসংখ্য প্রতিধ্বনির জন্ম দিতে চেয়েছেন সচেতন প্রয়াসে। তাঁর প্রতীক কিছুমাত্র এক অর্থে বলে না, আবার বহু অর্থে বলতে চায়। কোনো বক্তব্যকে সে টেনে আনতে চায় না। অথচ ভিন্নভাবে সেই বিষয়েই তার বলার কিছু আগ্রহ রেখে যায় তার নিজস্ব ভাষাতে। সে যেন ছলনাময় আলৌকিক রহস্যময়তায় হারিয়ে গিয়েও আবার প্রতিবাদের বাস্তব ভাষা। সে নিজেকে অতিক্রম করেও আবার নিজেকে ধরে নিতে চায় সে কেবলই নিজের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যামূলক-দর্শন মূলক চিন্তনে সর্বক্ষণ নিযুক্ত। অক্লান্ত সৈনিক। তাই বারবার ফিরে ফিরে চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক লোক জীবনের ফল সম্পর্কের যোজিত এক প্রতীকতায় টেনে নিতে চেয়েছেন। মহাকাশ যেন এই নবীনকেই প্রকাশ করে দেয়। প্রত্যেক মুহূর্ত কেবল বর্তমান নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকেই যেন তার নিরন্তর যাত্রা। সব কিছুতেই জীবিত চঞ্চল প্রবাহের সঞ্চরমান ছন্দকেই বুঝে নিয়েছেন ঋত্বিক। তাই কেবল বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছাই নয়, পুরাণপন্থা বা ক্লাসিক অনুবর্তনের শিকড় সন্ধানে ব্যস্ততাতেই কাটে তার শিল্পমন।

তাই তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মেই তিনি কেমন করে বর্জন করে চলছিলেন চলতি চরিত্রের ভাবনা। অথচ এই চলতি চরিত্রের নিবিড় ঐক্যের শিকড় সন্ধান করছিলেন সেই পুরোনো চরিত্রের মধ্যেই। সুবর্ণরেখায় যখন দেখি তিনি সব থেকে বিদ্রোহী, এবং মার্কসীয় চিন্তায় ভাবনায় নিষ্ঠুর এক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সত্যের অনুসন্ধানী, তখনও তিনি পুরোনো ঘটনা নিবেশেও নিয়োজিত থাকেন। ছবিটিতে রাম সীতার উপাখ্যান, অভিরামের রাম এই প্রাচীন চিন্তার ধরন ও প্রস্তাবনা তাঁর বৃহৎ ব্যবহারে আসে। তিনি নিজেই আমাদের শুধরে দেন এই বলে, "পুরাণের অলৌকিকতাও প্রতীক প্রথাকে খাদ্য যোগায় ।...প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে ধারালো করে তুলবার কাজে তাদের দান অপরিমেয়। তাছাড়া প্রথা নিকট ভবিতব্য সম্পর্কে

আমাদের মনকে সুস্থির রাখে—কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার লোভে মনকে অস্থির করে না। শিল্পভাষার অতিব্যবহৃত কৌশলের স্থান এতে নেই।" স্মরণযোগ্য, এই ছবিতেও এই দৃশ্যেও তিনি কবিতাকে ভেঙ্গে দেন ভেতর রহস্যের দ্বার উন্মোচনের জন্য। শিশু সীতা যুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্রে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক ভয়ংকর কালীমূর্তি তার সামনে এসে পড়ে। মাস্টার মশায়ের কথায় প্রকাশ পায় "বহুরূপী"। ঋত্বিক এই একটি দৃশ্যের ব্যঞ্জনাময় প্রতীক উপস্থাপনার মধ্যে মানব সভ্যতার জীবন মরণের কথা বলে দেন। "সুদূর অতীত থেকে যে archetypal image আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air command, তার নাম হয়তো বা De Gaulle হয়তো বা Adeneur হয়তো বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোন নাম। পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমরা ঐ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো তার সামনেই পড়ে গেছি।...এক মহাপ্রলয় পর্বের মূক সাক্ষীর ওপর দাঁড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো না। ধাক্কা দরকার।" এইখানে স্মরণ হয়, তিতাসের সেই দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা। যেখানে পাগলকে দোলের দিন নদীর ধারে নিয়ে আসে। পাগলও তাকে রঙ মাখায়, অনন্তর মাকেই কি একদিন পাগল এই ভাবে এই দিনে টেনে নিয়ে ছিল নিজের কাছে। এই কথা হয়তো তাকে মনে করায়। অনন্তর মাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এই দৃশ্য গ্রামের লোক ভালো মনে করে না। তারা এসে পাগলকে প্রহার করতে শুরু করে। দ্রুত কাট্ শটে দেখা যায় পাগল নদীর চড়ায় পড়ে, একই ফ্রেমে নদীর ঘাটে একটি নৌকা উপুড় হয়ে উল্টে মূক হয়ে পড়ে আছে। একই দৃশ্যের একই ফ্রেমের দৃশ্য গ্রহণের ব্যঞ্জনা, ঋজু ভঙ্গীতে তিনি স্থাপন করেন ক্যামেরা জীবনটাই এদের চলেছে উল্টো মুখে, কেবলি মার খেয়ে মার খেয়ে। শোষণের নিয়ত বন্ধনে। নদীর চরে মালোরা সমগ্র সত্তাকেই এই ভাবেই ছেড়ে ফেলে দেবে।

সময়খণ্ড যেন বায়ুশূন্য না হয়, তা যেন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তাঁর হাত কেবলই দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে, লোকপুরাণের দিকে ফিরে যেতে চাইছিল। দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যময়তার দার্শনিক ব্যাপ্তিকে তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন। দেশকালের লোকপুরাণের স্মৃতি আমাদের সেই গভীর পথে দাঁড় করায়। বিষ্ণুপ্রিয়া, শকুন্তলা বা উমার প্রত্যাকে এসে দাঁড়ায় তাঁর নারী চরিত্র। দেশ কালের স্মৃতি এই সব চরিত্রের মধ্যে পুরানো মহিমার সঙ্গে আমাদের বিলীন করে দেয় সভ্য এক জগতের মধ্যে। কোমলগান্ধারে অসম্ভব শক্ত অথচ দেশীয় প্রতীকতা, অসম্ভব এক জগতের মধ্যে দাঁড় করায়। পৌঁছে দেয় নিবিড় কোনো এক আত্মিক গভীর চেতনায়। সব কিছুতেই চলচ্চিত্রকার শিল্পমনস্কতায় চাতুর্যহীন ভাবে মুখোশহীন মানুষের মধ্যে যেতে চেয়েছেন। ঋত্বিক তাই বিষয়বস্তু নির্বাচনে, তাঁর শিল্পের ভঙ্গির ইতিহাসে আমাদের দেখিয়ে দেন, কেমন করে নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন চলতি ধরনের ভাবনাকে। তাঁর ধারণা, প্লট গঠনের গভীরতা, কেমন করে স্থান কালের বিন্যাসকে ক্রমে ক্রমেই নিটোল নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরে এনে আবার তা ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবিন্যস্ত করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে থাকে। সেই প্রতিবাদ মুখরতা, এই প্রতীক সর্বস্বতায়ও এক অনায়াস যোগ্য খুঁজে নিয়েছে।

তাই ম্যাচারিলিজমের, সুররিয়ালিজমের, রিয়ালিজমের, নিউ-ওয়েভের দৌরাত্ম্য থেকে সরিয়ে নেবার ঘনিষ্ঠ ইচ্ছায় সরে থাকে। কিন্তু একমাত্র ঋত্বিক ছাড়া, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র চর্চাতে এদেশে বসে কমই দেখতে পারছি, বুঝতে পারছি, তেমন কোনো সর্বাতিশায়ী চিন্তা, যা স্পর্শ করবে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানান সমতল অসমতল সত্তার মুখোমুখি চলন। আমরা কেবলি বিলাসী নগরমগ্নতায় শেষ পর্যন্ত কেবলি ঢুকে যেতে চাইছি,—ঋত্বিক এইখানে প্রতিবাদ করেন। প্রাণহীন বিপজ্জনক মধ্যবিত্ত দেউটি আমাদের পথ, নিতান্ত সহজ পথকে পিচ্ছিল করে দেয়, আমাদের পরাজিত করে দেয় বারবার—চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক এই পরাজিত মুহূর্তে আমাদের তীব্র সাহস এনে দেয়। এই তীব্র সাহসটাকে ঋত্বিক দেখেছেন কবিতার মতো, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণার ছন্দে সংগ্রামী সৌন্দর্যে। "মেঘে ঢাকা তারা", লৌকিক পুরাণের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের মধ্যে ধরে নেয় আজকের সমকালীন বাস্তবতার চরম ছিন্নমূল যন্ত্রণাকে। নীতা, একটি সাধারণ নারী। সে এই ভেঙ্গে পড়া উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে, নিজের আত্মসুখ আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে, চেষ্টা করছে বাঁচিয়ে রাখার। নীতা বাঙালী ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ে। ঋত্বিক আমাদের জানান great mother archetype এর আদলে এইটি গঠিত। তাই নীতার জন্ম হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। সেই মৃত্যুর চরম ক্ষণেও তাই শোনা যায়, মেনকার বিজয়ার বিলাপ, 'আয় গো মা উমা কোলে লই।' এই বিস্ময়কর লৌকিকতা বারবার আমাদের জন্য চৈতন্যে এসে ঘা দেয়। নীতার যক্ষার রোগের আবিষ্কারের সময়তেই এই বিলাপোক্তি আমাদের ক্রমশঃ আধুনিক জীবনের বহু পাপের প্রতীক দেখায়, এই পথ দেখানো বজ্রমুঠি তুলে আক্রমণের আহ্বান জানায়, যখন নীতা পাহাড়ের কোলে, মহাকালের কোলে দাঁড়িয়ে বলে "আমি বাঁচতে চাই দাদা"। ঋত্বিক অসম্ভব শক্ত ক্যামেরার প্যানিং এর দক্ষতার ছন্দে কবিতার শব্দে এই চরম তীব্র যন্ত্রণাময় হৃদয় উদ্বেলিত অথচ সংগ্রামী মনস্ক চিন্তা আমাদের সামনে হাজির করেন।

প্রতীক, অতীত, কাব্যছন্দ ভাষা শিল্পের জীবন, শিল্পই জীবন। এবং একটি পারমাণবিক প্রচণ্ড শক্তি। যাকে অনন্তভাবে জীবনকে এগিয়ে দেবার প্রতিবাদে মুখর করে তোলার অনন্ত সম্ভাবনায় নিযুক্ত করা যায়।

ঋত্বিক বুঝেছিলেন, অতীত কখনই শেষ হয়ে যায় না। আমরা বুঝি, এই মুহূর্তের কোনো ঘটনাই একটু পরে পুরাঘটিত। তাই বর্তমান এবং অতীত অবিচ্ছেদ্য ছন্দ্যতায় জন্ম নিয়ে এগিয়ে চলে। এবং তাতেই গভীর ভাবে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণ, বর্তমানকে সম্প্রসারিত করে তোলাই সেই পুরাণের অন্তর কথা। তাতেই সভ্যতার সাধনা পূর্ণতার পথ পায়। বিন্দুর মধ্যে সে দেখায় বিরাটত্বকেই, মীথ রিচুয়াল আর্কেটাইপে, আমাদের এবং নিজেও সচেতনভাবে গভীরভাবে সেই প্রতীকতায় অসম্ভব দ্বিধাহীন ভাবে তিনি আধুনিক সাম্প্রতিক এক যুগের রিচুয়ালকেই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। স্পষ্টতই আজ আমাদের এইসব প্রতীকতা জীবনাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং অতীত বর্তমান হয়ে আসে, জীর্ণতার রূপে নয়, জীবিত প্রবাহে চঞ্চল হয়েই, ভবিষ্যতের দিকে শক্তি নিয়ে চলতে শেখা অনুভব। তাই বেদ উপনিষদের শ্লোক, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই দৃশ্য, শকুন্তলার আদলে নায়িকার চরিত্র, আগমনী গান, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী এই সবই ব্যবহারের তীব্র কৌশলের, এবং জাতীয় জীবনের মৌলিক দিক চিন্তায়, শিল্পকর্মে জীবনানুগ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণে তাঁর ব্যবহারে আসে। তাঁর বক্তব্য "আমাদের জাতীয় culture complex যে ভাবে constellate করেছে, তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি।" যেহেতু আমাদের শিল্পের প্রেক্ষাপট প্রয়োজনের বাতাস নেবে জীবন নির্ভর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, তাই জনজীবনকে আমাদের দেশেরই জনজীবনের আনুপর্বিক ইতিহাস সচেতনতায় ধরে রাখার প্রচণ্ড প্রয়োজন।

স্মৃতির স্পর্শে বারবার যেন আমরা দেখতে পাই জীবনই শিল্প হয়ে ওঠে। তাতেই প্রয়োজন হয়, এই মুক্তিকে ধরবার জন্যে তথাকথিত অর্থের নিত্য বাস্তবিকতায় রূঢ় দেয়ালটাকে সরিয়ে সেই ভিতে দেশকালকে চিনিয়ে দেবার আয়োজনের মুখরতা। তাই সাম্প্রতিক যুক্তি তক্কো ও গপ্পোতে সেই দৃশ্যটি, যেখানে শালবনে সশস্ত্র যুবকের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ঋত্বিক, এবং সেই মুহূর্তে গুলি লাগে তার শাসকের হাত থেকে ছিটকে এসে, যে যুবকরা এই প্রচলিত ঘৃণ্য সমাজ ব্যবস্থাকে উলটে দিতে চেয়েছিলেন, তাদের সেই ভয়ানক দুর্দমনীয়তার মাঝখানে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন আন্তরিক অনুষঙ্গ বিশ্বাসেই। এই ঋত্বিকের মৃত্যুতেও কিন্তু শিল্পী ঋত্বিক নবীন জীবনের জয়যাত্রাকে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে শুনে নিয়েছেন। ভালোবাসা এক অমোঘ জীবনকে ত্বরান্বিত করছে জন্ম দিতে। যুদ্ধের ভয়াল-করাল আগুনের তপ্ত তেজের পাশে জন্ম নিচ্ছে সেই ভালোবাসা। পাশাপাশি তিনটিকেই রাখেন ঋত্বিক। যুদ্ধ এবং ভালোবাসা ও জন্ম। মৃত্যুকে এখানেই পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে হয় জীবনের সংগ্রামী সৌন্দর্যের কাছে। সেই জন্ম নিয়েছে এক নবীন জীবন। শব্দে ভরে থেকেছে রাইফেলের অগ্নিস্রাবী অগ্নিময় গুলিবর্ষণ। মৃত্যুর মধ্যেও জীবনকেই দেখে গেছেন ঋত্বিক। তাই তার অনন্ত শবযাত্রার মাঝে আমরা শুনেছি মাঙ্গলিক উলুধ্বনির প্রতীকতা। ভাবনায়, ব্যঞ্জনায় ঋত্বিক বারবার প্রমাণিত করে যান তার জীবনের প্রতি, দেশজ ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রতি, অমোঘ ভালোবাসার কথা। তিনি জেনেছিলেন, রুদ্রের দক্ষিণ হস্তেই বরাভয়। তাঁর এক মুখে পালন, এক মুখে ধ্বংস। এই বোধের গভীরতা, এই অমোঘ চিন্তা তিনি নির্মম নাটকীয়তায়, চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনার গভীরত্বে, নিষ্ঠুর ক্লেদাক্ত বীভৎসতায়, চিত্রশিল্পের নিজস্ব ফ্রেমিংয়ে, কিংবা নিপুণ সাঙ্গীতিকতায় একটি সম্পদশালী তীব্র কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এই সম্পদশালী ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে জীবনবোধেই, জন্মই জীবন, শিল্প জীবন। বস্তুতঃ সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি, এবং লেখায় রচনায় অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থাকে উলটে দেবার সংগ্রামী মনস্কতায় ভরে থেকেছে। আত্মভূমি বস্তুভূমি একই ভাবে দুই প্রান্ত থেকে টান দিয়ে মধ্যবর্তী যোগ পথের পথটুকুকেই নিকিয়ে দিয়ে গেছেন শিল্পী ঋত্বিক। এই অংশের মহিমার অন্তর্বিষয় ও বহির্গঠনে ব্যাপকভাবে আমরা বুঝে নিই, সেই লোক স্মৃতির মধ্যেই আছে জন্মই জীবন, শিল্প জীবন, এই সুঠাম ব্যবহার। তিতাস অন্তপ্রবাহিত হয়েই চলমান। কালের সঙ্গে, এই আত্মসত্তা বয়ে নিয়ে আসে। আমাদের চোখে দ্বন্দ্ব দেখি অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপনেও সেই সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যা ভালোবাসার গৃহে পৌঁছে দেবে। তাই শেষ দৃশ্যে একটি শিশু ভেঁপু বাজাতে বাজাতে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে চলে, শব্দ আসে তার ঘুনসির সেই ঘন্টাটা থেকে, টুং টুং টুং। এই শব্দ এই ছন্দ, এই কবিতায় আমাদের শিল্প জীবন, জন্মই জীবন। কারণ, শিল্প অথবা জীবন নিশ্চিত ভালোবাসা নয় এক সুন্দর ভালোবাসার গৃহেই পৌঁছতে চায়।

ঋত্বিক ঘটক আমাদের এই বোধের জবাবটুকুকে এগিয়ে দেন। তাঁর মন্তব্য : "মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি। সব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিল্মেও কতগুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি ছবি একটা শিল্প। এবং যখন শিল্প তাকে দায়ী হতে হবেই। দায়িত্ব মানবের প্রতি। একথাটা ভুললে চলবে না।"

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—১০১
স্থান—বাঁশ ঝাড়ের কাছে গাঁয়ের রাস্তা।
সময়—দিন।

দুর্গা : অমনি জুতোর পাটিটা দিয়ে ছিটকে পল একেবারে আমাদের পাড়ায়—নয় ?

ছিরু : এঁ !!

দুর্গা : "এঁ" কি গো ? যদি ওটা থানায় জমা দিই—

ছিরু : দুগ্‌গা—

দুর্গা : না না না দুবো না দুবো না দুবো না···যদি তুমি সব পোড়া ঘরের মাল-মশলা এক্ষুণি আবার পাঠিয়ে দাও—তবে আমিও ও জুতো ছুড়ে ফেলে দিব—মৌরাক্ষির জলে—

দুর্গার চোখে অমঙ্গলের ছায়া। হঠাৎ সে ছিরু পালের দাড়ি ধরে আদরের ভঙ্গি করে।

দুর্গা : চাঁদ বদন !

আতঙ্কগ্রস্ত ছিরু পালকে পেছনে ফেলে দুর্গা চলে যায় এগিয়ে।

গণদেবতা
চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

অনিরুদ্ধ ও দুর্গা (শমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়)
ছবি : ধীরেন দেব

উচ্চিংড়ে (কাঞ্চন দে বিশ্বাস)
ছবি : ধীরেন দেব

দৃশ্য—১০৩

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় একদল বাউড়ি সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। নারান নামে এক বাউড়ি ছুটে চলে আসে ডিসপেন্‌সারির কাছে।

নারান : ছিদেম—! ভ্যাকা—! নরহরি রে—!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০৪

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

নারান ছুটতে ছুটতে এসে জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারিতে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে তখন সবাই।

নারান : নরহরি রে—!

নরহরি : কি রে?

নারান : (হাঁপাতে হাঁপাতে) শিগ্‌গির চল্…পাল মশাই মাল দিচ্ছে—

নরহরি : এঁ্যা।

নারান : হ্যাঁ। ঘর উঠাবার মাল। কোনো কিছুর দাম নিবে নাই। ভাখ্ কেনে—

দুজনেই দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০৫

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

দরজার বাইরে দূরে দেখা যায় একদল বাউড়ি ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে চলেছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০৬

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

রাখহরি : আরে!

নরহরি : তাই তো!

নারান : কি বুললাম · চল্

সবাই : চল্‌রে!!

সকলে হুড়মুড় করে চলে যায়।

জগন : (দরখাস্তটা হাতে নিয়ে) এই শোন্—শুনে যা—

দৃশ্য—১০৭

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

নারান, রাখহরি, নরহরিরা সবাই-ই ছুটে বেরিয়ে যায় ডিসপেন্‌সারি থেকে। ভ্যাকা শুধু চীৎকার করে বলে—

ভ্যাকা : আস্‌চি ডাক্তারবাবু! আপনি লিখেন কেনে—

জগন হাতের কাগজটা নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রচণ্ড রেগে ওঠে সে।

জগন : বেইমানের দল!…ব্র্…ব্র্…শালারা—

দরখাস্তটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

দেবু : (off voice) আরে, আরে, ও কি?

জগন সেদিকে তাকায়।

দেবু পণ্ডিত বাঁশ ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

দেবু : এই যাঃ!…ছিঁড়ে ফেল্লে!

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার কট্‌মট্ চোখে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত কিছু মনে করে না। সেও দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০৮

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে পড়ার ভান করে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে।

কাট্ টু।

দেবুর ভিউ পয়েন্ট থেকে জগন ডাক্তার।

কাট্ টু।

দেবু : আমি কিন্তু তোমার কাছেই এলাম!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। অনিরুদ্ধ বসে গায়ে সরষের তেল মাখছে। সে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : কেনে?

কাট্ টু।

দুর্গা উঠোনে বসে আছে।

দুর্গা : এই এ্যা—ভো বড় একখানা দা গড়িয়ে দাও দিনি! একেবারে শেলেদা বাঘের ঘাড় অব্দি নেমে যায়! (ঝুপ্ করে বসে পড়ে) কতো পড়বে বলো!

পদ্ম : (ময়লা শাড়ি নিয়ে খিড়কি পুকুরের দিকে যেতে যেতে) ওমা,—অতো বড় দায়ে তুই কি কর্বি?

দুর্গা : ছি ছি,...রাত বিরেতে একা একা পথে পথে ঘুরি, যদি কখনো কামড়াতে আসে?

পদ্ম : কি?

দুর্গা : ক্ষ্যাপা কুকুর!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১০

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল হুঁকো টানতে টানতে রাগে গজরাচ্ছে আর ক্ষ্যাপা কুকুরের মত এধার ওধার পায়চারি করছে। উঠোনে এখন অনেক বাউড়ি মেয়ে পুরুষের ভিড়। সবাইকে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে গর্জে ওঠে—

ছিরু : আর কতো? আর কতো?—এ তো দেখছি ফাঁক করে দেবে!

সবাই : এদিকে আবার বাঁশ কম। কালীকে ফের আনতে পাঠালাম।

ছিরু : (চটে গিয়ে) হ্যাঁ! আরো বেশী করে বাঁশ আনাও!...আনাও, আর আমাকে—

কথা শেষ হবার আগেই দেখা যায় ভ্যাকা তার বৌ সুন্দরীকে নিয়ে এগিয়ে আসে।

ভ্যাকা : আয় আয় গড় কর্... গড় কর্

দুজনেই ছিরু পালের পায়ে পড়ে যায়।

ছিরু : (বিরক্ত হয়ে) একি! একি!—

ভ্যাকা : (অশ্রুসজল চোখে) আপুনি দেবতা....আপুনি গরীবের মা-বাপ—

ছিরু : এ্যাঁ?

ভ্যাকা : আপুনি মানুষ নন গো,—আপনার ছি-চরণে

আরেক দল লোক এসে ছিরু পালের পায়ে প্রনাম করে।

নরহরি : জয়....জয় হোক্ আপনার

ভ্যাকা : জয়

ছিরু : আরে আরে, ছাড়্ ছাড়্, পায়ে জখম আছে যে!

নরহরি : তা বল্লে শুনব না আজ্ঞা!....জয় জয় হোক আপনার।

নারান : ধনেপুতে লক্ষ্মীলাভ হোক্ গো—

ভ্যাকা : জন্ম জন্ম এই চরণের ধূলো হয়ে থাকব গো আমরা।

সকলে : বলো পাল মশাইয়ের জয়।

আরও সবাই ছিরু পালের পায়ে পড়ে।

সকলে : বলো আমাদের পাল মশায়ের জয়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল যেন আনন্দ মেশানো অস্বস্তিতে পড়ে।

কাট্ টু।

আরও কিছু বাউড়ি এসে পড়ে তার পায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে এগিয়ে যায় ছিরু পালের দিকে। মৃদু হাসি তার মুখে। বোকা বোকা শিশুসুলভ ভঙ্গি ছিরু পালের ঠোঁটে। হঠাৎ পাওয়া তার এই পদোন্নতি, সামাজিক সম্মান তাকে বিস্মিত করে তোলে।

ছিরু : মিতে!

সবাই : উঁ?

ছিরু : পেন্নাম করছে!

সবাই : হুঁ...

ছিরু : 'মোড়ল মশাই' বলছে

সবাই : হুঁ

ছিরু : বলছে বলছে...'জয়'·

সবাই অবাক চোখে মাথা নাড়ে।

ছিরু : (এক মুহূর্ত থেমে) শালাদের....মাথা পিছু পাঁচ সের করে চাল দিয়ে দাও!

সবাই : এ্যাঁ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১১

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সারি।

সময়—দিন।

জগন : মীরজাফর!....মীরজাফরের ঝাড় সব! বছর বছর বিনিপয়সায় চিকিচ্ছের বেলা জগন ঘোষ! তবু ওটা লিখে রেখেছি....ওষুধের দামও কেউ ঠ্যাকায় না! আর এঁটো পাত চাটবার বেলা ছিরে পাল! হুঃ!...এবারে এলে মারবো লাথি!

দেবু : পারবে?

জগন : দেখে নিও!…এ রাগ বড় সাংঘাতিক….এখন থেকে কোন ব্যাটার উব্‌গায়ের মধ্যে নেই!

দেবু : যদি বলি অন্ততঃ একটা ব্যাপারে থাকতে হবে!

জগন : মানে?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা : কি গো, বুঝে না কতো দাম পড়বে? আগাম দিয়ে এবার উঠি।

দুর্গা উঠে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বার করে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধর দৃষ্টি পড়ে দুর্গার দিকে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গা।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

দুর্গা শেষ পর্যন্ত ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা সিকি বার করে আনে। অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আর মুচকি হেসে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করে।

দুর্গা : কি দেখচ?….উ?

অনিরুদ্ধ : (সম্বিত ফিরে পেয়ে) কাজ হোক্…পরে দিস!

দুর্গা : (নীচু স্বরে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) তখন আবার বেশী নিবে না তো? সুযোগ বুঝে?

অনিরুদ্ধ : যা ভাগ্!

দুর্গা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। এই সময় দেখা যায় পদ্ম খিড়কি পুকুর থেকে শাড়ি কেচে ঢুকছে বাড়ীতে।

দুর্গা : চল্লাম হে কামার বৌ! ফের আসব আবার—

দুর্গা ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যায়।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে অনিরুদ্ধকে ধরে। অনিরুদ্ধ অপস্রিয়মান দুর্গার পথের দিকে তাকিয়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৩

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে গাঁয়ের রাস্তা।

সময়—দিন।

অসমাপ্ত একটি অন্নপূর্ণার মাটির মূর্তির ওপর থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এলে দেখা যায় একদল লোক মূর্তিটাকে 'হুঁাই—হুঁাই—হুঁাই—হুঁাই' শব্দ করতে করতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গা সেই ঝুড়ি হাতে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে।

দুর্গা : ও মা উ কি গো?

বাহক : পাল মশায়ের বাড়ী!….নবানের পুজো হবে যে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৪

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সারি।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্ করে দেবু আর জগন ডাক্তারকে ফ্রেমে ধরে।

জগন : কে বল্লে?

দেবু : এইমাত্র শুনে এলাম।

জগন : ছিরু আলাদা পুজো করছে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৫

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

সেই অসমাপ্ত অন্নপূর্ণার মূর্তিটা বারান্দায় এনে রাখা হয়। ভবেশ এগিয়ে আসে ছিরু পালের দিকে।

ভবেশ : তেল, বুঝলে, বড় তেল বেড়েছিল ঐ পণ্ডিতের!….নৈলে মজলিশে অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!

ছিরু : এখন থেকে সব পুজো আলাদা করব।

হরিশ : তবে! তুমি হলে গে গাঁয়ের মাথা….

ছিরু : হ্যা….সকলে পেন্নাম করে—

হরিশ : ওসব পাঁচভূতের ভিড়ে যাবে কেন তুমি?

ছিরু : ঠিক! যাবো কেন?

ভবেশ : (হেসে) তুমি সরে এলে—উদ্দিকের পুজোয় লালবাতি!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৬

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সারি।

সময়—দিন।

দেবু : ছিরু নেই বলে….এ্যাদ্দিনের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে?….কাল রাতে যখন তুমি আগুন নেবাচ্ছিলে,—মনে হ'ল—গাঁয়ে তো এখনো মানুষ আছে! তাই ছিরুর কাছে ভিক্ষে করতে না গিয়ে আমি তোমার কাছে এলাম।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার ভ্রূকুটি করে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

হঠাৎ জগন ডাক্তার উঠে দাঁড়ায় এবং দেবু পণ্ডিতের চেয়ারের কাছে গিয়ে বলে—

জগন : ওঠো।

দেবু জগনের কাঠখোট্টা শুকনো গলায় কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

জগন : ওঠো ওঠো ওঠো!....বাড়ী যাও।

দেবু : (উঠে দাঁড়িয়ে) উ?

জগন : পুজো বন্ধ!....ছিরু নেই, অমনি পুজো বন্ধ! কেন? কোথাকার পীর!

দেবু : ডাক্তার!

জগন : বাড়ী গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে!.. আমরা সবাই মরে গেছি!.. কঙ্কাল!..আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি সবার কাছে... দেখি তো কার ঘাড়ে কটা মাথা,—পুজো রোখে!...এঁ্যা—!
ছিরু নেই তো পুজো বন্ধ!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৭

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

গরাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত বাউড়িদের উদ্দেশ্য করে বলে—

গরাই : শোন্.. শোন্ তোরা—পুজোর দিন সবাই সকাল সকাল আসবি। দুবেলা এখানেই পেসাদ পাবি, বুঝলি?

বাউড়িরা : আজ্ঞে আচ্ছা।

গরাই : ও পুজোতে কেউ যাবিনে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৮ (গ্রহণ করা হয়নি)

দৃশ্য—১১৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

জুম লেন্স নিয়ে ক্যামেরা বাঁ থেকে ডাইনে ট্রলি করলে দেখা যায় উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে বিরাট আলপনা দেওয়া হচ্ছে। নবান্ন উৎসব চলছে।

আম পাতার দড়ি দিয়ে মন্দির সাজানো।

পুজোর যোগাড় তৈরী, কিন্তু পুরুতঠাকুর তখনও আসেননি।

একদল মহিলা ফলমূল নৈবেদ্যর ডালা নিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে।

দেবু পণ্ডিত ও জগন ডাক্তার সবাইকে নানা কাজের আদেশ দিচ্ছে।

জগন : গণ্ডায়ের বাড়ীতে ডঙ্কা বাজছে।

হঠাৎ দূরে ঢাকের শব্দ শোনা যায়। সকলে সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ঢাক বাজছে ছিরু পালের বাড়ীতে।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে মুখগুলোর ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২০

স্থান—ছিরুর গোলাঘর ও বারান্দায় পূজামণ্ডপ।

সময়—দিন।

ক্যামেরা একদল ঢাকির ওপর থেকে প্যান্ করে দেখায় অন্নপূর্ণার মূর্তি বারান্দার একটা উঁচু বেদীর ওপর রাখা হয়েছে। পুজো হবে।

সিল্কের ধুতি আর চাদর জড়িয়ে আজ ছিরু পালকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। হাত জোড় করে আধবোজা চোখে বলে—

ছিরু : মা—!....মা—!

সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ, হরিশ, গরাইরাও বলে ওঠে—

সবাই : মা—!....মা—!

ছিরু পালের মা ঢোকেন ফ্রেমে।

ছিরুর মা : হ্যাঁ রে, মরার চক্কোত্তি পুরুত আর কখন আসবে?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২১

স্থান—ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

একটা রুগ্ন ল্যাংড়া ঘোড়ায় চড়ে চক্কোত্তি পুরুতকে আসতে দেখা যায়। গাঁয়ের একদল ছেলে পেছন পেছন ছড়া কাটতে কাটতে আসছে।

"বাঁ ঠ্যাংটা লটর পটর
ডান ঠ্যাংটা খোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া—"

পুরুত : এ্যা-ই!...এ্যা-ই ছোঁড়ারা!....ভারী বদ তো!.... যা!....যা ভাগ্....

ওরা সবাই সামনের মাঠটা পেরিয়ে যেতেই পেছনের একটা ঝোপ থেকে পাতু বেরিয়ে আসে। হাতে একটা ভাঙা কঞ্চি।

ছিরু পালের বাড়ীতে ঢাকের শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়ায় বিধ্বস্ত চেহারা, অসহায়, ভাবলেশহীন পাড়ু বায়েন। বাজনার শব্দ শুনে যেন কষ্ট হয় তার, চোখেমুখে কষ্টের ছায়া পড়ে।

হাতের ভাঙা কঞ্চিটা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঝোপঝাড়ে আঘাত করতে করতে সে আবার একই পথে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২২ ও ১২৩ (চিত্রগ্রহণ হয়নি)

দৃশ্য—১২৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

লাইনে দাঁড়ানো গ্রামের স্ত্রীলোকরা একে একে তাদের হাতের থালা পুরুতঠাকুরের হাতে তুলে দিচ্ছে।

পুরুত : দাও!…
আর কে?….
এসো এসো, এগিয়ে এসো….

রাঙাদিদি : (থালাটা হাতে দিয়ে) আর এগিয়ে! কেমন পুরুত জানিনে বাপু!

পুরুত : কেনে?

রাঙাদিদি : খুব তো ঘোড়ায় চেপে আসো! উদিকে ঘোড়া যে তোমার আস্তাকুঁড়ে ঢুকে….ঐ ছাকো!

রাঙাদিদি আঙুল তুলে দূরের ডোবা দেখায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৫

স্থান—গ্রামের পুকুর ধার।

সময়—দিন।

ক্যামেরা জুম্ চার্জ করে দেখায় দূরে এক ডোবার পাড়ে পুরুত-ঠাকুরের ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৬

স্থান—পুরানো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

রাঙাদিদি : মা গো মা!….গাঁয়ের যত নোংরা সব ক্যাৎ ক্যাৎ করে যাচ্ছে গো!

পুরুত : (ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে) ওতে কিছু হয় না!

রাঙাদিদি : এ্যাঁ!

পুরুত : ওতে কিছু হয় না! ও ঘোড়া রোজ সন্ধ্যেবেলা এক ঘটি করে গঙ্গাজল খায়!

রাঙাদিদি : হুঁ! গায়ত্রী জপে না?

রাঙাদিদি সরে এগিয়ে গিয়ে পেছনের মহিলাকে জায়গা করে দেয়। ছকোক্তি পুরুত যেমনি তাঁর হাতের থালাটি নিতে যাবে, off voice যে শোনা যায়—

দেবু : (off) দাঁড়ান।

পুরুত ঠাকুর সেদিকে তাকান।

কাট্ টু।

দেবু : ওর পুজো নেবেন না!

কাট্ টু।

ক্যামেরা ঘোমটা দেওয়া মহিলা ও পুরুতঠাকুরের ওপর চার্জ করে। পুরুত বিস্মিত। ঘোমটা ঢাকা মহিলা পদ্মবৌ এর দিকে সে তাকায়।

কাট্ টু।

দেবু : (পদ্মকে) তুমি অনিরুদ্ধকে গিয়ে ব'লো, গাঁয়ের লোক পুজো ফিরিয়ে দিলে। এখানে পুজো দিতে হলে আগে চণ্ডীমণ্ডপে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হবে।

কাট্ টু।

মর্মাহত পদ্মবৌ এর ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত দৃঢ়ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। জগন ডাক্তার তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ও বলে—

জগন : তারা, গিরীশ—ওদেরও।

কাট্ টু।

পদ্ম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অবস্থাটা সামলে নেয়। তারপর, হঠাৎ হাতের থালাটা মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

পুরুত : আরে! ঠাঁইটা….ঠাঁইটা পড়ে রইল যে!

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত পদ্মবৌ-এর যাবার দিকে দৃঢ়ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে লাইনে।

কাট্ টু।

বিলু, ঘোমটা দিয়ে হাতে থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

বিলু চোখ নামিয়ে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যায় এই ঘটনায় সে আহত, অসন্তুষ্ট।

কাট্ টু।

ছিরু পালকে বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখা যায়।

ছিরু : কৈ হে চক্কোত্তি? আর কদ্দূর?

কাট্ টু।

পুরুত : (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) এই যে বাবা! এই ক'টা একটু ঝটপট্ সেরেই—

জগন : কেন? অত ঝট্পট্ কিসের?....এখনো অনেক আসবার বাকি!.. দেরী হবে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল জগন ডাক্তারের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল অনেক কষ্টে রাগ সামলে নেয়। জগনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছিরু : বেশ,...তাহলে সময় হলেই যেন আসা হয়—

ছিরু পাল চলে যেতে উদ্যত, এমনি সময় দূর থেকে অনিরুদ্ধর চীৎকার শুনে সে থেমে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

অনিরুদ্ধ : কে? কে?....কার ঘাড়ে দশটা মাথা? কোন্ নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি?

হঠাৎ সে থেমে যায়।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার দেবু পণ্ডিত ও ছিরু পালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিরুদ্ধ : বাঃ!....বাঃ! ভোল-পাল্টানো ধন্বন্তরী মশাই!... খুব খেল্ দেখালে যা হোক্! তাই তো বলি, ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে এসে না মিললে যাবে কুথা?

হঠাৎ সে পন্মর ফেলে যাওয়া পুজোর থালাটা তুলে নেয়। ছুটে যায় মন্দিরের দরজায় এবং থালায় চাল-কলা-ফল ছুঁড়ে দিতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৭

স্থান—ভাঙা কালীমন্দিরের ভেতর।

সময়—দিন।

ভাঙা কালীর মূর্তির মুখে অনিরুদ্ধর আউট ফ্রেম থেকে ছুঁড়ে দেওয়া চাল-কলা-ফলগুলো এসে লাগছে আর মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ : (off) খা....খা...

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৮

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : খা!....খা!....খা! আর বিচের কর্! যা দেখছিস তার বিচের কর্! ভগবান হইছে!

চাতাল থেকে লাফিয়ে নেমে এসে ছিরু পাল, দেবু পণ্ডিত, জগন ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে করতে পিছিয়ে যেতে থাকে অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ : পয়সাওয়ালার মাথায় আমি ঝাড়ু মারি—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : লাট-বেলাট দেখানেওয়ালাদের মুখে আমি ঝাড়ু মারি—ঝাড়ু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—জগন ডাক্তার।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : কাউকে গেরাহ্যি করি না আমি! কোনো শালাকে গেরাহ্যি করি না!! দেখি কোন্ শালা আমার কি কত্তে পারে—! ভগবান! ভগবানের ইজারা নিয়েছে সব—

সবাইকে হতবাক করে দিয়ে অনিরুদ্ধ চলে যায় ক্যামেরার বাইরে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না, নড়ে না চড়ে না।

দেবু পণ্ডিত যেন নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চাপা রাগে, অভিমানে সে ফেটে পড়তে চায়, পারে না। ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে বসে পড়ে দেবু পণ্ডিত। শক্ত করা মুঠো হাতে সে সজোরে আঘাত করে মেঝেতে। ক্যামেরা টিল্ট্ ডাউন করে দেখায় মেঝেতে লেখা রয়েছে—

"যাবচ্চন্দার্ক মেদিনী"

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

জলন্ত কুপির ওপর থেকে ক্যামেরা সরে গিয়ে দেখায় অনিরুদ্ধ খাচ্ছে। পদ্ম তার পাশে বসে যেন চিন্তায় মগ্ন।

পড়শীদের বাড়ীতে কোনো বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। মা তাকে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শোনায়।

পদ্ম (হঠাৎ) হ্যাঁ গো!

অনিরুদ্ধ উঁ?

পদ্ম কাল আমায় একটু নিয়ে যাবে?

অনিরুদ্ধ কোথা?

পদ্ম গয়েশপুরের শিবনাথ তলায়।

পদ্ম ফিক্ করে হেসে ওঠে। অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করে তাকে।

অনিরুদ্ধ : কেনে? ফের ঢেলা বাঁধবি?

খাওয়া সেরে অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়ায়। বারান্দার ধারে গিয়ে মুখ ধুতে শুরু করে।

অনিরুদ্ধ : আর কতো ঢ্যালা বাঁধবি? তোর ঢ্যালায় তারে শেষ-অব্দি না বাবা শিবনাথ শুদ্ধ্ উল্টে পড়ে!

পদ্মর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নীরবে সে এঁটো বাসন তুলতে শুরু করে।

মিক্স ইন্।

দৃশ্য—১৩০

স্থান—ছোট শহর।

সময়—দিন, অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহ।

চালকলের চোঙা থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখায় নদীর পারের ছোট্ট শহর।

(চলবে)

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers.

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র
দ্বাদশ বর্ষ
দশম সংখ্যা
জুলাই, '৭
চিত্রবীক্ষণ
বিষয়সূচী
কলকাতায় আর্ট থিয়েটার / তিন
ঋত্বিক ঘটক : শেষ সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার : মুহম্মদ খসরু) / পাঁচ
শিশু চলচ্চিত্র / প্রবোধ কুমার মৈত্র / চোদ্দ
তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', চিত্রনাট্য :
রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার / পনেরো
প্রচ্ছদচিত্র : 'কোমলগান্ধার' (ঋত্বিক ঘটক)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে
সম্পাদক : অনিল সেন

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-২

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোট ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

কলকাতায় আর্ট থিয়েটার

কলকাতায় আর্ট থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। এই শহরে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ক্রমবিস্তার এই ধরণের এক আর্ট থিয়েটারের সম্ভাবনাকে ক্রমশঃই বাস্তব করে তুলছিল।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা এব্যাপারে কার্য্যকরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকবছর আগেই, নানা কারণে সেই কার্যক্রম ১৯৭৭ সালের আগে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ১৯৭৭ সালের শেষদিক থেকে সংস্থার পক্ষ থেকে মেট্রো সিনেমায় নিয়মিতভাবে এবং মাঝেমাঝে গ্লোব, ম্যাজেস্টিক ও যমুনা প্রেক্ষাগৃহে রবিবার সকালে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আর্ট থিয়েটারের জন্য সংগ্রহ। আনন্দসংবাদ এই যে এইভাবে সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটারের জন্য ১ লক্ষ টাকারও বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। উল্লেখযোগ্য হল রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌরসভা এই অনুষ্ঠানসূচীকে সমস্ত রকম প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

কোনো একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষে এজাতীয় কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা যথেষ্ট কঠিন সন্দেহ নেই, এবং নিঃসন্দেহে এই পরিকল্পনাটি দীর্ঘমেয়াদী হতে বাধ্য কেননা এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

এতদ্‌সত্ত্বেও সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা-র আর্ট থিয়েটার গঠনের প্রচেষ্টায় অর্থসংগ্রহ-কর্মসূচীর প্রাথমিক অগ্রগতি এক বিপুল সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত করে তুলছে।

সংস্থা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন রেখেছেন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আশা রাখি যে সরকার এবিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেবেন। কেননা উপযুক্ত জমি ছাড়া এই পরিকল্পনা সার্থক বা যথাযথ হতে পারে না।

এছাড়াও রাজ্যের চলচ্চিত্র উৎসাহী মানুষ আরো ব্যাপকভাবে এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনে প্রত্যক্ষ সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এ আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবেনা। বিশেষ করে ফিল্ম সোসাইটি-সদস্যদের এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলার কাজে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয় ভাবে। এভাবে কলকাতা শহরে ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে স্থাপিত আর্ট থিয়েটার হওয়া সম্ভব।

এই প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটার ভালো' ছবির আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলবে, এমন এক দর্শকগোষ্ঠী গড়ে তুলবে যার মধ্য দিয়ে জীবনধর্মী সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী সম্ভব হবে। চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও এই আর্ট থিয়েটার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সার্থকভাবে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একটি আর্ট থিয়েটার তৈরী করছেন। প্রাথমিক কাজকর্ম প্রায় শেষ। কলকাতার মত বিরাট শহরে দুটি আর্ট থিয়েটার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। কাজেই আমরা চাইবো দুটি আর্ট থিয়েটারই হোক এবং তাড়াতাড়ি।

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।
* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

ঋত্বিক ঘটক ঃ

শেষ সাক্ষা

১৯৭৪ সালের ১৩ই মে বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ খসরু ঋত্বিক ঘটকের এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই সাক্ষাৎকারটি 'ধ্রুপদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত ঋত্বিক ঘটকের এটিই শেষ সাক্ষাৎকার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'চিত্রবীক্ষণ' এর আগে ঋত্বিক ঘটকের দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে।

মুহম্মদ খসরু ঃ মারী সীটন তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন আপনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'বিদ্রোহী শিশু'। তাঁর ধারণায় আপনার অতিরিক্ত মননশীলতা আপনার নিজের কিংবা আপনার চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি ?

ঋত্বিক ঘটক ঃ এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামতই নেই। কারণ বিদ্রোহী শিশুটা তো বাংলা করা হয়েছে। ওটা আসলে 'infant terrible'। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দই নেই। আর ওটা লিখেছিল 'অযান্ত্রিকের' সময়। 'অযান্ত্রিক' হচ্ছে ১৯৫৭-৫৮ সালের ছবি। আজকে চুয়াত্তরে তার উত্তর দেয়ার তো কোন মানে হয় না। আমার কোন কিছু বলার নেই। একজন সমালোচক আমার সম্বন্ধে কি বলেছে তা দিয়ে আমি কি করবো।

মু. খ. শিল্পাঙ্গনের কতকগুলি মাধ্যম পেরিয়ে আপনি চলচ্চিত্রে এসেছেন। যেমন প্রথম জীবনে কবি ও গল্পকার, তারপর নাট্যকার-নাট্যপরিচালক ইত্যাদি এবং অবশেষে চলচ্চিত্রকার। শিল্পমাধ্যমের প্রতি অগাধ মমত্ববোধই সাধারণতঃ শিল্পীকে তাঁর ভাললাগা মাধ্যমের প্রতি টেনে আনে। আপনি 'চিত্রবীক্ষণে'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "·········যদি কাল চলচ্চিত্রের চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। আমি সিনেমার প্রেমে পড়িনি········ I don't love film········"। এই সব কথার মাধ্যমটির প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়না কি ?

ঋ. ঘ. একেবারেই পায়না। মাধ্যমটা কোন প্রশ্নই না। আমার কাছে মাধ্যমের কোন মূল্য নেই। আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ সমস্ত মাধ্যম change করেছি, বদলেছি ? কারণ বক্তব্যটা মানব দরদী। বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোন কাজেরই কথা না। ও সমস্ত যারা Aesthets তারা করুন গিয়ে। 'Art for Arts sake যারা করেন তারা করুন গিয়ে। All art expressions should be geared towards the betterment of man—for man. আমি গল্প লিখছিলাম, তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছেনা। ক'টা লোক পড়ছে ? নাটকে immediate hit—আরো বেশী লোককে convert করা যায়। I am out to convert. তারপর দেখলাম নাটকের থেকেও ভাল কাজ হচ্ছে সিনেমায়। অনেক বেশী লোককে approach করা এবং convert করা যায় এতে। So Cinema is important. Cinema as such এমন কোন value নেই। I don't think it has any value. এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালবাসেনা, নিজেকে ভালবাসে। এ জন্যই কাল যদি একটা better medium পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এখন পর্যন্ত আর medium কোথায়! আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত জনতার কাছে পৌছতে পারে এমন medium হচ্ছে Cinema. কালকে TV হতে পারে। এখন পর্যন্ত ইণ্ডিয়াতে সিনেমাই সবচেয়ে বেশী লোককে at the same time reach করতে পারে। কাজেই আমার বক্তব্যের হাতিয়ার হিসাবে একেই বেছে নিয়েছি।

মু. খ. আপনাদের চলচ্চিত্রে আগমন—অর্থাৎ আপনি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার এরা সাধারণতঃ ইতালীয় 'নিওরিয়ালিজম' দ্বারা অনুপ্রাণিত। যুদ্ধ পরবর্তী ইতালীতে চলচ্চিত্রে যে বিপুল শৈল্পিক উৎকর্ষতা ঘটেছিল তদ্বারা আমার মনে হয় কমবেশী সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের শেষভাগে এবং ষাটের দশকে ফরাসী দেশে যে 'নবতরঙ্গ' চলচ্চিত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দোলনের ধারা কি আপনাকে আলোড়িত করেছিল ? ফরাসী 'নবতরঙ্গ' এবং নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতম চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গদার সম্পর্কে আপনি কিছু মন্তব্য করুন।

ঋ. ঘ. প্রথম কথা হচ্ছে যে মৃণাল বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন, সত্যজিৎ বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন আর আমি আর এক দিক দিয়ে এসেছি। এটা কোন একটা আন্দোলন—সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে আসেনি। যেমন সত্যজিৎ বাবু ছবি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রেনোয়া সাহেব যখন এলেন ছবি করতে তখন তার সঙ্গে থেকে তিনি highly influenced হলেন। রেনোয়াই তার গুরু। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন। নিও-রিয়ালিজমটা তার পরে। আমি সম্পূর্ণরূপে আইজেনস্টাইনের বই পড়ে influenced হয়ে ছবিতে আসি।

১৯৫২-তে film festival-এ যে neo-realistic ছবিগুলো দেখান হয়েছিল সেগুলো আমাদের definitely খুব মোহিত করেছিল, কিন্তু কাকে influence করেছিল আমি ঠিক বলতে পারিনা। কেননা সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে রেনোয়া সাহেবের রিয়্যালিজম এবং ম্লাহাটির রিয়্যালিজম—নেচার, লাভ এই থেকে তার আরম্ভ। আমার ছবি কারোই বোধহয় না। যদি থাকে আইজেনস্টাইনের আছে। কেননা neo-realistic ছবি আমার 'অযান্ত্রিক' একদমই না। 'নাগরিক'-ও না। 'অযান্ত্রিক' কমপ্লিটলী একটা Fantastic Realism. একটা Car—একটা গাড়ী without any trick shot ওটাকে animate করা হয়েছে। She is the heroine, আর Driver হচ্ছে হিরো। Whole গল্পটা একটা ড্রাইভার আর তার গাড়ী। আর কিছু নেই। এটার সঙ্গে neo-realism এর সম্পর্ক কি? ওটাকে সম্পূর্ণরূপে fantastic realism বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব powerful ছিল। এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের খুব ভাল লেগেছিল। Unconsciously হয়তো খানিকটা—সেই সারা পৃথিবীর ছবি দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানী ছবি দেখেও হয়েছে।

মু. খ. না, আপনাদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির পর পরই ভারতে Subjective Realism-এর শুরু হয় বলে বলা হয়েছে। এ জন্যেই আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম।

ঋ. ঘ. হ্যা, এরকম অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত lebelling এর কোন মূল্য নেই। ওই lebel গুলো lebelই। ওগুলো কোন কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে চলছে। আর ঐ ফরাসী 'নিউ-ওয়েভ' আমি একেবারে পছন্দ করি না। ওটা একটা Stunt আমার মতে।

মু. খ. আমরা 'নিউ-ওয়েভে'র কিছু ছবি দেখেছি, যেমন ত্রুফোর 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ' কিংবা গদারের 'ব্রেথলেস'। এগুলো দেখে মনে হয়েছে যে এরা একটা আন্দোলনের ফসল।

ঋ. ঘ. 'ফোর হাণ্ড্রেড ব্লোজ'! ওটা নিউ-ওয়েভই না। তবে খুব ভাল ছবি। আর 'ব্রেথলেস' আমি দেখিনি, ওদের যেটা দারুন 'নিউ-ওয়েভ' রেনের 'লাস্ট ইয়ার এট মারিয়ানবাদ', ওটা একেবারে Completely existentialist ছবি। 'নিউ-ওয়েভ'টা কি? লেবেলিং এর ব্যাপারগুলো কাটো তোমরা পথের থেকে। তোমরা নতুন করে ছবি ভালবাসতে এসেছো। এই লেবেলগুলো হচ্ছে অত্যন্ত false-critic দের তৈরী। লেবেলিং বলে কিছু নেই। একটা অবস্থা থেকে একটা পটভূমি থেকে এখন তোমাদের ঢাকায় নতুন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিল্পীরা পৃথিবীর ছবি দেখে তার থেকে influenced হবে যেমন, তেমনি এদেশের ইতিহাসের যে পটভূমি তাদের suffering sorrow-র যে পটভূমি—তা থাকতে বাধ্য। তার থেকে নাম লেবেল করার দরকারটা কি? এক একজন এক এক দিক থেকে করবে। I don't believe in names.

মু. খ. বেশ, আপনি গদারের ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. গদার কি new wave নাকি? Godar is an utter communist film maker, এবং একেবারে bold. He believes in street—fight from the street—এই তো বক্তব্য তাঁর। সে 'নিউ ওয়েভ' মোটেই না। আর সেও বদলাচ্ছে তো। তাঁর last statement গুলো কি? ত্রুফোর সাথে গদারের কোথায় মিল? আঁলা রেনের সাথে ক্লদ শ্রিবের কোথায় মিল?

মু. খ. ফর্ম-এর দিক থেকে কিছু মিল থাকতে পারে।

ঋ. ঘ. তা হলেতো সব ছবিতেই কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে। ফর্ম-টর্ম কিছু একটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে Content—Approach. তার থেকে expression টা আসে। form টা শুধু expression-এর জন্য। যেমন গদার completely একজন working communist. সে ভেবেছিল গল্পের কোন value নেই। এই ছিলো তার stand. এখন সে বলছে যে, না গল্পের দরকার আছে। এখন he has changed, লোকে অভিজ্ঞতা থেকে, নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী দেখে, তার ছবি দেখে অন্যের reaction দেখে আস্তে আস্তে বদলায়। যে আমি 'অযান্ত্রিক' করেছিলাম, সে আমি কি আছি? সত্যজিৎ বাবুর 'সীমাবদ্ধে'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কি মিল? 'অশনি সংকেত'-এর সাথে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটা শট-ফটে মিল থাকতে পারে, আর কি মিল?

মু. খ. কোন এক লেখায় বার্গম্যানকে আপনি নকলনবীশ বলে উল্লেখ করেছেন।

ঋ. ঘ. জোচ্চোর বলেছি।

মু. খ. আপনি বলেছেন বার্গম্যান সব জিনিসকে খানিকটা ভাইকিংসদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন যাকে আপনি চমক্ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আপনি 'তিতাস'-এর শুটিং চলাকালীন এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বার্গম্যান হল শিল্পের জোচ্চোর। আপত্তি না থাকলে বার্গম্যান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটা একটু বিশদভাবে বলুন।

ঋ. ঘ. বার্গম্যান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। বার্গম্যানকে দু'একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্যযুগ, আদি মধ্যযুগ ক্রুসেডের পিরিয়ড এবং তারো আগের পিরিয়ড এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে। কেন হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে সুইডেন হচ্ছে one of the last countries to be christianised. সুইডেনে বিশেষ করে whole Scandinevia

তে Viking philosophy যেমন সারাজ, জাহাজা ইত্যাদি একটা খুব vigorous ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গে লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে Christianity-কে। এখনও সেই Conflict-টাকে althrough refer back করে contineously। যেমন 'Virgin Spring, Virgin Spring-টা কি? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা চার্চ স্থাপন করে তার পিছনে একটা মিথ্যা গপ্পো তৈরী না করলে তো লোককে আর টানা যায় না। সেই জন্যই গপ্পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে raped হয়েছিল but she was so innocent যে সেখানে একটা spring grow করলো, এবং সেখানে বিরাট করে Cathedral তৈরী শুরু হলো। এখন এর পেছনে একটা গল্প তৈরী করতে না পারলে তো পুরুতদের জমবে না। সেই জন্য একটা গল্প তৈরী করা—সে মেরে হেন তেন—আসলে কিছুই না। আসলে হচ্ছে যে একটা emotional surcharge না করে তো আর Pagan philosophy কে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে ঐ জায়গায় একটা পীর, ওখানে একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরুদেব এই সমস্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে—উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই এটা হয়েছে। এই যে গল্প—এগুলো কি? What is this 'Seventh Seal'? Terrific. জোচ্চোর বলেছি এই জন্য—জোচ্চোর তো আর যাকে তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে বলবে, One of the supreme brain, one of the supreme technician যে জেনেশুনে বদমাইশি করছে। গাধাদের কাছ থেকে তো এটা আশা করা যায় না—যে জোচ্চোরি করতে জানে না। If he does not know the truth, he cannot cheat. So knowing fully well he is cheating. Do you follow me? সেই জন্যই তাকে জোচ্চোর বলেছি।

মু. খ. কিন্তু তার কিছু কিছু ছবি যেমন ধরুন 'Soul' ব্যতিক্রমধর্মী মনে হয়।

ঋ. ঘ. Terrific ছবি। শুধু 'Soul' কেন, 'The Face' ও Terrific ছবি। শেষটায় আমার মনে হয় যেন ego থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা আজকের agony কে ধরার চেষ্টা আছে। 'Silence' ও তাই। বলছি যে series of film যেমন 'Winter light', 'Wild strawberries'-christian philosophy র সেই ডাক্তার—সেই স্টেথসকোপের চিহ্ন, ক্রসের চিহ্ন, সিম্বল সমস্ত কিছু Biblical। এই জিনিষগুলিকে I don't like.

মু. খ. এটা তো Social Consiousness এর ব্যাপার।

ঋ. ঘ. এখানে social consciousness কোথায়? Seventh century কি Eighth century-র Sweeden এর সাথে আজকের সুইডেন এর কোন সম্পর্ক আছে? social consciousness এর মানে কি? একবার করলাম সেটা একটা কথা। তা করছে তো। পাসোলীনি করেনি? 'Gospel According to St. Mathews' সম্পূর্ণ Biblical কিন্তু কি terrific ভাবে সেটা আজকের context এ টেনেছে। কাজানজাকিস, কাকোয়ানীস এরাও তো ক্রিশ্চিয়ান myth গুলো নিয়েই ছবি করেছেন এবং আজকের context এ টেনে। কিন্তু এ ব্যাটা শুধু পেছনের দিকে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করছে। এঁরা ঐতিহ্যটাকে টেনে আজকের দিনের সঙ্গে তার মানে তৈরী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর এ ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন আমাদের পিছনমুখী করতে একই জিনিস—ওটা আমি কেন করব না। আমি করতে পারি—আমিও কি রামায়ণ, মহাভারতের গল্প করতে পারি না? করা মানে, আমি কি করবো ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মোটেই না। ওখান থেকে টেনে আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের দেশের কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকার আছে। এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে। আমি দেখাচ্ছি যে এই হচ্ছে ছবিটুকু।

মু. খ. সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের তো বক্তব্য থাকতে পারে।

ঋ. ঘ. আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার চাষী বসে আছে। আর তোমরা নেচে কুঁদে যাচ্ছ। সকলে নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্ছে এক বুড়োকে দিয়ে। আর কিছু নেই। শেষ ও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বসেই আছে। সে কাশছে। কি করবে? আর দাদারা সব করে যাচ্ছে। বাকতাল্লা বাজিয়ে বড় বড় কথা, হ্যান ত্যান। সকলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে করে বসে আছে। কি করে মুক্তি আসবে? কি করে সব কিছু হবে? সকলে জানে—সব ডাক্তার। সব গদীর জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে। এই তো বক্তব্য আমার। আমি এটা as a common Citizen of India who has gone through all these things, এর point of view থেকে দেখছি। No political issues. Universal পাগলামি। সেটা হলো এই জন্য যে ওরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি জানিনে solution, আমার কাছে কোন Theory নেই।

মু. খ. এটা এক ধরণের exposition. কিন্তু আপনার নিজের একটা বক্তব্য থাকতে পারে তো?

ঋ. ঘ. সুইডেন-এর Definitely অধিকার আছে করার। Crusades, প্রথম Christianity advent Pagen, philosophy এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পত্তি-

টাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো ? যেহেতু সে extremly powerful—One of the greatest film maker of the world. সে জন্যই ও কথা বলা হয়েছে। একটা হেজী, পেজী, Tom, Dick and Harry কে তো আর কেউ জোচ্চোর বলবে না। That fellow does not know, বুঝেছ ?

মু. খ আপনার নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে ছবি 'যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো' কে সরাসরি পলিটিক্যাল ছবি বলতে চেয়েছেন। পলিটিক্যাল ছবির যদিও কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই তথাপিও কি মৃণাল সেনের মত কোন বিশেষ একটি মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হবেন, নাকি অন্য কিছু ?

ঋ. ঘ. না, ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলার যে রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাতে কোন মতবাদের ব্যাপার নেই। আমি সেটাকে দেখেছি from a point of view of not a politician. Political কোন মতবাদকে যেমন Navalite মতবাদ আমার please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধীকে Please করার কথা না, CPM কে please করার দরকার নেই CPI কেও please করার দরকার নেই— আমার থাকলেও ছবিতে আমি স্লোগানে বিশ্বাস করিনা। ওর থেকে যদি emerge করে, through situation, through conflict একটা কিছু যদি তোমাদের mind এ আসতো এলো। কিন্তু আমি এইটেই soiution বলতে পারি না।

মু. খ. অবশ্য এটা কোন ছবিতে আপনি বলেন নি।

ঋ. ঘ. না বলা যায় না। আমি তো মনে করি বলা উচিতও না কিন্তু এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের পরে দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি।

মু. খ. আপনার প্রায় সব ছবিতেই একটা Optimism লক্ষ্য করেছি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

ঋ. ঘ. ও সমস্ত অপটিমিজম্-টপটিমিজম্ বুঝি না। মোদ্দা বাংলা হচ্ছে—এই হচ্ছে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। একে যদি তোমরা political বলো তো political, non-political বলো তো non-political. But no slogan, no party-বাজী, Universal Condemnation. আমার কিছু বক্তব্য নেই। I am not a political man, আমি politics করি না। কাজেই কোন party করি না। কিন্তু চারপাশে আমি reality দেখেছি তো।

মু. খ. আপনি কি কোন 'ইজমে' বিশ্বাস করেন ?

ঋ. ঘ. আমি কিসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য জায়গায়। As an artist আমি সেটাকে চাপাতে চাইনা। আমি mainly present করতে চাই যে এই ব্যাপারগুলো হয়েছে। এখন তুমি decide করো।

মু. খ. তার মানে আপনি কোন ideology impose করতে চান না।

ঋ. ঘ. Automatically থাকবেই ভিতরে, কিন্তু সেটা সোচ্চার নয়। তোমরা 'সুবর্ণরেখা' দেখনি ? এতে ideology নেই ? এতেও থাকবে।

মু. খ. হ্যাঁ দেখেছি। ভীষণ আশাবাদী ছবি।

ঋ. ঘ. আশাবাদ ছাড়াও ideology একটা definitely আছে। Analysis of the condition of the then West Bengal. তার পরে একটা comment আছে তো ? এখানে ও একটা comment থাকবে। আর সেই Comment টা দিয়ে আমি একটা slogan mongering বা ঐ সমস্তের মধ্যে নেই।

মু. খ. ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন যাদের টাকা দিচ্ছে আর যারা এফ, এফ, সি-র টাকা পাচ্ছে না এ নিয়ে দুটো গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যও দু'রকম। এফ, এফ, সি-এ পক্ষপাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকাররাই এফ, এফ, সি-র অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন। নতুনরা যারা ভাল ছবি করতে চাইছে তারা তাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে দেন-দরবার করতে করতে উৎসাহ ধৈর্য্য দুটোই হারিয়ে ফেলছে। এতে এফ, এফ, সি-র দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে না ? তা হলে আর ভালো ছবি সৃষ্টিতে এফ, এফ, সি-র ভূমিকাটা রইলো কোথায় ?

ঋ. ঘ. FFC এ পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে, আমি ঠিক exactly এর পরিসংখ্যানটা বলতে পারবো না, তবে জন্ম থেকে গোটা ষাটেক ছবি finance করেছে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কি আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমাত্র মৃণাল সেন এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি। আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে কেউ পায় নি। আর প্রতিষ্ঠিত সব নতুন নতুন ছেলে তাদের মধ্যে more than 75·/. যারা ছবি করতে গিয়েছিলো টাকা মেরে পালিয়েছে। Straight টাকা মেরে হাওয়া হয়েছে। যেমন একজনের নাম বলছি অচলা সচদেব বলে একজন actress আছেন তার স্বামী জান সচদেব। আড়াই লাখ টাকা advance নিয়ে বসে আছে। ফেরত নেওয়ার কোন উপায় নেই। এইভাবে সয়লাব করছে। আর তারা যে নতুন ছেলেদের টাকা দেয়নি তা না। আমারই student, Gold medalist from Film Institute of poona মনি কাউলের দু'দুটো ছবিকে finance করেছে এবং ওর দুটো ছবিরই যথেষ্ট নাম হয়েছে। He has established himself, not only

that, এ বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সেমিনার হয় সেখানে Jury হয়ে সে গিয়েছে। এতকিছু সম্মান সে পাচ্ছে। কুমার সাহানীকেও FFC একটা ছবি করতে দিয়েছে। সে ছবিটা এখনো release হয় নি। কে বলেছে নতুন ছেলেদের দেয় না? একজন দু'জন এখানে ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে। এখানকার মধ্যে আমি কিন্তু যতদূর জানি পূর্ণেন্দু পত্রীকে ওরা দেয় নি। সে জন্যই এতসব ব্যাপার। কিন্তু He is not a new director. সে 'স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিলো। তারপর এখন 'স্ত্রীর পত্র' করেছে। কাজেই তাকে—You cannot say, he is a new one.

মু. খ. কিন্তু তার অভিযোগটা খুব বড় করে দেখান হয়েছে।

ঋ. ঘ. সেটা আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ। Because he works in আনন্দবাজার। তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের কিস্সু যায় আসে না। আনন্দবাজার তো হচ্ছে একটা fascist organisation. Fascist ও নয় CIA agent।

মু. খ. এটা কি Off the record না কি?

ঋ. ঘ. Off the record কেন, on the record. I shout from the house tops, from the house tops to the streets. আজকে তোমাদের এখানে off the record করতে যাব কি জন্য?

মু. খ. পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ক'বছর ছিলেন? সেখানে শিক্ষক থাকাকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. এটা কে বললো, আমি ছিলাম মানে? পুনায় আমি visiting Professor হিসাবে দু'বছর জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক দু'মাস পর পর যেতাম। দশদিন করে থাকতাম—চলে আসতাম। তারপর আমি Vice-Principal হিসাবে মাত্র তিন মাস ছিলাম। পুনায় আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমি মনে করি আমার জীবনে যে কয়টা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাল্লার একদিকে দেয়া হয় আর, মাস্টারিটা যদি আরেক দিকে দেয়া হয় তবে ওজনে এটা অনেক বেশী হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রী আজকে উঠছে। I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my own film making, আমি বলছি তো ওটা অনেক বেশী।

মু. খ. পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আপনার ছাত্রদের মধ্যে কুমার সাহানী 'মায়া দর্পণ' এবং মনি কাউল 'উসকী রোটী' ছবির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনি দারুণ গর্বিত। পুনা থেকে পাশ করা কে, কে, মহাজনও আপনার ছাত্র যে এখন সবচাইতে প্রতিভাবান আলোকচিত্রী। আপনি শিক্ষক থাকাকালীন পশ্চিম বাংলার কোন ছাত্র-ছাত্রী কি পুনায় ছিল না যাদের প্রতিভা উপরোক্ত শিল্পীদের সাথে তুলনা করা চলে?

ঋ. ঘ. ছিলো। বেশ কয়জন ছিলো। ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি বসু ও সোমেন বলে দুটো ছেলে ছিল এবং এরা দু'জনেই সুযোগ সুবিধা পেলে মহাজনের থেকে খারাপ কাজ করবে না। ব্যাপার হচ্ছে ফিল্ম লাইনে ভাল কাজ জানলেই তো আর নাম করা যায় না। প্রতিযোগিতাও করা যায় না। মহাজন lucky যার ফলে সে একটা ভাল break পেয়ে গিয়েছে। এরা break এখনো পাচ্ছে না তাই ডকুমেন্টারী ফকুমেন্টারী করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের কাজ খুব ভাল।

মু. খ. দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙ্গা বাংলার প্রতি আপনার যে মমত্ববোধ সেটা আপনার ছবির একটা বিশেষ দিক। অন্তত সে কারণেই আপনার বিষয়গত ভাবনা সমন্বিত ট্রিলজী 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আপনার মতে আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটার কারণেই আজকের এই অর্থনৈতিক সংকট। স্বাভাবিক ভাবে তাই আপনার ছবিতে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলোকিত হয়। আপনি কি ভাবেন না ভাবেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে এই হয়েছে বলে এ রকম হচ্ছে, এই না হলে হয়তো অন্য রকম হতো ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আপনি সেরকম একটা ছবি করলেন না কেন? বিষয়বস্তুর দিক থেকে আপনি 'তিতাস' কে বেছে নিলেন কী কারণে? এ ছবিটা তো আরও পরে হতে পারত। কেননা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পূর্বেকার চিন্তা ভাবনাগুলো আরও উন্নতভাবে প্রকাশ পেতে পারত।

ঋ. ঘ. যখন আমার তিতাস করার কথা আসে তখন এ দেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে। এবং most unsettled। এখন যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু তবু যখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কি চেহারা নেবে। সব শিল্পই দু'রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আরেকটা হচ্ছে উপন্যাস—যেটা lasting value। সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়—ভাবতে হয়। It takes two-three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest. তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগজে তো নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা

করি। কাজেই তখন ফট করে এসে—পঁচিশ বছর যেখানে আসিনি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে না বুঝতে নাড়ীর যোগ না করতে করতে দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাঠে, শহরে যাদের দেখিনা, জানিনা, চিনিনা—আমি পাকামো করতে যাব কোন দুঃখে? আমার কোন অধিকারই নেই। এই হচ্ছে এক। আর দু' নম্বর হচ্ছে তখন condition কেমন fast changing এটা, ওটা, সেটা, নানা রকম তার মধ্যে থেকে একটা Pattern আস্তে আস্তে বেরোক। আমি ভাববার সুযোগ সুবিধা পাই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক বারে বারে। আস্তে আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েস দিয়ে শিল্প হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কি 'রাঘবশাহী' খাব কি 'রস কদম্ব' খাব তা নয়। 'দে দাও মরণ চাঁদের' এ ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতরে থেকে যখন ইচ্ছে আসবে তখন করবো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে তিতাস-টা ছিল আমার পক্ষে আইডিয়াল। কারণ তিতাস ছিল একটা subject যে subject মোটামুটি যে বাংলাটা নেই তার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা। তার উপর তো পটভূমিটা। এর subject-টা এমন যা বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোরার সুযোগ দেয়—গ্রাম বাংলাকে বোঝার সুযোগ দেয়। গাঁয়ে গিয়ে shooting করাটা বড় নয়। shooting করার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাথে মেশা, নাড়ীর স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই তিতাস-টা একটা অজুহাত এদিক থেকে। এবং ঐ অবস্থায় তিতাস ধরে করলে হয় কি—সেই মাকে ধরে পুজো করা হয়। তা এতগুলি কারণেই এই তিতাস পরে হতে পারত না। এখনো তিতাস আমার একটা study আর আমার একটা worship হিসাবে দেখা যেতে পারে। This river, this land, this people এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর সঙ্গে নিজেকে re-establish করা। আর শেষ হচ্ছে ও সময়ে ওটা time ছিল না এবং time এখনো আসে নি। এখনো serious study করে serious work যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সেরকম ছবি করার অবস্থা এখনো আমার আসে নি। মানে আমি এখনো এতটা বুঝে উঠতে পারি নি—কোন দিকে যাবে ইতিহাস। আমি যেদিন তাগিদ বোধ করবো, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে পেরেছো?

মু. খ. আপনি তো বাংলাদেশে একটা ছবি করলেন। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলী এবং যান্ত্রিক আয়োজন নিঃসন্দেহে ভাল ছবি তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়ত তিতাসের মত মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তবু কেন বাংলাদেশে ভাল ছবি হচ্ছে না? বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন তাতে কি মনে হচ্ছে আপনার? গলদটা কোথায়?

ঋ. ঘ. আমার জানা নেই। কারণ আমি এতো ভালো করে জানিও না। আর এ কথা আলোচনা আমার কি করা উচিত?

মু. খ. আমাদের একটা suggestion হিসাবে যদি কিছু বলেন, আমরা যারা আছি তাদের প্রতি আপনার একটা উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি তো ইণ্ডাস্ট্রিতেও কিছু দিন ছিলেন।

ঋ. ঘ. Suggestion হচ্ছে, এখানে ছবি না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে পঁচিশ বছর ধরে তোমাদের দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখা ছিল। কিস্‌সু দেখতে, শিখতে কিংবা পড়তে দেওয়া হয় নি। Somehow this has happened. হঠাৎ দরজা খুলেছে। এখন এই সুযোগটা গ্রহণ করে তোমাদের উচিত, যে করে পারো Film Society Movement করার সাথে সাথে একটা পাঠাগার তৈরী করা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ film সম্পর্কে বই, ম্যাগাজিন এবং ক্লাসিক বইগুলো জোগাড় ক'রে নিজেরা পড়াশুনা করো। আসলে জিনিষটা হচ্ছে যে Serious attitude টা develop করা উচিত। কিন্তু attitude develop করতে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে পড়াশুনা। কারণ আমাদের কারোই মুরোদ ছিল না film করি বা বিদেশের ছবি দেখি। ঠিক এই অবস্থা ছিলো কলকাতার, তা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০-এ শুরু হলো আমাদের World ক্লাসিক্স এবং অন্যান্য ভালো ছবি দেখা, যদিও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন (Calcutta Film Society) শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে। তার আগে আমরা কি করেছি? আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাইনের Film Form, Film Sense, পুদভকিনের Film Technique & Film Acting, ক্রাকাওয়ের, এবং পল রথার বই জোগাড় করে, রজার ম্যানভিলের বই জোগাড় করে, পড়ে, বুঝবার চেষ্টা করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি। আমাদের এই চেষ্টাটা Film Industry-র completely বাইরে ছিলো। আমরা সকলেই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে জড়িত ছিলাম। যেমন আমি Assistant Director ছিলাম, আমি গল্প লেখকও ছিলাম আবার এ্যাকটিংয়েও ছিলাম। কিন্তু সেটা ছিলো একটা দিক। কারণ ওখানে এসব কথা বললে হাসতো আজকের মত। একই, কোন তফাৎ নেই। নিজেদের individual চেষ্টায় বা বন্ধু বান্ধবরা কয়েকজন মিলে এদিক ওদিক করতে করতে এক আধটা বই নিয়ে, পড়ে, আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করো। এই করতে করতে বছর খানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে একটা আন্দোলন দানা বাঁধলো। তখন society তৈরী করার একটা অবস্থা তৈরী হলো। এই ভাল ছবির movement-টা, সত্যিকারের সৎ ছবির movement টা এই commercial world এর বাইরে করতে হয়। পরে commercial world-এ তার

effect পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আঘাতটা করবে কে ? অপ্রস্তুত সেপাই কতগুলো—হাতে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার—তাতে আর করতে পারবে না, তাদের তো complete mental preparation থাকা উচিৎ। আর ভেতরে কি আছে সেটার দরকার নেই। সব পৃথিবীতেই সমান আর কী।

মু. খ. উভয় বাংলার মানুষদের নিয়ে তো আপনি যথেষ্ট ভাবেন। আপনার চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতেও তারই পক্ষপাতিত্ব। এখন এই যে দু'দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময় এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র সৃষ্টির কথা উঠেছে, এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন।

ঋ. ঘ. করা উচিত। যত বেশী পারা যায় যৌথ প্রযোজনায় ছবি করা উচিত। আদান প্রদান হওয়া উচিত। যাওয়া আসা উচিত। মেশা উচিত। এটা তোমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণভাবে আশা করা যায় না যে এ সমস্ত ব্যাপারে সরকারী আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোন জায়গায় কোন Film Society, কোন Film Movement, কোন Art movement কোনদিন bureaucrat দের দিয়ে হয়নি। এরা একটা চেহারা করে পাঠাবে, আবার তারা ওখান থেকে একটা চেহারা করে পাঠাবে। এ চলবেই, এগুলো inevitable। কতগুলো ব্যাপার, তোমাদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত। কিছু বই পড়া উচিত, কিছু মেশা উচিত। আবার ওখান থেকে ছেলেপেলে এখানে আসা উচিত। ঠিক same. আর একটা পথ হচ্ছে ঐ joint production. ওখান থেকে কিছু ছেলে কিছু কর্মী এলো, তোমরা কিছু জুটলে। ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য যদি মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাক। নিজেদের মধ্যে জোর আনতে হবে, পরে সরকারকে convince করতে হবে। যেমন Indian Government এখন আর এই media-র গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। যার জন্য তার, FFC তৈরী করতে হয়েছে, Film Institute তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার আগে কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই seriousness টা ঢোকাতে হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বললে কেউ দিত নাকি ? '48-এ ভাবতে পারত নাকি কেউ যে সরকার টাকা দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে Film কে।

মু. খ. FFC আর Film Development Board-এর মধ্যে পার্থক্য কি ?

ঋ. ঘ. কলকাতায় West Bengal Film Development Board—সেটা Provincial আর এটা হচ্ছে All India থেকে। Development Board টা সবে হয়েছে, ওটার কোন কাজ-টাজ নেই।

মু. খ. ভারতের ভাল বাংলা ছবি, শিল্প, ছবি কিংবা চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা উঠলেই আবশ্যিকভাবে তিনটি একঘেঁয়ে নাম এসে যেত—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন। কিন্তু আশার কথা সম্প্রতি এর সাথে আর একটি নাম যুক্ত হয়েছে পূর্ণেন্দু পত্রী। কিন্তু এদের বাইরেও কি প্রতিশ্রুতিশীল চলচ্চিত্রকার নেই ? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম অনুচ্চারিত কেন ?

ঋ. ঘ. এ তো বাংলা ছবির কথা হচ্ছে।

মু. খ. না, আপনি All India Basis-এ বলুন।

ঋ. ঘ. মনি কাউল, কুমার সাহানী এদের নাম তো এখন উঠছে। আর কলকাতায় এখন পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় নি। কাজেই এদের কথা কি বলবো।

মু. খ. চলচ্চিত্র সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শিল্পীদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে না জানলেও বোধহয় স্বীয় মাধ্যমে করে খাওয়া যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রকারকে সকল প্রকার শিল্পকলা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আদৌ কোন উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন না বরং এ মাধ্যমটির প্রতি তাদের চরমতম অনীহা। চলচ্চিত্রের প্রতি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি ?

ঋ. ঘ. ঐ বললাম তো, লোককে জোর করে তো আর কিছু করানো যায় না ? সাহিত্যিকদের অনীহার কারণ হচ্ছে সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখছেন তার ভিত্তিতে হবে অনেকটা। কাজেই তারা যখন দেখবেন কিছু ছেলেপেলে কিছু serious চেষ্টা করছে, পারুক আর না পারুক, সবাই যে successful হবে এমন তো নয়। কিন্তু attempts হচ্ছে। Some good boys, রুচিবান কিছু ছেলে পুলে কিছু করার চেষ্টা করছে। তখন automatically সাহিত্যিকরা বুঝবে যে জিনিষটা serious. এখন বললে তাঁরা বলবেন যে এখানে যা হয় তাতে আমরা কি বলবো ? ভালো একটা গল্প দেবো, কেউ নেবেনা। তাই তো এখন সত্যি সত্যি ঘটনা। আমরা করবোটা কিভাবে ? How to help and why to get interested ? তাদের সবাইকে interested করতে গেলে এখান থেকে একটা force আসা উচিত। তাহলে automatically তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আসবে। আগ্রহ এলেই interested হবে। এবং তখন তারা সেই দিকে লেখার কথা ভাববেন। Filmic story কাকে বলে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। যাঁরা তোমাদের এখানে sincere লেখক আছেন তাঁরা এটা করবেন। কিন্তু এখন how do you expect serious people to be interested ?

ম. খ. যতদূর জানি এ যাবৎ আপনার কোন ছবি সরকারীভাবে কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত হয়নি।

জর্জ শাদুলের আমন্ত্রণের পর কি 'সুবর্ণরেখা'কে কোন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠান সম্ভব হয়েছিল? আপনার ছবি বিদেশে না পাঠানোর ব্যাপারে কারণটা কি—সরকারী আমলাদের কারসাজী, না কি রাজনৈতিক?

ঋ. ঘ. আমি তো সমস্ত কিছু বলতেও পারবো না। তবে এটা ঠিকই যে সরকারী ভাবে কখনো আমার কোন ছবি যায় নি। আর আসল কথা হচ্ছে যে 'সুবর্ণরেখা'র পিরিয়ড পর্যন্ত আমি ব্রাত্য ছিলাম—আমি অপাংক্তেয় ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক কারণে তো বটেই। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার ট্যাপার থাকে। এখন আমি জাতে উঠেছি। তখন তো আমি ছিলাম না এমন। কাজেই এখান থেকে ওখান থেকে নানা রকম খোঁচাখুঁচি—অমুক তমুক। যেমন 'সুবর্ণরেখা' তারা আটকাতে পারেনি। তখন India তে ভালো Subtitle হতো না। কোন ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে subtitle না করে পাঠানো ঠিক নয়। You cannot expect তারা Venice কিংবা Cannes-এ বসে বাংলা বুঝবে।

মু. খ. শুনছি বাংলাদেশে সৃজিত আপনার ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারী-ভাবে, কিংবা অন্য কোন বাধা এসেছে কি? আর তিতাস যে বাণিজ্যিকভাবে ভারতে প্রদর্শিত হবার কথা ছিল তার কি হলো।

ঋ. ঘ. এসবগুলো চেষ্টাই চলছে। এখন পর্যন্ত সরকারী-ভাবে এরা বিভিন্ন festival এ যেখান থেকে দাওয়াত পেয়েছেন সে সব জায়গায় পাঠাবার কথা ভাবছেন। সে নিয়ে আলোচনা চলছে। সে একই ব্যাপার কলকাতায় দেখানোর ব্যাপারেও। ওখানেও এটা আলোচ্য অবস্থায় আছে। এখনো final কিছু হয় নি।

মু. খ. সত্যজিৎ রায় কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতবর্ষে এখন তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি—এবং আমি সত্যিই জানিনা যে তার অর্থ কি? কমিউনিস্ট পার্টির এই দ্বিধা বিভক্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি।

ঋ. ঘ. তিনটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমার আপত্তি—ওটা ফিল্মের কোন ব্যাপার নয়। ওটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে আমার বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসবে, আর রাজনীতি আলোচনা আমি করতে পারি। ৮/১০ ঘন্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু why—লাভটা কি! ওটার সাথে ফিল্মের কি সম্পর্ক আছে? কমিউনিস্ট পার্টি-ফার্টির কথা তুলে লাভ কি আছে। আমি তো মনে করিনা যে as a film maker আমার politics নিয়ে কথা বলা উচিত। As a social being I may have some feelings, some ideas যা আছে ছবিতেই আছে, ওটা নিয়ে আমি কোন মতামত দিতে চাই না।

মু. খ. ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবেন বলে একবার ভেবে ছিলেন তার কি হলো?

ঋ. ঘ. ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবো বলে ভেবেছিলাম, তার স্ক্রিপ্ট হয়েছে এবং সে স্ক্রিপ্ট ছাপাও হয়েছে। কিন্তু ছবি হওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা না? ছবি করা গেল না।

মু. খ ওটা কি একেবারে বাদই দিয়েছেন, নাকি ছবি করার ইচ্ছে আছে আপনার।

ঋ. ঘ. এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায়? এখন আর ছবি করার কোন মানেই হয় না।

মু. খ. যুক্তি তক্কো গপ্পোর' পর কি ছবি করবেন? কোন পরিকল্পনা থাকলে কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. এখনো আলোচনা চলছে, ভাবছি। এখনো কিছু final হয় নি কথাবার্তা চলছে।

মু. খ. আপনার অধিকাংশ ছবির কিছু কিছু চরিত্র Archetypal symbol হয়ে প্রকাশ পায়। আপনি মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এর কালেকটিভ আনকনশাসনেস দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাই আপনার ছবির চরিত্রেরা যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, গৌরী, 'কোমল গান্ধার'-এর অনুসুয়া, শকুন্তলা, 'সুবর্ণরেখা'র সীতার মা, সীতা, এবং তিতাসের রাজার ঝি, ভগবতী প্রস্থপ্রতিমার আদলে গঠিত। আপনার 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এবং আগামী ছবিতে কি এ ধরণের আর্কিটাইপাল ইমেজের প্রকাশ ঘটবে?

ঋ. ঘ. আর্কিটাইপাল ইমেজ এমন একটা জিনিষ যেটা অঙ্ক কষে আসে না। আর দ্বিতীয়ত সে চিন্তা এখন যদি আমার থাকে তবে ওটা প্রভাবিত হবেই কোন না চরিত্রে।

মু. খ. বাংলাদেশের কোন ছবি দেখেছেন কি? দেখে থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন।

ঋ. ঘ. বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছি আমি, 'জীবন থেকে নেয়া'। হ্যাঁ, 'ওরা এগারোজন'-ও দেখেছি। এই দুটো, দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কি বলবো। 'জীবন থেকে নেয়া' আমি কলকাতায় দেখেছি। ও সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি এখানে বসে করা, এর জন্য বুকের পাটা দরকার। ছবির content-এর দিক থেকে বলছি। Form বা Structural ব্যাপার এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। তখনকার যে অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এরকম Bold ভাবে কাজ করতে পারে, ভাবতে পারে, সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আর 'ওরা এগারোজন'—ঠিক আছে।

মু. খ. 'তিতাস' এখানকার দর্শক নেয় নি। এর কারণটা কি? আপনি নিজে এ ব্যাপারে কি মনে করেন।

ঋ. ঘ. আমি তখন প্রথমতঃ মৃত্যুশয্যায়। কাজেই কে

গিয়েছে কে নেয় নি তারপরে যে লেখা 'তিতাস' সম্পর্কে এখানে হয়েছে তা উড়ো উড়ো শুনেছি, আমি পড়িনি কিছু। কারণ আমি বলতেই পারবো না। কারণ আমি এখানে ছিলামও না এবং কোন interest নেওয়ার মত অবস্থাও আমার ছিল না। আমি হাসপাতালে তখন পড়ে আছি। আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ পাই টাই নি। কাজেই এর সম্বন্ধে আমি বলি কি করে। কেন নেয় নি সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে। তোমরাতো এখানে উপস্থিত ছিলে। আমি তখন এখানে নেই। So how can I tell!

মু. খ. চিত্রবীক্ষণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলে-ছিলেন যে এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা 'তিতাস' করার সময় প্রথম প্রথম আপনাকে সুচক্ষে দেখে নি পরে নাকি এ বিরূপ ভাবটা প্রীতির সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু 'তিতাস' মুক্তি পাবার পর এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো আপনি পড়েছেন কি না জানি না, অনেকেই আপনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গালাগাল করেছে। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

ঋ. ঘ. এ বিষয়ে আমার বলার মত কোন ব্যাপার আছে? প্রথমে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন সত্যি সত্যি কিছু লেখা টেখা বেরিয়েছিল। সেগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা খুব ভালভাবে নেয় নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ করাকালীন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় টরিচয় যখন হলো আমি দেখলাম যে তাদের more or less আমার প্রতি বেশ ভালই attitude, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে কিছু করে থাকে—প্রথমতঃ কে করেছে, কে করে নি—বললামতো আমি কিছু জানি না। যদি করে থাকে তার উত্তর দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি। আর যদি ইচ্ছা করে না করে তার যদি সত্যিই মনে হয়ে থাকে তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, কিন্তু এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসন্ধিমূলকভাবে কোন কিছু করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিৎ? কি লাভ হবে দিয়ে?

মু. খ. বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি করার কথা ভাবছেন কি?

ঋ. ঘ. না এখনো পর্যন্ত ভাবার মতো সময় আসে নি।

মু. খ. ডাক পড়লে আসবেন কি?

ঋ. ঘ. সে সব পরের কথা পরে হবে। এ সব conjectural কথাবার্তাগুলো আলোচনা করে লাভ কি? কেউ যখন এখনো ডাকেনি তখন ডাক পড়লে আসবো কি না তা ভেবে কি হবে? তা ছাড়া নিজের হাত এখন full: এই তিতাসের পুরোটা তৈরী করতে হবে তো, 'যুক্তি-তক্কো গপ্প' শেষ করতে হবে। তা আমার হাত তো at least for a month or two full. তার পরে এ দুটো ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে Director-এর, বিশেষ করে কলকাতায় ছবি রিলিজের জন্য তার দায়িত্ব বেশী, তাই সেই রিলিজের পেছনে দৌড়াও, তারপর রিলিজের সময় লোককে ইয়ে করো, কাজেই ঐ সব দিকে এখন concentrate করতে হবে, কাজেই immediately এখন বলে কি লাভ?

মু. খ. ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রামাণ্য ছবি (যাকে আপনি প্রামাণ্য ছবি না বলে Character study বলতে চেয়েছেন) করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এ ধরণের বিষয়বস্তু আপনার চলচ্চিত্র মানসের সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক এবং চিন্তার দিক থেকেও যা একান্তই ভিন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর উপর এই ছবি করতে যাওয়াটাকে অনেকে আপনার কম্প্রোমাইজিং এ্যাটিচুড এবং স্ববিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করতে চাইছে। এ সম্পর্কে আপনি যদি স্পষ্ট করে কিছু বলতেন।

ঋ. ঘ. আমার স্পষ্ট করে কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে, ছবিটা আদ্দেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়—ছবি যখন বেরোবে তখন কেন করতে চেয়েছিলাম পরিষ্কার দিনের আলোর মত হয়ে যাবে। এবং স্ববিরোধিতা কিনাই ওটা প্রমাণ করবে। এবং compromise কিনা ওটাই প্রমাণ করবে। আর্টিস্ট-এর কাছে এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কথা যে wait কর। See it and then condemn it.

মু. খ. কিছু কিছু লোক এ ধরণের মন্তব্য করছে যে 'ঋত্বিক ঘটক তো এখন ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ছবি করছে!' এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ঋ. ঘ. এ সমস্ত কথার উত্তর দেবার কি আছে? যে উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরই। অভিসন্ধিমূলক কথার উত্তর দেওয়াটা ঘৃণ্য। ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই যদি বোঝা যায় যে আমি অভিসন্ধিমূলক কাজ করছি—কি আমি compromise করছি, কি আমি স্ববিরোধিতা করছি, তখন আমাকে তুলে খিস্তি করো। তার আগে যেটা হয় নি, হবে কিনা তা জানা নাই, সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় না?

মু. খ. পুনাতে যে দুটো শর্ট ফিল্ম হয়েছে যেমন 'রঁদেভো' আর 'ফিয়ার' ওগুলো কি আপনিই করেছেন না ছেলেরা করেছে আপনার তত্ত্বাবধানে?

ঋ. ঘ. 'রঁদেভো'টা ছেলেরা করেছে আমার তত্ত্বাবধানে। For Direction students. আর 'ফিয়ার'টা আমি করেছি for Acting Course.

শিশু চলচ্চিত্র

প্রবোধ কুমার মৈত্র

মন্দের ভালো বলতে হবে যে এবছর 'আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় শিশুদের সম্পর্কে অন্যান্য কার্যসূচীর মধ্যে চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে। ভেবে দেখুন, এদেশে গতবছর ছশো'রও বেশী ছবি তৈরী হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ছ'টি শিশু বা কিশোর-দের জন্য বিশেষভাবে কল্পিত নয়। পশ্চিমবাংলায় তো শিশু সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ, বেশ কয়েকটি সুসম্পাদিত পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তবে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এ অনীহা কেন ?

একটা কারণ বোধহয়, চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যয়। কিন্তু সেটা পুরো ব্যাখ্যা হতে পারে না। বাংলা ছবির আজকের হালের সংগে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই যুক্ত—পরিবেশনের অব্যবস্থা, প্রদর্শনের অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা, রঙীন ছবির অসুবিধে—সব মিলিয়ে শিশুচিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংকুচিত।

তাই, রাজ্য সরকারকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি ছবি তৈরীর কাজ এ বছর শুরু হয়েছে। সত্যজিৎ রায় রঙীন সংগীতবহুল "হীরকরাজার দেশে" ছবিটির শুটিং করেছেন। "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" এর পরবর্তী অংশ হিসেবে ছবিটি কল্পিত। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয় নিয়ে কিশোরদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য ছবি করা হচ্ছে। যেমন দার্জিলিং থেকে সাগর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক চেহারা, ইতিহাসের কাহিনী। মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে একটি রঙীন ছবি, আরেকটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে। পরেরটি মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের রূপরেখা ছোটদের উপযোগী করে তুলে ধরা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও একটি নাটক অবলম্বনে দুটি ছবি হচ্ছে। কিশোরদের কাছে অ্যাডভেঞ্চার-এর গল্পের আকর্ষণ খুবই। অন্তত এরকম একটি কাহিনী নিয়ে ছবির কাজও এগিয়েছে। সবগুলি ছবি শেষ হলে এক বছরেই বাংলার শিশু-কিশোর চিত্রের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাবে মনে হয়। এগুলি শহর ছাড়াও গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে না পারলে অবশ্য উদ্দেশ্য সার্থক হবে না।

রাজ্য সরকার এছাড়া কলকাতায় শিশুদের জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী। এই কেন্দ্রে ছবি দেখানো, অভিনয়, গ্রন্থাগার সবের ব্যবস্থা করা হবে।

সবচাইতে বড় কথা এবছরই যেন শিশুদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা শেষ হয়ে না যায়। এবছর শুরু করবার বছর হিসেবে মনে করলে প্রতি বছরই কিছু কাজ করে শিশুদের মনের খোরাকের দিকে নজর দেওয়া যাবে।

আমাদের দেশে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি উদ্যোগ দেখা দিলেও, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কিংবা পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে কিন্তু অনেক আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। বিলেতে তো শিশু চলচ্চিত্র আন্দোলন পঞ্চাশ বছরেরও বেশী পুরানো। যেখানে শনিবারের একটি করে প্রদর্শনীতে শিশুচিত্র দেখানো বাধ্যতামূলক। আর অভিনেতা বা কলাকুশলীরা অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন শিশুদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জন্য ব্যয় সম্ভবত সবচাইতে বেশী। শরীরের পুষ্টির সংগে মনের পুষ্টি—এক সংগে দেখা সেখানে শিশুর বেড়ে ওঠার সংগে জড়িত। অন্যান্য দেশ, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোস্লোভাকিয়া, জাপান, সব জায়গাতেই শিশু চলচ্চিত্রের সংখ্যার মানও উন্নত, সংখ্যাও বিপুল। ওয়াল্‌ট্‌ ডিজনে তো অ্যানিমেশন ছবির জগতে যুগপ্রবর্তক—সারা দুনিয়ার শিশু ও বয়স্ক একসংগে তাঁর ছবি দেখে আনন্দ পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে বেসরকারী উদ্যোগে শিশুদের জন্য ছবির ঠাঁই নেই। ভারত সরকার দু'দশক আগে শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ গঠন করে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু সম্যক ফল লাভ হয় নি। এ রাজ্যেও একটি পর্ষদ হয়েছিল কিন্তু অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়। আশার কথা, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এরাজ্যের যাঁরা প্রধান পুরুষ—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার—সবাই কোন না কোন সময়ে শিশুদের জন্য ছবি করবার সময় দিয়েছেন। তরুণ পরিচালকরাও এগিয়ে এসে হাল ধরলে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হবে না।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—১৩১

স্থান—শহরের কামারশালা।

সময়—দিন।

কামারশালে বসে অনিরুদ্ধ একটা গন্‌গনে লাল লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। জড়ানো মেয়েলি গলায় গুন্‌গুন্ সুর শুনে সে থেমে যায়।

"হায় লো পিতলের কলসী
তুরে নিয়ে যাবো যমুনায়—
কলসী রে তুর পায়ে ধরি
নিয়ে চল বন্ধুর বাড়ী—"

দুর্গাকে কামারশালের দরজায় দেখা যায়। গলায় বাসি ছেঁড়া ফুলের মালা, চুল উসকো-খুসকো, শাড়ি আগোছাল।

সে দোকানের মধ্যে ঢুকে একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই গুন্‌গুন্ করার পর কথা বলে।

দুর্গা : কৈ গো বন্ধু!....আমার দা?....
দা দেবে না?

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ তাকে অবাক চোখে দেখছিল।

অনিরুদ্ধ : হয়ে গ্যাছে, দাঁড়া!

অনিরুদ্ধ ডাঁই করা যন্ত্রপাতির মধ্য থেকে দুর্গার দা'টা বার করতে থাকে। দুর্গা তখন মুচকি হেসে বলে—

দুর্গা : যদি বলি...বলতে মন গিছে....!

অনিরুদ্ধ দুর্গার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে যেন। তারপর ডানদিক থেকে একটা ছোট টুল নিয়ে দুর্গার সামনে রাখে।

দুর্গা হাই তুলে, শরীর দুলিয়ে বসে পড়ে টুলটায়।

দুর্গা : বাব্বাঃ রাতভোর বা ধকল গেইচে!

সে শাড়ির ভেতর থেকে একটা মদের বোতল বার করে সামনে রাখে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বোতলটার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

একটি বিলিতি মদের বোতল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ দুর্গার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দুর্গা : (একটু হেসে) ঐ চালকলের নাগর গো... মাড়োয়াড়ী মিন্‌সেটা...এই ক'টা আনিয়েছিল (তিনটে আঙুল দেখায়)....দুটো যেতেই ফাঁক! শেষ বেশ বুঝে,—বাঃ!....উটা তু দিয়ে যা! (ব্লাউজের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট বার করে। এপাশ ওপাশ ফুঁ দিয়ে, ঠোঁটে চেপে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলে) দেখি....

অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয়। একটা লাল গন্‌গনে লোহা চিমটে দিয়ে তুলে দুর্গার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্য হাত দিয়ে হাপর টানতে শুরু করে।

দুর্গা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ অনিরুদ্ধর দিকে চোখ পড়ে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ সোজা দুর্গার দিকে তাকিয়ে।

কাট্ টু।

দুর্গা অনিরুদ্ধকে লক্ষ্য করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গা। আদিম দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় দুর্গার ঠোঁটে। চোখে রহস্যের ছায়া। সিগারেটে টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে দুর্গা।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ হতবাক।

কাট্ টু।

দুর্গা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা অনিরুদ্ধ'র মুখের ওপর ছেড়ে দেয়। ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যায় অনিরুদ্ধ'র চোখে লুকানো প্রেমের আগুন।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে সাইড ট্র্যাক্ করে উনুনের ওপর যায়। অনিরুদ্ধর হাত যন্ত্রের মত হাপর টেনে চলেছে। উনুনের কয়লা জলছে আর নিবছে।

উনুনের ওপর কিছুক্ষণ ধরা থাকে ক্যামেরা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩২

সময়—বিকেলবেলা।

ময়ূরাক্ষীর হাঁটু জলে দুর্গাকে কাঁধে নিয়ে অনিরুদ্ধ আর দুর্গা গান গায়—

ওলো দেখে যা সই দেখে যা

পাখির বোল ফুটেছে

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৩

স্থান—শিবনাথতলা, গয়েশপুর।

সময়—বিকেলবেলা।

মন্দিরের সামনে গাছের ডাল থেকে সুতো দিয়ে একটি ঢ্যালা ঝুলিয়ে দেয় পদ্ম। প্রণাম করে।

(ব্যাক গ্রাউণ্ডে সুর শোনা যায়—"ওলো দেখে যা")

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৪

স্থান—নদীর চড়া।

সময়—বিকেলবেলা।

নদী পার হতে হতে অনিরুদ্ধর কাঁধে চড়ে দুর্গা গাইছে।

"ওলো দেখে যা সই দেখে যা"

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের রাস্তা।

সময়—সন্ধ্যা।

পদ্ম মন্দির থেকে ফিরছে। হঠাৎ ছিরু পালকে উল্টো দিক থেকে আসছে দেখতে পেয়ে ঘোমটা টেনে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়।

পদ্ম ছিরু পালকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ক্যামেরা চার্জ করে ছিরু পালের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৬

স্থান—নদী।

সময়—সন্ধ্যা।

দুর্গা অনিরুদ্ধর কাঁধ থেকে নেমে নদী পার হয়। গানও শেষ হয়ে যায় আর অনিরুদ্ধ ধপাস করে বালির ওপর বসে পড়ে।

দুর্গা উ কি?

কাট্ টু

দৃশ্য—১৩৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—সন্ধ্যা, অগ্রহায়ণ (৩য় সপ্তাহ)

খিড়কি দরজার বাইরে ক্যামেরা।

পদ্ম বাইরে থেকে এসে উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ শূন্য ফ্রেমে ক্যামেরা ধরাই থাকে। একটু পরেই টলতে টলতে ফ্রেমে ঢোকে ছিরু পাল। চারদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ে উঠোনে।

কাট্ টু।

পদ্ম হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাত ধুতে আরম্ভ করে। পদ্মর পা থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে টলায়মান ছিরু পালকে ধরে। হাত ধোয়া বন্ধ করে দেয় পদ্ম। ক্যামেরা টিল্ট-আপ্ করে পদ্মর মুখের ওপর স্থির হয়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম কয়েক মুহূর্তের জন্য নার্ভাস হয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট—ছিরু পাল এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম কি করবে ঠিক করতে পারছে না।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে একটুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠে আসতে থাকে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম ভয় পেয়ে সরে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল এগিয়ে আসার সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্মর হাতে হঠাৎ একটা দেয়ালে গোঁজা দা-এর ছোঁয়া লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সে দা'টাকে শক্ত করে ধরে।

হঠাৎ দা'টা বার করে উচিয়ে তোলে পদ্ম

পদ্ম : না:!

কাট্ টু।

ছিরু হতচকিত হয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। যে কোন ঘটনা যেন ঘটাতে পারে সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল ভয় পেয়েছে। সে এক পা এক পা করে পেছনে সরতে থাকে। পরাজিত জন্তুর মত তারপর পেছন ফিরে দ্রুত চলে যায়।

কাট্ টু।

পদ্ম ঘটনার আকস্মিকতায় এতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করেছিল। এখন সে হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ে।

পদ্ম বারান্দায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। ভারি নিঃশ্বাস ফেলে দাটাকে দিয়ে এক কোপ মারে মাটিতে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৮

স্থান—গ্রামের এক চাষীর বাড়ী।

সময়—দিন, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি।

সমবেত উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে দেখা যায় একজোড়া বলদ একটা বাঁশের খুঁটির চারদিকে ঘুরছে। ধানের ছড়া দিয়ে উঠোনটা সাজানো।

কাট টু।

দৃশ্য—১৩৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্যামেরা চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আস্তে আস্তে ট্রলি করে এগিয়ে যায়। দেবু ছাত্রদের সেখানে পড়াচ্ছে।

দেবু (off voice) অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাসদাসী

ছাত্ররা (off voice) অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাসদাসী

দেবু (off voice) ক্ষতি নাই আমি নহি সে সুখপ্রয়াসী

ছাত্ররা (off voice) ক্ষতি নাই আমি নহি সে সুখপ্রয়াসী

দেবু আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে

ছাত্ররা আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে

দেবু নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে

ছাত্ররা নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে

দেবু : পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান।

সুধীর নামে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়ায়।

সুধীর : মাস্টার মশাই!

দেবু : কি রে?

সুধীর : আজ ইতু। আমাদের আজ হাফ-ইস্কুল হয় মাস্টারমশাই।

দেবু : ও! (একটু থেমে) আচ্ছা... যা!

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা উঠে পড়ে এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে চলে যায়। ছেলেদের পাশ দিয়ে একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে এগিয়ে আসেন বৃদ্ধা রাঙাদিদি।

রাঙাদিদি : এ্যাই!....এ্যাই!...এ্যাই!...আ মরণ!

চণ্ডীমণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসেন তিনি।

রাঙাদিদি : যেমন বজ্জাত ই ভাঙ্গাকালী....তেমনি ঐ গাঁজা-খেকো বুড়ো শিব! কতো বলি, আর ক্যানে,.... ইবার লে—লে আমাকে! তা লেবে? লেবে না ক'!

মণ্ডপে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে মুড়ো ঝাঁটাটি দিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করে।

রাঙাদিদি : ই বুড়ো বয়সে....বাপরে বাপ্....

দেবু : (এগিয়ে এসে) কি গো রাঙাদি! আজ যে এতো সকাল সকাল?

রাঙাদিদি : (চোখের ওপর হাত আড়াল করে) কে? দেবা?

দেবু : তোমার ঝাঁটার কথা আমি বলে দিয়েছি সতীশকে। কাল এসে নতুন ঝাঁটা দিয়ে যাবে।

রাঙাদিদি : দিইছিস! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক্! স্থাখ তো এটা দিয়ে হয়? (ঝাঁটাটি দেখায়)

দেবু : (হাসতে হাসতে) তবু তোমরা আছ তাই এখনো ঝাঁটপাট পড়ছে!... এরপর কি হবে?

রাঙাদিদি : ক্যানে? তুদের বৌরা এসে দেবে!....আমরা পারছি তো উয়া পারবে না ক্যানে? (তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে) নাকি চব্বিশ ঘন্টা স'গ্ দিয়ে কোলে বসায়ে রাখছিস—এঁ্যা?

কাট টু।

দৃশ্য—১৪০

স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা বিলুর ওপর থেকে ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় সে

হাতজোড় করে ইতুর পুজো করছে। পাশে পদ্ম বিলুর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে। দুর্গাকে দেখা যায় একটু দূরে বসে।

বিলু : "অষ্ট ধান অষ্ট দুব্বা কলমিপাত্রে থুয়ে
শোন্ রে ইতুর কথা প্রাণমন দিয়ে
ইতু দেন বর
ধনে ধান্যে পৌত্রে পুত্রে বাড়ুক তোর ঘর।"

বিলু পাঁচালী গায় আর পদ্ম ও দুর্গা উলু দিয়ে মাটিতে মাথা নীচু করে প্রণাম করে।

দুর্গা : গড করো, গড় করো ভালো করে! আমার তো আর করে লাভ নাই, আসচে জম্মে কেউ আমাকে একটা সোয়ামী ধার দিয়ো বাপু।

দেবু বইখাতা আর বেত হাতে নিয়ে উঠোনে ঢোকে। দুর্গা তার দিকে তাকায়।

দুর্গা : হেই মা!....জামাই পণ্ডিত!

কাট্ টু।

পদ্ম দেবুকে দেখেই চমকে যায়। ঘোমটায় মুখ আড়াল করে উঠে দাঁড়ায়।

দুর্গা : উ কি? উঠলে কেনে?

দেবু পদ্মকে দেখে।

দুর্গা : (পদ্মকে) বোসো দিকি! কেউ কিচ্ছু বুলবে না! উ—। আমি নে'সচি সঙ্গে ক'রে...বুল্লেই হল!

হাসি হাসি মুখ নিয়ে দুর্গা দেবুর কাছে আসে।

দুর্গা : গিয়ে দেখি, গোঁজ হয়ে বসে আচে ঘরে।....কি? ....না, পুজোর দিন—কথা শুনবে কোথা? পালের বাড়ী হয়—সেখানে তো যায় না!...তা আমি বুল্লাম—ঠিক আছে। আমার বিলুদিদি আচে,...চল সেখানে! তা বলে, বাপ্ রে! পণ্ডিতের বাড়ী আমি যাবো না।

বিলু : তা কি করবে? সেদিন পুজো নিয়ে যা কাণ্ডটা হল!

দেবু : শুধু কাণ্ডটাই দেখলে। দোষটা দেখলে না?

দুর্গা : (হাত নেড়ে) এটা কিন্তু তোমার যুগ্যি কথা হল না জামাই পণ্ডিত!

দেবু : কেন?

দুর্গা : আচ্ছা, মানলাম না হয় কম্মকার মুখ্যু....না হয় কম্মকারেরই সব দোষ।....কিন্তু সেই দোষে তুমি (পদ্মকে দেখিয়ে) ওর পুজোটা ফিরিয়ে দিলে কোন্ মুখে?....বচ্ছরকার পুজো?....বলো!... তুমি তো পণ্ডিত!...বুকে হাত রেখে বলো! কাজটা তোমার ঠিক হয়েছে—বলো বলো...কি?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু উত্তর দিতে পারে না।

কাট্ টু।

দুর্গা : কি? এখন কথা নাই কেনে?

কাট্ টু।

দেবু কথায় হেরে যায়। চোখ নামিয়ে নেয়।

বিলু : (off voice) ওমা!...ওকি!

দেবু সেদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

বিলু ক্রন্দনরত পদ্মর দিকে এগিয়ে যায়।

বিলু : কি হয়েছে?

পদ্ম চোখ মোছে।

দুর্গা : কান্ছ কেনে?

কাট্ টু।

নীরবে পদ্ম তার চোখ মোছে।

কাট্ টু।

দেবু পদ্মর দিকে তাকায়, সে কিঞ্চিৎ অভিভূত। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারে না। তারপর ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—

দেবু : কেঁদো না মিতে বৌ,....ভুল আমারই!....আমি নিজে গিয়ে অনির কাছে,.. ওকে বসতে বল্ দুর্গা। .. জল না খাইয়ে ছাড়িস্ নে—

দুর্গার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দুর্গা : বা রে! আর আমার কথা বুল্লে না যে!... (বিলুকে) দেখেচ, আমার জলখাবারের কতা বুল্লে না!

দেবু : তোর আবার ভাবনা কি? তোর তো দিদিই আছে!

দুর্গা : উঁহু,....টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি, দিদির চে দিদির বর ইষ্টি! তুমি নিজের মুখে একবার আদর ক'রে বলো।

দেবু : ফাজিল—

দেবু বারান্দার দিকে যেতে উদ্যত হয়, এমনি সময় দূরে বাইরে ঢ্যাড়া পেটানোর শব্দ শুনে সকলে দরজার দিকে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৪১

স্থান—দেবুর বাড়ীর সামনেকার গ্রাম্য রাস্তা।

সময়—দিন।

সেটলমেন্ট অফিসের একজন পিওন কর্মচারী গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে একজন ঢাক-পিটিয়ে।

পিওন : এতদ্বারা সর্বসাধারণকে লুটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ২২শে পৌষ ১৩৩২ হইতে এই গ্রামে সার্ভে সেটলমেন্টের খানাপুরীর কাজ শুরু হইবেক—।

দৃশ্য—১৪২

স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দরজার কাছে দেখা যায় দেবু, দুর্গা, পদ্ম ও বিলুকে।

বিলু : কি ?···কি শুরু হবে বলছে ?

দেবু : খানাপুরী···সরকার থেকে যার যার জমির মাপজোক···কিন্তু—

কাট টু।

দৃশ্য—১৪৩

স্থান—পুরোন চণ্ডীমণ্ডপ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরার সামনে থেকে সেই সেটলমেন্ট অফিসের পিওন-কর্মচারী, ঢাক-পিটিয়ে আর একদল বাচ্চারা সরে যায়।

পিওন : অতএব পেত্যেক জমির মালিকগণকে নিজ নিজ জমিতে উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সম্বন্ধ দেখাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেক—

ক্যামেরা প্যান করে দেখায় চণ্ডীমণ্ডপের একটা খুঁটিতে ঐ মর্মে একটা নোটিশ লাগানো রয়েছে। একদল গ্রামবাসী সেটি দেখছে। জগন ডাক্তার এগিয়ে আসে।

জগন গুষ্টির পিণ্ডি হইবেক! ·ঠাকুরমার ছেরাদ্দ হইবেক! ··ইয়ার্কি!···মামদোবাজী!

মুকুন্দ মাঠে এখনো ধান···সবে পাক ধরেচে এর মধ্যে ওরা যদি ওপর দিয়ে শেকল টেনে নিয়ে মাপজোক করে—

জগন থামেন তো!···শেকল অমনি টানলেই হল, না ? মগের মুলুক! আজই দরখাস্ত করছি কালেক্টারের কাছে—

কাট টু

দৃশ্য—১৪৪

স্থান—খিড়কি পুকুরের কাছে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পাল আর দাসজী মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। দূরে দেখা যায় সেটলমেন্টের কর্মচারী, ঢাক-পিটিয়ে, লোটন ও বাচ্চার দল যাচ্ছে।

দাসজী : (দাবার চাল দিতে দিতে) তা বেশ, সেটেলমেন্টের আগেই হয়ে যাক্! কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো ?···এ্যাদ্দিনের বাপুত্তি নামটা—

ছিরু : না না, ওসব পাল ফাল আর চলে না। একেবারে হেলে-চাষার গন্ধ। তার চাইতে··"ঘোষ"·· "শ্রীহরি ঘোষ"·· কেমন মানায় বলুন দিকি ?

দাসজী : তা যদি বল্লে তো!—

হঠাৎ সে অন্য কি যেন দেখতে পায়।

দাসজী : কে হে ? · দুগ্‌গোর সঙ্গে উটি কে ?

কাট টু।

দৃশ্য—১৪৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

দাসজীর পার্সপেক্‌টিভে লং শটে দেখা যায় বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে দুর্গা আর পদ্ম ক্যামেরার দিকে পেছন করে হেঁটে যাচ্ছে। দুজনের হাতেই কলার পাতায় মোড়া প্রসাদ।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৬

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও দাসজী দুজনেই দূরে পদ্ম ও দুর্গার দিকে তাকিয়ে আছে। ছিরু পালের চোখে কামনার আলো।

ছিরু : কামার বৌ।

দাসজী : উঁ ?

ছিরু : অনিরুদ্ধর পরিবার।

দাসজী : তা দুগ্‌গোর সঙ্গে ঘোরে কেন ?

ছিরু : কি করে জানব বলেন ?·· পরচিত্ত অন্ধকার।

দুজনেই আবার পদ্মর দিকে তাকায়।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৭

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

ক্লোজ, লো অ্যাঙ্গেল শটে ধীরে ধীরে পদ্ম ক্যামেরা থেকে সরে যায়। দুর্গাও।

কাট টু।

দৃশ্য—১৪৮

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

দুর্গাকে নিয়ে পদ্মর যাবার পথে তাকিয়ে আছে ছিরু পাল আর দাসজী। ক্যামেরা চার্জ করে ছিরু পালের ওপর।

দাসজী : বা বা বা!···এ যে ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল হে ··আঁ্যা?

এফেক্ট মিউজিক শোনা যায়। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে ছিরু পালের মুখের ওপর।

এফেক্ট মিউজিক জোরালো হয়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৪৯

স্থান—পদ্মর ঘর।

সময়—রাত্রি (যে কোন সময়)

দ্রুত কতগুলি কাটা কাটা শটে দেখানো হয় ছিরু পাল পদ্মকে ধর্ষণ করছে। ছিরু পালের অবচেতন মনের ইচ্ছে।

একটা ধারালো কাটারি দেখা যায় ফোরগ্রাউণ্ডে।

পদ্ম : নাঃ

পদ্ম কাটারি হাতে ছুটে আসে ক্যামেরার দিকে, তারপর চীৎকার করে ওঠে—

পদ্ম : নাঃ নাঃ

কাট টু।

দৃশ্য—১৫০

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পালের চমক ভাঙে।

দাসজী : (ছিরুর ভাবান্তর লক্ষ্য করে) কি হল?

ছিরু : আঁ্যা?··না····

দাসজী : ওগ্ গোকে দিয়ে (চোখ টিপে)··একবার দেখবে নাকি?

ছিরু : (ভ্রূকুটি করে) নাঃ! ও হারামজাদীকে আর বিশ্বাস নাই।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

পদ্ম আর দুর্গা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক-মুঠো ধুলো আউট ফ্রেম থেকে কেউ ছুঁড়ে দিতেই ক্যামেরার ফ্রেম ঢাকা পড়ে।

দুর্গা : (মুখ ঢেকে) এ্যাই!···কে রে!

উচ্চিংড়ে : হুই—!

দুর্গা : এ্যাই ছোঁড়া! যা, ভাগ্ বল্‌চি।

উচ্চিংড়ে : (আবার ধুলো উড়িয়ে) হুই—!

দুর্গা : তবে রে!···দাঁড়া তো দেখাইছি মজা—

দুর্গা আশপাশে একটা কঞ্চির খোঁজে তাকায়। উচ্চিংড়ে ইতিমধ্যে মুঠো মুঠো ধুলো ছুঁড়ে নাচতে থাকে।

উচ্চিংড়ে : হুই—হুই—হুই····

পদ্ম : ছিঃ অমন করে না বাবা!···কার ছেলে তুই?

দুর্গা : আর কার?···ঐ তারিনী বাউণ্ডুলের!··দিনরাত পথে পথে·আর বজ্জাতি! যা ভাগ্!····ভাগ্ বলচি। (হঠাৎ চুল সরাবার জন্য কপালে হাত দিয়েই) ওমা!····আমার টিপ?

চারদিক তাকিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করে টিপ।

পদ্ম : ধুলো ছাড়্!···ধুলোয় বসে খেলতে নেই!

উচ্চিংড়ে : এঃ

পদ্ম : ছাড়্! মেঠাই দেব।

উচ্চিংড়ে : (সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে) কৈ, দে!

পদ্ম : ও মা! ঐ হাতে?····আগে আমার ঘর চল্। হাত ধুয়ে তবে তো?

উচ্চিংড়ে : (সন্দিগ্ধ মনে) না। মারবি।

পদ্ম : (হেসে) কে বুল্লে?···মারব না, চল্।····এই দ্যাখ্!

কলা পাতায় মোড়া প্রসাদটা দেখায়।

কাট্ টু।

দুর্গা ইতিমধ্যে টিপটা খুঁজে পেয়েছে। সেটি লাগাতে লাগাতে এগিয়ে আসে।

দুর্গা : ও মা! জোটালে তো?···এরপর রোজ গিয়ে জ্বালাতন করবে—তখন বুঝো। (উচ্চিংড়েকে) আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে!····চল!!

উচ্চিংড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাওয়ায় ধুলো ওড়াতে থাকে আর ওদের সঙ্গে চলে।

পদ্ম আর দুর্গা ছুটছে। ক্যামেরা পাশে পাশে চলে।

সেতার বাজনার শব্দ

পদ্ম : নাম কিরে তোর ?

উচ্চিংড়ে : (লাফাতে লাফাতে) উচ্চিঙ্গে।

পদ্ম : ও মা !....ও আবার কেমন নাম ?.. উচ্চিংগে ?

উচ্চিংড়ে : আমি খুব লাফাই তো ? দেখবি ?....এই গ্যাব্....

উচ্চিংড়ে লাফায়, আর দুর্গা ও পদ্ম তা দেখে হাসে।

পদ্ম : এ্যাই !.. পড়ে যাবি !....এ্যা-ই !

উচ্চিংড়ে ক্যামেরা থেকে সরে যায়।

Mixes into

দৃশ্য—১৫২

স্থান—যে কোন জায়গা।

সময়—রাত্রি।

আকাশে চাঁদ। আলোয় ঝলমল চারিদিক।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৩

স্থান—বায়েনপাড়ার পুকুর ও বাঁশ ঝাড়।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

পৌষ মাস, মাঠে ধান পাকা।

বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কানুনগো আর লোটন আসছে। ধুতি জামা মোজা জুতো পরায় কানুনগোকে ঠিক ফুলবাবুর মতোই দেখাচ্ছে।

ওরা দুজন ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কানুনগো : কৈ হে.. কোনদিকে.. কোনখানে ?...

লোটন : আপনি একটু দাঁড়ান।

এই বলে সে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৪

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা। দুর্গার মায়ের ঘরের পিছন।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

লোটন ফ্রেমে ইন্ করে দুর্গার মা'র ঘরের জানলার কাছে যায়।

লোটন : দুগ্‌গার মা !....দুগ্‌গার মা—

দুর্গার মা জানলার কাছে আসে।

দুর্গার মা : আর বোলো না বাপু। সন্জে থেকে এই নিয়ে তিনবার তাগাদা দিচ্ছি !....হারামজাদী মেয়া.... যাও, নিজে শুধোও ক্যানে

লোটন দুর্গার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৫

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা—দুর্গার ঘরের পিছন।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

লোটন ফ্রেমে ইন্ করে দুর্গার ঘরের জানলার দিকে যায়। জানলা বন্ধ।

লোটন : (ফিসফিসিয়ে) দুগ্‌গা.. দুগ্‌গা আছিস ?

দুর্গা : (off voice) কে ?

দুর্গা জানলা খুলে উঁকি দেয়।

লোটন : ঘরে কেউ আছে নাকি ?

দুর্গা : ক্যানে ?

কেউ যেন ভেতর থেকে দুর্গার হাত ধরে টানে। দুর্গা তাকে থামিয়ে দেয়, বলে—

দুর্গা : আরে উঁকি ?....ঐ গ্যাকো ! (লোটনকে) ক্যানে গো ?

লোটন : কঙ্কনা থেকে বাবু এসেছে। কানুনগোবাবু।

দুর্গা : কি বাবু ?

লোটন : ঐ সেটেলমেন্ হবে না ?.. তার বড়বাবু'

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৬

স্থান—পুকুর ও বাঁশ ঝাড়—বায়েনপাড়া।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় একলা দাঁড়িয়ে কানুনগোবাবু গায়ের মশা মারছে। লোটন ফ্রেমে ঢোকে।

কানুনগো : (আগ্রহভরে) কি ?

লোটন : নাঃ ! ঘরে লোক রইছে—

কানুনগো : (বিমর্ষ হয়ে) চচুঃ।....ম্যাসাগায় !

দৃশ্য—১৫৭

স্থান—দুর্গার ঘরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ ও দুর্গা আলিঙ্গনরত।

লো এ্যাঙ্গেল ক্লোজ কম্পোজিট শট্।

দুর্গা : তোমার লেগেই আমার সব লাটে উঠবে।

অনিরুদ্ধ : (জড়িত গলায়) উঠুক না।

দুর্গা : হেই মা। উঠুক না, তবে খাবো কি !

অনিরুদ্ধ : খাবি ?

দুর্বুদ্ধি আর দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় তার চোখে। দুর্গার ঠোঁটের দিকে নিজের ঠোঁট এগিয়ে আনে অনিরুদ্ধ। দুর্গা প্রতিবাদ করে—

দুর্গা : এ্যাই !… হ্যাৎ !…এ্যাই হ্যাকো !…এ্যা-ই !

অনিরুদ্ধর ঠোঁট ক্যামেরার আরও কাছে এগিয়ে এসে এক সময় লেন্স ঢাকা পড়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম রান্নার কাজে ব্যস্ত।

ভূপাল : (off voice) কম্মকার ! কম্মকার রইছ নাকি ?

পদ্ম দরজার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

ভূপাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূপাল : কম্মকার নাই ?

পদ্ম : (নীচু গলায়) ফেরে নাই এখনো—

ভূপাল : হ্যাকো দিকি !…উদিকে গোমস্তা শালা রোজ বুলবে—বসে বসে ভাত মারবার জন্যে মায়না দিচ্ছি তুকে ?…কম্মকারকে বুলো, কাল যেন একবার সেরেস্তাটা ঘুরে যায়।

পদ্ম মাথা নেড়ে আবার রান্নার কাজে যায়।

ভূপালও ফিরে যেতে যেতে গজরাতে থাকে।

ভূপাল : যার কথা ! ওপারের কামারশালও তো খোলে নাই ক' আজ !

পদ্ম ভূপালের শেষ ক'টা শব্দ শুনে কিঞ্চিৎ থমকে দাঁড়ায়। মুহূর্তখানেক কি যেন ভাবে, তারপর ওসব কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে গিয়ে বসে রান্নার কাজে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৯

স্থান—দুর্গার ঘরের বারান্দা, বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

এক হাতে লম্ফ ও অন্য হাতে অনিরুদ্ধকে ধরে ঘরের বাইরে আনে দুর্গা। অনিরুদ্ধ পূর্ণ মাতাল।

দুর্গা : এসো !….এসো !…

অনিরুদ্ধ : ক্যানে ?…আট্‌ থাকলে কি হত ?

দুর্গা : না !….অনেক হইছে !….উথানে যে একজন বাড়াভাত নিয়ে বসে আছে….তার ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম অনিরুদ্ধর জন্য একটা থালায় খাবার গোছাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের বাঁশ ঝাড়।

সময়—রাত্রি।

এক হাতে লম্ফ আর অন্য হাতে মাতাল অনিরুদ্ধকে কোন রকমে সামলে নিয়ে আসছে দুর্গা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬২

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

ওরা দুজন ফ্রেমে ঢুকে থামে।

দুর্গা : যাও।

লম্ফটা নিবিয়ে দুর্গা তাড়াতাড়ি চলে যায়। অনিরুদ্ধ কম্পিত পায়ে এগিয়ে যায় বাড়ীর দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরার দিকে পিঠ করে মাতাল অনিরুদ্ধ বাড়ীর দরজা ঠেলে। দরজাটা খুলতেই দেখা যায় পদ্ম লম্ফ হাতে করে উঠোন থেকে এগিয়ে আসছে।

পদ্ম : ও মা ! কোথায় ছিলে গো ?….উদিকে ভূপাল চৌকিদার এসে—

হঠাৎ তার কথা থেমে যায়। বিস্ময়ে পাথরের মত কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম।

অনিরুদ্ধ : (off voice) কি ? কি দেখছিস ?

পদ্ম উত্তর দেয় না। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ঠোঁট কাঁপছে। সারা শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে শুরু করে।

অনিরুদ্ধ : (off voice) আরে ! অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস ক্যানে ?….পুতুল হয়ে গেলি….নাকি ?

কাট্ টু।

ক্যামেরা জুম্ করে অনিরুদ্ধ'র মুখের ওপর। দেখা যায় দুর্গার কপালের টিপটা তার চুলের মধ্যে আটকে রয়েছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কম্পমান পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কম্পমান পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : (ঝুঁকে পড়ে) পদ্ম!....পদ্ম!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৪

স্থান—কঙ্কনায় সেটল্মেন্ট অফিসের তাঁবু।

সময়—দিন, পৌষলক্ষীর আগের দিন।

নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তারিনীর লো এ্যাঙ্গেল শট্। তারিনী গাইছে।

তারিনী : এখন পীরিত্তির পরিণাম
এতদিনে বুঝিলাম
ভিখারি সাজিলাম, ছিল কপালে, পাগল
পাগল হইয়ে বন্ধু আমায় বানাইলে পাগল।

ক্যামেরা পেছনে সরে গিয়ে দেখায় বিরাট ধান ক্ষেতের মাঝে বেশ কয়েকটা তাঁবু পড়েছে সেটল্মেন্ট অফিসের। কানুনগো-মশাই একটি হেলান-চেয়ারে বসে, আর সব কর্মচারীরা ম্যাপ, চেন, অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে জমি মাপজোপের কাজে ব্যস্ত।

কানুনগো : বাঃ....বেড়েতো!...কি নাম?

তারিনী : এজ্ঞে তারিনীচরণ! দুটো পয়সা দেবেন বাবু, মুড়ি খাবার লেগে! কাল পৌষলক্ষী

কানুনগো : অমনি?

কানুনগো উঠে দাঁড়ায় ও একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয় তারিনীর দিকে, সেটা সে কুড়িয়ে নেয়।

কানুনগো : এই, শোন!

তারিনী : এজ্ঞে?

কানুনগো : (দূরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে) ঐ যে গাঁ-টা... ঐ-যে-রে, কাঁদর পেরিয়ে....কি যেন নাম?

তারিনী : এজ্ঞে শিবকালীপুর—উ আজ্ঞা আমাদের গাঁ বটে, শিবকালীপুর!

কানুনগো : (বিড় বিড় করে) অ! শি-ব-কা-লী-পু-র!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৫

স্থান—লং শটে শিবকালীপুর গ্রাম।

সময়—দিন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৬

স্থান—কঙ্কনার সেটেল্মেন্ট তাঁবু।

সময়—দিন।

কানুনগো দূরের গ্রামে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখটা জলজ্বল করে ওঠে। ধীরে ধীরে সে সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়।

কানুনগো : অ!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৭—১৭৪

স্থান—গাঁয়ের এক চাষীর বাড়ী।

ক্যামেরা পেছনে সরে এসে দেখায় পৌষলক্ষী উৎসব উপলক্ষে বিলু ও একদল গ্রামের বৌ ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে আর গান গাইছে।

"এসো পৌষ, সোনার পৌষ
এসো আমার ঘরে,
বোসো আমার মা লক্ষী
এ ঘর আলো করে।
আয় জননীর পা ধোয়াই
চুল দিয়ে আয় পা মোছাই
জননীকে দিই সাজায়ে
আলতা সিঁদুরে।
ঢেঁকুস্ কুস্ ঢেঁকুস্ কুস্
তুলবে ঢেঁকি বোল রে
কানায় কানায় উঠবে ভরে
লক্ষী মায়ের কোল রে
যেয়ো না যেয়ো না পৌষ
যেয়ো না ঘর ছেড়ে
পিঠে ভাতে সুখে রাখো
স্বামী পুত্তুরে॥

সীতায় ধান মেলেলো
ঐ কদমের তলেরে
লক্ষ্মী মায়ের কৃপাতে
ক্ষেতে সোনা ফলেরে।

এই গান চলার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি শটে দেখান হয় আলপনা দেওয়া পিঠে ভাজার দৃশ্য। আরও দেখানো হয় কানুনগো সাইকেল চেপে গ্রামের রাস্তা দিয়ে আসছে; পদ্ম একা বারান্দায় বসে আছে ইত্যাদি।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৫
স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ীর সামনের রাস্তা।
সময়—দিন।

কানুনগো সাইকেল চেপে ক্যামেরার দিকে আসছে। হঠাৎ সে দূরে কাউকে দেখতে পেয়ে থেমে যায়।

কাট্ টু।

খালি গায়ে একজন গ্রামবাসী কোদাল দিয়ে একটা নালা তৈরি করছে। ক্যামেরার দিকে পেছন।

কাট্ টু।

কানুনগো : এ্যাই! ওরে এ্যাই!··শুই!····

কাট্ টু।

খালি গায়ের লোকটা কানুনগোর দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় সে দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

কানুনগো : হ্যাঁ, তোকে তোকে! শোন্ শোন্, শোন্ না···

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত এই ব্যবহারে হতবাক। সে এগিয়ে এসে কানুনগোর সামনে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

কানুনগো : ইয়ে··তোদের ইদিকে বায়েনপাড়াটা কোন্ রাস্তায় রে?··ঐ যে···চারদিকে বাঁশবন····মশা! ····বায়েনপাড়া!

দেবু যারপরনাই বিস্মিত। কোন উত্তর দেয় না। এই অচেনা লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে চোখ বুলিয়ে নেয়।

কানুনগো : আ মোলো! অমন মরা মাছের মতো চেয়ে আছিস কেন? বোবা নাকি?

দেবুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কর্কশ উগ্র একটা সঙ্গীত খুব তাড়াতাড়ি জোরে বেজে যায়। দেবু সরাসরি কানুনগোর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—

দেবু : না!···কি বলবি বল্?

কথাটা ঠিক শুনতে না পেলেও কানুনগো দেবুর স্পর্ধা দেখে রেগে যায়।

কানুনগো : কি বললি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৬
স্থান—গ্রামের যে কোন জায়গা।
সময়—সন্ধ্যা।

পশ্চিমের আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সিল্যুট গ্রাম। শঙ্খ ধ্বনিত হয়। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ইন্ করে। গ্রামের মেয়েরা প্রদীপ হাতে চলেছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৭
স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে বাঁশ ঝাড়।
সময়—সন্ধ্যা।

অনিরুদ্ধ বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছে। দূরে পৌষ-লক্ষ্মীর গান শুনে একটু থামে, আবার চলতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৮
স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।
সময়—সন্ধ্যা।

একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বারান্দায় বসে আছে পদ্ম। তার দৃষ্টি শূন্য, শুকনো, ভাবলেশহীন।

অনিরুদ্ধ উঠোনে এসে পদ্মকে দেখে, চারদিকে চোখ বুলোয়। পদ্ম নিরুত্তর।

অনিরুদ্ধ : একি! বাতি জ্বালিস নাই? (তুলসীতলার দিকে চেয়ে) সন্ধ্যেও দিস নাই নাকি?

পদ্ম উঠে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে লম্ফটা নেয়।

অনিরুদ্ধ : (দাওয়ায় উঠে এসে) বলি ব্যাপার কি তোর? ····সাত কথাতেও রা' করিস না? দিনরাত কি ভাবিস এত?····কার কথা?

কাট্ টু।

পদ্ম তীক্ষ্ণভাবে রিঅ্যাক্ট করে।

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : এই তুই !....তুই-ই আমার লক্ষ্মী ছাড়ালি—বুঝলি ?

পদ্ম কি !!

অনিরুদ্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই তুই !! যখন ভ্যাখো, একেবারে উদাসিনী রাই হয়ে বসে রয়েছেন—পটের রানী ! আজ বাদ কাল পৌষলক্ষ্মী, কুনো খেয়াল নাই ! আর এই শোন্,... শোন্ অন্য বাড়ীতে কি হচ্ছে ?

দূর থেকে উলুধ্বনি ও পৌষের গান শোনা যায়।

পদ্ম : এতবড় কথা ! ·

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ হ্যাঁ, এতবড় কথা !....কোন্ পিত্যেশে ? কোন্ পিত্যেশে মানুষ এখেনে থাকবে ?·· কি দিছিস তুই আমাকে ? ··দিনরাত শুধু কবচ, তাবিচ আর মাদুলি। দূর্ দূর্, এর নাম সংসার ? ·· যদি বংশে বাতিই না জ্বললো তবে শ্মশান খারাপ কিসে ?

পদ্ম প্রায় ফ্যাকাশে চোখে তাকায় অনিরুদ্ধর দিকে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ হ্যাঁ শ্মশান শ্মশান ! বাঁজা বৌয়ের থেকে শ্মশান অনেক ভালো !

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকে যায়।

ক্যামেরা পদ্মর ওপর স্থির। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ। কয়েক মুহূর্ত শোকাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম। তারপর একবারে ভেতর থেকে গভীর ক্ষোভে দুঃখে চাপা রাগে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে।

পদ্ম : তবে, তবে তাই হোক্....তাই হোক্ · (হঠাৎ রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে) শ্মশানই হয়ে যাক্ সব—

রান্নাঘরে জ্বলন্ত উনুনের দিকে ছুটে যায় পদ্ম।

পদ্মর গলা শুনে অনিরুদ্ধ বিচলিত হয়। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

পদ্মর চলন্ত পা অনুসরণ করে ক্যামেরা। রান্নাঘরে উনুনের কাছে গিয়ে সে একটা জ্বলন্ত কাঠ বার করে নেয় উনুন থেকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : পদ্ম !

কাট্ টু।

পদ্ম : (উন্মাদের সুরে) শ্মশানের চিতেই জ্বলুক আজ থেকে—

পদ্ম ছুটে যায় বারান্দার কোণে এবং জ্বলন্ত কাঠটাকে গুঁজে দেয় খড়ের চালে।

অনিরুদ্ধ ছুটে যায় পদ্মর দিকে।

অনিরুদ্ধ : (বাধা দিয়ে) পদ্ম ! · পদ্ম কি করছিস ?

পদ্ম : ছেড়ে দাও ···ছেড়ে দাও আমাকে।

অনিরুদ্ধ : শোন্....শোন্ পদ্ম—

পদ্ম : ছাই হয়ে যাক্....শেষ হয়ে যাক্ সব কিছু—

অনিরুদ্ধর বাধা অগ্রাহ্য করে পদ্ম বারান্দার অন্য কোনে ছুটে যায়। অনিরুদ্ধ ওকে থামাতে চেষ্টা করে।

অনিরুদ্ধ : আরে পদ্ম, শোন্ শোন্—

পদ্ম : বলছি তো ছেড়ে দাও আমাকে—আমার মাথার ঠিক নেই—

অনিরুদ্ধ : (ধমকে) পদ্ম, কি করছিস !!

পদ্মর হাত শক্ত করে ধরে থাকে অনিরুদ্ধ। আর ঠিক তখনই খুব নীচু স্বরে উচ্চিংড়ের নাকি-কান্না শোনা যায়।

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় উচ্চিংড়ে উঠোনে দু'জনকে ঝগড়া করতে দেখে বারান্দার কোণে গিয়ে বসেছে। তার চোখ জলে ভর্তি। ভয়ও পেয়েছে সে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম উচ্চিংড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে : খিদে নেগেচে !....দুটো খেতে দে কেনে ?

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে : দুটো খেতে দে !·· খিদে নেগেচে !

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম। ক্যামেরা ধীরে ধীরে পদ্মর মুখে চার্জ করে।

উচ্চিংড়ে : (off voice) এ্যাই ! · দে না !....দুটো খেতে দে !

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে কাঁদতে শুরু করে।

কাট্ টু।

ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা মৃদু সুর বেজে ওঠে। পদ্ম জ্বলন্ত কাঠের টুকরোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে তার হাতটা নীচে নামে।

কাঠটা পড়ে যায়। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে। কাঠের আগুন যায় নিভে।

বি—র—তি

ফেড্ আউট।

(পরবর্তী অংশ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 July 1979 Vol. 12 No. 10

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowring
Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANI

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

১৯১৯
১৯৭৯

সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের
ষাট বছর

জনগণই আমাদের শক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত মজুররা বিধিসঙ্গত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা 'অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ় সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুত সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণআন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ষাট বছর"

১৯১৯ সালের ২৭শে আগস্ট সোভিয়েত রাষ্ট্র চলচ্চিত্র শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঐতিহাসিক আদেশনামায় স্বাক্ষরকারী ছিলেন লেনিন। লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে "সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ"।

লেনিনের ঘোষণাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের মহান আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা শুধু জীবনের সত্যরূপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্ব ও গতি-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে সর্বহারা শ্রেণীর নতুন শিল্পবোধের সৃষ্টি করলেন। এই নূতন শিল্পবোধের মূল ভিত্তি হ'ল শ্রেণীচেতনা ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্খা।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পতাকাবাহী সোভিয়েত চলচ্চিত্র নিরলসভাবে বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা ও প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলো। দেশের শিল্পায়ন, কৃষিতে সমবায় খামারের প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম ও সাফল্য চলচ্চিত্রায়িত হতে থাকলো। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ ও চলচ্চিত্র কর্মীরা সোভিয়েত ছবি দেখে উৎসাহিত হলেন।

ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই-এর দিনগুলিতে বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ সোভিয়েত ছবি দেখে উদ্বুদ্ধ হলেন।

বিশ্বযুদ্ধের পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞ সোভিয়েত চলচ্চিত্রে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হল।

আজকে তাই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আমরা স্মরণ করতে চাই কুলেশভ, ভের্তভ, আইজেনস্টাইন, পুডোভ্‌কিন, ডভঝেঙ্কো, ডনস্কয় ও অন্যান্য মহান চলচ্চিত্রকারদের যাঁরা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শবাহী হাতিয়ার হিসেবে।

বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে মহত্তম ভূমিকায় অধিষ্ঠিত সেই সোভিয়েত চলচ্চিত্র আমাদের প্রেরণার মত কাজ করুক—সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুধু একথাটিই বলছি।

"আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যের পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন বিভাগে হস্তান্তর সম্পর্কে"

১। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য, এই শিল্প ও বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠন এবং কারিগরী উপায় ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও পরিবেশন পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন-এর উপর ন্যস্ত হবে।

২। এই বিষয়ে পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশনকে এতদ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে: (ক) সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল ইকনমি-র অনুমতি অনুযায়ী বিশেষ কোন আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয়করণ করা, (খ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বা দ্রব্যাদি দখল করা; (গ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্পের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্থির ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা, (ঘ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্প ও বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করা, (ঙ) বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনামা ঘোষণা করে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করা, যে নির্দেশনামা এই শিল্প-সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ এবং সোভিয়েত সংগঠনগুলির প্রতি বাধ্যতামূলক হবে।

চেয়ারম্যান অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশার্স
ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

একজিকিউটিভ অফিসার অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশার্স
ভল্যাড বনচ ব্রুয়েভিচ্

মস্কো, ক্রেমলিন
২৭শে আগস্ট, ১৯১৯

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া,
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে লেনিনগ্রাডের কাছে রেপিনাতে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র বসেছিল। উপলক্ষ্য ছিল ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। আলোচনার বিষয়ঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'Soviet Film' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে এই আলোচনার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্রবীক্ষণেও এর আগে এই আলোচনাগুলির কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই আলোচনাগুলি আমরা প্রকাশ করছি।

চলচ্চিত্র-শিল্পের নতুন দর্শন

জর্জি স্টয়ানভ-বিগর (বুলগেরিয়া)

অনুবাদঃ রবীন ভট্টাচার্য

সমগ্র মানব-ইতিহাসে মহান অক্টোবর-বিপ্লব এক অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয় ঘটনা। এই বিপ্লব অসম্ভব গতিশীল, এই বিপ্লব শুধু ধ্বংস ও বর্জনে সীমিত নয়, বরং ব্যাপ্ত মহান সৃজনশীলতায়, সমগ্র মানবজাতিকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করায় এবং ব্যক্তি ও সমাজ-সম্পর্কে নতুন ও প্রগতিশীল আদর্শের ঘোষণায়।

আমরা যখন ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সিভিল ওয়ার সম্পর্কিত তথ্যচিত্রগুলি দেখি, তখন আমাদের বিশ্বাস হয়না যে, ছবিগুলি অর্ধশতাব্দী আগে তোলা।

...পেট্রোগ্রাড ও মস্কোর শ্রমিকদের উত্তাল মিছিল, লালফৌজবাহিত ট্রেনগুলি, গোলন্দাজবাহিনীর তরুণেরা, বিপর্যয়, ক্ষুধা, সেকালের পোশাক-পরা জনতা, সামান্য অস্ত্রাদিতে সজ্জিত, আবার ছুঁচালো টুপি, মেশিনগানের শকট, অশ্ব, বেয়নেট এবং এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে দেখা মুখের সারি, হাসি-খুশী অথবা বিষণ্ণ, আমরা আর তাদের দেখবনা।

আইজেনস্টাইন, ডের্টভ, ভ্যাসা.লয়েভ ভ্রাতৃদ্বয়, রম চলচ্চিত্র-পরিচালক হওয়ার আগে এ রকম দেখতে ছিলেন। আজকের অধ্যাপক, স্থপতি, শিক্ষাবিদ ও মহাকাশচারীদের পিতারা দেখতে এরকম ছিলেন, যাঁরা দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষকে উপেক্ষা করে, দেশের ভিতরের ও বাইরের চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করে বিপ্লবের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের মধ্যে সবাই এই বিপ্লব ও তার ফল অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এর বিপুল গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কার বাদ দিয়ে সমকালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

আমি আমার দেশ বুলগেরিয়া থেকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

কুড়ি দশকের গোড়ার দিকে প্রগতিশীল বুলগেরিয়ান সংবাদপত্র আর. এল. এফ. (ওয়ার্কার্স' লিটারারী ফ্রন্ট) বেশ কয়েকজন ইয়োরোপীয় লেখকের কাছে সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলেন। প্রখ্যাত প্রগতিশীল ফরাসী লেখিকা জেরমাইন দুলাক এই প্রশ্নমালার উত্তরে লিখেছিলেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অর্থ হচ্ছে চলচ্চিত্রশিল্পের মৌলিক আদর্শের নবজন্ম, যে আদর্শ ভাবালু কাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত ও বিনষ্টপ্রায়। জীবনের গভীরে প্রবেশের ছাড়পত্র সোভিয়েত ছবিগুলি অর্জন করেছে, এটাই তাদের সাফল্যের রক্ষাকবচ।

হেনরী বারবুসে বিশ্বাস করতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালকরা তুলনারহিত, কেননা তাঁরা কাহিনী ও দৃশ্যসজ্জায় জীবনের রং লাগাতে সক্ষম এবং সৃষ্টি করতেন এমন ছবি, যা গভীর উদার প্রেরণার উপকরণে জীবন্ত বাস্তব।

আমি এ প্রসঙ্গে আর কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত উপস্থিত করার প্রয়োজন দেখছিনা, কেননা তাঁদের বক্তব্য বহুবার প্রকাশিত হয়েছে ও বহুল প্রচারিত।

আমরা ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে[১] সোভিয়েত চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গে পুলিস ও ও সেন্সর কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্রের সারাংশ জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারি, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, শত্রুপক্ষও একভাবে সোভিয়েত ছবিকে প্রশংসা বা অভিনন্দন জানিয়েছে।

এটা নিশ্চয়ই ঠিক নয় যে, যে জার্মাণ কৌসুলী বিচারালয়ে এক অদ্ভুত প্রতিবাদী 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ছবিটি হাজির করেছিলেন তিনি শুধু আমাদের মতই বুঝতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প অন্যান্য দেশের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। তিনি দাবী করলেন যে, এই ছবিতে কিছু কিছু দৃশ্য রয়েছে যা সামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এমন কিছু দৃশ্য যেখানে বিদ্রোহের কথা আছে, যেখানে সাধারণ সৈনিকদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে দেখা যাচ্ছে। একজন বুলগেরিয়ান কৌসুলী আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন', 'মাদার', 'দি আর্থ', ও 'শ করস্' একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলেন।

'চ্যাপায়েভ' ছবিটি তেরবার সেন্সর করা হয়েছিল এবং অবশেষে চেনা যায়না এমন ক্ষত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। 'দি থার্টিন',

১ কুড়ি বা তিরিশ দশকে

'সার্কাস', 'ট্রাক্টর ড্রাইভার্স', 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কী', 'দি গ্রেট এম্পায়ার' ছবিগুলি সেন্সর কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে প্রায় একইরকমভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল।"

আমি বুলগেরিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশের কথা জানিনা যেখানে সোভিয়েত ছবি-প্রদর্শনের আগে প্রেক্ষাগৃহে পুলিসের নির্দেশ-অনুযায়ী পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘোষণা ছবির পর্দায় দেখানো হত :

"অনুগ্রহ করিয়া হাততালি দিবেননা।

এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হইলে ছবির প্রদর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে।"

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুলগেরিয়াতে একজন তরুণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন 'চ্যাপায়েভ' ছবিটি সাতবার দেখার অপরাধে। তরুণটির আশা ছিল যে, তিনি ছবির নায়ককে নদী অতিক্রম করতে দেখবেন, প্রতিটি সময় তাঁর ধারণা ছিল যে, এই আশা সার্থক হবে। তরুণটির কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলনা যে, ছবির নায়ক কমাণ্ডার এমন অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প আদর্শগতভাবে নতুন—এই ধারণার প্রমাণ এর চেয়ে ভালোভাবে উপস্থিত করা সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। এটা শুধু সুন্দর সম্পাদনা, অপূর্ব ফোটোগ্রাফি বা চলচ্চিত্রের কৌশলগত খুঁটিনাটির বিষয় নয়। ফ্যাসিস্ট পুলিস এই সমস্ত কিছু বুঝতনা। এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে সঠিকভাবেই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র-আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তাঁরা ভীত হয়েছিলেন সোভিয়েত ছবির বৈপ্লবিক স্বরূপ উদঘাটনে যে, বৈপ্লবিক সত্যের দর্শনে বুলগেরিয়ার শ্রমজীবী মানুষ শত সহস্র বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় যাঁরা মহান প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এই সোভিয়েত ছবিগুলি ছিল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। প্রতিরোধ-সংগ্রামে যোগ দিয়ে তাঁরা সোভিয়েত ছবির বীর নায়কদের নামে নিজের নিজের বাহিনীর নাম রাখলেন, যেমন কলকা, মুক্তাকা, ক্লিম, চ্যাপায়েভ...। এই অকুতোভয় সাহসী নায়কদের কথা মনে রেখে এই বীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করতেন এবং মৃত্যুর সময়ে তাঁদের এই বিপ্লবী আদর্শ অটুট ছিল।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারেরা বিবিধ দার্শনিক, নান্দনিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে ছবি করেছেন। নতুন অনুসন্ধান ও নতুন মূল্যায়নে এর সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন যে, সমস্যাবলী গ্রিফিথের ছবিতে পরীক্ষার বিষয় ছিলনা এবং যে সমস্যাবলী বর্তমানকালে বার্গম্যান বা গদারের ছবিতে অনুপস্থিত।

নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিকোণজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিতে প্রতিভাবান্ সৃজনশীল শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এবং যার থেকে অতুলনীয় সম্ভার, নতুন রীতি ও আঙ্গিক জন্মলাভ করেছে।

আজকে চলচ্চিত্রে নতুন ফরাসি-সাহিত্যের প্রভাবপ্রসঙ্গে বহু কিছু লেখা হচ্ছে, চলচ্চিত্রের ভাষা-পরিবর্তনে জয়েস্ বা কাফ্কার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, ডভ্‌ঝেঙ্কো যুদ্ধের পরে তাঁর শেষ চিত্রনাট্যে জয়েস্ বা কাফ্কার প্রভাব ছাড়াই ইউক্রেনিয়ান্ ধ্রুপদী সাহিত্য ও মায়াকোভাস্কীর রচনা অবলম্বন করে এক নতুন বিন্যাসে কাহিনীকে উপস্থিত করেছিলেন। কাহিনীর এই বিন্যাস, সময় ও স্থানের অবস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি কাহিনীর বিস্তার চৈতন্যবাদের প্রবাহে, চিন্তার সংলগ্নতায়; কথোপকথনে সমস্ত ক্রিয়াপদ ও ভাব ব্যবহৃত—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত ইত্যাদি।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে এ কথা সম্ভবতঃ বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই ঐতিহ্য এই সমস্ত দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে বুদ্ধিদীপ্ত, অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিল্পবোধের আলোকে নতুন সম্ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ও আমেরিকান চলচ্চিত্র

জে লীডা [আমেরিকা]

বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-জগতে এক কথায় সমগ্র বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম-অর্থবাহীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রনির্মাতা ও দর্শকদের কাছে সোভিয়েত ছবির যে কোন সাফল্য বা গৌরব ১৯১৭ সালের বিপ্লব সঞ্জাত ফল বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বাস্তবতার প্রতিফলনে আমেরিকান চলচ্চিত্র সাফল্য ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত ছিল। বায়োগ্রাফ কোম্পানীর হয়ে তোলা গ্রিফিথের দশ বা কুড়ি মিনিটের ছবিগুলি চলচ্চিত্রে বাস্তব উপকরণের সার্থক ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ, ফ্রান্সে ও ডেনমার্কে বাস্তব ঘটনাবলীর নাটকীয় উপস্থাপনা গ্রিফিথকে এই পথ অনুসরণে ও আরো সার্থক রূপায়ণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯১৮ সালে আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্প বিশিষ্ট ব্যবসায়ে পরিণত হল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ভূ-সম্পত্তি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী নীতি, নিয়ম ইত্যাদির উপর ক্রমাগত নির্ভরশীলতায় আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশঃ পদ্ধতি, কাহিনী এবং প্রযোজনার বিভিন্ন ছকে গণ্ডীবদ্ধ হতে শুরু করল। চলচ্চিত্রের অঙ্গন থেকে বাস্তবজীবন প্রায় নির্বাসিত হয়ে গেল। কখনো কদাচিৎ ফ্লাহার্তি, স্ট্রহিম বা চ্যাপলিনের মত উদ্ধত মহৎ শিল্পী এই প্রচণ্ড নির্ধারিত গণ্ডীবদ্ধ মেকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে স্বাভাবিক সতেজ, বাস্তবে প্রাণবন্ত, সৎ আবেগে উদ্ভাসিত ছবি তৈরি করতেন। ধনতান্ত্রিক জগতে সঙ্কট শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নতুন দুটি ঘটনা আমেরিকান ছবিকে বাস্তবের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল: সবাক ছবির শুরু এবং সাফল্য এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রের শিল্পগত সাফল্যের প্রভাব।

এই সময়ে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশী প্রদর্শিত সোভিয়েত ছবিগুলি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, হিংসা ও ব্যঙ্গ এ ছবিগুলিতে বিশেষভাবে বিধৃত। এই বিষয়গুলির উপস্থাপনা তৎকালীন চলচ্চিত্র-পরিচালকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে কারণেই পুডোভকিনের ছবি 'দি এণ্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' ছবিটির শিল্পপতির বীভৎস নিষ্ঠুরতার প্রতিফলন দেখা যায় এডওয়ার্ড জি, রবিনসনের ছোট সিজার চরিত্রে। তিরিশ শতকের বহু ছবির চিত্রনাট্য 'রোড টু লাইফ' ছবির দ্রুতগতিসম্পন্ন দৃশ্যাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

বাস্তবতার এই বন্যা এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে ছবি তোলা সূচিত করল যা এযাবৎকাল ফিল্ম কোম্পানীগুলির কাছে ছিল এক কথায় অস্পৃশ্য। কোম্পানীগুলি অনেক সময়েই মনে করেছিলেন যে, পরিচালকরা বেশীদূর এগিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের ছবির বক্তব্য তরল করে দেওয়ার জন্য তাঁরা সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রায়শঃই চাপসৃষ্টি করে পরিচালকদের আপোষে বাধ্য করতেন। এই তরলীকরণ ও আপোষ সত্ত্বেও ছবিগুলি একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায়না, জীবনানুগ বাস্তবের সুর এ ছবিগুলিতে কিছু পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই আমরা এগুলিকে আজও মনে রেখেছি। ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—'আই অ্যাম্ এ ফিউগিটিভ্ ফ্রম্ দি চেইন্ গ্যাং', 'ট্যাক্সি', 'টু সেকেণ্ডস্', 'কেবিন ইন্ দি কটন', 'ওয়াইল্ড বয়েজ অফ্ দি রোড্' ও 'মেয়র অফ হেল্'। এই বিষয় ও পদ্ধতি পরবর্তী ছবিগুলিতেও অনুসৃত যেমন 'বর্ডার টাউন', এবং 'ব্ল্যাক ফিউরি এণ্ড ব্ল্যাক লিজিয়েন'। শেষ ছবিটি আমেরিকার তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সংগঠন কু ক্লুক্স্ ক্ল্যানের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

কিছু কিছু পরিচালক বাস্তবতার অভ্যুদয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের সমগ্র প্রচেষ্টা এই ধারার অনুসারী করে তুললেন। প্রতিভাবান রাউবেন মামাউলিয়ান এঁদের মধ্যে অন্যতম। মামাউলিয়ান মস্কোর মঞ্চজগৎ থেকে নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। এই পালাবদলের সন্ধিক্ষণে তিনি চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করলেন এবং অসাধারণ বাস্তবানুগ ছবি তুলে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। তাঁর ছবি 'এ্যাপ্লজ' (১৯২৯) ও 'সিটি স্ট্রীটস্' (১৯৩১) সোভিয়েত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। কিং ভিদর এর আগেই জীবনানুগ বাস্তবতায় অনুরাগের জন্য চলচ্চিত্রশিল্পব্যবস্থার বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এই সময়ে তিনি কোন স্টুডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেননা। ১৯৩৪ সালে ভিদর স্বাধীনভাবে একটি ছবির প্রযোজনা করলেন। বেকার শ্রমিকদের একটি কৃষি-সমবায়-স্থাপনের ঘটনা নিয়ে তোলা এই ছবির নাম 'আওয়ার ডেইলি ব্রেড্'। এ ছবির বিষয়বস্তু একদিকে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অপরদিকে বেশ কিছু সোভিয়েত ছবিতে ব্যবহৃত আঙ্গিকগত পদ্ধতির ব্যবহার তুলে ধরল। আঙ্গিকগত এই পদ্ধতি বিশেষ করে তুরিনের 'তুর্কসিব' ও রেইজম্যানের 'দি আর্থ ইজ থার্স্টি' ছবিতে পরীক্ষিত। এমনকি, আইজেনস্টাইনের অসমাপ্ত ছবি 'কুই ভিভা মেক্সিকো' আমেরিকান ছবিতে দ্রুত ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। 'কুই ভিভা মেক্সিকো' 'ভিভা ভিলা' (১৯৩৪) ছবিটির মূল অনুপ্রেরণা যা পরবর্তী দুই দশক ধরে মেক্সিকোর বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল।

ইলিয়া ট্রউবার্গের 'ব্লু এক্সপ্রেস' ছবিটির কাহিনী নবরূপে অনূদিত হল আমেরিকান ছবিতে। জোসেফ স্টেনবার্গ ও প্যারামাউন্ট স্টুডিও এই কাহিনী পরিবেশনের মাধ্যমে মার্লিন ডিয়েট্রিশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলতঃ 'ব্লু এক্সপ্রেস' ছবির সমস্ত সামাজিক বাস্তবতা 'সাংহাই এক্সপ্রেস' (১৯৩১) ছবিতে অনুষ্ঠিত।

যখন এসথার শাব নির্দেশিত 'ক্যাননস্ অব ট্রাক্টরস্' ছবিটি আমেরিকায় পৌছাল, তখন এই শিল্পীর মতবাদ ও সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমেরিকান চলচ্চিত্র-সমালোচকদের আলোড়িত করল এবং গিলবার্ট সেল্ডেস যুদ্ধোত্তর যুগের আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরলেন তাঁর 'দিস্ ইজ্ আমেরিকা' (১৯৩৩) ছবিতে।

আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্পীদের সংযোগ ও যোগসূত্র শুধু আইজেনস্টাইন ও শাব, এক ও রেইজম্যান্ বা পুডোভ্কিন্ ও ট্রউবার্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই প্রথিতযশা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের অনিবার্য প্রভাব আমাদের যুগের আমেরিকান চলচ্চিত্র-পরিচালকদের প্রেরণাস্বরূপ। তুরিন বা ভের্টভের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির সমারোহের সময় রিচার্ড লিকক অত্যন্ত তরুণ, তবুও লিককের বর্তমান শিল্পপ্রতিভা বহুলাংশে এই প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের প্রেরণা-সঞ্জাত। জীবনানুগ বাস্তবতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ আর একজন আমেরিকান চলচ্চিত্রকার এলিয়া কাজান সম্প্রতি এক ফরাসী পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনে ডভ্ঝেঙ্কোর প্রভাব অপরিসীম, বিশেষতঃ ডভ্ঝেঙ্কোর 'এয়ারোগ্রাড' ছবিটি তাঁর শিল্প-ভাবনার আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-গত যোগসূত্র কোন যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কাজেই আমার আলোচনা যা তিরিশ দশককে কেন্দ্র করে করা হয়েছে নিঃসন্দেহে অসমাপ্ত ঃ অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েত চলচ্চিত্রে যেভাবে উদ্গত, সেভাবে আমেরিকার চলচ্চিত্র-শিল্পের সার্বিক কাঠামোয় বিপুলপ্রভাবে বিস্তারিত।

অক্টোবর বিপ্লব ও চলচ্চিত্র

ফার্নাণ্ডো বিরি [আর্জেন্টিনা]

চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি যে বইটি প্রথম পড়েছি সে বইটি হল আইজেন-স্টাইনের 'ফিল্ম সেন্স'। সে অনেক বছর আগের কথা। আমি তখনো আমার কৈশোরে, বাস করছিলাম এক গ্রামে (সান্তা ফে, আর্জেন্টিনা) কর্কটক্রান্তির সীমানায়। সেখানেই আমার জন্ম, সেখানেই আমি বড় হয়েছি এক ভীষণ বিরাট নদী পারানার তীরে। যে কোন তরুণের মত আমিও প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলাম—একদিকে প্রথমে স্কুলে ও পরে কলেজে আইন পড়াশুনা, অপরদিকে আমার সত্যকারের আকাঙ্ক্ষা একটা ভোজবাজিকর, ভবঘুরে বিদূষক ও জাদুকর হওয়ার তাড়নায়। আমি অবশেষে শেষেরটিই বেছে নিলাম। আমি নিজস্ব পুতুলনাচের দল খুললাম, 'ডন্ কুইক্সোট্' থেকে ধার করে দলের নাম রাখলাম ' দি ডেন অফ পেড্রো দি টিচার'। বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমি এই পুতুল-নাচের প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান করেছিলাম।

তারপর আইজেনস্টাইনের সেই বই যা আমি তাঁর ছবি দেখার অনেক আগেই পড়েছি, আমাকে চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট করল। আমি বলতে চাইছি যে, ছোটবেলা থেকেই আমরা ছবি দেখি, ছবি দেখতে আমাদের ভালো লাগে, তখন মনে হয়, যে ছবি সারা পৃথিবীর কথা বলছে, এমন সমস্ত ছবির সংগ্রহ যাতে সমস্ত পৃথিবীটা দেখা যায়। আইজেনস্টাইনের উপলব্ধি চলচ্চিত্রজগতের এক নূতন আবিষ্কার। সরল-ভাবে বলতে গেলে, যে চলচ্চিত্র-শিল্প সংস্কৃত ও প্রকাশ-মাধ্যমের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী, চলচ্চিত্র আদর্শগত উপাদানে সমৃদ্ধ ও দৃশ্যগত উপস্থাপনায় এক বৃহদাকার ফ্রেস্কোর অনুরূপ।

অনেক পরে, আমি যখন আইজেনস্টাইনের ছবি দেখলাম, দেখলাম ঠিক সেই বইয়ের মত ইতিহাস তার অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনে উপস্থিত।

বুয়েনাস এয়ার্সের ফিল্ম-ক্লাবে অনেক বছর বাদে আমি পুডোভ্কিন্ এবং ডভ্ঝেঙ্কোর ছবি দেখলাম। পুডোভ্কিন্ সম্পর্কে আমাকে আরো অনেক কিছু জানতে হল যখন আমি 'রোম এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টারে' হাতে-কলমে কাজ করছি। সেখানেই আমি পুডোভ্কিনের 'সিনেমা এণ্ড সাউণ্ড সিনেমা' পড়ি।

চলচ্চিত্র-শিল্প এক জায়গায় অচল, অনড় হয়ে থেমে থাকেনি, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর নব নব পরিবর্তন তুলে ধরে। কিন্তু আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন্ ও ডভ্ঝেঙ্কো অক্টোবর-বিপ্লবজাত 'নতুন চলচ্চিত্রের প্রতীক হয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন চলচ্চিত্রের জগতে স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক ও জীবন্ত প্রেরণা হয়ে আজও অমলিন, আজও উজ্জ্বল।

অক্টোবর বিপ্লব ও মঙ্গোলীয় চলচ্চিত্র

চোইকিলিন চিমিদ [মঙ্গোলিয়া]

পঞ্চম মস্কো চলচ্চিত্র-উৎসব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে আমরা শুধু বিশেষ জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কীর্তির স্বাক্ষরই দেখলামনা, দেখলাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের অতুলনীয় বিপুল প্রভাব। এই উৎসবের উদ্দেশ্য 'চলচ্চিত্রশিল্পে মানবতা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও শান্তি'; এই উদ্দেশ্য বিপ্লবের আদর্শের অনুরূপ। বহু সভা-সমিতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে যোগদানের মাধ্যমে আমার ধারণা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষ আমাদের দেশের অধুনা অতীত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, কিন্তু, তাঁরা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবেও অবহিত নন।

এই উৎসবের সময়ে ১১ই জুলাই আমাদের দেশের মঙ্গোলীয় জনগণ বিপ্লবের ৪৬তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করছিলেন। মঙ্গোলীয় জনগণের বিপ্লব প্রত্যক্ষভাবে অক্টোবর বিপ্লবের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত।

বিপ্লবের সাফল্য শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনই সূচিত করলনা, জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ ও সমগ্র জনগণের সংস্কৃতিতে প্রবেশের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

বিপ্লবের পূর্বে মঙ্গোলিয়াতে কিছু কিছু ছবি সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে দেখানো হত। এ সমস্ত ছবির দর্শক ছিলেন রুশ-প্রভাবাধীন কিছু কিছু সামন্ত-অধিপতি। কিন্তু, বস্তুতঃ, ২০ দশকের শেষ দিক ও ৩০ দশকের গোড়ার দিক থেকেই বৃহৎ জনসমাজে নিয়মিতভাবে সোভিয়েত নির্বাক ছবির প্রদর্শনী শুরু হল।

এই ছবির মানুষ ও জীবনের সঙ্গে নিজেদের বহু পার্থক্য থাকলেও মঙ্গোলীয় জনগণ এ ছবিগুলির মধ্যে নিজেদের চরিত্র ও জীবনের কিছুটা প্রতিরূপ খুঁজে পেল।

১৯৩৬ সালে 'সন অফ মঙ্গোলিয়া' ছবিটি মুক্তিলাভ করল। মঙ্গোলীয় কাহিনী ভিত্তি করে ইলিয়া ট্রটবার্গ এ ছবিটি তুললেন, এ ছবিতে অনেক মঙ্গোলীয় অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন। ত সেন্ডেন নামে এক যাযাবর উপজাতীয়ের কাহিনী প্রসঙ্গে এ ছবিতে জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ও মহান সৃজনশীল ক্ষমতার উত্তরণের আখ্যান বিধৃত।

ছবিটি সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার নতুন চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রথম যৌথ-প্রযোজনা। ১৯৩৫ সালে মঙ্গোলিয়াতে প্রথম স্টুডিও স্থাপিত হল। সঙ্গত কারণেই প্রথম দিকে তথ্য-চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এই স্টুডিওর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র জনগণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে ছবি তোলা শুরু হল। নতুন মানুষ, তার জন্ম, জীবিকা ও সামগ্রিক উন্নতি অর্থাৎ নতুন জীবনের প্রাণস্পন্দন স্পন্দিত হল মঙ্গোলিয়ার চলচ্চিত্রে এবং বস্তুতঃ সামগ্রিক সংস্কৃতিতে।

১৯২৫ সালে মঙ্গোলিয়ার বুদ্ধিজীবীরা ম্যাক্সিম্ গোর্কীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোন কোন ইয়োরোপীয় পুস্তক তাঁরা মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ করবেন। উত্তরে ম্যাক্সিম গোর্কী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তাঁরা যেন এমন সমস্ত বই বেছে নেন, যাতে ঘাত-প্রতিঘাত আছে, প্রচণ্ড চিন্তা-ভাবনা আছে ও যাতে সচল স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কারিগরি ও বিভিন্ন সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প গড়ে তুলেছি। আমাদের চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষালাভ করেছেন এবং সোভিয়েত পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানদের সহযোগে বহু মঙ্গোলীয় কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। প্রখ্যাত সোভিয়েত-চলচ্চিত্রকার ইউরি টারিচ সপ্তদশ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত মঙ্গোলীয় দেশপ্রেমিকের জীবনী নিয়ে বিরাট ছবি-নির্মাণে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। ছবিটি হল 'হিরোজ্ অফ্ দি স্টেপ্' (১৯৪৫)। বর্তমান বছরে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এক্সোডাস্' নামে ওয়াইড্ স্ক্রীনে ছবি তুলেছি।

যৌথ-প্রযোজনার ছবিগুলি খুবই জনপ্রিয়, যেমন 'হিজ্ নেম্ ইজ্ সুখে-বাতোর' (১৯৪২, পরিচালক-আলেকজাণ্ডার জারখি, ইয়োসিফ হেইফিটজ্). 'এনভয় অফ্ দি পীপ্ল্', ও 'দোজ্ গার্ল', এল্, ভান্গানের চিত্রনাট্য-অবলম্বনে দু'খণ্ডে তোলা 'ওয়ান্ অফ মেনি' ('টেইল্ অফ্ এ ম্যান্'), ছবিতে একাধারে সৈনিক ও শিক্ষক এমন একজন সাধারণ যাযাবর উপজাতীয় মানুষের কাহিনী নিয়ে তোলা, 'সিন্স্ অ্যাণ্ড ভার্চু্স' (পরিচালক এন্ চিমিড-অসর্) ও 'হাই ওয়াটার' (পরিচালক ডি. ঝিয়েঝিড্)। এঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

মঙ্গোলীয় ছবিগুলি জীবনের বাস্তব প্রতিফলনে সমৃদ্ধ, বিবিধ আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিল্পসম্মত নব নব সৃজনশীলতায় সজীব। মঙ্গোলীয় অভিনেতারা সংযত, অথচ সার্থক অভিনয়ে নিজেদের অভিনয়-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন।

আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশঃ উন্নতির পথে। নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে (প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন কোন-না-কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণরত), বহু নতুন চিত্রগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন আরো বেশী ও আরো ভাল ছবি। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-পরিচালকদের এখন আশু কর্তব্য হচ্ছে জনগণের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করা এবং সেই জীবনের চিত্র সার্থকভাবে প্রকাশ করা। নতুন বিষয়গুলি যেমন শিল্পায়ন, গ্রামাঞ্চলে সমবায়-মূলক খামারের সাফল্য ও নতুন সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চিত্রায়ণ চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত করতে হবে। আমাদের দেশ এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে এসেছে, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, মাঝের ধনতন্ত্রের স্তর পেরিয়ে এসেছে। এই বিপুল ও মৌলিক পরিবর্তনের আলোকে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও জনগণের জীবনের মূলসূত্র-অনুধাবন আজকে মঙ্গোলীয় চলচ্চিত্রের আশু কর্তব্য।

অক্টোবর বিপ্লব এবং যুগোস্লাভ চলচ্চিত্র

স্টেভো অস্টোজিক ও রুডলফ্ স্রেমেক্

১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুগোস্লাভ জনগণের হাজার হাজার প্রতিনিধি ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতারা। প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আমাদের "চাপায়েভাইটস"-দের সংগ্রাম বিপ্লবের ইতিহাসে এক মহান অধ্যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারা এবং তার সাফল্য প্রগতিশীল ও স্বাধীন শিল্পী এবং সাংবাদিকদের ওপর এনেছে এক বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া।

ঝিভকোভিচ রাজত্ব শেষ হওয়ার পর অবশেষে আমরা দেখতে পেলাম নিকোলাই একের ছবি "দি রোড টু লাইফ"। এরপরই চলচ্চিত্রপ্রেমীরা দেখলেন গ্রিগরি আলেকজান্দ্রভের কমেডিগুলো। তারপর এলো আবার বন্ধ্যা দশা। তখন চলছিল জেভটিক-কোরোসেক-সিভেটকোভিক—স্টোজাডিনোভিকদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব। কিন্তু, অবশেষে একটি সময় এলো। যখন লুবজানার প্রথমশ্রেণীর ম্যাটিকা সিনেমা দেখালো ভ্লাদিমির পেট্রভের পিটার দি গ্রেটের দুটি অংশ। এই ছবির প্রদর্শনীর পরই ধর্মীয় এবং ফ্যাসিবাদী ছাত্ররা "স্ট্রেজ ভ ভিহাজু" পত্রিকার সঙ্গে মিলে সোভিয়েতবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল (এই বিক্ষোভকে তাদের নির্দয়ভাবে সাহায্য করেছিল পুলিস)।

একই সময়ে দেখা গেল ঝাগরেবে নিকোলাই একের ছবিকে প্রচণ্ড সফল হতে। টুসকানেক-এ উরানিয়া সিনেমাতেও পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখানো হয়েছিল। এমনকি বেশ কিছু লোক মেঝেতে বসে ছবিটি দেখেছিল।

সস্তা মিঠে প্রলোভনের ছবির বন্যায় বিরক্ত হয়ে এক সাংবাদিক "নাসা স্টভারনস্ট" পত্রিকার ১৯৩৭ সালের পঞ্চম সংখ্যায় লিখেছিলেন 'আমাদের "চাপায়েভ", "দি ইউথ অফ ম্যাক্সিম," "উই আর ফ্রম ক্রনস্টাডট" দেখান'। এটাকে কিন্তু শুধু দুঃখজনক অসার আবেদন ভাবলে ভুল করা হবে। বরং, এটা ছিল সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড বিরক্তির অভিব্যক্তি। "তিনি লিখেছিলেন, ক্যামেরা ইতিমধ্যেই মস্ত মিথ্যেগুলোর বড় অংশ দেখিয়ে ফেলেছে সবরকমের অসার উপায়ের মধ্যে দিয়ে। গত তিন দশক ধরে ক্যামেরার সামনে মিথ্যের তালগোল পাকিয়ে হাজার হাজার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সব ছবি করিয়ে যে চায় ঐ হাজারো চোখকে অন্ধ করে দিতে। কিছু কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত ছাড়া জীবন তার সব বাস্তবতা নিয়ে অনুপস্থিত। কিন্তু, দেখে, মনে হয় এরা বোধ হয় জানেনা, একটা মহান অলৌকিকতা অপেক্ষা করছে। একটি সর্বশক্তিমান চোখ আছে যে আসল ঘটনাকে মনে রাখতে পারে, ধরে রাখতে পারে, আর সেই সঙ্গে দেখাতেও পারে জনগণ কেন অসুখী।'

"ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" প্রথম আমদানী করে যুগোস্লাভিয়া। তখনকার সার্বস, ক্রোট্স এবং স্লোভেন্স রাজত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমস্ত রকম সতর্কতা সত্ত্বেও আইজেনস্টাইনের এই বৈপ্লবিক ছবিটি মস্কোর বলশয় থিয়েটারে উদ্বোধনের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই আমাদের দেশে আনা হয়েছিল।

১৯২৬ সালের ৯ আগস্ট ঝাগরেবের সংবাদপত্র "ভিসার" লিখল, "এই সিজনের গোড়ার দিকে ঝাগরেবে "ব্যাটলশিপ্ পোটেমকিন্" নামে অসাধারণ একটি ছবি দেখানো হবে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এটা শুধু ইতিহাসের চলচ্চিত্রায়ন। কিন্তু এটা তা নয়। বরং, নিপীড়িত জনগণের স্বাধীনতা এবং মানবিক অধিকারের সব থেকে আদিম এবং স্বাভাবিক

হচ্ছে এটি একটি মহান কবিতা। "ব্যাটল্‌শিপ্‌ পোটেম্‌কিন্‌" একটি সম্মিলিত কাজ এবং এর প্রধান চরিত্র জনগণ।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন এক অপরিচিত ২৮ বছরের যুবক। এই রুশ ছবির গভীরতার পরিমাপ হবে কিভাবে? এই নামহীন রুশী জনগণ মাঝামাঝি ধরণের কিছু করেনা। বরং যা করে তা হয়ে ওঠে মহান। এর কারণ, প্রত্যেক রুশী শুধু কাজের জন্য শিল্পকে ব্যবহার করেনা। বরং, যা করে, তাতে হয় বিস্ফোরণ। কোন কিছুই এই বিস্ফোরণকে রোধ করতে পারবেনা। এইভাবেই "ব্যাটল্‌শিপ পোটেম্‌কিন্‌" তৈরি হয়েছে।"

যাই হোক, যুগোশ্লাভ পর্দাতে "পোটেম্‌কিন্‌"-এর প্রতিফলনের প্রচেষ্টা ভয়ণভাবে ব্যর্থ হয়।

আট বছর পর প্রখ্যাত শ্লোভেন লেখক ডঃ ব্রাটকো ক্রেফ্‌ট শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণ করে লিখলেন ক্রুদ্ধ ভাষায়। লেখাটি বেরিয়েছিল ১৯৩৮ সালে "ক্লিজিঝেভনস্ট" পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন, "মহান চলচ্চিত্রশিল্পটির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন্‌, ওটসেপ, এক, চ্যাপলিন, পাবস্ট এবং অন্যান্যরা আমার মনে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে। এই অল্প কিছু ছবি ব্যবসায়িক ছবির গ্যাঙ্গস্টারদের তৈরি বাধাগুলো ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ দের শৈল্পিক ক্ষমতাকে ধন্যবাদ জানাই। চলচ্চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী। কেননা, আমি এর দাসত্ব-মোচনে বিশ্বাস করি। যা আসবে সর্বসাধারণের দাসত্বমোচনের মধ্য দিয়েই। ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্ভবতঃ খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বর্তমানে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতেই আছে চাবুক। আর, এই কারণেই এরা সমাজকে সেই ব্যাবিলনীয় দাসত্বে বেঁধে রেখেছে। আজকের চলচ্চিত্র-শিল্পের অস্তিত্ব এই দাসত্বের অন্ধকারের মধ্যে থাকলেও রাস্তা দেখানোর জন্য টর্চের আলো জ্বলেছে। শিল্পের পথে হাঁটতে গেলে, জনগণের বৃহত্তর অংশের মানসিক উন্নয়ন এবং সচেতনতা আনতে গেলে এর এই পথই ধরা উচিত।"

১৯৪৫ সালের স্বাধীনতার পর সেই সার্বিক উৎসাহজনক পরিবেশে আমাদের চলচ্চিত্র-দর্শকেরা সোভিয়েত ছবিগুলো দেখার সুযোগ পেলেন এতদিন যা ছিল তাঁদের কাছে স্বপ্ন। ঝিগা ভের্তভ, লেভ কুলেশভ, সের্গেই আইজেনস্টাইন, ভ্‌সেভোলোড পুডোভকিন্‌, আলেক-জাণ্ডার ডবঝেঙ্কো, মার্ক ডনস্কয়, গ্রিগরি কোজিনৎসভ, লিওনিদ ট্রাউবার্গ, ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, সের্গেই য়ুৎকেভিচ, মিখাইল রম প্রমুখ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র এবং নাটক যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এক অনন্যসাধারণ তৈরি করেছে।

যুদ্ধপূর্ব নির্বাক যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাক্‌ ইতিহাস বলে ভাবা যেতে পারে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমাদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র তৈরির কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিলনা। যে সব ছবির মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রতি যুগোশ্লাভ জনগণের আনু-গত্যকে ভালোভাবে দেখাতে পারবে। ছাই এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেশ যখন জেগে উঠছে, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলছে তখন চলচ্চিত্রের ক্যামেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরম্ভ করল সেই সব মুখ আর হাতের ছবির মধ্য দিয়ে। যারা ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছিল, মৃতদের কবর দিচ্ছিল এবং নতুন করে তৈরি করছিল শহরগুলো, কারখানাগুলো।

অক্টোবর বিপ্লবের বিষয় যুগোশ্লাভ ছবিতে এলো অনেক পরে। যখন চলচ্চিত্রকারেরা বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, খুঁজে পেয়েছে তাঁদের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার শৈল্পিক ফর্মকে।

সবপ্রথম এর পরিপূর্ণ উন্নতি দেখা গেল "ওলেকো ডান্‌ডিক" কাহিনী-চিত্রে। ১৯৫৭ সালে এটি সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ যুক্ত প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এটি তৈরি। যুক্ত প্রযোজনা চলচ্চিত্রশিল্পে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজনীয় তা প্রমাণ করে এই ছবিটি। ছবিটি গৃহযুদ্ধের এক নায়কের সম্পর্কে, এক যুগোশ্লাভ স্বেচ্ছাসেবকের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। ওরা সোভিয়েত সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল এবং উক্রাইন সীমান্তে বুডিয়ন্নির সৈন্যদলে যুদ্ধ করেছিল। এটি ওলেকো ডান্‌ডিক নামে একজন সার্বের কথা বলেছে, যিনি বিচ্ছিন্ন দলটির কমাণ্ডার ছিলেন। ইনি এই ছবি তৈরির আগে নিজের দেশের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন। এই যুক্ত প্রযোজনাকে ধন্যবাদ। কেননা, এ ছবির জন্যই যুগোশ্লাভ জনগণ তাঁদের সেই দেশপ্রেমিককে চিনতে পারল, যিনি গৃহযুদ্ধের সময় প্রায় চ্যাপায়েভের মতই জনপ্রিয় ছিলেন।

আদর্শগত এবং শৈল্পিকবোধ উভয় দিক থেকেই এটি ছিল যৌথ উদ্যোগ এবং যৌথ কথাটার আসল সত্য বজায় থেকে তা হয়েছিল। রুশী চরিত্রগুলো অভিনয় করেছিল রুশীরা এবং যুগোশ্লাভগুলো করেছিল যুগোশ্লাভিয়রা। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় কথা বলেছিল। ছবিটির পরিচালক লিওনিদ লুকভ।

লুকভের এই সুন্দর ছবি শুধু সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকারদের যৌথ উদ্যোগে উৎসাহিত করেছিল তা নয়। সেই সঙ্গে যুগোশ্লাভ লেখকদের সামনে এটাও হাজির করেছিল যে, যুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকারেরা যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যেমন, কোটোরায় খালাসীদের বিদ্রোহ, ক্রোয়াটিয়ায় কৃষকবিদ্রোহ, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও আগে এবং আধুনিক যুগোশ্লাভিয়া তৈরির আগে শ্রমিক-সংগঠনের সংগ্রাম। এই সব বিষয়বস্তু রূপায়িত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অক্টোবর বিপ্লবের বিষয় নিয়ে ভালো ভালো সোভিয়েত ছবিগুলো আমাদের জনগণের ইতিহাস নিয়ে ছবি করার ক্ষেত্রে একই রকম উদাহরণ হতে পারে।

অক্টোবর বিপ্লব ও প্রথম সোভিয়েত ছবিগুলি

(জর্জ সাদুল / ফ্রান্স)

১৯৬৭ সালের ১৩ই অক্টোবর প্যারিস থেকে অবশেষে সেই দুঃখের খবরটি এসে পৌছল। অতি পরিচিত ফরাসী চলচ্চিত্র-সমালোচক জর্জ সাদুল মারা গেছেন। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা এবং দর্শকেরা এই চমৎকার মানুষটিকে শুধু চিনতেননা, শ্রদ্ধাও করতেন। যিনি বিংশ শতাব্দীর শিল্পের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর জনগণকে একত্র করায় এবং শান্তি-অর্জনে যথাসাধ্য করেছেন।

'৬৭-র গ্রীষ্মে লেনিনগ্রাদের কাছে রেপিনোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে জর্জ সাদুল যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংক্ষেপ এখানে ছাপা হলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর আমরা কিছু সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। ফ্রান্সে আসা প্রথম ছবিগুলোর মধ্যে ছিল "সার্ফ'স উইঙ্গস"। পরে যার নামকরণ করা হয় "ইভান দি টেরিবল্"। ছবিটা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে। তবে এ ছবি থেকে আমি কোন বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, এ কথা বলতে পারবনা। কিন্তু, এর প্রযোজনায় যে সম্পদ দেখি, তা পুরোপুরি রূপদা ঐতিহ্যবাহী।

সেই সময়ে আমি সুররিয়ালিস্ট গ্রুপে তরুণতমদের অন্যতম। আমি বিশ্বাস করতাম সোভিয়েত ইউনিয়নে সবই আভা-গার্দ হতেই হবে। সে রাজনীতি বা শিল্প যাই হোক না কেন। আর তার পরই, আচমকা প্যারিসে দেখানো হলো "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন"।

প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন লিও মোসিনাক। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যবসায়িক সফরের সময় তিনি ছবিটা দেখেন। ছবিটিতে ফরাসী সাবটাইটেল ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে তাঁর বন্ধু, লিও পয়রিয়ার এবং জারমেইন ডুলাককে ছবিটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য বোঝানোয় খুব অসুবিধে হয়নি। ওঁরাই চালাতেন ফিল্ম ক্লাব অফ ফ্রান্স। অক্টোবর বিপ্লবের নবম বার্ষিকীর অল্প পরেই ১৯২৬ সালের ১২ই নভেম্বর সের্গেই আইজেনস্টাইনের এই ছবিটি দেখানো হলো। এটা ছিল খুব বাছা কিছু লোকের জন্য প্রদর্শনী। আমি তখন এক আঞ্চলিক তরুণ। সদ্য প্যারিসে এসেছি। সুতরাং, আমি তো আর আমন্ত্রণ পেতে পারিনা। আঁদ্রে ব্রেটন, পল এলওয়ার্ড আর লুই আঁরাগকে মনে মনে খুব হিংসে করছি। কেননা সুররিয়ালিস্টদের রোজ আড্ডার জায়গা ব্লেঙ্ক স্কোয়ারের কাফে সিরানোতে ওরা একদিন জানালো সেইদিনই সন্ধ্যায় ওরা "পোটেমকিন্" দেখতে যাচ্ছে। ......ফরাসী চলচ্চিত্র-জগতের নামী লোকজনদের ভিড়ে সিনেমা আর্টিস্টিক একেবারে উপচে পড়ছে। ছবি দেখে হাততালির ঝড় বয়ে গেল। বোঝা গেল, দর্শকদের মধ্যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র এবং পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের উপস্থিতির কথা। আইজেনস্টাইন তখনও তিরিশের কোটায় পা দেননি। কিন্তু, একটি সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র পত্রিকা ধিক্কার দিয়ে বলল যে একদল যুবক মনে করছে, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং রাজনৈতিক আলোচনা একসঙ্গেই হতে পারে। ঐ সমালোচক নিশ্চয়ই আমার সুররিয়ালিস্ট বন্ধুদের কথা মনে রেখেই এ কথা বলেছিলেন। কেননা, ওরা ছবি দেখার পর চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল "আপ্ দি সোভিয়েতস্"।

পরের দিন কাফে সিরানোতে আঁরাগ আর পল এলওয়ার্ড বলল ছবিটির কথা ওরা ভুলতে পারবেনা। তারা আরও বলল, এই প্রথম তারা পর্দায় অক্টোবর বিপ্লবের তীব্রতা অনুভব করল। তারা সেই মাংসের বীভৎস দলাগুলোর কথা বলল। বলল, পোকামাকড়ের হামাগুড়ি দেওয়ার কথা, আর অফিসারদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথা। কিন্তু, তারা একবারও আইজেনস্টাইনের সম্পাদনা এবং প্রতীকের ব্যবহারের কথা বললনা।

প্যারিসে "পোটেমকিন্" দেখার কিছুদিন পরই আঁরাগ এবং এলওয়ার্ড ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে আমিও তাদের অনুসরণ করলুম। আর, তারপরই অবশেষে আমি ছবিটি দেখতে পেলাম।

কিন্তু, এর মানে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন না যে, শুধু আইজেনস্টাইনের জন্যই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। ১৯২৫ থেকে এবং আরও বেশী করে মরক্কোয় ঔপনিবেশিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে শৈল্পিক আভাগার্দ থেকে রাজনৈতিক আভাগার্দ এই পরিবর্তন আসছিল। ১৯২৬-এর শেষে তাঁরা এবং কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন, "বিপ্লবই প্রথম এবং শেষ"। এঁদের মধ্যে ছিলেন জর্জ পুলিৎজার (১৯৪২-এ নাজীরা তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে এবং মেরেও ফেলে)। ইস্তাহার লেনিনের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে, "শুধুমাত্র সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এই বিপ্লবকে দেখছি......"।

ফরাসী সেন্সর "ব্যাটল্‌শিপ্ পোটেমকিন্"-কে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। ২৭ বছর ধরে। এমনকি, ১৯৫৯-সালেও যখন সিনেমাথেক ফ্রান্সের

প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হেনরি ল্যাংলোইস আস্তিবেসের উৎসবে এই ধ্রুপদী ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা করলেন তুর্‌সে। তখনও কিছু কিছু সাংবাদিক বলেছিলেন, ফরাসী খালাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার এটা একটা চেষ্টা। বেলজিয়ামে হল এ সব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে "পোটেমকিন্"-কে বলা হল "পৃথিবীর সেরা ছবি"। এর ফলে ফরাসী সেন্সার তাদের কদর্য সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হলো।......

১৯৩০-এর অক্টোবরে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে এলাম। আমার সঙ্গে ছিল লুই আঁরাগ এবং এলসা ট্রায়লেত। খারকভে বিপ্লবী লেখকদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আমরা এসেছিলাম। এখানে বিদেশী লেখকদের প্রচণ্ড সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা দু'টি নতুন উক্রানিয়ান ছবি দেখার আমন্ত্রণ পেলাম। ছবি দু'টি হলো ডবঝেঙ্কোর "আর্থ" এবং মিখাইল কাউফ ম্যানের "স্প্রিং"।

তখনকার দিনে নীপার বাঁধের বিশাল সমাজতান্ত্রিক কাজকর্মের মত ডবঝেঙ্কোর ছবিও আমাদের মনকে অভিভূত করেছিল। উক্রাইনে থাকার সময় বিপ্লবের শিকড় আমাদের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তাই যখন ১৯৩২-এর মে মাসে আমাদের সুররিয়ালিজম আর কমিউনিজমের মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়ার সময় এলো তখন আমরা কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্যের সিদ্ধান্ত নিলাম। এর জন্য আমাদের হারাতে হলো অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে।

১৯৩১-এ আমাদের সঙ্গে সুররিয়ালিস্টদের মতভেদের অন্যতম কারণ "আর্থ"। কেননা "আর্থ" সম্পর্কে ওরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে মত মেলাতে পারছিলনা। ওদের ভাষায় এটা "আপেলের গল্প"। ওরা বুঝতে পারছিলনা, এটা দেখে আমরা কেন এত উৎসাহিত।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, ডবঝেঙ্কোর মত মহৎ ধ্রুপদী এবং ছন্দময় কবির আবিষ্কারের সঙ্গে নীপার বাঁধের তুলনা করা চলেনা। কিন্তু দু'টো জিনিষই প্রশংসনীয়। বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ লোকের কাছে মহৎ শিল্পকর্মের অর্থ হলো, যা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। "মহৎ প্রেম" মৃত্যুর থেকেও বেশী শক্তিশালী—এই ব্যঞ্জনায় আমরা ভীষণভাবে মোহিত হয়েছিলাম। "আর্থ" ছবির শেষ কয়েকটি দৃশ্যে এই ব্যঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে। পরে "আর্থ"-কে "পৃথিবীর সেরা বারটি ছবির অন্যতম" বলে ঘোষণা করা হলো (ব্রাসেলস্; ১৯৫৮)।

ঐতিহাসিক এবং সমালোচকদের মত সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নির্বাক সময়কে আমি "স্বর্ণযুগ" বলে মনে করিনা। বরং, আমার মনে হয়, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সালই হলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময় আইজেনস্টাইন, ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, পুডোভকিন্, গ্রিগরি কোজিনেৎসভ, লিওনিদ ট্রাউবার্গ, সের্গেই ইউৎকেভিচ, নিকোলাই এক (ওঁর "রোড্ টু লাইফ" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাফল্যলাভ করেছিল), মার্ক ডনস্কয়, আলেকজান্দার জারখি, জোসিফ হেইফিজ, ঝিগা ভের্তভ, মিখাইল রম, ফ্রিয়েড্রিক এরমলার, সের্গেই গেরাসিমভ, গ্রিগরি রোসাল এবং আরও অনেকের কাজ ছিল। তাঁদের নৈপুণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উনিশ এবং বিশের দশকে একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে অনেক তরুণ ক্ষমতাসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের আগমন আমাকে খুশী করেছে। এঁদের নাম বিদেশে ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে। কুড়ির দশকের শেষের দিকে শিল্পের চিরাচরিত ফর্মের প্রতি ঘৃণায় সোভিয়েতের তরুণ চলচ্চিত্রকারেরা একত্র হয়েছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, ঐ ফর্মটা নিতান্তই জরাজীর্ণ বা তার থেকেও খারাপ। সেখানে আছে বুর্জোয়া এবং প্রতিবিপ্লবী ছাপ। সেই 'বৃদ্ধদের" বিরুদ্ধে তাঁদের নামতে হয়েছিল তীব্র লড়াইয়ে। লড়তে হয়েছিল নিজেদের মধ্যেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী-প্রতিষ্ঠার জন্য।

তাঁরা দেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই তাঁদের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লবের আহ্বানকে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সঠিক অর্থে কোন একটা জায়গায় আবদ্ধ নয় বা এটা কোন তাত্ত্বিক আলোচনা বা পুঁথিগত অধ্যবসায় নয়, যা অবিরাম কোন আদর্শকে অনুকরণ করে যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাকে প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেই পথ করে নেবে।

অক্টোবর বিপ্লব ও ভিয়েতনামের ছবি

লি থাই বাও (ভিয়েতনাম)

হ্যানয় ফিল্ম স্কুলের সাধারণ প্রেক্ষাগারে লেনিনের বাণী লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে : 'আমাদের কাছে সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ।'

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ্ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্য এবং সাম্যবাদনির্মাতা অপরাজেয় মানুষের ছবিতে শ্রদ্ধাশীল ও উচ্চধারণা পোষণ করেন। এ ছবিগুলি যেমন 'দি ব্যাট্‌ল্‌শিপ্ পোটেম্‌কিন্', 'আর্থ', 'মাদার', ''লেনিন ইন্ অক্টোবর', 'উই আর ফ্রম্ ক্রন্‌টাড্‌ট', 'চ্যাপায়েভ', 'দি ম্যাক্সিম ট্রিয়োলজী' 'দি ভিলেজ্ টিচার' ফিল্ম-স্কুলের পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অনেক চলচ্চিত্রকার সোভিয়েত-চিত্রকারদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত রচয়িতাদের বিভিন্ন পুস্তক ও বক্তৃতামালা ভিয়েতনামী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রে আইজেনস্টাইনের মণ্টাজ, রমের পরিচালন-কৌশল, ডভ্‌ঝেঙ্কোর ক্যাবিক সুষমা, গাভ্রিলোভিচের চিত্রনাট্যের দার্শনিক উপাদান, 'নাইন ডেজ অফ্ ওয়ান ইয়ার্' ছবির সংলাপ, ইউরুসেভ্‌স্কীর ক্যামেরার কলাকৌশল, ভের্টভ এবং কারমেনের তথ্যচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা-সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেনিনের মতবাদের আলোকে আমরা এই বাণী অনুসরণ করছি : জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্য দেশপ্রেম ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে সংগ্রাম কর।

প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা ও ত্যাগস্বীকারসত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিত্রকাররা প্রভূত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ফরাসী ঔপনিবেশিকবাদ-দের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের চিত্ররূপ, 'ভিয়েতনাম ফাইট্‌স্' ও 'দি ভিক্টরী অফ্ দিয়েন্ বিয়েন্ ফু' এবং কাহিনীচিত্রগুলি 'ফায়ার্ অন্ দি সেন্ট্রাল সেক্টর্ অফ্ দি ফ্রন্ট', 'দি ইয়াং সোলজার', 'দাই হাউ' (১৯৬৩ সালের মস্কো-উৎসবে রৌপ্যপদকে পুরস্কৃত), 'দি টমটিট' (১৯৬২ সালের কার্লোভি ভ্যারী উৎসবে পুরস্কৃত), 'সি অফ্ ফায়ার্' আমাদের চলচ্চিত্র-কারদের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।

১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপিত হল এবং উত্তর ভিয়েতনামে পুনর্নির্মাণযজ্ঞ শুরু হল। এই সময়ে তোলা হল, 'ব্যাঙ্ হিও হাই' নামে ছবি, যাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত দেশে সব-কিছু পুনর্গঠনের জন্য যাঁরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের কথা বলা হল। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মস্কো-উৎসবে সুবর্ণপদক পেয়েছিল।

যখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ-ভিয়েতনামে আগ্রাসনমীতি চালিয়ে নয়, বর্বর ও বীভৎস আক্রমণ শুরু করল, তখন আরো ছবি নির্মিত হ'ল 'উই অয়ার্ ফোর্স'ড টু টেক্ টু আর্ম্‌স্' (দি লিবারেশন্ স্টুডিও), 'বাই এ রিভার্', 'দি স্টর্ম ডেভেলাপ্‌স্' ও 'সেভেন্‌টিন্‌থ্ প্যারালাল্', যে-সমস্ত ছবিগুলিতে আমাদের দেশের পুনর্গঠন ও ঐক্যের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। পঞ্চম মস্কো চলচ্চিত্র-উৎসবে আমাদের জন্মদেশের ছবি 'ফ্রিডম্ ফাইটার্স' কুই তি' (লিবারেশন্ স্টুডিও), ও 'এট্ দি গেট্ অফ দি উইণ্ড' (হ্যানয় ডকুমেণ্টারী স্টুডিও), দু'টি ছবিই সুবর্ণপদক পেয়েছে।

আমার মনে পড়ছে প্রতিরোধ-আন্দোলনের গোড়ার দিকের কথা, যখন আমরা জঙ্গলে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। তখন প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার সহস্র বেড়াজাল পেরিয়ে কিছু কিছু সোভিয়েত ছবি আমাদের জঙ্গলে এসে পৌঁছাত, ছবিগুলি দেখার জন্য আমরা ১৫ মাইল হেঁটে আসতাম। যে ছবি দু'টির কথা আমার মনে পড়ছে, সে ছবি দু'টি হ'ল 'মেম্বার অফ দি গভর্নমেণ্ট', ও 'দি ইয়াং গার্ড'। ক্রাস্‌নোডনে নাজীবিরোধী যোদ্ধাদের ছবিগুলি দেখে আমরা ওলেগ্ কশেভয়, লিউবা সেভসোভা ও সের্গেই টিউলেনিনদের মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই সমস্ত বীর-চরিত্র বিপ্লবের সার্থক ফসল, ফ্যাসিবাদ উৎখাত করার জন্য যাঁরা জীবন-বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আজকে আমাদের চলচ্চিত্রকাররা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছেন, তাঁরা লড়াই করছেন বিভিন্ন ফ্রন্টে, তাঁদের এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে মুভি ক্যামেরা। এই অসমসাহসী বীর চলচ্চিত্রকাররা আমাদের জনগণের মহান সংগ্রাম ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের অনিবার্য পরাজয়ের কাহিনী তুলে ধরেছেন ছবির মাধ্যমে। আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতার দল ছড়িয়ে আছেন দেশের সর্বত্র, আকাশে-সমুদ্রে, পাহাড়ে-নদীতে, গ্রামে-শহরে-গঞ্জে, কলে-কারখানায়-খামারে সর্বত্র। তাঁরা তুলছেন যুদ্ধের ছবি, তুলেছেন যুদ্ধ প্রতিরোধের ছবি। বিপুল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ছবির তৈরির সংখ্যা কমেনি, বরং এই সংখ্যা সাম্প্রতিককালে দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের দেশে কার্টুন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিও তোলা হচ্ছে। আমাদের ফিল্ম-স্কুলের বিভাগ সিনারিও-রচনা, পরিচালনা, অভিনয়, ক্যামেরা এবং অর্থনীতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে চলেছেন।

আমি সোভিয়েত-ইউনিয়নের পার্টি ও সরকার এবং সোভিয়েত জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে সাহায্য ও সমর্থনের জন্য। আমাদের নবীন চলচ্চিত্র-শিল্পে সাহায্যের জন্য আমরা সোভিয়েত সিনেমাটোগ্রাফার্স' ইউনিয়নের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা অক্টোবর বিপ্লবজাত সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসরণে সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

রুমানিয়ায় সোভিয়েত চলচ্চিত্র (১৯২০-১৯৪০)

বুজর র্যাপিয়ানু

বিপ্লবের অগ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল সোভিয়েত চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে এক সুমহান ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নবতম শিল্প নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলনে আশ্চর্য সমৃদ্ধ হয়ে শিল্পসংস্কৃতির নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

প্রথমদিকে এই চলচ্চিত্র দর্শক হিসাবে পেল স্বাভাবিকভাবে মিত্র সর্বহারা শ্রেণীকে। দর্শকরা ছবির মধ্যে নিজেদের ভাগ্য, নিজেদের জীবন খুঁজে পেল, নিজেদের জীবন-সংগ্রামের প্রতিরূপ খুঁজে পেল পোটেমকিন জাহাজের নাবিকদের মধ্যে। পোটেমকিনের নাবিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করল যে, মুক্তির একমাত্র পথ বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং এখানেই সোভিয়েত ছবির সার্থকতার যথার্থ কারণ নিবদ্ধ। এই সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে এর বৈপ্লবিক উপাদান, হেনরী বারবুসে যার সম্পর্কে বলেছেন, 'নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ নতুন শিল্প'।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠল, বিভিন্ন রাজনৈতিক, দার্শনিক ও নান্দনিক ধারণায় সর্বহারা শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিপ্লবী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তুলে রাখতে সচেষ্ট ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিরন্তর কুৎসা প্রচারে রত এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সত্য প্রচারে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের দণ্ডিত করতেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, অক্টোবর বিপ্লবের সংগ্রামী আদর্শের বিস্তার রুদ্ধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়কে অবরোধ করে যে বলয় তৈরি হয়েছিল, বুর্জোয়া রুমানিয়ার অবস্থান ছিল তার মধ্যে বিশিষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে রুমানিয়া সম্পর্কে প্যারিসের পত্রিকা 'জার্নাল' ১৯২৪ সালে মন্তব্য করেছিল "রুমানিয়া বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ইউরোপের বর্ম"।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রুমানিয়ায় শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং এ কারণেই রুমানিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প ও সাহিত্যের প্রবেশ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু, বাধার বেড়াজাল পেরিয়ে রুমানিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের যা কিছু প্রবেশ করত, তা থেকেই রুমানিয়ার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসঞ্জাত সাফল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার এভাবেই সাধিত হত। যাঁরা মিথ্যা ও কুৎসার ভারি পর্দা খুলে ফেলতে চাইতেন, তাঁদের কাছে সোভিয়েত শিল্প ছিল এক নির্ভরযোগ্য মিত্র।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি ৪০টি সোভিয়েত কাহিনীচিত্র, ৩টি পূর্ণদৈর্ঘের তথ্যচিত্র এবং ১১টি স্বল্পদৈর্ঘের তথ্যচিত্র রুমানিয়াতে ব্যবসায়িকভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হচ্ছে 'দি হেয়ার অফ চেঙ্গিজ খান', 'আলেকজণ্ডার নেভস্কি', 'ব্লু এক্সপ্রেস', 'স্টর্ম'.'দি রোড্ টু লাইফ্', 'জলি ফেলোজ' ও 'ভল্গা ভল্গা'।

অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে দুটি করে সোভিয়েত ছবি রুমানিয়ায় এ সময়ে দেখানো হয়েছিল। আমেরিকা ও জার্মানীর ছবির মিলিত সংখ্যা বছরে ছিল গড়ে ২০০টি। সোভিয়েত ছবির সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং ছবিগুলিও সেন্সর কর্তৃপক্ষের রুষ্ট দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতনা, ছবিগুলি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করত ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সমস্ত ছবিই প্রচুর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হত। সংবাদপত্রের সমালোচনা ও ব্যবসায়িক সাফল্য দর্শকদের মনোভাব ব্যক্ত করত।

'সাক্সেস্' পত্রিকা এ সময়ে লিখেছিল "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সোভিয়েত ছবি আমাদের দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। এখানে সোভিয়েত ছবির প্রথম রজনী—চলচ্চিত্রের এক বিরাট ঘটনা, এর কারণ, সোভিয়েত রাশিয়ায় কি ঘটেছে, এ বিষয়ে সকলের অগাধ কৌতূহল"।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রশংসা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ঔৎসুক্যের প্রকাশ। সোভিয়েত ছবির সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক সাফল্যের অঙ্গ হিসাবে প্রতিভাত হত, কম্যুনিস্ট-বিরোধ ও সামরিক-প্রস্তুতির জিগিরে ব্রতী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের নিরন্তর কুৎসাপ্রচারের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ হিসাবে ছবির সমাদর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

রুমানিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল যে, জনগণের মধ্যে এই প্রচার ব্যাপকভাবে রাখতে হবে যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা নিজেদের প্রতিরক্ষার সংগ্রামের অঙ্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজন, মৌলিক ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংগ্রাম"। (১৯২৯ সালে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে)। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রুমানিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সর্বহারা শ্রেণী ও প্রগতিশীল বুদ্ধি-

জীবীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সহানুভূতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসূ হতে পারত।

পুলিস ও বিচারালয় সেন্সরশিপ কমিশনে নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ করল, যে সেন্সরশিপ কমিশন বুর্জোয়া রুমানিয়ায় সোভিয়েত ছবির বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র ছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রুমানিয়ার সেন্সরশিপ পদ্ধতি দেশের ভিতরে ও বাইরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

সেন্সরই ছিল একমাত্র কারণ, যার জন্য রুমানিয়ার দর্শকরা 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন্', 'মাদার', 'চাপায়েভ' ও 'বাল্টিক ডেপুটি'-র মত ছবি দেখতে পারেনি। অতি অল্প সংখ্যক ছবিই সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেত, আর সে ছাড়পত্রের মাশুল ছিল প্রচুর কাটাকুটি।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন রুমানিয়াতে সেন্সর ও পুলিসের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিবাদকে মুখর করে তুলত।

এই রকম একটা অবস্থা যা মাঝে মাঝে নাটকীয় আকার নিত, তার মধ্যেও ৪০টি ছবি রুমানিয়ার দর্শকদের মধ্যে মুক্তিলাভ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে প্রদর্শিত সোভিয়েত ছবির তাৎপর্য বিচার করতে হবে।

সোভিয়েত ছবি কম্যুনিস্ট ও গণতান্ত্রিক মহলে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল। ১৯৩৬ সালে 'এরা নোভা' পত্রিকায় এস. রল লিখলেন, "সোভিয়েত ছবির প্রথম পনের বছর আমাদের কাছে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যে যুগের চলচ্চিত্র মানবসমাজে জনগণের এক শিল্পে পরিণত হয়েছে, এক নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান যা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও বর্তমান যুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনার সংযুক্তিতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ করে চলেছে।"

প্রগতিশীল সমালোচকরা উপলব্ধি করলেন যে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসের গতি সুস্পষ্টভাবে সোভিয়েত ছবির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে চলেছে এবং এঁরা চলচ্চিত্রের নতুন পথনির্দেশে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

এই সমালোচকরা সোভিয়েত ছবির বৈশিষ্ট খুঁজে পেলেন কাহিনীর উপস্থাপনায়, রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণায়। "সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র পরিবেশ যা বিরাট পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্রকারদের নতুন ও সঠিক পথের নির্দেশ দেয়।" 'সোভিয়েত শিল্পীরা সর্বশ্রেষ্ট মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। সৌন্দর্য নৈতিকতা ও সুস্থ আদর্শ প্রচারের বাহন হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। সত্য ও ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ছবির ভূমিকা অতুলনীয়।......'

"রাশিয়ার ছবি জীবনের প্রতি গভীর প্রেমে আবদ্ধ, সমস্ত সম্ভাবনায় আগ্রহী"।

"যুদ্ধোত্তর যুগের সোভিয়েত ছবি অপরিসীম আশাবাদে উদ্বুদ্ধ"।

"সোভিয়েত ছবিতে সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত।"

রুমানিয়ার সমালোচকরা সোভিয়েত ছবি প্রসঙ্গে এই ধরণের মন্তব্য করেছেন।

সোভিয়েত ছবির অবিসংবাদিত সাফল্য রুমানিয়ার চলচ্চিত্রকে সঙ্কট-পরিত্রাণের সূত্র-অন্বেষণে সাহায্য করল।

রোমানা লিটেরারার সমালোচক লিখলেন: "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে বহু-প্রতীক্ষিত রুমানিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের নবজন্ম সম্ভব হতে পারে।" এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন পেল লেখক কামিল পেট্রেস্কু, জান মিহাইল, সাশু এলিয়াড ও অভিনেতা পপ মার্শিয়ান প্রমুখের কাছ থেকে। "সোভিয়েত চলচ্চিত্রের পুরোধারা সংশিল্পসম্মত চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছেন......সকলকে প্রথম যুগের সোভিয়েত ছবির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে হবে, এমন ছবি তুলতে হবে যা পর্যটনকারীদের কাছে আমাদের দেশকে ছবির মত তুলে ধরবে। এমন ছবি হবে যাতে রুমানিয়ার কৃষকসমাজের জীবনগাথা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে।"

সাম্প্রতিককালে বহু সোভিয়েত ছবি রুমানিয়াতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সমাদর লাভ করেছে। এই সমস্ত ছবির শিল্পগত ও আদর্শগত উপাদান আমাদের দেশে নতুন রুমানিয়ার চলচ্চিত্রের সূচনা ও বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে ও করছে।

বৃটেন ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র

নিনা হিবিন

সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের পুরোধাদের শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বৃটেন অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় প্রথমদিকে কিছুটা পেছিয়ে ছিল।

এর কারণ মোটামুটি দু'টি। প্রথম কারণ হচ্ছে, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি—যা বৃটেনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এক বেড়াজালের সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় কারণ, বৃটেনের প্রচলিত সেন্সরশিপবিধি যা অন্য সমস্ত জাতীয় সেন্সরশিপপদ্ধতির বিচারে বীভৎস ও হাস্যকর ছিল।

বিশ দশকের চলচ্চিত্রামোদীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারে সেন্সরশিপসংক্রান্ত অচলায়তনের বদ্ধ প্রাচীরের জন্য ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়ে উঠছিলেন। এবং ক্রমশঃ সেন্সরশিপসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদ সংহত হয়ে উঠছিল ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাস্বর ছিল সোভিয়েত চলচ্চিত্র। সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন সংগঠিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সোভিয়েত চলচ্চিত্র এক আশ্চর্য সংবাদ হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছিলো।

'ক্লোজ-আপ্' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে এক লেখক ঘোষণা করলেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র 'স্টার' পদ্ধতির মূল্যহীনতা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ছবি আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রতিটি মানুষ, নারী এবং শিশু এক একজন 'স্টার'।

পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন, 'রাশিয়ান ছবি দেখার পর অন্যান্য সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে, রাশিয়ান ছবিগুলি মানবতার সার্থক এবং প্রত্যক্ষ রূপায়ণে জীবন্ত, সজীব সোভিয়েত চলচ্চিত্র নতুন পৃথিবীর এক আশ্চর্য সম্পদ'।

তিনি আরও বললেন যে, কিভাবে দুনিয়াজোড়া সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত ছবিকে উত্থান, হত্যা ও ধ্বংসের ভাবধারা প্রচারের বাহন হিসাবে চিহ্নিত করার চক্রান্ত করে চলেছে।

বিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বৃটেন জুড়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে উঠল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আন্দোলনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করল।

১৯২৫ সালে লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত । এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—লেখকদের মধ্যে 'জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্, শিল্পী অগাস্টাস জন, বিজ্ঞানী জুলিয়াস্ হাক্সলী, জে.বি.এস্. হল্‌ডেন্ এবং অভিনেত্রী ড্যামে এলেন টেরী প্রমুখ।

অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল সাধারণ চিত্রগৃহে রবিবার বিকালে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সেন্সরশিপ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি দিল এবং এইভাবেই প্রথম ১৯২৮ সালের ২১শে অক্টোবর বেলা ২-৩০ টায় একদল উৎসাহী ফিল্ম সোসাইটি সদস্য নিউ গ্যালারি প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করল সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক ছবি দেখার জন্যে। ছবিটি হ'ল পুডোভ্‌কিন নির্দেশিত 'মাদার'।

উৎসাহী ও সৎশিল্পে বিশ্বাসী চলচ্চিত্র-সমালোচকরা ছবিটি নিয়ে প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। 'ক্লোজ্-আপ্' কাগজের একজন সংবাদদাতা লিখলেন যে, সমগ্র লণ্ডন এক সপ্তাহের জন্য উদ্দীপিত হয়ে উঠল, কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রসমূহ ছবিটির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে উদ্যোগী হয়ে উঠল। তাঁরা এই ছবিটিকে 'কম্যুনিস্ট ভাবধারার প্রচার এবং শয়তানি, ধূর্ততা, হিংসা ও মিথ্যার জঞ্জাল' বলে অভিহিত করলেন।

সোভিয়েত ছবির 'প্রচারমূলক উপাদান' সম্পর্কে বিতর্ক পরবর্তীকালে আরো সোচ্চার হয়ে উঠল যখন পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে পুডোভ্‌কিন্ বৃটেন পরিদর্শনে এলেন এবং তাঁর ছবি 'দি এণ্ড অফ্ সেণ্ট পিটার্সবার্গ' ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে প্রদর্শিত হল। 'দি বেড্ এণ্ড সোফা' (এপ্রিল, ১৯২৯), 'দি নিউ ব্যাবিলন' (নভেম্বর, ১৯২৯) ও 'আর্থ' (অক্টোবর, ১৯৩০) ছবিগুলি প্রভূত প্রশংসা ও প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

'ক্লোজ্-আপ্' কাগজে একজন লেখক অল্‌গা প্রেব্রাঝেন্‌স্কায়া ও ইভান্ প্রাভ্‌ভ্ নির্দেশিত 'দি পেজাণ্ট ওম্যান্ অফ্ রিয়াজান্' (মার্চ, ১৯৩০) ছবিটির অসম্ভব সামাজিক গুরুত্বের কথা এবং দ্রুত নাটকীয় গতি, বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের উল্লেখ করলেন। ফিল্ম সোসাইটির বহু সদস্যের সঙ্গে এ ছবিটি প্রসঙ্গে আলোচনা করে আমি দেখেছি যে, তাঁরা এ ছবিটি সম্পর্কে কি আশ্চর্য গভীর আত্মিক যোগ অনুভব করেন।

"ব্যাট্‌ল্ শিপ্ পোটেম্‌কিন্" ফিল্ম সোসাইটিতে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রদর্শিত হল। ছবিটিতে কাহিনীর মহৎ সংগ্রাম দর্শকদের বিপুলভাবে মুগ্ধ করল।

বিশ ও ত্রিশ দশকে বৃটেনের প্রচণ্ড সংগ্রাম ও আন্দোলনমুখর রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সরশিপবিধি ও এই আইনের প্রতিবাদ-আন্দোলনের বিকাশ লক্ষণীয়। খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট ও ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এবং পরবর্তী অগ্নিগর্ভ অবস্থা, ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকের ভুখা-মিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আন্দোলন সমগ্র বৃটেনে এক ঝটিকা-যুব্ধ-অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছিল। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি এই অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল এক বিপ্লবের সম্ভাবনায় এবং নিজেদের শাসন ও শোষণ বিপন্ন হতে পারে, এমন সমস্ত কিছুই বে-আইনী ঘোষণা করতে তৎপর হয়ে উঠল।

'ব্যাটল্‌শিপ্ পোটেমকিন্' ছবিটিকে বোর্ড অফ সেন্সর ছাড়পত্র দিলনা এবং লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ও মিড্‌লসেক্স কাউন্টি কাউন্সিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করল। কারণ হিসাবে এঁরা বললেন যে, ছবিটিতে 'বর্বর হিংসা' দেখানো হয়েছে। এই বিধিনিষেধের মূল কারণ যে শাসকশ্রেণীর হস্তক্ষেপ, এটা বুঝতে অবশ্য সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা হয়নি। শাসক-শ্রেণীর ধারণা ছিল যে, ছবিটি বিপ্লবের একটি বিশ্বস্ত দলিল।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাব ছিল বিপুল। কিন্তু, এই ছবিগুলি যাঁরা দেখার সুযোগ পেতেন, সংখ্যার বিচারে তাঁরা ছিলেন নগণ্য। চাঁদার উচ্চ হারের জন্য লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা সাধারণতঃ আসতেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

কাজেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার প্রয়োজন অনুভূত হল। বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগ্রাম ও উপলব্ধির বিশ্বস্ত বাহক সোভিয়েত ছবি ব্যাপকভাবে প্রদর্শনীর জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের নব বিস্তার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি সেন্সরশিপসংক্রান্ত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর চলচ্চিত্রসংস্থাগুলিকে বঞ্চিত করা হল। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের থিয়েটার ও মিউজিক্ হল্ কমিটির চেয়ারম্যান মিস্ রোজামণ্ড স্মিথ্ এই বিষয়ে এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন যে, এই ধরণের সংস্থাগুলির সদস্যদের চাঁদার হার অত্যন্ত কম বলে যে কেউ এই ধরণের সংস্থার সদস্য হতে পারে এবং সেহেতু এই "সংস্থা-সমূহের প্রদর্শনীকে সাধারণ প্রদর্শনীর মত বলা যায়। এইভাবে সেন্সরশিপের বিষয়ে দুটি পদ্ধতি চালু হ'ল, ধনীদের জন্য এক ধরণের আইন এবং শ্রমিকদের জন্য আর এক নিয়ম। ওয়ার্কার্স ফিল্ম সোসাইটি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করল এবং অবশেষে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে একটি কো-অপারেটিভ্ প্রেক্ষাগার ভাড়া নিল।

এই সোসাইটি একেবারে শুরুতেই অভাবিত সাফল্যলাভ করল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শত শত শ্রমিক এই সংস্থার সদস্য হল। বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল, সাউথ ওয়েল্‌সের খনি শ্রমিকদের অঞ্চল থেকে বিভিন্নস্থানে শ্রমিকরা এগিয়ে এলেন, সংগঠিত হলেন এবং সারা দেশের শিল্পাঞ্চলে এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হ'ল। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে ওয়ার্কার্স ফিল্ম সোসাইটিসমূহের এক ফেডারেশন্ স্থাপিত হ'ল। এই সর্বপ্রথম এইভাবে শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগ লাভ করল।

ত্রিশ দশকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আরো বিস্তারিত ও ব্যাপক-ভাবে প্রসারিত হয়ে উঠল। এই আন্দোলনের শরিকদের মধ্যে একদলের কাছে এই আন্দোলন ছিল বস্তুতঃ চলচ্চিত্রের নান্দনিক ও শিল্পগত বিষয়ে আসক্তিপ্রসূত। অপরদলের কাছে এই আন্দোলন রাজনৈতিক মতামতের ভাববাহী উপাদানে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী এবং বিশেষ ক'রে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠিত করার হাতিয়ার হিসাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল এবং এই ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ছবি ছিল এক আশ্চর্য সম্পদ। কেননা, সোভিয়েত ছবি একাধারে ছিল শিল্পসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাণবন্ত এবং অন্যদিকে বৈপ্লবিক আবেদনে সমৃদ্ধ।

'ফোরাম্' নামে একটি ছোট ব্যবসায়িক চিত্রগৃহ শুধুমাত্র সোভিয়েত ছবি দেখানো শুরু করল। এই চিত্রগৃহেই লণ্ডনের চিত্রামোদীরা 'উই ক্রম্ ক্রন্সটাড্‌ট্', 'চ্যাপায়েভ', 'লড্ হোয়াইট্ সেইল্' ও 'দি নিউ গালিভার' প্রমুখ বিখ্যাত ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেল। এই সমস্ত ছবির মধ্যে 'বেড্ এণ্ড সোফা' ছবিটি দীর্ঘ ছয়মাস ধরে চ'লে এক নতুন কীর্তি স্থাপন ক'রল।

ক্রমশঃ এটা স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হ'য়ে উঠল যে, সোভিয়েত ছবি সাধারণ মানুষকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করছে। আজকের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত বহু লোকই মনে করেন যে, সোভিয়েত ছবিই তাঁদের সামনে প্রথম সমাজতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির চেহারা তুলে ধরেছে।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানেই আমাদের দুই দেশ মৈত্রীবদ্ধ হ'ল। এই মৈত্রী সমগ্র সংস্কৃতিতে, বিশেষতঃ, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হ'ল। এই প্রথম সাধারণ ব্যবসায়িক চিত্রগৃহে ব্যাপকভাবে

সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হওয়া শুরু হ'ল এবং এই সমস্ত ছবি বৃটেনের জনগণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরো উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলল।

বৃটেনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাব ব্যাপক ও বহুমুখী। বৃটেনের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রত্যক্ষ। সমগ্র চলচ্চিত্রের সংজ্ঞায় নবরূপায়ণে এবং চলচ্চিত্র একটি শিল্প, এই প্রতীতির সার্থক প্রয়োগে সোভিয়েত ছবি আমাদের দেশে সাড়া জাগিয়েছে। সেন্সরশিপবিধিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রগতিশীল সার্থক আন্দোলনকে সম্ভব করেছে। আমাদের দুই দেশের মৈত্রীবন্ধনকে সোভিয়েত চলচ্চিত্র দৃঢ়তর ক'রেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান ত্যাগ ও বিপুল বীরত্ব আমরা সোভিয়েত ছবি থেকে জেনেছি, অগণিত মানুষকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করেছে সোভিয়েত চলচ্চিত্র এবং অসংখ্য মানুষকে সোভিয়েত ছবি অকৃত্রিম আনন্দ ও অভিনব প্রেরণা দিয়েছে।

আক্টোবর বিপ্লবজাত চলচ্চিত্র থেকে ইতালীর নব-বাস্তবতা।

সার্জিয়ো সেকুচিনি (ইতালী)

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ফসল বিপ্লবী সোভিয়েত চলচ্চিত্র ইতালীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ যুগ—নয়া বাস্তবতার যুগ, এমনকি আজকের ধারা ও ধারণাকেও আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে ফ্যাসিবাদ কর্তৃক আরোপিত শত সহস্র বিধি-নিষেধের বেড়াজালকে উপেক্ষা ক'রে ইতালীর চলচ্চিত্রকারবা চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত শিক্ষকদের মূল্যবান রচনাবলী থেকে শিক্ষা-গ্রহণ ক'রতে শুরু করেছিলেন। এই মহান চলচ্চিত্রকারদের ছবির প্রদর্শনী তৎকালীন ইতালীতে অত্যন্ত কদাচিৎ হলেও এই দুর্লভদর্শন ছবিগুলি ছিল এই রচনাবলীর মূলসূত্রের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষার প্রভাব প্রাথমিকভাবে অনুভূত হ'ল কয়েকজন তরুণ পরিচালকের তথ্য ও কাহিনী চিত্রে। আলেক্জান্দ্রো ব্লাসেট্টি পরিচালিত 'সান' (১৯২৯) 'মাদার আর্থ' (১৯৩০) ও 'পালিয়ো' (১৯৩২), ইভো পেরিলি নির্দেশিত 'দি বয়' (১৯৩৩) ও উমবের্তো বার্বারো পরিচালিত 'পিলগ্রিমার্স ইন দি অ্যাড্রিয়াট্রিক' ছবিগুলি এই জাতীয় প্রভাবপ্রসূত বলে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। আজকে এই সমস্ত ছবির কথা কারুরই মনে নেই। শুধুমাত্র ইতিহাসের কিছু কিছু পাতায় সামান্য উল্লেখের মধ্যেই এ ছবি-গুলির পরিচয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু, সে সময়ে এ ছবিগুলি চলচ্চিত্রের জগতে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল, ইতালীয় চলচ্চিত্রের এক দশকের অনড় অবস্থাকে আলোড়িত করেছিল এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে উদ্গাত ধ্যান ও ধারণাকে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করেছিল, যে ধ্যান ধারণাগুলি সূচিত করেছিল আগামী দিনের আরো মহৎ তাৎপর্যকে।

১৯৩২ সালের ৬ থেকে ২১ আগস্ট অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল ভেনিসে। পরবর্তীকালেও ভেনিসে আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এক্সেলসিয়র, হোটেলের চত্বরে লিডো প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ফারাও ধরণের স্থাপত্যে কোন এক শেখের নির্দেশে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল, শেখ সাহেব ভেনিসে এসে এই বাড়িতে ছুটি কাটাতেন শত শত স্ত্রী ও উপপত্নী নিয়ে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু আংশিকভাবে সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে হয়েছে বলে বলা যেতে পারে, কেননা, রোমের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশনাল্ ফিল্মসের অধ্যক্ষ লুসিয়ানো দে ফেও সোভিয়েত নির্বাক যুগের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে অসম্ভব অভিভূত হয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২৯-১৯৩০ সালের আর্থনীতিক সঙ্কটজনিত মন্দা থেকে হোটেল ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কিছুটা অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত ছিল। এইভাবে আশা করা হয়েছিল যে, সে বছরে পর্যটনের মরসুমকাল আরো বর্ধিত ও আকর্ষণীয় করা যাবে। কাউন্ট ভল্‌পি ডি মিশুরাটো, যিনি তিরিশ দশকের ভেনিসে রেনেসাঁ-যুগের অভিজাতদের মত বাস করতেন, তাঁর কাছে এই সঙ্কটের সমাধানের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হ'ল। ভল্‌পি পরামর্শ চাইলেন দে ফেও-র কাছে। দে ফেও তখন লীগ্ অফ্ নেশন্সের প্রতিনিধি হিসাবে সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এসেছেন, সেখানে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের চরম সাফল্যের দিক্‌চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছবিগুলি দেখে তাঁর মনে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে প্রভূত উৎসাহ ও সাধারণ ব্যবসায়িক ছবি সম্পর্কে প্রচণ্ড বীতরাগ দানা বেঁধে উঠছিল।

দে ফেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলেন

এবং নিজে এই উৎসবের সংগঠক হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। সোভিয়েত ছবি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহের জন্যেই বস্তুতঃ প্রদর্শনী-সূচীতে সোভিয়েত ছবি অন্তর্ভুক্ত হল।

ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠির ধারণা ছিল যে, বেসরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র উৎসব সতর্কতার সঙ্গে মনোনীত স্বল্পসংখ্যক দর্শকের (যার বেশীর ভাগই বিদেশী) মধ্যে সীমিত থাকবে এবং তাঁরা এই উৎসবে হস্তক্ষেপের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এই ভেবে যে, বিদেশে সোরগোল উঠবে যে, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইত শাসকগোষ্ঠি অসহনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন। তা সত্বেও কিছু অদ্ভুত ধরণের হস্তক্ষেপ ঘটল, যেমন কর্তৃপক্ষ রেনে ক্লেয়ারের ছবি, 'আ নাউস লা লিবার্তে'র নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করলেন 'আ মে লা লিবার্তা'। ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠি ভীত হলেন এই ভেবে যে, ছবিটির মূল নাম ইতালীর জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠবে বা এই নাম সংগ্রামের জন্যে এক মারাত্মক আহ্বানস্বরূপ হয়ে উঠবে।

ভেনিসের কিছুটা প্রস্তুতিহীন প্রথম উৎসবে তিনটি সোভিয়েত ছবি 'রোড্ টু লাইফ্' (নিকোলাই এক), 'আর্থ' (ডভ্ঝেঙ্কো) ও 'কোয়ায়েট্ ফ্লোজ্ দি ডন্' (অল্গা প্রেব্রা ঝেন্সকায়া ও ইভান্ প্রাভ্ত্) দেখানো হল। সমস্ত ছবিগুলিই বিশেষ করে এক নির্দেশিত ছবিটি বিপুলভাবে সমাদৃত হল। সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হল—'রাশিয়া নতুন ভাষায় কথা বলছে'। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে দর্শকদের মতামতের ভিত্তিতে কোন পুরস্কার বা পদক ছাড়াই উৎসবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন, নিকোলাই এক এবং তাঁর ছবি 'রোড্ টু লাইফ্' সমালোচক ও চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। অনেকে এই প্রচণ্ড প্রভাবের সূত্র অনুসরণ করে মনে করেন যে, একের 'ওয়েফ্স্' ডি সিকার 'স্কিউস্কিয়া'র পূর্বসূরী।

ডভ্ঝেঙ্কোর 'আর্থ' এত উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসিত হয়নি সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ছবিটির দর্শক ছিলেন সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। তা হলেও সমালোচকরা একইরকম উৎসাহে ছবিটির সমালোচনা প্রকাশ করলেন। সবচেয়ে সুন্দর বিচার অবশ্য ফ্যাসিস্টদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভেনিসে প্রদর্শিত ছবিটির প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

ভেনিসে প্রথম চলচ্চিত্র-উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রায় একই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। উমবের্তো বার্বারোর উদ্যোগে পুডোভ্কিনের 'সিনেমাটোগ্রাফিক থিম্স'-এর ইতালীয় অনুবাদ 'Il soggetto Cinematograficos' প্রকাশিত হল।

বার্বারো লিখেছেন, "পুডোভ্কিনের এই ছোট বইটি নতুন উপলব্ধিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করল। আমার মনে হল, এই বইটি পড়ার আগে চলচ্চিত্রের জগৎ আমার কাছে যেন অবাস্তব ও অচেনা ছিল। এই উপলব্ধি বা ধারণাও সবচেয়ে প্রবল ছিল না, আমার সবচেয়ে প্রবল উপলব্ধি চলচ্চিত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। কেননা, পুডোভ্কিনের প্রশান্ত উদ্ঘাটন আমি এবং অন্যান্যরা যে সংস্কৃতির সেবা করছিলাম, তাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গেচুরে দিল, যদিও আমি এই সংস্কৃতিকে সব সময়ই অসহনীয় ভাবতাম…'আদর্শগত শিল্প', 'বাস্তবসম্মত শিল্প', 'সম্পাদনা'…এক প্রশস্ত রাজপথ, শিল্প সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার এক নির্দিষ্ট পথ, ইতালীতে বর্তমান সমস্ত কিছুর বিপরীত…বইটি ছিল ফ্যাসিজমের আবহাওয়া, এমনকি ইতালীয় সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নামী ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যের সীমানার বাইরে, এই ব্যবধান এত বিশাল ছিল যে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে বইটিকে একান্ত অবাস্তব ভেবেছিলাম এবং এর ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছিলাম।"

"কিন্তু বইটি প্রশংসার সাড়া জাগিয়ে তুলল। সংবাদপত্রের উল্লেখেও প্রশংসার মালা…এবং আমরা অনুশীলন করতে বসলাম, এবারে বেশ কঠিন বিষয় কেননা এগুলি ছিল পুডোভ্কিনের ছবি।"

পুডোভ্কিনের উজ্জ্বল বইটি এবং এই সোভিয়েত পরিচালকের অন্যান্য রচনাবলী পরবর্তীকালে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। অনেক তরুণ পরিচালক, অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের কাছে বইটি পাঠ্যপুস্তকের মত অবশ্য পঠনীয় হয়ে উঠল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল প্রথম প্রত্যক্ষ করল এই প্রভাবের বাস্তব রূপ। আলেজান্দ্রো ব্লাসেট্টির ছবি "১৮৬০" মুক্তিলাভ করল। ছবিটি উল্লেখযোগ্য, এক সুস্পষ্ট অধ্যায়ের স্মারক, ইতালীর চলচ্চিত্রে দিনবদলের এক সুস্পষ্ট দিকচিহ্ন, ছবিটি অত্যন্ত সুষ্ঠু, প্রশ্নাতীত, এবং আমি বলব যে সোভিয়েত ছবির অনিবার্য্য প্রভাবের অতুলনীয় চিহ্নে চিহ্নিত। ইতালীর রাইজঅরগিমেন্তোর গৌরবময় কাহিনী নিয়ে ছবিটি গ্যারিবাল্ডির "থাউজাণ্ড" এর কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে গিউসেপ্পে সিজারে আব্বার রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। গ্যারিবাল্ডির লক্ষ্য ছিল বুরবনদের হাত থেকে সিসিলির দুই রাজ্যকে মুক্ত করা। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের স্মারক "পোটেমকিন" ছবিটির মত '১৮৬০' ছবিটিও ইতালীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই অধ্যায়ের, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে অনুসরণ করেনি বরং কিছু কিছু নির্দিষ্ট মুহূর্তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমৃদ্ধ এই ছবিটি সম্পর্কে করাডো আলভারোর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে কোন নায়ক ছাড়া এই ছবিটির মূল চরিত্র হচ্ছে জনতা এবং ছবিটি ঘটনার গতির ছন্দে নির্ভরশীল। ছবিটি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রতীক 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন,' 'ডিসেণ্ডাণ্ট অফ চেঙ্গিজখান,' এবং 'ব্লু এক্সপ্রেস' প্রভৃতি ছবিগুলির অনুসারী। এ এক অত্যন্ত উপভোগ্য কৌশল কেননা এই কলা-কৌশল ব্যক্তিগত কাহিনী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সামগ্রিক চরিত্রে গ্রথিত করে এবং সহযোগী ভূমিকাগুলি সমগ্র ঘটনাকে অবলম্বন করে বিধৃত হয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা জনগণের আন্দোলন ও ধারণাতে মিলিত হয়। '১৮৬০' ছবিটি এই কলাকৌশলের সার্থক দৃষ্টান্ত।"

আলভারো (যিনি বহু বছর পরে, নয়া-বাস্তবতার যুগে নিজেই ছবিতে কাজ শুরু করেছিলেন, যিনি 'বেকনস ইন দি ফগ' এবং 'ট্রাজিক হাণ্ট' ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার কাজ করেছিলেন।) '১৮৬০' ছবিতে সোভিয়েত প্রভাবের বিশদ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া ব্লাসেট্টি নিজেও এই প্রভাবকে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ব্লাসেট্টির কথায় প্রথম যুগের সোভিয়েত ছবিগুলি যেমন 'ডিসেণ্ডাণ্ট অফ চেঙ্গিসখান,' 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন,' 'মাদার' ও আরো অনেক ছবি আজকের নতুন ইতালীয় চলচ্চিত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রভাব সমান ভাবে পড়েছে সেই সমস্ত তরুণদের ওপর যাঁরা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ করছিলেন এবং সেই নবীন উৎসাহীদের যাঁরা পরবর্তীকালে স্টুডিওতে এসেছিলেন। যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত কোন প্রয়োজনে লাগে তাহলে আমি বলবো যে, সে যুগের উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ছবিগুলি সম্পর্কে আমার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা রয়েছে যদিও ছবি অনুযায়ী এই ধারণার বিভিন্নতা রয়েছে। আমি কিছুটা কমখ্যাত ছবি নিকোলাই এক পরিচালিত 'রোড টু লাইফ' সম্পর্কে সবচেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমি ছবিটিকে শুধুমাত্র প্রশংসা করিনা বা ছবিটি সম্পর্কে কেবল অভিভূতই নই, আমি নিশ্চিন্তভাবে বুঝেছি ছবিটি অপূর্ব কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এবং প্রবলরকম দর্শনীয়তা ছাড়াও 'রোড টু লাইফ' এক নতুন, সজীব এবং প্রাণবন্ত মানবতার আলোকবর্তিকা স্বরূপ………"

সে বছরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমৃদ্ধ আরো একটি ছবি মুক্তিলাভ করলো। ছবিটি এমিলো সেক্‌চি নির্দেশিত 'স্টীল'। পুডোভকিন, আইজেনস্টাইন প্রমুখ সোভিয়েত পরিচালকদের তত্ত্বগত রচনাবলী প্রতিশ্রুতিময় ইতালীয় চলচ্চিত্রের নতুন শক্তির বিকাশে ও সমৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলো। এবং এইভাবে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারিত হল ইতালীয় ছবির জগতে। এখন চলচ্চিত্র বিষয়ক সোভিয়েত গ্রন্থ ও পুস্তকাবলী ইতালীতে অনুবাদ হয়েছে বিপুলভাবে।

এইভাবে আমরা এলাম ১৯৩৪ সালে যখন ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বেশ কিছু সংখ্যক কাহিনী ও তথ্যচিত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উৎসবে যোগদান করলো। ১৯৩২ সালের উৎসবের সময় যে ধরণের পরিবেশ ছিল এবারের উৎসবের পরিবেশ ছিল তার বিপরীত। নাজীবাদের অভ্যুদয়ে ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা তখন সমস্যাসঙ্কুল। বিগত উৎসবের প্রস্তুতিহীনতা এবারে ছিলনা বরং এবারের উৎসব ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। কিন্তু এই সুসংগঠনের সঙ্গে উৎসবে পুলিশের অনুপ্রবেশ ঘটলো। নিম্নোক্ত ছবি-গুলি ভেনিসের দ্বিতীয় উৎসবে প্রদর্শিত হল। গ্রিগরী আলেকজান্দ্রভের 'মেরী ফেলোজ,' আলেকজাণ্ডার ডভ্‌ঝেঙ্কো পরিচালিত 'ইভান,' ভ্ল্যাদিমির পেট্রভের 'দি স্টর্ম,' আলেকজাণ্ডার পটুশকোর 'দি নিউ গালিভার,' মিখাইল রম নির্দেশিত 'বল অফ ফ্যাট,' 'গ্রিগরী রোশাল ও ভেরা স্ট্রয়েভা পরিচালিত 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ নাইট।' এছাড়া উৎসবে প্রদর্শিত তথ্যচিত্রগুলি ছিল, ইয়াকভ পসেলস্কি পরিচালিত 'দি পিপল অফ চেলুইস্কিন,' ঝিগা ভের্তভ নির্দেশিত 'থ্রি সঙস অ্যাবাউট লেনিন' ও সয়ুজ-কিনো প্রযোজিত 'স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল ইন মস্কো'। ছবিগুলি বিপুলভাবে সমাদৃত হল। এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি মনোনয়নের বিচারে সোভিয়েত ছবিগুলি সামগ্রিক ভাবে 'গোল্ডেন কাপ' পুরস্কারে ভূষিত হল। বিশেষভাবে উল্লেখ পেল 'ইভান' ও 'নিউ গালিভার,' 'বল অফ ফ্যাট' ও 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ নাইট'।

সমালোচনায় অবশ্য একটি বিশেষ সুর শোনা গেল বিশেষ করে সেই সমস্ত সংবাদপত্রগুলিতে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিস্টদের কর্তৃত্বে ছিল। মতামত সোচ্চারিত হল যা পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তর যুগেও কিছু কিছু সমালোচক গ্রহণ করেছিলেন যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের স্বর্ণ যুগ অবসিত হয়েছে। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি অবশ্য এ জাতীয় সমালোচনার যথার্থতা প্রমাণ করেনা। বরং এই সমালোচনা একতরফা, অপরিণত ও উদ্ভট লাগে এই ভেবে যে সেবছর সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয় 'চ্যাপায়েভ'-এর মত মহৎ ছবি নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তী বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কী', 'ইভান দি টেরিবল', 'স্করস' ও 'দি রিটার্ণ অফ ভাসিল বর্তনিকভ' প্রভৃতির মত ছবি নির্মিত হয়েছিল।

যুদ্ধপরবর্তীকাল অবধি ভেনিসে ছবি প্রদর্শনের এটিই ছিল শেষ বছর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা তখন চতুর্দিকে। ফ্যাসিস্ট ইতালী

ইথিওপিয়া আক্রমণ করলো এবং এর অব্যবহিত পর থেকেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে বিপুলভাবে সাহায্য করতে শুরু করলো। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী অবশেষে সাংস্কৃতিক প্রকাশ ও শিল্পসৃষ্টির সমস্ত স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করলো। চলচ্চিত্র তাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠলো, বিদেশী ছবিগুলির ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের বিধি-নিষেধ অত্যন্ত অনড় হয়ে উঠলো (এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ছবিগুলির ওপর ভীষণভাবে কাঁচি চালানো হত।) সেন্সর কর্তৃপক্ষ ইতালীর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ জগদ্দল পাথরের মত হয়ে উঠলো এবং বিদেশের ধ্বংসাত্মক আদর্শ থেকে ইতালীয় চলচ্চিত্রকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে সতর্ক হয়ে উঠলো। অপরদিকে আবার ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচারচিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হল এবং ইতালীয় চলচ্চিত্রকারদের এ ধরণের ছবি নির্মাণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হল।

"ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত ছবির বহিরঙ্গকে অনুকরণ করতে চাইলেন এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষিত কলাকৌশল কিছু কিছু প্রচারচিত্রে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্ল্যাক শার্ট' ছবিটির কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের বাঁধনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মহান শিক্ষাকে আবদ্ধ করার বিষয়ে এই ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা অনেকেই মনে করতে পারবেন........." (উমবের্তো বার্বারো)।

এই সমস্ত প্রচেষ্টা এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল যখন আলেক-জান্দ্রভের ছবি 'মেরি ফেলোজ'-এর একাধিক দৃশ্য কার্লো এল, ব্রাগা-গলিয়া নির্দেশিত 'র‍্যাবিড অ্যানিমালস' (১৯৩৮) ছবিতে ব্যবহৃত হল। ফ্যাসিস্ট প্রচারমূলক ছবির প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক আঙ্গিক যা সোভিয়েত ছবির বক্তব্যকে সঠিকভাবে বহন করতে পেরেছিল— অন্ধ অনুসরণের এই প্রচেষ্টা আইজেনস্টাইনের ভাষায় মর্গে প্রাণ সঞ্চার করার মত হয়ে দাঁড়াল। তবুও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটল যখন এই অনুকরণ একটু গভীর হয়ে গেল যখন এই আঙ্গিক বক্তব্যকে সামান্যভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হল তখনই প্রশ্নাতীত প্রচারচিত্রগুলির মধ্যে এমন ছবি দেখা গেল যার ব্যাখ্যার বিভিন্নতা ফ্যাসীবাদীদের মধ্যে সন্দেহ, বিতর্ক ও সংঘাতের সৃষ্টি করলো এবং অবশেষে সেই ধরণের বিতর্কমূলক ছবি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এই ধরণের ঘটনা 'দি ওল্ড গার্ড' ছবিটির ক্ষেত্রে ঘটলো, ছবিটির পরিচালক ছিলেন সেই ব্লাসেটি যিনি এর আগে '১৮৬০' ছবিটি পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ব্লাসেটি সেই সময় নিরুপায় হয়ে ফ্যাসিস্টদের চাপে তাদের নির্দেশমত ছবি তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সময়ে যখন ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতাকে উপযোগিতামূলক ভিত্তিতে ব্যবহার করায় সচেষ্ট, তখন একদল তরুণ চলচ্চিত্রশিক্ষার্থী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিজেরা সংঘবদ্ধ হলেন। এই তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উমবের্তো বার্বারো এবং চিয়ারিনি। এঁদের দুর্গ হয়ে দাঁড়ালো রোমের এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম সেন্টার, যেখানকার পাঠ্যসূচী আইজেনস্টাইন ও পুডোভকিনের রচনাকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই সেন্টারে কিভাবে 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ও 'দি এণ্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' ছবির প্রিন্ট সংগৃহীত হয়েছিল এবং এখানে বারবার এ দুটি ছবি দেখানো হত। ('মাদার' ছবিটি যুদ্ধের পরে ইতালীতে প্রদর্শিত হতে পেরেছিল)। এইভাবে ইতালীয় দর্শক যা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল এই ছবি দুটি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টারের বাইরে গোপনভাবে এই ছবিগুলির প্রদর্শনীর আয়োজনের প্রচেষ্টা করা হল। এক্সপেরিমেন্টাল সেন্টার শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায় মুক্ত বন্দরের মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিরন্তর সরকারী আইন ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ব্যাহত হত। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো কোনো ছবির সম্পূর্ণ প্রদর্শনীতে বাধা দিতেন না সম্ভবত কর্তব্যরত পুলিশবাহিনী এই আবেগদীপ্ত ছবিগুলি দেখে অভিভূত হয়ে যেতেন। আমি 'পোটেমকিন' ছবির একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম। প্রেক্ষাগৃহে হঠাৎ পুলিশ প্রবেশ করলো, যখন ছবির পর্দায় দেখা যাচ্ছে যে কশাকরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। যখন নৌবাহিনীর সমস্ত জাহাজ পোটেমকিনের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন পোটেমকিন সাগরে পাড়ি জমানোর জন্য প্রস্তুত, যখন নাবিকদের 'হুররে' ধ্বনির সঙ্গে দর্শকরাও গলা মিলিয়েছে, তখনই পুলিশবাহিনীর মনে পড়েছে যে কি কারণে তারা প্রেক্ষাগৃহে এসেছে। কিন্তু তখন প্রদর্শনী বন্ধ করা বা প্রেক্ষাগার শূন্য করে দেওয়ার বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করায় অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সেই সময়ে যে তরুণ চলচ্চিত্রকারদের দল এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম সেন্টারে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের ছবি ও রচনা থেকে শিক্ষালাভ করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নয়া-বাস্তবতার যুগের পুরোধা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

আমরা আরো একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনার সাক্ষী হলাম। চলচ্চিত্র থেকে উদ্‌গত আদর্শগুলি ক্রমশঃ এক এবং নিরন্তর প্রসারিত হয়ে ফ্যাসীবাদ বিরোধিতার স্রোতে ব্যাপ্ত হচ্ছিল। এই প্রতিবাদ ও বিরোধ চূড়ান্তভাবে প্রতিভাত হল আগামী দিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে।

যুদ্ধের বছরগুলি ইতালীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বস্তুতঃ নতুন কিছুই সংযোজন করেনি, কেবলমাত্র এই দুঃসহ বছরগুলিতে জনগণের সামাজিক বোধ আরো পরিণত হয়েছিল। এবং এইভাবেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বীজই শুধু রোপিত হয়নি, ধ্বনিত হয়েছিল আগামী দিনের আলোকোজ্জ্বল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্কেত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীয় চলচ্চিত্রের সার্থক জয়যাত্রা শুরু হল। ১৯৪৬ সালের ২৩শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর ভেনিসের অতীব সুদৃশ্য ডোগে-র প্যালেসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। নটি দেশ উৎসবে এই যোগদান করলো—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও ভ্যাটিকান। এই প্রথম ভেনিস উৎসবে সকলরকম বাধানিষেধমুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশকিছু তাৎপর্যময় ছবি নিয়ে এই উৎসবে যোগদান করলো এবং এইভাবে ১৯৩৪ সালে থেমে যাওয়া আলোচনা ও বিতর্ক আবার প্রবলভাবে শুরু হল। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি ছিল ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয় পরিচালিত 'চাপায়েভ,' আলেকজাণ্ডার জারখী ও ইয়োসিফ হেইফিৎজ নির্দেশিত 'বালটিক ডেপুটি', ভিক্টর এইসিমন্ত পরিচালিত 'দেয়ার লিভড্ এ লিটল গার্ল' ভ্লাদিমির পেট্রভ-এর 'গিল্টি ইনোসেন্টস,' মার্ক ডনস্কয় নির্দেশিত 'আনভ্যাঙ্কুইসড্' এবং মিখাইল চিয়াউরেলি নির্দেশিত 'দি প্লেজ'।

কিন্তু পরের বছরের ভেনিস উৎসব আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো তাৎপর্যময়। এই উৎসবে পুডোভকিনের আরো একটি ছবি 'অ্যাডমিরাল নাখিমভ' দেখানো হল এবং এই উৎসবে সোভিয়েত ধ্রুপদী ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজিত হল। এই বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতালীর দর্শকরা দেখতে পেলেন ভিয়াচেস্লাভ ভিসকোভস্কি নির্দেশিত 'জানুয়ারী ৯' (এ ছবিটি অবশ্য আগেও দেখানো হয়েছিল) আইজেনস্টাইনের 'দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ' ও 'অক্টোবর' এবং গ্রিগরী আলেকজান্দ্রভের 'সার্কাস', 'মেরি ফেলোজ,' 'ভলগা-ভলগা' এবং 'স্প্রিঙ্'।

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সংঘাতের মধ্যবর্তী এই সময়টি ছিল সংক্ষিপ্ত। এই উৎসবগুলিতে ইতালীয় চলচ্চিত্রকাররা উপহার দিলেন নয়া-বাস্তবতা যুগের প্রথম কয়েকটি ছবি আলডো ভার্গানো পরিচালিত 'দি সান রাইজেজ এগেন,' রবার্তো রসেলিনী নির্দেশিত 'পয়সা' ও গিউসেপে দা স্যান্টিস পরিচালিত 'ট্রাজিক হান্ট'। কিন্তু এই আলোচনা যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল তা সংক্ষেপিত হয়ে গেল আবার সেই আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য যা সে সময়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকোপে অত্যন্ত বিষাক্ত ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এই ঘটনা ফ্যাসিজমের অবস্থার অনুরূপ ছিলনা। দুই দেশের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে যোগাযোগ এসময়ে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইতালীর সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোধারা এসময়ে এগিয়ে এলেন যাতে এই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী বা গভীর না হয়।

ফ্যাসিজমের বদ্ধ নাগপাশ থেকে মুক্তির পর চলচ্চিত্রে উৎসাহী ইতালীর মানুষ সোভিয়েত চলচ্চিত্রের যা কিছু সম্পদ এযাবতকাল প্রদর্শিত হতে পারেনি তা দেখে নিতে সচেষ্ট হলেন। এই ধরণের ছবি দেখার জন্য চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল এবং তাঁরা একে একে সমস্ত ছবি দেখলেন, অনেক সময় ভালো নয় এমন ছবিও, অনেক অনেক সময় ভালো ছবি। সবক্ষেত্রেই এই দুই ধরণের ছবির মান বিচারে তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গীর স্থিরতা রাখতে পারলেননা, দ্রুততার সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন মতামত দিলেন যা পরবর্তীকালে আবার সংশোধন করে নিতে হল। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ এই দশকের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ করে দুই দেশের চলচ্চিত্রের মধ্যে যোগাযোগের ভঙ্গুর সেতু বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই বছরগুলিতে এই ধরণের উদ্যোগ, প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল বিভিন্ন সংস্থা, বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন, ফিল্ম ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে। এই সমস্ত সংগঠন নিয়মিতভাবে ছবির প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এই সময়ে ইতালার চলচ্চিত্রের বিকাশে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ শুরু হল। এই ধরণের গবেষণা উমবের্তো বার্বারোকে বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কারে সাহায্য করলো যে আবিষ্কারের মূল সূত্র হচ্ছে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষিত চলচ্চিত্র-শিল্পের মূল তত্ত্বই ইতালীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের নব অভিযান শুরুর উৎস স্বরূপ এবং এর অনিবার্য প্রভাব ইতালীয় চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির নব নব বিকাশে সাহায্য করেছে।

বহু সমালোচক, চলচ্চিত্রকার এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পের ছাত্ররা ইতালীয় চলচ্চিত্রের বিপুল অগ্রগতিতে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবের তাৎপর্যকে স্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু পরোক্ষ প্রভাবের কথা বলেন, তাঁদের মতে এই প্রভাব চলচ্চিত্রের নয় এই প্রভাব শুধু তত্ত্বগত রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেননা শিল্পগত প্রকৃতি এবং নান্দনিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ ও সার্থক যোগাযোগের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। আবার কেউ কেউ এই প্রভাবকে ইতালীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশে চূড়ান্ত তাৎপর্যময় বলে বর্ণনা করেন। অন্যান্য অনেকে যেমন মারিও গ্রোমো মনে করেন সোভিয়েত প্রভাব ইতালীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে খুব ব্যাপক নয় কেননা ফ্যাসিস্ট শাসক গোষ্ঠী জনগণকে সোভিয়েত ছবি দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি যদিও একই সময় তিনি স্বীকার করেন যে ইতালীয় ছবির পুনরুজ্জীবনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের

ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং কেউ কেউ ব্রাসেল্লির মত তৎকালীন সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে মহান শিল্পের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে মতামত দিয়ে থাকেন। এছাড়া লুইগি চিয়ারিনি-র মত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষকরা বলেন পুডোভকিন ও আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র অনুশীলনের মূল সূত্র এবং আজকের দিনেও চলচ্চিত্র অভিধান অনুসরণে এবং সামগ্রিক ভাবে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও বিশদীকরণে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এছাড়াও চলচ্চিত্র সমালোচনায় আন্তর্জাতিক খ্যাত সিজানী-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "ডি সিকা ও রসেলিনীর প্রথমদিকের ছবিগুলিতে পুডোভকিন ও তাঁর সহকর্মীদের দৃশ্য-কল্পনা ও আঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা যায়।"

সোভিয়েত ছবির প্রশংসা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জগতে অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ছাত্র ও রসজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা চলচ্চিত্র দর্শকদের এক বিপুল অংশ সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পের মহান কীর্তির সৌন্দর্য ও শক্তিতে অভিভূত ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সোভিয়েত ধ্রুপদী ছবির আলোচনা ও প্রদর্শনীতে, বামপন্থী সাহিত্য-পত্রিকাগুলির বিতর্কে এবং সমকালীন ও পুরানো সোভিয়েত ছবির মধ্যাহ্ন প্রদর্শনীতে জনগণ বিপুল উৎসাহে অংশ-গ্রহণ করলেন। সাধারণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোভিয়েত ছবির সাফল্য বিচার করলেই এই জনপ্রিয়তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সোভিয়েত তথ্য-চিত্র ও শিশু-চিত্র (শেষোক্ত বিভাগের সোভিয়েত ছবিগুলি বলা যায় ভেনিসের আন্তর্জাতিক উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারসমূহের সিজন টিকিট কিনেছে) সাধারণ এবং সর্বসম্মত প্রশংসা অর্জন করেছে।

সম্ভবত যখন নয়া বাস্তবতার অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল তখন পুরানো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আবার নতুন উৎসাহ দেখা গেল। বিশ দশকের সোভিয়েত ছবির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষতঃ ঝিগা ভের্তভের 'সিনেমা ভ্যারাইটি' এই নতুন উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো। চলচ্চিত্রগত প্রকাশ মাধ্যমের নিরন্তর অনুসন্ধান এক সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে আজও অব্যাহত, এই অনুসন্ধান মননশীল দর্শকের সাথে একাত্ম হওয়ার সঙ্গে জড়িত। (এই ইতালীর চলচ্চিত্রের বাজারে 'ওয়েস্টার্ন' মার্কা ছবির এবং সাধারণভাবে বাস্তবতাজিত ছবির প্রাবল্য, এই সমস্ত ছবির এমন অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা এর আগে 'আদর্শবাদী' ছবি নির্মাণে অগ্রণী ছিলেন।) তবুও সার্বিক নৈরাশ্য থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান চলছে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের বিশ দশকের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে পরশমণি করে আজও ইতালীর চলচ্চিত্র-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলেছে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র এক মহৎ ও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র শুধু ইতালীর চলচ্চিত্রে নয় বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পকে বক্তব্য ও আঙ্গিকের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে পৃথিবীটা আর আগের জায়গায় রইলনা তেমনি বলা যায় যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের আত্মপ্রকাশের পরে পৃথিবীর চলচ্চিত্রশিল্প আর আগের অবস্থায় রইলনা। এর আগে চলচ্চিত্র ছিল এক উপভোগ্য গতিশীল চাতুর্য, প্রযুক্তিবিদ্যার এক নব কৌশল যা মানুষের কৌতুহল নিবৃত্তিতেই সফল, পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে পরিগণিত হল।

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 August 1979 Vol. 12 No. 11

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers.

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র
দ্বাদশ বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, '৭৯
চিত্রবীক্ষণ
বিষয়সূচী
ওদের বলতে দাও / তিন
'জলসাঘর'-এর মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে / অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়/ পাঁচ
তৃতীয় বিশ্বের নবতম নির্ভীক চিত্র পরিচালক দারিয়ুস মেহরজুই / প্রদীপ বিশ্বাস / চোদ্দ
তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার / তরুণ মজুমদার / সতেরো
সম্পাদক : অনিল সেন

আমাদের সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হয়ে দাবী দাবী আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।
সব রকমের প্ররোচনা চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জনসাধারণের শত্রু

আইসিএ ৮৮৪৩/৭৯

॥ ওদের বলতে দাও ॥

সরকার বদল মানেই নতুনভাবে কিছু পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি। ব্যাপারটা এতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে এ নিয়ে মাথা ঘামানো মানে মাথা ধরা। নতুন মন্ত্রী মানেই কিছু সদিচ্ছার বাণী সজোরে সশব্দে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই দুয়ের যোগফল হচ্ছে 'কমিশন', 'স্টাডি গ্রুপ' বা 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' ইত্যাদির তৈরী ভারী মাপের রিপোর্ট। নতুন যখন কিছুটা পুরাতন হয়ে যাবে তখন হারিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি, দফতরের কোণে লালফিতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে সেই রিপোর্টের সুপারিশ।

কথাটা উঠলো কেন্দ্রীয় সরকারের 'ফিল্মস ডিভিসন' প্রসঙ্গে। আজ প্রায় এক যুগ ধরে মাঝে মধ্যে শোনা যায় 'ফিল্মস্ ডিভিসন'-এর কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা। ষাট দশকের মধ্যভাগে ভাবনগরীর যুগে এক ঝোড়ো হাওয়া এসেছিলো কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু অন্ধকারের জীবরা তো আলো হাওয়া সহ্য করতে পারেনা। তাই অচিরেই আশার আলো নিভে গেল।

এখন আবার হৈ-চৈ হচ্ছে 'ফিল্মস ডিভিসন'-কে স্বয়ংশাসিত করা হবে কি হবেনা তাই নিয়ে। সরকার নিয়োজিত কমিটির সুপারিশ মানতে যখন সরকারই গররাজী, তখন অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। যে সরকারই গদীতে আসুন না কেন, তারা দেশজোড়া প্রচারের এই সহজলভ্য ঢাকটিকে নিস্তব্ধ করতে চাননা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 'ফিল্মস ডিভিসন' কবে স্বয়ংশাসিত হবে, সে কথা চিন্তা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি চলবে! দিনের পর দিন ভারত জুড়ে ফিল্মস ডিভিসনের এই একচেটিয়া প্রচার কি অব্যাহত গতিতে চলবে?

সারা পৃথিবী জুড়ে যে নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন চলছে তার প্রাণকেন্দ্র হ'ল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি আর তথ্যচিত্র। কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চসংখ্যক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্র এই দেশ ভারতবর্ষে 'ডকুমেন্টারী' বলতে খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝায় মন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা সরকার কিভাবে গ্রামে নতুন জীবন আনছে তার ছবি! 'সৃজনশীল বাস্তবতা'র সঙ্গে এইসব ছবির বাস্তবতার আস্ফালন [illegible] কারবার। ফিল্মস ডিভিসনের ছবি যতোই নির্লজ্জ প্রচার বা নিয়মানের হোক—ম্যালেরিয়া রোগীর ক্লোরোকুইন খাওয়ার মত সারাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতাকে এইসব অসহ্য ছবিকে সহ্য করতে হয়। কারণ সেই বৃটিশ জমানার আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে আবশ্যিকভাবে 'ফিল্মস ডিভিসন'-এর ছবি দেখাতে হবে। আর এই একচেটিয়া অধিকার পেয়েই তারা নির্মূল করতে চায় নতুন চিন্তাধারা, বিতর্কমূলক ভাবনা আর জীবনের বাস্তব ছবি।

সাহিত্যিকের কালি কলম আর চিত্রকরের রং-তুলির মতো চলচ্চিত্র এতো সহজ তৈরী হয়না। তাই যারা বহু কষ্ট করে বহু টাকা যোগাড় করে ছবি বানান তারা অন্তত এটুকু আশা করেন যে তাদের ছবি দেখানো হবে। কিন্তু বেসরকারী ছবি কার্যত বাক্সবন্দী হয়ে থাকবে যদি না ফিল্মস ডিভিসন বা রাজ্য সরকার তা কিনে নেন। সরকারের মনোমত না হলে সে ছবি যে বিক্রী হয় না এই সহজ সত্যটাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

আজকে তরুণ চিত্রানুরাগীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় তৈরী করছেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। এরা প্রচলিত নিয়মের গণ্ডী অতিক্রম করে তৈরী করছেন নতুন ছবি, তুলছেন বিতর্ক, ভাবাচ্ছেন দর্শকদের। আজ এই আন্দোলন ক্ষীণকায়—কিন্তু সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলে একদিন এরাই থেকে সৃষ্টি হতে পারে এক নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন।

আজকে তাই প্রশ্ন উঠছে যাদের ছবি সরকার (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যাই হোক না কেন) কিনছেন না তারা কি সুযোগ পাবেন সাধারণের কাছে তাদের ফিল্মকে পৌঁছে দিতে। বিতর্ক, দ্বিমত এতো শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা চাই এই তরুণ চলচ্চিত্রকাররা তাদের তৈরী স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানোর সুযোগ পান। আমরা দাবী জানাচ্ছি প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মাসের মধ্যে অন্তত এক সপ্তাহ সরকারী পরিবেশনার বাইরের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বাধ্যতামূলকভাবে দেখানোর জন্য আইনের পরিবর্তন করা হোক—এব্যাপারে স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রযোজকেরা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গঠন করতে উৎসাহী হবেন এবং চলচ্চিত্র পরিবেশকরাও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন।

বাক্সবন্দী রেখে চলচ্চিত্র তৈরী অর্থহীন। আমরা চাই সেই বন্দীত্বের অবসান।

ওদের বলতে দাও।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভুপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধুর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

'জলসাঘর'-এর মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(১)

'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্র ও তার চরিত্রায়ণ নিয়ে সম্প্রতি একটি পত্রিকায় কিছু বিতর্ক উঠেছে। বিতর্কের মূল সূত্র বর্তমান লেখকের পাঁচ/সাত বছর আগের লেখা 'জলসাঘর' ছবির মূল্যায়ন যা 'চিত্রবীক্ষণে'-ই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আলোচনায় জলসাঘর সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত একটি মূল্যায়নে ছবির মূল ত্রুটির একটি দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল ছবিতে সত্যজিৎ রায় দ্বিমুখী ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, (ক) সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাত, এবং (খ) বিপরীত দিক থেকে নব্যবুর্জোয়া চরিত্র মহিমের প্রতি অযৌক্তিক অবিচার। এখন প্রশ্ন উঠেছে, প্রথম ভুলটি সত্যজিৎ রায় অবশ্যই করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি আদৌ কোন ভুল কিনা, কেননা নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের সবচেয়ে মন্দ দিক যেটি 'টাকার গরম' বা 'সবার ওপর হল টাকা' এই অসংস্কৃত বোধ যা নব্য-বুর্জোয়ার চরিত্রে দানা বেঁধে ছিল এবং আজো আছে—তাকে প্রচণ্ড ভাবে তিরস্কৃত করা হয়েছে মহিম চরিত্রের মধ্যে এবং সেদিক থেকে সমস্ত ছবির মধ্যে অন্ততঃ মহিম চরিত্রের রূপায়ণে সত্যজিৎ রায়-ই সঠিক।

প্রশ্নটি ভেবে দেখার—কেননা এটি শুধুমাত্র 'জলসাঘর' ছবির সঠিক মূল্যায়নের জন্যই জরুরি নয়, সামন্ত যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের উত্তরণপর্বে নব্যবুর্জোয়া চরিত্রগুলিকে—সমগ্র বিশ্বসাহিত্য জুড়ে এবং চলচ্চিত্রেও যারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—তাদের কোন নান্দনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা দরকার—সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণাকে নির্ভুল করার জন্যও জরুরি।

সুতরাং প্রশ্নটি 'জলসাঘর' ছবির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ প্রশ্নটিকে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা দরকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতটি কি? সেটি হচ্ছে—মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণীকে সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় পরাভূত করে একটি নূতন যুগ নূতন মূল্যবোধ নিয়ে জন্ম নিল, শিল্প বিপ্লব একে ত্বরান্বিত করল এবং রেনেসাঁ ও ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে এই উত্তরণ একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৌছোচ্ছিল। এটা হচ্ছে ইউরোপের চেহারা। আমাদের দেশে এই উত্তরণ স্বভাবতঃই, পিছিয়ে পড়া দেশের মত, সমান ভাবে ঘটেনি—কিন্তু উত্তরণের মূল্যবোধগুলি দেরী করে এলেও এসেছে। এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণে ইউরোপীয় উত্তরণের লক্ষণগুলি আমাদের ক্ষেত্রেও কম বেশি প্রযোজ্য।

বিশাল মনুষ্যজাতির অগ্রগতির হিসেব নিকেশ করার সময় আমরা লক্ষ্য করে এসেছি এই অগ্রগতি বিশ্বের সর্বত্র সমান ভাবে হয়নি—যার জন্য এখনো আদিম সমাজ ব্যবস্থার কিছু কিছু রূপ আফ্রিকায় বা আমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু উপজাতি মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এটা আজ আর নূতন কিছু কথা নয়। কিন্তু যেটা আমরা সব সময় খেয়াল করিনা সেটা হ'ল এই যে, সামগ্রিক উত্তরণ মানেই এটা নয় যে বিগত যুগের (পরাভূত যুগের) **সমস্ত কিছুর-ই** উত্তরণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও উত্তরণ মানে **সর্বক্ষেত্রে** সমানভাবে উত্তরণ নয়। এমনও সম্ভব যে একটা বিশেষ অবস্থায় পরাভূত যুগে একটা বিশেষ ক্ষণে কয়েকটি 'ভালো' জিনিষ গড়ে উঠেছিল, সামগ্রিক ভাবে যুগটি মানুষের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও—এবং সামগ্রিক উত্তরণ ঘটাতে গিয়ে সেই 'ভালো' জিনিষগুলিকে হারাতে হয়েছে।

যেমন মধ্যযুগে পলাতক দাসরা ছোট ছোট 'শহরে' এক ধরণের গিল্ড সিস্টেম পত্তন করে ও সেখানে যে সব কামার, কুমোর, তাঁতী ও ছোট কারিগর শিল্পী ছিল—এরা একধরণের সন্তুষ্টি ভোগ করত। এবং যেহেতু তারা ছিল গিল্ড-এর মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শ্রম বিভাজন (division of labour between the individual guilds) তখনও তেমন দানা বাঁধেনি, তাই কারিগরদের মধ্যেও শ্রম বিভাজন ঘটেনি। ফলে প্রত্যেক কারিগর বা শ্রমিককে (worker) তার হেতার পত্র (tools) দিয়ে যা করা সম্ভব সবই করতে হ'ত···তাই যে-মানুষ চাইত তার কাজে সে হবে একজন দক্ষ ব্যক্তি তাকে তার বিদ্যায় হতে হত সববিষয়ে পারদর্শী। মধ্যযুগের কারিগরদের মধ্যে তাই দেখা গেছে তাদের কাজ সম্পর্কে এক বিপুল আগ্রহ এবং তাতে পারদর্শিতা অর্জন করে তাগিদে তারা সীমাবদ্ধভাবে হলেও এক শৈল্পিক চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারত···সেই তুলনায় আধুনিক যুগের (বুর্জোয়া যুগের) একজন শ্রমিকের কাছে তার 'কাজ' এক বিরক্তিকর উদাসীন ব্যাপার (এমনকি অনেক সময় বিতৃষ্ণার)।' কথাগুলি স্বয়ং এঙ্গেলস ও কার্ল মার্কসের।(১) এর ফলে সে যুগে এই বিশেষ অবস্থায় একজন শিল্পী বা কারিগর তার শ্রমের যে ফল তার সঙ্গে এক বিশেষ সামঞ্জস্য (Harmony) সূত্রে বিবৃত থাকত, তাই তার চরিত্রের সুপ্ত শক্তিগুলি কিছুটা পূর্ণতা পেতে পারত, ধনতান্ত্রিক যুগে অত্যধিক শ্রম বিভাজনের ফলে কর্মের সঙ্গে কর্মীর সেই সামঞ্জস্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ায়—আজ আর সেই চারিত্রিক পূর্ণতা বা অখণ্ডতা, সহজ লভ্য নয়।

এই উত্তরণ পর্বের নিপুণ বিশ্লেষণগুলিতে মার্কস এবং এঙ্গেলসই শুধু নন, সে সময়ের মহৎ মানবতাবাদী শিল্পীরা যেমন শীলার, মহাকবি গ্যেটে এবং

বালজাক নব্যবুর্জোয়া যুগের প্রারম্ভ কালেই মানুষের ব্যক্তিত্বের এই অবক্ষয় বা ভাঙনকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গেছেন।

এ বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হচ্ছে গ্যেটের "উইল্‌হেল্‌ম মেইস্টারের শিক্ষানবীশী" (Wilhelm Meister's Apprenticchip) নামক অসামান্য উপন্যাসটি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ইণ্ডাস্ট্রির বিস্তার, আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার, ভারত ও চীনের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ বেড়ে যাওয়া—এই সমস্ত কিছু নিয়ে পৃথিবী ক্রমশঃ যত ঘনিষ্ঠ হতে থেকেছে এবং মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা, সাংস্কৃতিক ক্ষুধা যত বেড়েছে, জানার আগ্রহ ও নিজেকে বিস্তারিত করার সুপ্ত আগ্রহ তীব্রতর হয়েছে, ততই দেখা গেছে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে এবং যে পলাতক দাসরা একদিন গ্রামের সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য তৎকালীন ছোট্ট ছোট্ট শহরে এসে গিল্ড স্থাপন করেছে, তারাই ধীরে ধীরে নব্যবুর্জোয়ার প্রাথমিক রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে। এটা নব্যবুর্জোয়াদের তৎকালীন প্রগতিশীল ভূমিকামাত্র নয়, বৈপ্লবিক ভূমিকা। কিন্তু এর ফলে যেমন সামগ্রিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে, তেমনি এমনকি সেই মধ্যযুগেও শ্রম বিভাজন (divison of labour) না থাকায় উপরিউক্ত শিল্পী কারিগর যে তাদের কর্মের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিল, ও মানবিক পূর্ণতার স্বাদ কিছুটা পেয়েছিল—সেটি নূতন উত্তরিত বুর্জোয়া যুগে ক্রমশঃ শ্রম বিভাজন তীব্রতর হওয়ায় অপসৃত হয়েছে। মানুষ ক্রমশঃ 'যন্ত্রের একটা অংশে পরিণত হয়েছে' (মার্কস, 'লুডিক ফুয়েরবাখ' আলোচনা) অর্থাৎ যা একটা অনুন্নত পর্বের একটা বিশেষ অবস্থায় ছিল কিছুটা মানবিক, **সামগ্রিক উত্তরণ সত্ত্বেও** শ্রম বিভাজন তাকে করে তুলেছে ক্রমশঃ 'যান্ত্রিক'। এবং কর্মের এই বিভক্তিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ, ক্রমশঃ নব্যবুর্জোয়ার চিন্তাধারাতেও এনেছে একই বিভক্তিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ। সেই জন্যে গ্যেটে তার মানসপুত্র ইউল্‌হেল্‌ম্ মেইস্টারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "আরো লৌহ উৎপাদন করে হবে কি, যদি আমার অন্তরটাও গলানো লোহায় ভরে যায় ?" চিন্তার এই বিভক্তিকরণ বা যান্ত্রিকতার আর একটা রূপ হচ্ছে সূক্ষ্মতার বা সৌজন্যের সব আবরুকে সরিয়ে ফেলে শোষণ ও শাসনের আসল উৎসটির নগ্ন রূপটিকে চিনতে পারার পর—(যার নাম অর্থ বা সম্পদ বা সোনা) মনের ও চিন্তার সবটুকু সেখানেই সমর্পণ করে ফেলা—এবং বিশ্বের সবকিছুকে টাকার মূল্যে বিচার করার প্রবণতা। অবশ্য তাই বলে কোন সামন্ত প্রভুর এটা মনে করে আত্মসন্তুষ্টি ভোগ করার সুযোগ নেই যে তারা এই অর্থশক্তির দাপটেই রাজত্ব করেনি, কিন্তু তবু তখন একে ঘিরে অনেক আবরু ছিল, যেমন ধর্মের আবরু একধরণের সংস্কৃতির আবরু, ঐতিহ্য বা সংস্কারের আবরু --কিন্তু বুর্জোয়ারা এগুলিকে সব আবরুহীন করে ফেলল, নগ্ন সত্যটাকে নগ্নতর করে ফেলল, এবং তার প্রয়োগ হল আবরুহীন ভাবে। গ্যেটের মেইস্টার বলছে "বুর্জোয়ারা চেষ্টা করলে অনেক কিছু শিখতে পারবে, জ্ঞান অর্জন করবে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে যাবে তার কাছে মানুষ সম্পর্কে প্রশ্নটা হবে না 'তুমি কি ?' হবে—'তোমার কি আছে।' অর্থাৎ গ্যেটের মতে—এর পর মানুষের পরিচয় হবে তার কি আছে—কত সম্পদ, টাকা, সম্পত্তি—এই দিয়ে। প্রশ্ন এটা কি প্রাক-বুর্জোয়া যুগে ছিল না ? ছিল এবং গ্যেটের মেইস্টারই তার উল্লেখ করেছে, কিন্তু এরকম আবরুহীন নির্লজ্জ রূপ নিয়ে নয়। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোতে মার্কস এবং এঙ্গেলস এই নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে লিখছেন, "It has pitilessly torn asunder the motely feudal ties that bound man to his 'natural surperiors' and has left remaining no other nexus between man and man than naked self interest than callous". "Cash payment". It has drowned the most heavenly ecstasis of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of Philistine sentimentalism in the icy water of egotistica calculation. It has resolved personal worth into exchange valne, and in place of numberless indefeasible chartered freedoms, has set up that single un-conscionable freedom —Free Trade. **In other word, for explortation, valued by relegious allusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitations".**(২)

এতদসত্বেও এই উপরিউক্ত প্যারাগ্রাফের ওপরই মার্কস-এঙ্গেলস লিখছেন, "The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part." এই ঐতিহাসিক বোধশক্তি বা সচেতনতা তৎকালীন অনেক মহৎ শিল্পীদের মধ্যেও ছিল না. শ্রম বিভাজনের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তার মধ্যে যে সংকীর্ণতা এসেছিল, আবরুময় শোষণকে বে-আবরুভাবে ব্যবহারের যে রুক্ষতা—সেটাই সেই সব মহৎ মানবতা-বাদীকে বেশি আহত করেছে এবং অনেক সময় অসচেতন বা সচেতনভাবে এর বিপক্ষে 'অভিজাত শ্রেণী'র গুণগান করে বসেছেন। গ্যেটের 'মেইস্টার' উপন্যাসেও এর লক্ষণ আছে, যেজন্য সেসময়ের কিছু পরে যুগ-সচেতন কিছু সমালোচক উক্ত উপন্যাসের ক্যাসেলের দৃশ্য পর্য্যায়ের ঘটনার আলোচনায় গ্যেটে কর্তৃক অভিজাতদের গৌরবান্বিত করাকে গ্যেটের 'যুগ চেতনার অভাব' বা 'বেহিসেবীপনা' বলে উল্লেখ করে গেছেন।(৩) কিন্তু আজকে এত কাল পরে পুনশ্চ ইউল্‌হেল্‌ম্ মেইস্টারের শিক্ষানবীশী' পড়লে বোঝা যায় গ্যেটের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যদিও ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তিনি নব্যবুর্জোয়া যুগের অগ্রগমনকে একেবারে চিনতে পারেননি, এটা ঠিক নয়। উক্ত উপন্যাসেই শেষের দিকে 'অভিজাত'দের গৌরবদানকে তিনি প্রায় ধূলিসাৎ করেছেন যখন দেখা যায় একটির পর একটি পারস্পরিক

কন্যাদানের মাধ্যমে বিবাহসূত্রে গজদন্ত মিনারবাসী অভিজাতরা একে একে নূতন যুগের প্রতিভূ বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্যেটের যেখানে মহৎ মানবিক প্রতিবাদ ছিল বুর্জোয়াদের টাকার মূল্যে সব কিছুকে দেখার বিরুদ্ধে, এবং অতিরিক্ত শ্রমবিভাজনের ফলে তাদের খণ্ডিত মানবসত্তার বিরুদ্ধে—সে প্রতিবাদ সেখানে আজো মহত্তর ভূমিকায় উজ্জ্বল, একই সঙ্গে নূতন যুগের অপ্রতিরোধ্য গতিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এবং কোনমতেই তিনি অপসৃত পরাভূত যুগ সম্পর্কে কোন মোহ বিস্তার করেন নি। তাই সেই যুগকে বোঝার ব্যাপারে গ্যেটের 'মেইস্টার'কে যুগান্তকারী গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছেন অনেক শ্রদ্ধেয় আলোচক তার মধ্যে জর্জ লুকাচ অন্যতম।

গ্যেটের কথা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, গ্যেটেকে বলা হয়ে থাকে অখণ্ড মানবসত্তা বা 'হার্মোনিয়াস ম্যান' এর মহান প্রবক্তা। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে দেখলে ক্রমশঃ শ্রমবিভাজনের ফলে বুর্জোয়াদের মানবসত্তা যে ক্রমশঃ সংকীর্ণতর ও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এটা গ্যেটে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। স্বয়ং এঙ্গেলসও তা পারেন নি তাই রেঁনেসার সময়কার বিশাল মানুষগুলি—দান্তে, দ্যভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো—এঁদের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধাবনত এঙ্গেলস যেমন একদিকে জানিয়েছেন এঁরাও ছিলেন বুর্জোয়া যুগের প্রতিভূ, মধ্যযুগীয় সমস্ত মূল্যবোধ থেকে ছাড়া পাওয়া নূতন যুগের মানুষ, এবং এক একটা 'কলোশাস'—কিন্তু "কোন মতেই এঁরা সংকীর্ণ বুর্জোয়া ছিলেন না।" এঙ্গেলস লিখেছেন যে ক্রমশঃ শ্রম বিভাগের ফলে এঁদেরই উত্তর পুরুষ যেমন "একপেশে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত মনের হয়ে পড়েছিল—এই রেঁনেসার স্রষ্টারা ছিলেন তা থেকে মুক্ত।"[৪]

সুতরাং নব্য বুর্জোয়াদের এই যে (ক) টাকার মূল্যে সবকিছুকে বিচার করার প্রবণতা এবং (খ) মানব সত্তার বিভাজন (শ্রম বিভাজনের ফল)—এই দুটি ত্রুটি অবশ্যই অনেককে বিচলিত করেছে এবং এদের মধ্যে যাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর তৎকালীন বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁরা 'অভিজাতদের' পক্ষে চলে গেছেন। গ্যেটের মধ্যেও এর চিহ্ন কিছু আছে, সম্ভবতঃ তাঁর অতলস্পর্শ প্রতিভা তাঁকে শেষ সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এ প্রবণতা এখনো চলছে, একালেও, এবং তারই একটি উদাহরণ 'জলসাঘর' কিনা সেটা আমাদের বিচার্য।

এই প্রবণতার ভুলটা কোথায়? ভুলটা হচ্ছে নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ তার চরিত্রকে না উপলব্ধি করা। আমরা জানি নব্য বুর্জোয়ারা 'ধোয়া তুলসী পাতা' হয়ে আসে নি, কিন্তু এটাও জানি এরা যে 'পাপ' কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেটা মধ্যযুগের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেও অন্য ও আবরুময় চেহারায় যে ছিল না তা নয়, এবং এটাও জানি আবরুময় শোষণকে বে আবরু করে তোলার জন্য শোষণের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে পরবর্তী কালে মানুষ বুঝতে পারায় অনেক সুবিধেও হয়েছে, পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পেরেছে মারটা তার ওপর কোথায়, কী ভাবে ঘটানো হচ্ছে। নব্য বুর্জোয়াদের ভালমন্দ দুটো দিকই সবচেয়ে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস এবং সম্ভবতঃ কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোই তার সবচেয়ে বড় দলিল। সেখানে খুব পরিষ্কারভাবে ('বুর্জোয়া ও শ্রমজীবী' অধ্যায়ে) দেখান হয়েছে, কীভাবে বিগতকালের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই বুর্জোয়ারা ইতিহাসের মঞ্চে এল, দেখান হয়েছে কীভাবে সমস্ত অভিজাতদের দ্বারা নিপীড়িত একটি শ্রেণী অগ্রগামী হয়ে মধ্যযুগীয় 'কম্যুন' এর মত স্বশাসিত সংস্থা সৃষ্টি করেছিল, কিভাবে তৎকালীন উৎপাদন পদ্ধতির পশ্চাদপদতা ঘুচিয়ে ছিল···এবং আধুনিক শিখা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেখান হয়েছে, যে নগ্ন সত্যটা আবরুর আড়ালে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পশ্চাদপটে একদিন লুকানো ছিল—তাকে বুর্জোয়ারা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়েছে—এতে যেমন কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধের ক্ষয় হয়েছে তেমনি শোষণের নগ্নরূপকে জানতে পারায় নিপীড়িত মানুষের ভবিষ্যত বংশধররা, আজকের শ্রমজীবী শ্রেণী হয়েছে উপকৃত। যে সব জীবিকা, যেমন পুরোহিতগিরি, ডাক্তারি, কবি ও শিল্পীর জীবিকা, বৈজ্ঞানিকের জীবিকা—যার উপর এতকাল গৌরবচ্ছটা ছড়ান হ'ত—তাদের পরিচয়কে দাঁড় করিয়েছে বেতনভুক শ্রমজীবী (বুদ্ধিজীবী) হিসেবে—যেটা তাদের আসল রূপ। মধ্যযুগের সামন্তযুগীয় উদ্‌গাতাবা যে 'বীরত্বে'র জয়গান গায়, তার পাশবিকতাকে উদ্ঘাটিত করেছে নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী। **এই শ্রেণীই বিশ্বে প্রথম প্রমাণিত করেছে মানুষের কাজের কী অসীম ক্ষমতা মানুষ কী না করতে পারে।** বুর্জোয়ারাই প্রথম আধুনিক শহরের সৃষ্টি করেছে। সপ্তডিঙা নিয়ে এরাই মহাসমুদ্র পার হয়ে নবনব দেশ আবিষ্কার করেছে। নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃতিই ছিল অবিরাম উৎপাদন পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান, নূতনতর আবিষ্কার, অনবরত একটা চাঞ্চল্যের মধ্যে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা—যা আর আগে কোন যুগে ঘটেনি। বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা পঞ্চাশ বছরে যা করেছে; বিগত সহস্র বছরের সামগ্রিক পরিবর্তন তার কাছে শিশু মাত্র, বুর্জোয়াদের কীর্তি পুরাকালের সব পীরামিডিয় কীর্তিকে করে দিয়েছে ম্লান। বুর্জোয়ারাই প্রথম মানুষকে বুঝিয়েছিল নগ্ন সত্যটা কী, জীবনের বাস্তব অবস্থাটা কী এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই বা কী। তারাই অভিজাতদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় বাণীতে অভিসিক্ত এই মিথ্যা তত্ত্বকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছিল যে তত্ত্ব বলত মানুষের সত্য বংশপরম্পরাগত।

সুতরাং সামন্ত যুগের উত্তরণ পর্বে নব্যবুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক ভূমিকা খাটো করে দেখার অর্থ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। এরই সঙ্গে মানবসম্পর্ককে টাকার সম্পর্কে নামিয়ে আনার প্রবণতার জন্য বুর্জোয়াচরিত্রের প্রতি গ্যেটের ধিক্কারও ভুলে থাকা উচিত নয়।

সাহিত্যে শিল্পে চলচ্চিত্রে চিত্রিত এই উত্তরণপর্বের নব্যবুর্জোয়াচরিত্র-

গুলিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে আমাদের তাই দুধরণের বিভ্রান্তি থেকেই দূরে থাকতে হবে। প্রথম বিভ্রান্তি হচ্ছে, নব্যবুর্জোয়ার সামগ্রিক ভূমিকা বৈপ্লবিক বলে, তার চরিত্রে শ্রমবিভাজনজনিত যে খণ্ডীকরণ ও তজ্জনিত একধরণের বর্বরতা এসেছিল এবং সব সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কতে পরিণত করার কুৎসিত যে প্রবণতা তার ছিল—তার এই ত্রুটিকে এড়িয়ে যাওয়া। এই ভুলটি কোন কোন মার্কসবাদী কখনো কখনো করে থাকেন। (যেমন সাত বছর আগের 'জলসাঘর' আলোচনায় এই রকম ভুল আমি করেছিলাম ঃ **কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি আরো মারাত্মক**—সেটি হচ্ছে, বুর্জোয়া চরিত্রের উপরিউক্ত ত্রুটি দেখে নব্যবুর্জোয়াশ্রেণীর সামগ্রিক এবং বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে বিগতকালের অভিজাতদের গৌরবান্বিত করা, তাদের মধ্যে 'এই পবিত্র যুগের অবসান' দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা এবং তাকে নিয়ে রোম্যান্টিক হয়ে পড়া বা বিগত আরো ক্ষতিকারক যুগের কিছু কিছু 'ভালো' বা তথাকথিত ভালোর জন্য নস্টালজিয়া উদ্রেক করান—অথবা যারা এই ভাবে 'অভিজাত'দের সঙ্গে একাত্মতার দরুনই যে নব্যবুর্জোয়াদের 'টাকাসর্বস্ব' মানসিকতাকে আক্রমণ করেছে, গোটের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বা অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবত্বের তাগিদে যে নয়—তাদের এই উদ্দেশ্য না বুঝে **নব্যবুর্জোয়ার 'কদর্য' দিকটিকে আক্রমণ মাত্রই প্রগতিশীল কাজ** বলে চিহ্নিত করা। এই ভুলটিও অনেকে করে থাকেন, এঁদের উদ্দেশ্যে মার্কস এঙ্গেলসের সেই শ্লেষবাক্যগুলি স্মরণীয় যা তাঁরা লিখেছিলেন 'ফিউডাল সোস্যালিজম'-এর বিরুদ্ধে। যে অদ্ভুত 'সমাজতন্ত্র'-এর নাম নিয়ে একদা পরাভূত 'অভিজাত'রা বুর্জোয়া চরিত্রের দোষগুলিকেই শুধু দেখিয়ে ও নিজেদের শোষণ যে কত 'নিরীহ' ছিল তা বলে বেড়িয়ে তাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাত।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই আশা করা যায় যে সেই উত্তরণ পর্বের মহৎ সাহিত্যিকরা সেকালের নব্যবুর্জোয়ার চরিত্রায়নে উপরিউক্ত দু ধরণের বিভ্রান্তিকে পরিহার করবেন। এবং সত্যই বেশির ভাগ তাই করেছেন। গোটের অর্ধশত বৎসর পরে সেই নূতন বুর্জোয়া যুগ থেকে তিনি যেকোন ঐতিহাসিকের চেয়েও ভাস্বর করে রেখে গেছেন, সেই অমর বালজাক একই অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন, সচেতনভাবে তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও। বালজাকের বিভিন্ন উপন্যাসে অভিজাতদের সামনাসামনি নব্যবুর্জোয়া চরিত্রকে খাড়া করা হয়েছে, এবং কে না জানেন বালজাকের শ্রেণীগত সহানুভূতি ছিল এই অভিজাতদের প্রতিই, তবুও অভিজাতদের পতনের বর্ণনায় বালজাকের কলম হয়েছিল নির্মম শুধু তাই নয়, এঙ্গেলসের ভাষায়, "তিনি এই পতনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেই ভাবেই এদের বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝা যায় অভিজাতরা **এই পতনেরই যোগ্য** (deserving no better fate)।" এঙ্গেলস এরপরে লিখছেন, বালজাক চোখের সামনে দেখেছিলেন তাদের যারা ভবিষ্যতের সত্যিকার মানুষ। এটাই হচ্ছে রীয়ালিজমের জয়, এবং এটাই হচ্ছে বালজাকের সবচেয়ে গরিমাময় দিক।"(৫) একেই একটি ভিন্ন পত্রে এঙ্গেলস লিখেছিন, "What boldness! What a revolutionary dialecties in his poetic justice।"(৬) এখানে poetic justice-র ডায়ালেকটিস্ কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার ভিত্তিতে আমরা 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় ও মহিম চরিত্র আলোচনা করব।

গোটে এবং বালজাকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার, তাঁরা নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানে যাই থাকুননা কেন, তাঁদের সাহিত্যের দর্পণে অভিজাত এবং নব্যবুর্জোয়ারা যখনই মুখোমুখি হয়েছে, নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের কদর্যতা অর্থগৃধ্নুতা ও টাকার মূল্যে সব কিছুকে দেখার প্রবণতাকে তাঁরা যেমন প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন—কিন্তু তা করতে গিয়ে কখনোই অভিজাতদের পক্ষে ঢলে পড়েন নি। গোটের ইউলহেলম্ মেইস্টার অভিজাত সম্পর্কে একজায়গায় বলছে, "যেহেতু একজন অভিজাত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদরাশি পেয়েছে সম্পূর্ণ আরামের জীবন সম্পর্কে সেতো নিশ্চিন্ত...তাই সাধারণতঃ এই সব সম্পদকেই জীবনের প্রাথমিক ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু ভাবতেও সে অভ্যস্ত, স্বভাবতঃই প্রকৃতিপ্রদত্ত মানবতার মূল্যকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পারবেনা। অধঃস্তনদের প্রতি, এমনকি অন্য একজন অভিজাতের প্রতিও একজন অভিজাতের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদাই বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা প্রভাবিত, অভিজাতরা তাদের খেতাব, পদমর্যাদা, তার রূপ, বহিরাবরণ জাঁকজমক ইত্যাদিকে ব্যবহার করে, কিন্তু কদাপি নিজেদের আসল স্বরূপটির নয় ('not his own worth')।" এথেকেই স্পষ্ট, বুর্জোয়া চরিত্রের যেটা সবচেয়ে বড় কদর্যতা, মার্কসের ভাষায়—"no other nexus between man and man than...callous cash payment" (মূলতঃ এই cash nexus কথাটি তরুণ মার্কস পেয়েছিলেন কার্লাইলের লেখা থেকে)—সেটা এত নগ্ন আকারে না হলেও মূলতঃ অভিজাত চরিত্রেও ছিল, এবং গোটেকে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত করার অপচেষ্টা হলেও, গোটেকে বোকা বানানো সম্ভব হয়নি, তিনি সত্যটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন।

এমনকি সেক্সপীয়ার, যার সময়ে ইংল্যাণ্ডের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারাটা গোটের জার্মানী বা বালজাকের ফ্রান্সের মত ছিলনা, অর্থাৎ অন্ততঃ অনেকের মতে সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব দেয়নি, বরং বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল—এককথায় ফ্রান্স বা জার্মানীর মত সেক্সপীয়ারের সময়কালের ইংরেজ বুর্জোয়ারা 'বৈপ্লবিক' ভূমিকা নেয়নি—এবং তাই সেক্সপীয়ার যেখানে যেমন পেরেছেন নব্য বুর্জোয়াদের 'cash-nexus' কে আক্রমণ করেছেন, যার সবচেয়ে প্রকট মূর্তি শাইলক—এবং হ্যামলেটকে নব্য বুর্জোয়াদের সংগুণের প্রতীক ধরা হয়েছে ও তাকে সমর্থন করা হয়েছে বলে যে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করে

থাকেন—সে কথা না ভুলেও বলা চলে—সেক্সপীয়ার নব্য বুর্জোয়াদের সমর্থন না করুন, কিন্তু তা বলে অভিজাতদের বিপক্ষে নব্য বুর্জোয়াদের উপস্থাপিত করে অভিজাতদের গৌরবগান গেয়ে গৌরবান্বিত করেন নি। উৎপল দত্ত তাঁর অতি মূল্যবান "সেক্সপীয়ারের সমাজ চেতনা" গ্রন্থে লিখছেন "পচা ফিউডাল সমাজকেও গ্রহণ করা তাঁর (সেক্সপীয়ারের) পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। 'টিমন' বা 'ওথেলো' যেমন বুর্জোয়া মতবাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ, 'কোরিওলানুস' এবং 'চতুর্থ হেনরি' ফিউদাল মূল্য বোধের ওপর তেমনি তীব্র আক্রমণ।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নানান চারিত্রিক বিকৃতির জন্ম নব্য বুর্জোয়াদের সমালোচনা করা এক জিনিস, কিন্তু সেই সমালোচনাকে ব্যবহার করে অভিজাতদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করান আর এক জিনিস। প্রথমটি গ্যেটে, শীলার, বালজাক এবং সেক্সপীয়ার সবাই কম বেশি করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি কদাপি নয়। সেক্সপীয়ারের প্রশ্নটি জটিলতর হওয়ায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার অবকাশ এখানে নেই বলে তাঁকে বাদ দিলে, গ্যেটে, শীলার এবং বালজাক সম্পর্কে বলা চলে তাঁরা তদুপরি নব্য বুর্জোয়াদের সামগ্রিক বৈপ্লবিক ভূমিকাকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে কিন্তু অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করেছেন।

এখানে আর একটি জটিল প্রশ্ন আসে। নব্য বুর্জোয়ারা কি সচেতনভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল? যদি তা না করে থাকে, তাহলে তার জন্য তারা কি প্রশংসা দাবী করতে পারে? তাদের সবকিছুকে টাকার মূল্যে দেখার প্রবণতা, অর্থগৃধ্নুতা কিন্তু প্রত্যক্ষ বা সচেতন প্রক্রিয়া এবং সেজন্য তারা আক্রমণের যোগ্য। তাহলে কি এটাই ঠিক যে, যেহেতু তাদের, বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন ছিল অপ্রত্যক্ষ অসচেতন প্রক্রিয়া তাই তার জন্ম প্রশংসা তাদের প্রাপ্য নয়, কিন্তু তাদের 'cash-nexus' বা অর্থগৃধ্নুতা ইত্যাদি ছিল প্রত্যক্ষ ও সচেতন কাজ—তাই তারা নিন্দাযোগ্য—এবং "তাই সামগ্রিকভাবে তারা নিন্দারই যোগ্য?" ব্যাপারটা যদিও জটিল, কিন্তু যেভাবে উপরোক্তভাবে কেউ কেউ এই জটিলতাকে সহজ করতে চান, সেটাও অত্যধিক ও যান্ত্রিক সরলীকরণ। আমার বিনীত ধারণা, একমাত্র দ্বান্দ্বিকভাবেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব। এই পদ্ধতি 'ইউলহেলম মেইস্টার' উপন্যাসে গ্যেটে নিয়েছেন বা বালজাক তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই কম বেশি নিয়েছেন ('Dialecties of Poetic Justice'—Engles)। অর্থাৎ তাদের ভালো দিকটির সঙ্গে খারাপ দিকটিও দেখাতে হবে, এবং খারাপের সঙ্গে ভালো দিকটি—এবং সামগ্রিক ভাবে তাদের দ্বান্দ্বিক রূপটি অন্য কোন সমাধানের নিদর্শন করছে কিনা। তা না করলে আমরা আর এক ধরণের ভ্রান্তির শিকার হব—যা পূর্বোক্ত দুটি ভ্রান্তিকে ধরে তৃতীয় ভ্রান্তি।

এই তিন রকম ভ্রান্তি থেকে দূরে সরে এসে বিচার করা যাক 'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্র।

(২)

'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সামগ্রিক ছবির আলোচনাতে যত স্পষ্ট হওয়া সম্ভব—অন্যভাবে তত নয়। কিন্তু এখানে সে অবকাশ নেই। এখানে মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে ছবিটি সম্পর্কে বা অন্য চরিত্র সম্পর্কে যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই বলা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন—ছবিতে মহিম একজন নিছক নব্যবুর্জোয়া চরিত্র অথবা নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ যার মধ্যে থাকবে এমন একটি নব্য-বুর্জোয়া চরিত্র? এর উত্তর, ছবিটি যেহেতু এক যুগ সন্ধিক্ষণকে নিয়ে এবং যেহেতু গৌরব সায়াহ্নের আলোয় রঞ্জিত একজন 'অভিজাত' এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র যার বিপক্ষে মহিম উপস্থাপিত, তখন মহিম নিছক মহিম নয়, তার মধ্যে নব্যবুর্জোয়ার শ্রেণী বিশেষত্ব বা টিপিক্যালিটি থাকা অবশ্যই উচিত। এ বিষয়ে যার দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ বলে প্রচারিত এবং এমনকি বুর্জোয়া এরিক রোড-ও যার এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তার The History of Cinema' গ্রন্থে—সেই মার্কসবাদী পণ্ডিত জর্জ লুকাচ তাঁর The Historical Novel গ্রন্থে যুগসন্ধিক্ষণের ওপর লেখায় বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে (এবং একই কথা চলচ্চিত্রে) এই ধরণের চরিত্রের চরিত্রায়ণে যে তিনটি স্তর বা মাত্রা থাকা দরকার বলে দেখিয়েছেন—তা হচ্ছে (১) চরিত্রটির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপ বা ব্যক্তিরূপের স্তর, (২) চরিত্র যে সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অসচেতন বা সচেতন ভাবে তুলে ধরছে—সেই সামষ্টিক বা শ্রেণীরূপের স্তর এবং (৩) চরিত্রটির ব্যক্তিরূপ বা শ্রেণীরূপের (মূলতঃ শ্রেণীরূপের) মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক শক্তি রূপ নিচ্ছে—চরিত্রটির সেই ঐতিহাসিক স্তর—(historial dimension). লুকাচের বক্তব্য আক্ষরিক ভাবে না তুলে, তাঁর বক্তব্য মূলতঃ যা তাই বলা হল। লুকাচেরই হোক, বা যারই হোক—ঐতিহাসিক স্তর বিশিষ্ট যে কোন উপন্যাস, মহাকাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে যেসব প্রধান চরিত্র থাকে তাদের অমরত্ব যে নিহিত থাকে চরিত্রগুলির মধ্যে এই ত্রিরূপের মিলনের জন্য তার প্রমাণ টলস্টয়, বালজাক, গর্কী, চেখভের অমর চরিত্রগুলি—এবং এটা ঘটনা।

সুতরাং 'জলসাঘর' ছবিতে মহিম একদিকে (১) ব্যক্তিমানুষ, (১) অন্যদিকে তার মধ্যে তার শ্রেণী চরিত্রের লক্ষণ থাকা উচিত, (৩) তৃতীয়তঃ তার চরিত্রের একটি শৈল্পিক ঐতিহাসিক মাত্রা বা ডাইমেনশন থাকা উচিত। এবং এগুলি থাকা উচিত এক দ্বান্দ্বিক বিধি নিয়মে, যান্ত্রিক ভাবে নয়।

ব্যক্তি মানুষ হিসাবে মহিমের চরিত্রায়ণ, আমার মতে, নিখুঁত। গঙ্গাপদ বসুকে দিয়ে, তাঁর চেহারা, ভাব ভঙ্গী, বচন, চলন সব কিছু দিয়ে এমন একটি চরিত্রের 'ইমেজ' সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর প্রথম পর্বের প্রতিভার গভীর স্বাক্ষরবাহী। যাঁরা ব্যক্তিমানুষের স্তর ছাড়িয়ে মহিমকে অন্যভাবে দেখতে চাইবেন না তাঁদের স্মৃতির চরিত্র

চিত্রশালায় মহিম স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু এটা হচ্ছে খণ্ডিত দৃষ্ট, এদের স্মৃতির চিত্রশালায় ধূলি ধূসরিত ব্যক্তি মহিম ক্রমেই বিস্মৃত হয়—এটাও স্মর্তব্য। তার কারণ এই ধরণের যুগ সন্ধিক্ষণের ওপর রচিত শিল্পে বিশুদ্ধ ব্যক্তি চরিত্রের ধারণাটাই মূলতঃ ভ্রান্ত।

অতএব মহিমের চরিত্রায়ণের দ্বিতীয় স্তর, তার শ্রেণী চরিত্রের বা টাইপ চরিত্রের প্রসঙ্গ অবশ্যই ধর্তব্য। এখানে তার মত নব্যবুর্জোয়া চরিত্রে সদাত্মক ও নঞাত্মক দিক মিলে মিশে আছে। বিনা দ্বিধায় বলা চলে মহিমের মত নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের নঞাত্মক দিক, তার কল্প খণ্ডিত আত্মসত্তা, তার টাকার গরম,—এসব সত্যজিৎ তুলে ধরেছেন এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন এসব নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করেছেন তা নয়, তাকে হাস্যকর চরিত্র হিসেবে, প্রায় ভাঁড় সদৃশ চরিত্র হিসেবে, উত্থাপিত করেছেন। বোঝা যায়, মহিমকে আক্রমণ করার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় যেন রীতিমত স্ফূর্তি অনুভব করেছেন। এটি করা ঠিক হয়েছে কিনা সেটি বিচার্য। আপাতঃ ভাবে অবশ্যই ষোল আনা সঠিক। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে—এই ধরনের সচেতন-অচেতন দোষ-গুণ মেশান চরিত্রকে বিচার করার পদ্ধতি হল—"Dialecties of Poectic Justice". সেই ডায়ালেকটিকস্ তো দূরে থাকুক 'পোয়েটিক জাস্টিস' কি মহিমের প্রতি সত্যজিৎ রায় করেছেন? এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে, মহিমের 'টাকার গরম' ইত্যাদি মহিমের সচেতন দোষ বা প্রত্যক্ষ স্বরূপ আর নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে মহিমের ভূমিকা তা নিতান্তই ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ অপ্রত্যক্ষ ও অসচেতন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র—সুতরাং এই পরোক্ষ বা অসচেতন ভূমিকার সমর্থনের জন্যই মহিমের সচেতন স্বরূপকে অস্বীকার করার কারণ নেই। অস্বীকার কোনটাকেই করা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন কতটা গুরুত্ব দেব? সত্যই কি মহিমদের বা নব্যবুর্জোয়াদের ভূমিকা 'নিতান্তই' ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ? এটা ষোলআনা সঠিক নয়, এটাও একটি জটিল ব্যাপারের সরলীকরণ। বালজাক বা চেখভের সাহিত্যে অনুরূপ নব্যবুর্জোয়া চরিত্ররা তার প্রমাণ। বস্তুতঃ গ্যেটের 'মেইস্টার' ও বালজাক সাহিত্যের পর যে অমর শিল্পকর্মটি এই বিষয়ের ওপর একটি দিগনির্দেশক সৃষ্টি বলে সারাবিশ্বে স্বীকৃত সেটি হচ্ছে চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড"—যার সঙ্গে 'জলসাঘর' ছবির বিষয়বস্তুর, এমনকি কিছু কিছু ঘটনারও এত মিল যে চোখে না পড়ে যায় না। সেখানেও মহিমের তুল্য একটি চরিত্র আছে লোপাখিন, পূর্বতন দাস এখন নব্যপুঁজিপতি—সেখানে কিন্তু তার অর্থমগ্ন খণ্ডিত সত্তা, যেজন্য সে প্রেমকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে অসাড়—এসব দেখান হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যে প্রগতিশীল ঐতিহাসিক শক্তি কাজ করছে, তাকেও সে সচেতনভাবে চিনতে পেরেছে এর চিহ্নও আছে। মহিমের মধ্যে এটা সত্যজিৎ (এবং তারাশংকরও) দেখাননি—এবং **সেটাই একমাত্র সম্ভাব্য ঘটনা** মনে করে তাবৎ নব্যবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে ও তাদের ভূমিকাকে নিতান্তই ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বলে ফরমান জারি করা যান্ত্রিকতা নয়। তা যদি হয় তাহলে বিশ্ব সাহিত্যের অনেক অমর নব্যবুর্জোয়া চরিত্রকে এক কথায় খারিজ করতে হয়। তাছাড়া এঙ্গেলসের সেই কথাটা ভুলে থাকা অনুচিত যেখানে রেনেশাঁর মহৎ ধারকদেরও তিনি নব্যবুর্জোয়া বলেছেন, "যদিও তারা সংকীর্ণ বুর্জোয়া ছিলেন না" (F. Engles : Dialectics of Nature, Moscow Publication, page 21-22 এবং George Lukaes : "Writer & Critic". Merlin Press, London, page 91) সুতরাং শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ "বুর্জোয়াদেরই নব্যবুর্জোয়া বলে ধরে নেওয়াটা কি অধিক মনগড়া সরলীকরণ নয়? একই সঙ্গে এঙ্গেলসের আর একটি কথাও স্মর্তব্য, তিনি বলেছেন নব্যবুর্জোয়ারা খণ্ডিত সংকীর্ণ সত্তার অধিকারী হয়েছিল "কিছুটা পরবর্তীকালে যখন শ্রম বিভাজন তীব্রতর।" বুর্জোয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যদি কালানুসারে বিচার করা যায়, দেখা যাবে—উদয়-কালে এরা ছিল **'বৈপ্লবিক'** ক্রমশঃ **বিকৃত**, এবং আজ অন্তিমক্ষণে এরা চূড়ান্ত **প্রতিক্রিয়াশীল**। সুতরাং যখন আমরা নব বুর্জোয়াদের বিচার করব তখন তার "নবত্ব" সম্পর্কে আমাদের খেয়াল রাখা কি উচিত নয়? বস্তুতঃ এই 'নব' বা সেই যুগসন্ধিক্ষণে তাদের 'অপ্রত্যক্ষ' ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে **ততটা** অসচেতন ছিলেন না, **যতটা** মহিম চরিত্রায়ণের জন্য সত্যজিত রায়ের উদার প্রশংসাকারীরা ভাবেন। কয়েকটা সহজ উদাহরণ ধরা যাক—যেমন সামন্ত অভিজাতরা "নীলরক্তের পবিত্রতা" বা মানুষের সত্য বংশ পরম্পরাগত, অথবা তার "বংশপরম্পরাগত অধিকারের ন্যায্যতা"—ইত্যাদি যে সব ধারণাকে সমাজে দৃঢ় প্রোথিত করে ছিল, তার বিরুদ্ধে নববুর্জোয়াদের লড়াই, অথচ ছবিতে মহিম এর উল্টো কথাই বলেছে। পেডিগ্রির জয়গান গেয়ে অভিজাতরা যে "শ্রম"কে ঘৃণা করে এবং সেই তুলনায় নিষ্কর্মা বসে কলানুরাগকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিল, যারা সারাজীবনে এক ঘটি জল নিজে গড়িয়ে খায়নি তারা গৌরব বোধ করত কেননা তারা জলসা বসাত, ঠুংরীর রস উপভোগ করতে জানত। তাদের এই শ্রমবিমুখতাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছিল নব বুর্জোয়ারা সেটা তাদের ছিল সচেতন কাজ। ঠিক এই প্রসঙ্গটি অন্যভাবে স্বয়ং টলস্টয় তুলেছেন তাঁর কিছুটা আত্মজীবনী মূলক অমর "লাইট সাইনস্ ইন দ্য ডার্কনেস্" নাটকে। সাধারণভাবে সামন্তযুগের রুদ্ধতা ও অনড়ত্বকে যে তারা ভেঙে দিয়েছিল, সেটা অনেক সময়ই ছিল তাদের সচেতন কাজ। এছাড়াও আর যেসব সচেতন প্রগতিশীল ভূমিকা তারা নিয়েছিল তার বিবরণ বালজাক সাহিত্যে আছে, এবং চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড" নাটকেও। এই প্রসঙ্গে পাঠককে বিশেষ করে লোপাখিনের চরিত্রটি স্মরণ করতে বলি। জমিদার বাবুদের বসে বসে খাওয়া এবং মেকী সৌন্দর্যবাদও অবাস্তব রোম্যান্টিকতাকে লোপাখিন বেশ ভাল রকম ব্যঙ্গ করেছে একটা চেরীর বাগান, শুধু সৌন্দর্যদান ছাড়া যার আর কোন কাজ নেই—তার জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, কলকারখানার প্রতিষ্ঠাকে লোপাখিন সচেতনভাবে

শুধু স্বাগত জানায়নি, হাতে নাতে করতে চেয়েছে, এটা তার মুনাফা অর্জনের স্পৃহার সঙ্গে মিশে গেছে বলেই কাজটা অসচেতন বা কাজটা বিশুদ্ধ স্বার্থান্বেষণ বলা চলেনা—সাধারণ মানুষের কথাও লোপাখিন ভেবেছে ও বলেছেও। এর কারণ লোপাখিনের চরিত্রায়ণের মধ্যে (১) তার অর্থ-মগ্নতা, তার খণ্ডিত মানবসত্তা এবং (২) তার শ্রেণী হিসেবে প্রগতিশীল ভূমিকা—এই দুটিকে 'ডায়ালেকটিকস্ অব পোয়েটিক জাস্টিস' এর বিচারে এনে তুলে ধরা হয়েছে—এবং সৃষ্ট হয়েছে এক স্মরণীয় চরিত্র।

এর থেকে বোঝা যায় 'জলসাঘর' ছবির মহিম বিশুদ্ধ একটি "সংকীর্ণ বুর্জোয়া" হিসেবে চিত্রিত, নব্যবুর্জোয়ার অন্যান্য সচেতন গুণের চিহ্ন নেই, এমনকি খুব স্পষ্ট যে চিহ্নগুলি থাকা অবশ্যম্ভাবী ছিল—তার উদ্যম, তার আত্মশক্তির ওপর দৃঢ়তা—এগুলি পর্যন্ত নেই। ছবিতে তাকে দেখে দর্শকরা হেসেছে। যে যখনই অভিজাত বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে উপস্থিত তখনই দেখা যায় সে নার্ভাস, তার মধ্যে একটা 'হেঁ হেঁ' ভাব, তার গরু চোরের মত চাহনি, একটা বিপন্ন অপ্রতিভতা—তার সামগ্রিক 'ইমেজ' এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা হীনত্ব এবং এটা সত্যজিৎ রায় বেশ ভালো ভাবেই ফুটিয়ে গেছেন দক্ষতার সংগে। পদে পদে সত্যজিৎ বলতে চেয়েছেন "দেখ এই অভিজাতের তুলনায় নব্য বুর্জোয়াটি কত হীন।" একে নিয়ে বেশ হাস্যরসের অবতারণাও করা হয়েছে। কেন? এতে কি জর্জ লুকাচ কথিত এবং এরিক রোড স্বীকৃত টাইপ চরিত্র হিসেবে বা শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ থাকার প্রশ্নে মহিমের চরিত্রায়ণ ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে না? অবশ্যই যাচ্ছে। জলসাঘরের মহিম চরিত্রায়ণের গুণগ্রাহী যেসব আলোচক 'ছবিতে মহিম প্রায় আগাগোড়া হাসির পাত্র'—এটা দেখেও এর পিছনে সত্যজিতের উদ্দেশ্যটা ভুলে থাকতে চেয়েছেন তাঁদের প্রতি প্রশ্ন তাঁরা কি মহৎ বিশ্ব সাহিত্য থেকে এমন একটিও উদাহরণ দিতে পারবেন যেখানে এই যুগসন্ধিক্ষণের ওপর স্বীকৃত কোন মহৎ রচনায় নব বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব গুণ সম্পন্ন কোন চরিত্রকে নিয়ে পাঠকের 'আগাগোড়া' হাস্যোদ্রেক করান হয়েছে—বিশেষ করে যে নব বুর্জোয়া চরিত্র অভিজাত চরিত্রের বিপক্ষে উপস্থাপিত?

যদি স্বীকার করা হয়ও যে, শ্রমবিভাজন তীব্রতর হওয়ায় বুর্জোয়া চরিত্র এত বিকৃত খণ্ডিত হয়ে গেছে যে তা প্রায় 'ক্যারিকেচারের পর্যায়ে এসেছে (এটা ঘটতে পারে) তাহলেও লক্ষ্য করার যে এ ধরণের চরিত্র নব বুর্জোয়ার মধ্যে পড়ে না, এটা ঘটেছে আরো পরবর্তীকালে যখন তাদের নবত্ব গেছে ঘুচে। যারা উদয়কালে অভিজাতদের বিরুদ্ধে উদীয়মান তারা 'ক্যারিকেচার' শ্রেণীতে পড়ত না।

এবং মহিম তার গরুচোর ভাব, হীন চাহনি, বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে তার অপ্রস্তুত ভঙ্গী, জমিদারের কবুতর কর্তৃক তার গায়ে মলত্যাগ দৃশ্যে তাকে নিয়ে সত্যজিতের মজা দেখান—এসব কিছু সৃষ্টি করেও সত্যজিৎ থামেননি—মহিমের কমিক ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বজ্জাতি বা villainy-র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবশ্যই এটি প্রকট নয়, এটি ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে বা সংলাপে অতটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু মহিমের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসুর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে তার চাহনি, তার প্রত্যক্ষ বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে গোবেচারী 'হেঁ হেঁ' ভাব, আড়ালে ঘৃণা, বিশেষ করে বিশ্বম্ভরের বর্তমান দারিদ্র্য দেখে ভিতরে ভিতরে স্ফূর্তি, বিশ্বম্ভর রায়ের চাকরের কাছে কথা বলার সময় গলার স্বরে শ্লেষ—এর মধ্যে স্পষ্ট। ক্রিস্তিঁয়া মেজ (Christian Metz) যাঁর 'A Semiotics of the Cinema' একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ, দেখিয়েছেন ঘটনা পরম্পরায় যে 'হোরাইজনট্যাল' রেখা তার মধ্যে দিয়েই শুধু ছবির বক্তব্য বলা হয় না, আর একটি 'ভার্টিকেল' রেখাও চলচ্চিত্র ভাষায় থাকে, যাকে বলা হয়েছে চলচ্চিত্রভাষায় paradigmatic dimension এর মধ্যে সেখানে একটি বস্তুর প্রতীকী উপস্থিতি, চরিত্রের অভিনয়ের একটি ভঙ্গীও একটি নূতনতর অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। মহিমের কমিকী সূক্ষ্ম বজ্জাতিটা আছে সেই ছবির ভাষার paradigmatic dimension এর মধ্যে। (মেজ্ এর পূর্ণ বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য Film Theory And Criticism, O. U. P, Christian Metz : Page 103—119 এবং The Major Film Theory, O. U. P, page 220—229).

তাছাড়াও একটা প্রশ্ন আছে। ছবিতে বিশ্বম্ভরের শেষ করুণ ট্র্যাজেডির কারণ জলসা বসান নিয়ে, নববুর্জোয়া ধনী মহিমের সঙ্গে তার অসম প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা বিশ্বম্ভর অহংকারের বশে যেচে টেনে এনেছিল, এটাও যেমন ঠিক তেমনি শেষ ও মর্মান্তিক জলসা প্রতিযোগিতা তাকে নিতে বাধ্য করেছে মহিমের তথাকথিত 'স্পর্দ্ধা'। কারুর কারুর কাছে এটা মনে হয়েছে মহিমের 'জাতে উঠতে চাওয়ার' একটি প্রকাশ। এখানেও যারা এরকম ভাবছেন তাঁরা ভুল করছেন। নববুর্জোয়ারা শ্রেণী হিসেবে কখনো অভিজাতদের 'জাতে উঠতে' চায়নি, ইতিহাস এবং বালজাক, গ্যেটে, চেখভ সেকথা বলে না। নববুর্জোয়ারা অভিজাতদের প্রতি বিদ্বিষ্ট, প্রতিশোধপরায়ণ, তারা জাতে উঠতে চাইবে কেন সেই শ্রেণীর যে-শ্রেণী তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে? নববুর্জোয়ারা সেই কর্তৃত্ব চেয়েছে, অভিজাতদের মিথ্যা আড়ম্বরকে তারা ঘৃণা করেছে। নববুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্বগুণ সম্পন্ন চরিত্রে এই গুণ থাকা উচিত। মহিম চরিত্রে যদি তা না থাকে, তাহলে টাইপ চরিত্র হিসেবে তা ব্যর্থ। কিন্তু বস্তুতঃ মহিম চরিত্রে অভিজাতের প্রতি ঘৃণা, তাকে অপদস্থ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক শ্রেণী ঘৃণা হওয়া উচিত, এটা বজ্জাতি বা ভিলেনি নয়। সত্যজিৎ ব্যাপারটা এমন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যাতে মনে হয় মহিমের টাকার গরম এমন একটা অবস্থায় এমন একজন করুণার পাত্র নিঃসঙ্গ নিঃসহায় 'মানুষকে' এমন ধ্বংসের পথে ফেলে দিল—যাতে করে দর্শকদের মহিমের প্রতি ক্রোধ জাগে, তার ভাঁড় সদৃশ ব্যবহারের মধ্যে মিশে মহিমকে একটা মিচ্‌কে

শয়তান মনে হয়, কেননা ছবিতে মহিমই তার টাকার গরমের জন্য বিশ্বম্ভর রায়ের মত ফুরিয়ে যাওয়া মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে তার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে তাকে এক অসম প্রতিযোগিতার নামাচ্ছে—যার মানে তার সর্বনাশ !

এক কথায় ছবির মহিম ব্যক্তি চরিত্র হিসেবে যত অনবদ্যই হোক, তার মধ্যে তার তৎকালীন শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে নি। শুধু দুটি দিক থেকে তার মধ্যে শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে—নঙাত্মক দিক থেকে তার মধ্যে একটি বুর্জোয়া চরিত্রের Cash-nexus বা অর্থসর্বস্বতা বা টাকার গরম। একথা ঠিক তার এই বদ্‌গুণটি, তৎসহ তার খণ্ডিত আত্মসত্তা. এগুলিকে সত্যজিৎ রায় ব্যঙ্গাঘাতে জর্জরিত করেছেন। যদি এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়, তবে এই দিক থেকে সত্যজিৎ রায় সঠিক। কিন্তু সত্যজিতের এই ভালো কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে যাচ্ছে এর পিছনে অন্য একটা উদ্দেশ্যের ছায়া প্রলম্বিত বলে, এবং এইখানেই এই একই কাজ গ্যেটে ও বালজাক করলেও, সত্যজিৎ তাঁদের থেকে ভিন্ন।

অর্থাৎ আগে যে তিন ধরণের ভ্রান্তির কথা বলা হয়েছিল, তার প্রথমোক্ত ধরণের ভ্রান্তি যেমন ঘটান হয়নি; এবং কারুর কারুর কাছে সেজন্য সত্যজিৎ রায় প্রশংসার যোগ্য, তেমনি দ্বিতীয় ধরণের ভ্রান্তি (যা আরো গুরুতর ভ্রান্তি) তা ঘটান হয়েছে বলে সত্যজিৎ রায় সমালোচনার যোগ্য। তিনি নববুর্জোয়া চরিত্রের অর্থসর্বস্বতাকে, সংকীর্ণতাকে ঘৃণ্য মনে করেছেন (ঠিকই করেছেন), কিন্তু তা করতে গিয়ে নববুর্জোয়া শ্রেণীর সামগ্রিক বৈপ্লবিক ভূমিকাকেও অস্বীকার করে সোজা অভিজাতদের পক্ষে চলে পড়েছেন, এবং নানান প্রক্রিয়ায় দর্শককে অভিজাত মানুষটির সঙ্গে মানসিক ভাবে একাত্ম করে দিতে চেয়েছেন—যা, আগেই বলা হয়েছে, আরো বড় ভুল ! তার ফলে দর্শক ছবিটির মূল বিষয় বস্তুর যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে—এক পচা ইতিহাস পরিত্যক্ত যুগের মূল্যবোধের প্রতি নস্টালজিয়া অনুভব করেছে।

সমস্ত ছবিটির মধ্যে এই যে একটা ভুল মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, যেজন্য পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক আলোচকরা লিখেছেন এছবি 'এক পবিত্র যুগের অবসানের ট্রাজেডি'—এর জন্য সত্যজিৎ যে সব প্রকরণ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে মহিম চরিত্রের বিকৃত রূপায়ণও একটি। শুধুমাত্র মহিম (নববুর্জোয়া) চরিত্রের একটি বদ্‌গুণ 'টাকার গরম' কে চাবুক মারা হয়েছে দেখেই যারা সত্যজিৎ রায়ের 'মানবতাবাদী' চাবুক মারা হাতটি শ্রদ্ধায় চুম্বন করতে উদ্যত, তাঁরা এটা লক্ষ্য করছেন না যে, সেই একই হাত তাঁর দক্ষ ক্যামেরার মধ্য দিয়ে সেই মহিমের মত নব বুর্জোয়া চরিত্রের শ্রেণী লক্ষণের ভালো দিকগুলি সযত্নে পরিহার করেছে, দর্শকের কাছে 'সারাক্ষণ' মহিমকে একটি হাস্যোদ্রেককারী চরিত্রে পরিণত করিয়েছে তাতে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাতি মিশিয়েছে—এবং এর সর্বমোট ফল হয়েছে দর্শক মহিমের মধ্যে নব বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার টিকিও দেখতে পারনি, বরং তার মধ্যে একটা দিককে শয়তানকে দেখে বিপরীত দিকের অভিজাত বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতি ও তার অভিজাত মূল্যবোধের প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হয়েছে। সুতরাং যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে নববুর্জোয়ার টাকার গরমকে চাবুক মারার জন্য সত্যজিতের কাজ প্রশংসনীয়, কিন্তু এই শুধুমাত্র চাবুকমারারই যোগ্য হিসেবেই নব বুর্জোয়া মহিম চিত্রিত হওয়ায় এই 'প্রশংসনীয় কাজটি' যে ভুল ও পচা মূল্যবোধের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে তার সামগ্রিক ফলাফলের বিচারে এই "প্রশংসনীয় কাজটিকে" তার কাব্যিক বিচার বলা তো চলেইনা, বলা চলে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক। তাছাড়া আরো একটা কথা স্মর্তব্য, এই টাকার গরম নববুর্জোয়ারা আকাশ থেকে পায়নি, সমস্ত সমাজেই এর অস্তিত্ব ছিল যদিও বাহ্যাড়ম্বরের আড়ালে (গ্যেটের মেইস্টারের কথাগুলি স্মরণ করুন) সুতরাং একজন অভিজাতের বিপক্ষে উপস্থাপিত নববুর্জোয়াকে টাকার গরমের জন্য চাবুকমারাকে এবং এই প্রসঙ্গে অভিজাতদের পূর্বতন ভূমিকাকে এড়িয়ে যাওয়াও এক ধরনের পক্ষপাত। তাই সামগ্রিক বিচারে আমার মতে মহিমের টাকার গরমকে চাবুক মারা যেমন উচিত কাজ বলে স্বীকার করব, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বিচারে এই ছবির অন্য বিষয় ও পরিস্থিতির সমাবেশে তা যে ভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করছে সেটাও লক্ষ্য করব।

অতএব এর ফল মহিম চরিত্রের তৃতীয় স্তর—ঐতিহাসিক মাত্রা—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ছবি দেখার পর, যেমন চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড' নাটক দেখার বা পড়ার পর, যে মনে হওয়া উচিত সামন্ত যুগ শেষ হয়েছে সামগ্রিক দিক থেকে ভালই হয়েছে, তেমনি শ্রমবিভাজন জনিত কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধেরও ক্ষয় হয়েছে—নূতন বুর্জোয়া যুগ এসেছে সামগ্রিক ভাবে ভালোই হয়েছে—তেমনি কিছু কিছু খারাপ মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে —এবং এই সব কিছু হয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং এক সত্যিকার মহৎ উজ্জ্বল মানবিক পূর্ণতর ভবিষ্যতের তাগিদে যে ভবিষ্যতকে চেখভ "দ্য চেরী অর্চার্ড' নাটকে মূর্ত করেছেন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে জাগ্রত তরুণ ট্রফিমভের মধ্য দিয়ে—এই যে সামগ্রিক সত্যের নির্মল সত্যরূপ অর্থাৎ ছবির সামগ্রিক ঐতিহাসিক ডাইমেনশন, ছবির মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

এবং এর একটি প্রধান কারণ মহিম চরিত্রের সামগ্রিক বিকৃত রূপায়ন। এবং নব বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকাকে যদি স্বীকার করি, তাহলে এইভাবে তার প্রতিনিধিত্বগুণ সম্পন্ন চরিত্রের প্রতি অন্ধ বিরূপতা এক অর্থে এক ধরনের প্রগতিকে প্রত্যাখ্যানের নামান্তর। কিন্তু এর মানেই প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, যদিও কোন যান্ত্রিক মার্কসবাদী এভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থ আরোপ করতে ভালোবাসেন, বরং মার্কস্ এঙ্গেলসের অনেক সাবধান বাক্য খেয়াল না করেই। প্রগতিকে কোন একটা 'ইস্যু'তে প্রত্যাখ্যান আমাদের মধ্যে অনেকেই করেন, যেমন আমাদের মা বাবাদের বেশির ভাগই এখনো এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের বিবাহকে মেনে নিতে

স্বেচ্ছায় রাজি নন, এটাও প্রগতির বিরুদ্ধাচরণ, কিন্তু তার মানেই তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল নন। **মানুষ সম্পর্কে, বিশেষ করে শিল্পীদের সম্পর্কে 'হয় এটা' আর না হলেই "একেবারে উল্টো'—এটা ভাবাই যান্ত্রিকতা।** মানুষ এত সহজ বিবর্ণ বস্তু নয়।

এই ছবির মধ্যে সত্যজিতের কোন প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্ন নেই—যা আছে তা হচ্ছে তাঁর পশ্চাদমুখী মনোভাব, প্রগতি সম্পর্কে, সেই যুগ সন্ধিক্ষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব। তবু ছবির মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত আছে যেখানে ঘটেছে মানবিকতার উজ্জল উদ্ধার বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বম্ভর রায়ের ব্যক্তি রূপই প্রধান বিষয়—অসাধারণ উচ্চস্তরের শিল্প নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও সব মিলিয়ে ছবিটি একটি 'মেজর ফিল্ম' আজো সাধারণ মধ্যবিত্ত দর্শক ছবিটি দেখে মুগ্ধ উদ্বেলিত।

কিন্তু ঐতিহাসিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য ছবিটি ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠা দর্শক কি ভাবে নেবেন? তাই সামগ্রিক বিচারে এই 'চিত্রবীক্ষণ' পত্রিকায় সাত বছর আগে ছবিটি সম্পর্কে যে কথা লিখেছি তারই পুনরাবৃত্তি করছি: **ছবির অঙ্গে অঙ্গে চিত্রভাষায় অনুপম ঐশ্বর্য থাকা সত্বেও মধ্যবিত্ত পুষ্ট চিন্তাধারা স্বল্পকালীন আয়ুর মধ্যেই ছবিটির শিল্প মূল্য হারিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।**

এর জন্য যেসব প্রধান কারণ দায়ী মহিম চরিত্রের ভ্রান্ত চরিত্রায়ণ তার একটি।

সূত্র নির্দেশিকা—

(১) K. Marx and F. Engles : TheG ermar Ideology. vol 1, Moscow, Page—24.

(২) K. Marx aud F. Engles ; Selected Works in One Volume, Moscow and Lawrance and Weshswart, Londan, page 38.

(৩) গোটের সমকালীন যে বিখ্যাত সমালোচক গোটের তথাকথিত অভিজাত প্রেমকে আক্রমণ করেছিলেন তাঁর নাম Frederich Schlegel. দ্রষ্টব্যঃ George Lukaes : Goethe and His Age, Merlin Press, London, Page 52.

(৪) F. Engles : Dialecties of Nature, Moscow, Page 20-22.

(৫) Engles to Margaret Harkner, Marx and Engles : "Selected Correspondence," Moscow, pp 379-81.

(৬) Engles to Laura Lafargues, 1883, "Engles and Laforgues : Correspondence Vol 1, Moscow, p-160

তৃতীয় বিশ্বের নবতম নির্ভীক চিত্র পরিচালক দারিয়ুস মেহরজুই ॥

প্রদীপ বিশ্বাস

তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আহমেদ রাচেদি সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ছবি করার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন : "we should make films about the armed revolution, even after 50 years we will still need to show it…the war of Liberation comes first, this is very important". এই মন্তব্য থেকে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। সেটা হলো বর্ত্তমান তৃতীয় বিশ্বের ছবি নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং কিই বা তাদের ভূমিকা ছবি নির্মাণের ব্যাপারে। এরা চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে কি ভাবে ব্যবহার করতে চান তাও উপরের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়। বর্ত্তমান চলচ্চিত্র আন্দোলন যে মুক্তিকামী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে, তাও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের ভূমিকা প্রমাণ করে।

লাতিন আমেরিকা, আলজিরিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে ইরানের কতিপয় পরিচালক হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আমরা ইরানের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ করে পরিচিত হতে পারিনি এ পর্য্যন্ত নানা কারণে। আমাদের এখানে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ইরানের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারেনি দুটি কারণে। প্রথমটি হলো তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্কে আমাদের একধরনের অনীহা। দ্বিতীয়ত ছবি আনা নেয়ার ব্যাপারে সরকারী গাফিলতি।

তৃতীয় বিশ্বের ছবি করিয়ে দেশগুলির মধ্যে ইরানের ছোট্ট স্থান আস্তে আস্তে চলচ্চিত্রের মানচিত্রে নতুন আলোর স্ফোটক হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইরানকে চলচ্চিত্র আন্দোলনের শরিক হিসেবে যিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি হলেন দারিয়ুস মেহরজুই। ইরানী সমাজ ব্যবস্থার শোষণ, নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের চেহারাটি সর্বপ্রথম আমরা মেহরজুই-য়ের সৃষ্ট চিত্রগুলির মধ্যে পাই।

মেহরজুই খুব বেশীদিন চলচ্চিত্র আন্দোলনে আসেননি। তাঁর ছবিগুলি পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় সত্তরের দশকের গায়ে গায়ে এই পরিচালক শিল্পীর আবির্ভাব। তবে তিনি খুব সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি মোটামুটি ভাবে শোষণ ভিত্তিক সমাজকে জোর একটা নাড়া দেবার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য কাউ' নির্মিত হয় সত্তর দশকের সামান্য কিছু আগে। একটি গরু হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ছবির বিস্তার। গল্পের কেন্দ্র চরিত্র নিঃসন্দেহে একজন দরিদ্র কৃষক। শোষণ যন্ত্রের প্রতিঘাতে সে উন্মাদ হয়ে যায় তার একমাত্র মূলধন 'গরু' হারানোয়। এই সঙ্গে মেহরজুই তাঁর সমাজ কাঠামোর সংস্কার, ভয়, অশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে সমাজ-সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

মেহরজুই-য়ের পরের ছবি 'দ্য জানক হাউস' ও 'দ্য পোস্টম্যান'। ছবি দুটি যথাক্রমে বাহাত্তর ও তিয়াত্তর সালে তৈরী হয়। বলা বাহুল্য মেহরজুই-এর এই ছবি দুটি তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও ছবি নির্মাণের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন ফ্রেম গঠনের এবং সেই সঙ্গে বিষয়-ভাবনার প্রবাহটি তিনি অব্যাহত রাখেন। এই ছবির বিদেশে প্রদর্শন তেমন না হওয়ায়, তুলনামূলক বিচার হয়তো বা সম্ভব হয়নি। তবে ইরানের নিজের মাটিতে, যতটুকু জানা যায়, উপরোক্ত ছবি দুটির কদর হয় এবং মেহরজুই পরিচালক হিসেবে নিজের ইমেজ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মেহেরজুই-এর সবথেকে বিতর্কিত ছবি 'দ্য সাইকেল'। ছবিটি নির্মিত হয় সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে। এবং রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে ইরানের শাহ সরকার ছবিটির দেশে বিদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেন। এই সঙ্গে এই তরুণ পরিচালককে নানাভাবে বাধা দেয়া হয় যাতে করে এই শিল্পী-পরিচালক আর কোন সমাজ-সচেতন ছবি করতে না পারেন। কোন এক সাক্ষাৎকারে এই পরিচালক জনৈক চিত্র-সমালোচককে বলেন : "For three years I have done nothing. Only recently have they allowed me to do a documentary for television". এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে শিল্পীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা কতখানি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে ইরানের শাহ সরকারের শাসন যন্ত্রে। অবশেষে 'দ্য সাইকেল' ছবিটি সাতাত্তরে প্যারী উৎসবে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এখানেই ছবিটি যথেষ্ট সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় তোলে। ছবি প্রদর্শনের পর শিল্প জগতে বিদগ্ধ মহলে সাড়া পড়ে যায়। ছবিটি আপাততঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেয়েছে।

'দ্য সাইকেল'-এর গল্প বলা হয়েছে এক দরিদ্র কৃষক সন্তান আলীকে নিয়ে। এই দরিদ্র যুবকের ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতন ও তার শোষণ তীব্রতর করে দেখানো হয়েছে। আলী ও তার বাবা শহরে আসে বাঁচার তাগিদে। দারিদ্র যেহেতু এদের মরণসঙ্গী তাদের সংগ্রাম গড়ে ওঠে কেবল বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে। দেখা যায় শহরে রক্ত বিক্রীর পসার বসেছে। এবং মানুষের রক্ত নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা ফাঁকিয়ে চলেছে

শহরের অলিতে গলিতে। অসাধু ব্যবসায়ীরা দরিদ্র মানুষদের রক্ত অল্প মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়ে তা চড়া দরে বিক্রী করে মুনাফা লুটে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আলীকে দেখি তার রক্ত বিক্রী করতে। আলীও মেতে ওঠে এই অমানবিক ব্যবসায়। মুনাফা আরও মুনাফা এই উল্লাস আলীকে পেয়ে বসে। এই অর্থ নেশার মধ্যে আলী তার বাবাকে বাঁচাতে পারে না। সে মারা যায়। মৃত্যু এখানে করুণার অনুভূতি বয়ে আনে না। বরং দেখা যায় সরকারের চোখের উপরে রক্ত বেচা কেনার উৎসব জোর কদমে এগিয়ে চলে। অপরদিকে হতাশা, দারিদ্র, প্রবঞ্চনা, শোষণ পর্দার উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মেহেরজুই একজন নিষ্ঠাবান সচেতন পরিচালক। তিনি সমগ্র ইরানের অবক্ষয়ের চেহারাটি তাঁর ছবির ফ্রেমে রেখে দিয়েছেন। ছবিতে কোন পথ তিনি বলে দেননি, বলে দেননি কোন পথে মুক্তির উপায়। তিনি কেবল্ চরম বিপর্যস্ত সত্যকে, বাস্তবকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন কোন মোহ, ভয় না রেখেই।

এই ছবি দেখে অনেক সমালোচক বলেছেন : "Mehrjui's use of his principal characters as symbols of the various conflicting forces within contemporary Iran is also quite remarkable. Ali's father, Ali and Sameri, symbolize the forces of religion, oppression and youth at odds with one another." অর্থাৎ বর্তমান ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেহারা এবং সেখানকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে পরিচালক মেহেরজুই-এর ছবিতে। আজ যখন দেখি তৃতীয় বিশ্বে সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে, লড়াই চলেছে ভেতরে বাইরে শোষণের বিরুদ্ধে, ইরান চলচ্চিত্রের বর্তমান অগ্রগতি এই প্রেক্ষাপটে উপেক্ষা করবার নয়। দারিয়ুস মেহেরজুই এই নবতম অগ্রগতির প্রবাহ চলমান রাখতে এক নির্ভীক ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

মেহেরজুই-এর ছবিগুলি এখনও ভারতের মাটিতে প্রদর্শিত হয় নি। আমাদের এখানে যারা তৃতীয় বিশ্বের ছবির জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকেন, যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৈরী ছবি দেখতে চান, মেহেরজুই-এর সাম্প্রতিকতম ছবি তাদের জন্য আবশ্যিক বিষয়। আমাদের এখানে বাইরের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ছবি নিয়ে আসার অনেক অসুবিধে আছে, বাধা আছে। এই অসুবিধের কথা আমাদের অজানা নয়। তবুও বলে রাখা ভাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এবং ব্যক্তিগতভাবে যারা আমাদের এখানে ছবি আনা নেবার ব্যাপারে নিজ নিজ স্তরে লড়াই করে চলেছেন, তারা যদি মাঝে মাঝে এই অজানা তৃতীয় বিশ্বের ছবির অ্যালবাম ভারতীয় দর্শকের কাছে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে মনে হয় বহু আকাঙ্খিত পাওনার স্বাদ কিছুটা মিটতে পারে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত। কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন, যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশি —অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতার অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে কিভাবে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপু চিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ীর আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে— যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫ তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশাকরি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা ক্লাবের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :"

যোগাযোগের জন্য :

CINE CLUB OF ASANSOL

16, Municipal Market, G. T. Road (West)

ASANSOL

Phone : 3338

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফেড্ ইন্।

দুর্গা (সন্ধ্যা রায়)

ছবি : ধীরেন দেব

দুর্গা ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

দুর্গা : বাপ্ রে!

কাট্ টু।

পদ্ম পেছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ে।

দুর্গা : উ কি? কেম শুলে যে!....ওঠো।

পদ্ম : ক্যানে?

দুর্গা : বাঃ আমি যে তোমার কাছেই এলাম!

পদ্ম : উ—! কি আমার আপনজন!

দুর্গা : (হেসে) নাই?....বুকে হাত রেখে বলো!....
আমি যে তোমার সতীন গো!

পদ্মর কাছে অসহ্য ঠেকে। সে উঠে একটা ঝাঁটা হাতে তুলে দুর্গার দিকে ছোঁড়বার জন্য।

পদ্ম : কি বুঝি?

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

দেবু পণ্ডিত (সৌমিত্র চ্যাটার্জি)

ছবি : ধীরেন দেব

দুর্গা : কি হইছে গিরিশদা!

গিরিশ : থানাপুরী! জরিপ শুরু হয়ে গেইচে! যার যার মাঠে এক্ষুনি চলে যাও।

বলেই সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮০

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

পাকা ধানের ওপর দিয়ে ভারি লোহার চেন টেনে টেনে জমি মাপছে লোকরা। ধান গড়িয়ে পড়ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮১—১৮৩

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

উত্তেজিত একদল গ্রামবাসী নানা দিক থেকে ছুটে যায় ধানখেতের দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৪

স্থান—দেবুর ঘর।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় বিলু দেবুকে একবাটি পিঠে আর পায়েস খেতে দিচ্ছে। দেবু পণ্ডিত আসনে বসে।

দূরের গোলমালের শব্দ জোরে হতে থাকে। দেবু উঠে পড়ে।

দেবু : কি হল?

বিলু : ও কি!

দেবু পণ্ডিত জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৫

স্থান—দেবুর বাড়ির পাশের রাস্তা।

সময়—দিন।

জানলা দিয়ে দেখা যায় একদল গ্রামবাসী ছুটে যাচ্ছে ধানক্ষেতের দিকে। তারা রয়েছে সেই দলে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৬

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৪'র মত।

দেবু : কি হয়েচে—তারা?

দৃশ্য—১৮৭

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৫'র মত।

তারা : শিগ্ গির আসেন!...মাঠে শেকল টানছে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৮

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৪'র মত।

দেবু : সে কি?

দরজার কাছে চলে আসে সে।

বিলু : শোনো—

দেবু : আসছি বিলু—

দেবু পণ্ডিত ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৯

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮০'র মত।

বিগক্লোজ শট্। হতভম্ব পাতু বায়েন।

পাতু : নাই!...নাই!! (পাশে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে গিয়ে) শুনেন,...শুনেন চৌধুরীমোশায়!.... বইলছে আমার জমি নাই!! তবে তো আমি নাই!!—আপনি নাই,—মাথার ওপর কেউ নাই, ...ভগবান শুদ্ধ নাই!!

জায়গাটা ঘিরে জমাট ভিড়। চারিদিক থেকে আরও আরও লোক আসছে।

বিরক্ত পেশকার একটা ম্যাপ খুলে পাতুকে দেখায়।

পেশকার : আমি তার কি করব! এইতো...এইতো কাগজ!...আছে কোথাও?...স্থাখ্, এখান থেকে এখান অব্দি স—ব কঙ্কনার বাবুদের মালজমি—

দ্বারকা বলেন কি পেশকার বাবু,... চার পুরুষ ধরে মন্দিরে যে ঢাক বাজায় ওরা!

পাতু আজ্ঞে হাঁ—দেবোত্তরের চাকর! নিষ্কর চাকরান জমি আমাদের...

পেশকার ওসব চাকরান ফাকরান বুঝি না! এখানে তার কোনো হদিশ নেই—

হঠাৎ পাতু বায়েন ঝাঁপিয়ে পড়ে পেশকারের ওপর।

পাতু : (পাগলের মতো) নাই!...হদিশ নাই! গেল কুথা?...কাইল তক্ ছিল...আইজ গেল কুথা... বল্!

পেশকারের গলা চেপে সজোরে ঝাঁকাতে থাকে পাতু। মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য সেটলমেন্ট কর্মচারীরা ছুটে আসে, পাতুকে মারতে আরম্ভ করে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় উল্টোদিকে।

দেবু পণ্ডিত সেই দিক থেকে ছুটে আসছে।

কলরব : "পণ্ডিত, পণ্ডিত এসে গ্যাচে"

দেবু : কি, কি হয়েছে পাতু? পাতুকে অমন করে মারছে কেনে?

পাতু : শোনেন গো···শোনেন পণ্ডিত মশাই···আমার জমি—

যারকা : ঐ ভাখো, ঐ ভাখো···

সঙ্গে দেবু পণ্ডিত পাতুর পেছনে তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে—

দেবু : ও কি!!

কাট্ টু।

সেটলমেন্ট অফিসের কয়েকজন কর্মচারী ভারী চেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাকা ধানখেতের ওপর দিয়ে। সব ধান নষ্ট হচ্ছে।

কাট্ টু।

দেবু : (ছুটে গিয়ে) এসব কি করছেন?····এঁ্যা?···· কি করছেন আপনারা? বন্ধ করুন!···বন্ধ করুন বলছি!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লোকের মধ্য থেকে একটা চেনা গলা শোনা যায়।

কাহ্নগো : (off voice) কে, কে বন্ধ কত্তে বল্লে?

লোকটা দেবুর দিকে তাকায়, সে কাহ্নগো।

দেবু : (অবাক হয়ে) আপনি!

কাহ্নগো : যাক্, চিনতে পেরেছেন তাহলে?

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দেবুকে। দেবু আগের দিনের ঘটনা মনে করে অবাক হয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯০

স্থান—দেবুর বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন, পৌষলক্ষীর আগের দিন।

একই কম্পোজিশনে দেবু ও কাহ্নগো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

কাহ্নগো : আ মোলো! অমন মরা মাছের মতো চেয়ে আছিস কেন!····বোবা নাকি?

দেবুর মুখ কঠিন হয়। তীক্ষ্ণ স্বরটি আগের মতই শোনা যায়। কাহ্নগোর চোখের ওপর তাকিয়ে দেবু উত্তর দেয়—

দেবু : না!···কি বলবি বল্!

কাহ্নগো : (বিস্মিত) কি বল্লি!!····আমায়····আমায় তুই "তুই" তোকারি করলি!

দেবু : সে তো তুই আগে করলি।

কাহ্নগো : ও!·· আচ্ছা!····ঠিক আছে!···কী····কী নাম তোর?

দেবু : আমার নাম শ্রীদেবনাথ ঘোষ।···তোর?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯১

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় কাহ্নগো দেবু পণ্ডিতের সামনে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসছে।

কাহ্নগো : অধীনের নাম শ্রীবঙ্কিনাথ বাঁড়ুজ্জে। বলুন কি সেবা কত্তে পারি?

দেবু : এ অন্যায়! এমন করে ধান নষ্ট করে শেকল টেনে নিয়ে যাওয়া—নিয়ম আছে আপনাদের?

কাহ্নগো : নিয়ম!

দেবু পণ্ডিতের কাছে এগিয়ে এসে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ দেয়।

কাহ্নগো : পড়ে দেখুন।

দেবু খবরের কাগজটা খোলে।

কাট্ টু।

কাগজের হেড লাইন—

জননেতা শ্রী জে এল ব্যানার্জী গ্রেপ্তার
সরকারী জরিপে বাধাদানের পরিণাম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কাহ্নগো দেবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

দেবু কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল।

কাট্ টু।

কাহ্নগো : এখন আমি যা বলব তাই নিয়ম। বেশি কপ্‌চালে দাওয়াই আমার জানা আছে। (কর্মচারীদের) একি! থামলি কেন?—চালা! চালা!

কাট্ টু।

কর্মচারীরা আবার শেকল টানা শুরু করে।

কাট্ টু।

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত 'না' বলে চিৎকার করে ছুটে যায় ধানখেতের মধ্যে। কর্মচারীদের হাত থেকে শেকল কেড়ে নিতে যায়।

দেবু : দেখি···দেখি···

সংঘর্ষ বাধে। দেবু চেনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দূরে।

কাট্ টু।

শেকলটা ঝপাং করে মাটিতে পড়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯২

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির—

সময়—দিন।

মথুর গ্রামের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে।

মথুর : পুলিশ—! পুলিশ আসচে গো!

জনৈক : এঁ্যা?

মথুর : হ্যাঁ!···পণ্ডিতকে ধরে নিয়ে গেছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৩

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বিলু চকিতে বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিলু : সে কি?

দুর্গা : (হাঁপাতে হাঁপাতে) এই মাত্তর খবর পেলাম। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি!

বলেই দুর্গা ছুটে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৪

স্থান—ছিরু পালের গোলা ঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও গড়াই বারান্দায় বসে আছে। ভবেশ ঝড়ের গতিতে বারান্দায় ঢোকে।

ভবেশ : ছিরু! ছিরু আছো নাকি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৫

স্থান—গ্রামের পথ—সজনেতলা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার ক্যামেরার দিকে ছুটে আসতে আসতে কয়েকজন গ্রামবাসীকে দেখে সেদিকে আসতে।

জগন : শিগ্‌গির···শিগ্‌গির এ দিকে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৬

স্থান—বায়েনপাড়ার ঝোপঝাড়।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : (এক বাউড়িকে) এঁ্যা? কি বলছিস তু?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

উচ্চিংড়ে পদ্মর হাত ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যায়।

উচ্চিংড়ে : হিঁ গো!···এসো না। দেখবে এসো—

পদ্ম রাস্তার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৮

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় একদল পুলিশ গ্রামের রাস্তা দিয়ে আসছে। দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে; তার হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা। বৃন্দাবন, দ্বারকা চৌধুরী হরিশ এবং অন্যান্যদের নিয়ে বেশ বড় একটা দল পেছন পেছন আসছে। সবাই নীরব। শুধু রাঙাদিদি পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি আসছে আর প্রতিবাদের সুরে বলছে—

রাঙাদিদি : শুনছ! বলি শুনছ!···গট্ গট্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছ যে!

দুর্গা ডানদিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে।

রাঙাদিদি : বলি হ্যাগা দারোগা!···চুরি··· না জোচ্চুরি··· না ডাকাতি···না ডাকাতি করেছে বাছা, যে পৌষলক্ষীর দিনে টেনে নিয়ে চলে?···বচ্ছরকার দিন,···ঘরের মরা বেড়ালটাও বার করে না কেউ—

হরিশ : আহা পিসি, তুমি থামো—

রাঙাদিদি : কেনে? থামব কিসের ভয়ে শুনি?

হরিশ : আহা, বলছি তো আমরা দেখছি। তুমি মেয়েছেলে···

রাঙাদিদি : মেয়েছেলে!····আমার সাড়ে তিন কুড়ি বয়েস হল,—আমি আবার মেয়েছেলে কি রে? একশোবার বুলব !....হাজার বার বুলব!···· আমাকে কি করবি?····বাঁধবি ? নে, নে, নে, —বাঁধ কেনে ?····পণ্ডিতের মত লোক, দড়ি দিয়ে বাঁধছিস—

বলতে বলতে রাঙাদিদি কেঁদে ফেলে।

দেবু : চুপ করো রাঙাদিদি, আমি তোমার কাছে, হাতজোড় করছি—

রাঙাদিদি দেবুর কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে তার মুখ ও মাথায় হাত বোলায়।

রাঙাদিদি : আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই !···সায়েব তোকে দেখা মাত্তর ছেড়ে দেবে !....চেয়ারে বসিয়ে বুলবে—পণ্ডিত লোক তোমাকে কি জেহেল দিতে পারি বাপ ?····ঘরে তোমার কচি বৌ ছেলে····

রাঙাদিদি কাঁদতে থাকে।

কাট্ টু।

কম্পোজিট ক্লোজশট—দেবুর চোখ জলে ভরে আসে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ পদ্মর চোখে জল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গার চোখেও জল। সে দেবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—

দুর্গা : চলো,—ঘর চলো একবার!

কাট্ টু।

দেবু পুলিশ অফিসারের দিকে তাকায়।

পু. অ. : চলুন!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৯

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় ছিরু পাল কাবুলিগোকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। গড়াই ও ভবেশ রয়েছে সঙ্গে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০০

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবল আর হাতকড়া পরান কোমরে দড়ি বাঁধা দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে উঠোনে ঢোকে। দুর্গা আর রাঙাদিদি আগেই ঢুকে যায়। দেবু সামনের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ বারান্দায় স্তম্ভিত আহত বিলু দাঁড়িয়ে—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ বিলু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কুসুম বিলুর ছেলেটাকে দেবুর কাছে নিয়ে আসে। একটু থেমে দেবু বলে—

দেবু : সাবধানে থেকো····এঁরা সবাই রইলেন—

বিলু আর সহ্য করতে পারে না, ডুকরে মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০১

স্থান—দেবুর ঘর।

সময়—দিন।

বিলু সশব্দে কেঁদে ওঠে। ঘরের দরজায় মাথা রাখে। কান্নাটা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

বিলু কাঁদছে। ব্যাক গ্রাউণ্ডে দেখা যায় পুলিশের দল দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিলু ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। ক্যামেরা পেছনে সরে এসে দেখায় শূন্য আসন খাবার থালা মিষ্টি তেমনিই পড়ে আছে মেঝেতে।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে বেজে ওঠে "যেয়োনা যেয়োনা পৌষ, যেয়োনা ঘর ছেড়ে—পিঠে ভাতে সুখে রাখো স্বামী পুত্তুরে—"

গানটির সুর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবুর বাড়ির সামনে বড় ভিড়। ছিরু পাল, তখেশ আর গড়াই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসে। দেবু বাড়ি থেকে বেরোতেই—

ছিরু : খুড়ো শোনো! (দারোগাকে) একটু···

দেবু দাঁড়িয়ে পড়ে।

ছিরু পাল তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলে—

ছিরু : যদি পর না ভাবো, একটা কথা বলি।···দেখলে তো নিজের লোকের মুরোদ। এদিকে একটা ব্যবস্থা হয়েচে···এখন তুমি যদি রাজী হও তো—

দেবু ছিরু পালের কথা যেন ঠিক বুঝতে পারে না।

ছিরু : মানে, এমন কিছু নয়। ধরো ঐ কানুনগো সায়েবের কাছে গিয়ে একটু হঁয়ে করলে···আর সন্দের দিকে একটা ছোট মোট দিলে—

দেবু : ছি:! ছি: ছিরু!

ছিরু : (অবাক হয়ে) ক্যানে? এতে তো—

দেবু : ছি:!···ছি ছি ছি··

প্রচণ্ড বিরক্তিতে সে মাথা নেড়ে ছিরু পালকে ফেলে এগিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ উল্টোদিক থেকে ছুটে এসে দেবুর মুখোমুখি হয়।

অনিরুদ্ধ : (ধরা গলায়) দেবু ভাই!

চোখ দিয়ে জল গড়ায় তার। অনিরুদ্ধর পিঠে সস্নেহ হাত বুলিয়ে এগিয়ে যায় বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর দিকে। পায়ে প্রণাম করে।

চৌধুরী : (দু হাতে বুকে জড়িয়ে, আবেগ কম্পিত গলায়) ভগবান এর বিচার করবেন·· ভগবান—

সে আর কথা বলতে পারে না।

পুলিশ অফিসার দেবু পণ্ডিতের কাছে এসে বলে—

পু. অ : এবার চলুন দেবু বাবু—

জগন : (off voice) দাঁড়ান!

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার হাতে একটা মালা নিয়ে এগিয়ে আসে। দেবুর গলায় সেটা পরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে—

জগন : বলো, শ্রীদেবু ঘোষের—

সবাই : জয়—!

জগন : শ্রীদেবু ঘোষের—

সবাই : জয়—!!

জগন : শ্রীদেবু ঘোষের

সবাই : জয়—!!!

একটা বিদ্যুৎচালিত মুহূর্ত যেন। উলুধ্বনিও শোনা যায়।

ক্যামেরা দুর্গা, রাঙাদিদি, অন্তান্তদের ওপর প্যান্ করলে দেখা যায় সবাই উলু দিচ্ছে।

কাট্ টু।

পদ্মর ভেজা চোখ। সেও উলু দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দেবু এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হাত জোড় করে এগিয়ে যায়—

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৩

স্থান—গ্রামের পথ।

সময়—দিন।

গ্রামের মহিলারা সব রাস্তার দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। তারা সকলেই উলু দিচ্ছে, কেউবা শাঁখ বাজাচ্ছে।

দেবু হাত জোড় করে ফ্রেমে ইন্ করে এগিয়ে যায়। ক্যামেরাও ট্রলি করে। এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেবু ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায় আর ক্যামেরা তখন চার্জ করে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছিরু পালের বৌ লক্ষ্মীমণির ওপর। সে ভেজা চোখে শাঁখ বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

টপ্ শট্। পুলিশ অফিসার কনেস্টবল সহ দেবু পণ্ডিত ফ্রেমে ঢুকে এগিয়ে যায় একটু দূরে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। গাঁয়ের লোকরা ক্যামেরার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে থামে। পাথরে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—গ্রামবাসীরা।

কাট্ টু।

পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে দেবু পণ্ডিত নদীর বাঁধের দিকে যেতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৫
স্থান—নদীর পার।
সময়—দিন।
নদীর উঁচু পাড় দিয়ে পুলিশ দলের সঙ্গে দেবু পণ্ডিত যায়।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৬
স্থান—সাধারণ, শিমুল গাছ।
সময়—দিন, বসন্তকাল।
ক্যামেরা বাঁ থেকে ডাইনে প্যান্ করে কতগুলো শিমুল গাছ দেখায়।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৭
স্থান—সাধারণ, (মাঠ)।
সময়—দিন, গ্রীষ্মকাল।
সারা মাঠ ফেটে চৌচির।
বাঁধের ওপর দিয়ে ধুলো উড়ছে।
শুকনো গাছের ডাল।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৮
স্থান—সাধারণ (গ্রাম)।
সময়—দিন, বর্ষাকাল।
বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট আপ্ করে দেখায় ধান খেত।
চাষীরা ক্যামেরার পাশ দিয়ে চলেছে খেতে।
টপ্ শট বৃষ্টিতে ঢাকা ধান খেত।
মাঠের মধ্যে ফড়িং উড়ছে।
মেঘে ঢাকা আকাশ।
বাঁশ পাতায় জল পড়ছে।
বৃষ্টির মধ্যেই গ্রামের ছেলেরা রথ টানচে।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৯
স্থান—দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।
সময়—দিন, শরৎ কাল।
ক্যামেরা দুর্গা প্রতিমার মুখের ওপর থেকে পিছনে সরে এসে গ্রামকে দেখায়।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২১০
স্থান—কাশবন।
সময়—দিন, শরৎকাল।
শরৎকালের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা নীল মেঘের ওপর থেকে ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে শালবনের ওপর।

লং শটে দেখা যায় চারটি লোক দূর থেকে ক্যামেরার দিকে আসছে।

কাছে আসলে বোঝা যায় ওরা হচ্ছে যতীন, রাম সিং, একজন কনেস্টবল ও একটা কুলির মাথায় যতীনের মালপত্র।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২১১
স্থান—বাঁধের পাশে শালের জঙ্গল।
সময়—দিন।
দুর্গা তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ছুটে যায়। হঠাৎ ডান দিকে কি দেখতে পেয়ে থেমে যায়।
দুর্গা : (গালে হাত দিয়ে) হেই মা!
কাট্ টু।
অনিরুদ্ধ একটা গাছের গোড়ায় এগিয়ে কাত হয়ে বসে আছে। পা ছড়ানো, মাথা ঝুলছে। পাশে একটা দিশি মদের খালি বোতল।
কাট্ টু।
দুর্গা অনিরুদ্ধর কাছে যায়। ঝুঁকে পড়ে তাকে ঠেলা দেয়।
দুর্গা : এ্যাই! শুনচ!
অনিরুদ্ধ ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়।
দুর্গা : ঐ ছাখো!...বলি শুনচ?...না: আর পারি না বাপু!....ওঠো ওঠো ওঠো....ওঠো!
দুর্গা অনিরুদ্ধকে ঠেলে টেনে তুলতে চেষ্টা করে।
অনিরুদ্ধ : (চোখ না খুলেই ধমকে) এ্যা—ও!
দুর্গা : উ—! আবার বলে এ্যা-ও....বলি কাল যেতে ছিলে কুন্ চুলোয় শুনি?
অনিরুদ্ধ : ক্যানে? তু ছাড়া কি আর মরবার জায়গা নেই?
দুর্গা : হ্যাঁ, খুব আচে! (বোতলটা তুলে) একজন খেয়ে মরচে,—আর একজন না খেয়ে।
কাট্ টু।

দৃশ্য—২১২
স্থান—পদ্মর ভাঁড়ার ঘর।
সময়—দিন।
পদ্মর চেহারা আগের তুলনায় অনেক খারাপ, রুক্ষ, রুগ্ন। সে পাগলের মত ভাঁড়ার ঘরের পাত্রগুলো খুঁজছে।

উচ্চিংড়ে দরজার কাছে বসে কাঁদছে আর ঘিন্ ঘিন্ করছে।

উচ্চিংড়ে : হুঁ : !… খিদে পেয়েছে · হুঁ হুঁ….কখন থেকে দিদি ?

পদ্ম উত্তর দেয় না। বৃথাই খোঁজে পাত্রগুলো!

উচ্চিংড়ে : (একটু থেমে) সকাল!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৩

স্থান—নদীর পাড়ের শালের জঙ্গল।

সময়—দিন।

দুর্গা কোনক্রমে টেনে তোলে অনিরুদ্ধকে এবং ধরে ধরে কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর আবার ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে যায়।

দুর্গা : দূর্! থাকো তবে!

একটু দূরে রামসিং, কনেস্টবল, যতীন আর কুলীকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

রাম : আরে এ দুগ্ গা—

দুর্গা : ও মা!….এসে গ্যাচো ?…এ্যাদ্দেরি হল যে!

অনিরুদ্ধ : (হঠাৎ চোখ বুজেই ধমকে ওঠে) চল্ শালা! দুগ্ গা কি ? দুগ্ গা মাই বল্।

যতীন এবং রাম সিং অবাক হয়ে থমকে যায়।

দুর্গা : (হেসে) ও কিছু লয়! আসেন!… আসেন বাবু—

ওরা চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৪

স্থান—গ্রামের পথ।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও ভূপালের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে। গ্রামের পথে একটু দূরে দেখা যায় দুর্গা, যতীন, রামসিং, কনেস্টবল এবং কুলি আসছে।

ছিরু : কে রে ভূপাল ?

ভূপাল : (তীক্ষ্ণ চোখে) উ…নজরবন্দীবাবু মনে লাইগছে!

ছিরু : কি বাবু ?

ভূপাল : উ 'ভিটিচু' না কি বলে….স্বদেশীবাবু। ক'দিন হল থানায় এসে রইছে যে!…এখুন বুঝলাম।

ছিরু : কি বুঝলি ?

ভূপাল : আজ্ঞে দুগ্ গা….সেদিন ছোট দারোগার ওখানে দেখলাম কি না!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৫

স্থান—থানা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর থেকে সরে এসে ছোট দারোগাকে কম্পোজিশনে ধরে। ঘরের বাইরে তখন ভূপাল ও অন্যান্য চৌকিদার মাইনে নিচ্ছে।

দুর্গা : জান্ না গো ছোটবাবু!….গরীবের খুব উবগার হয় তালে….

দারোগা : শুধু রাখবার ব্যবস্থা করলে হবে না, বুঝলি! ঐ সঙ্গে ছোকরার মাথাটাও যদি কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে দিতে পারিস….সরকারের কাছ থেকে সেটা বকশিস!

দুর্গা : (হেসে) হেঁ হেঁ….উ আর আপনাকে বইলতে হবে না!…মাথা চিবানো….(নীচু গলায়) হুঁ হুঁ.. নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখেন ক্যানে!

দারোগা : স্ স্ স্! (বিরক্ত হয়ে) যা ভাগ্!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

দুর্গা খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে ফ্রেমে ঢোকে। তারপর আসে যতীন, রামসিং ও অন্যান্যরা।

দুর্গা : আপনারা দাঁড়ান,…আমি আইসচি—

দুর্গা উঠোনে ঢোকে।

যতীন পাখির ডাক শুনে আকৃষ্ট হয়। ক্যামেরার সামনে এগিয়ে এসে সে পাখিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা কতগুলো টাকা পয়সা সামনে রাখে। ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় পদ্ম বারান্দায় বসে আছে।

দুর্গা : এই ঘর ভাড়া পাঁচ, আর খোরাকি আট। এক মাসের আগাম।...ভালো করে তুলে রাখো।... কৈ রাখো?

রাম : (off voice) এ দুগ্‌গা—

দুর্গা : যাইরে বাবা, যাই—

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে আসে পদ্মর কাছে।

দুর্গা : ও হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার...। (গলা নামিয়ে) ছোট দারোগা বুল্‌ছিল—দেখতে অমন হলে কি হবে,... লোকটা নাকি বোমা বানায়!

পদ্ম : এঁ্যা?

দুর্গা : হ্যাঁ গো!...পারোতো এট্টু নজর রেখো দিকিনি।

দুর্গা ফ্রেমের বাইরে চলে গেলে ক্যামেরা চার্জ করে পদ্মর ওপর। সে কিঞ্চিৎ বিচলিত।

Mixes into

দৃশ্য—২১৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্ যতীনের আঙুল বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ঘোমটা মাথায় পদ্ম দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। উচ্চিংড়ে এসে তার পাশে দাঁড়ায়। পদ্ম ফিস্ ফিস্ করে তার কানে কিছু বলে। উচ্চিংড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যতীনের খাটি্‌য়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। যতীন তখনও বাঁশি বাজাচ্ছে।

উচ্চিংড়ে : বাবু! বাবু!

যতীন : উঁ?

উচ্চিংড়ে : মা মণি শুধোলে, বিছনা কি তুমি পাততে পারবে—না পেতে দেবে?

যতীন : পারব।

উচ্চিংড়ে : বাইরে চলে যায়। যতীন আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে পদ্মর কাছে ফিরে আসে। সে আবার উচ্চিংড়ের কানে কানে কি যেন বলতেই সে যতীনের কাছে যায়।

উচ্চিংড়ে বাবু!

যতীন উঁ?

উচ্চিংড়ে মা মণি বল্লে, নতুন জায়গা। শোবার সময় ঐ জানালাটা বন্ধ করে রেখো। ওস্ আসবে।

যতীন : আচ্ছা।

উচ্চিংড়ে চলে যেতে আবার যতীন বাঁশি বাজাতে শুরু করে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে পদ্মর কাছে আসতেই আবার সে তার কানে কানে কিছু বলে। এবং সে যতীনের কাছে যায়।

উচ্চিংড়ে : বাবু! বাবু!

যতীন : উঁ?

উচ্চিংড়ে : মা মণি শুধোলো, তোমায় খাবার ওখানে পাঠিয়ে দেবে?

যতীন উচ্চিংড়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত বাদে বলে—

যতীন : তোর মা মণিকে বল্, আমি খাবো না।

উচ্চিংড়ে : (দরজার আড়ালে দাঁড়ানো পদ্মর দিকে তাকিয়ে) বলছে খাবে না।

কাট্ টু।

পদ্ম দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

পদ্ম (নীচু গলায়) ক্যানে?

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে (যতীনকে) ক্যানে?

যতীন তোর মা মণিকে বলে দে, যে মা ঘরে জায়গা দিয়েও বাইরে ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে—তার কাছে আমি যাই না!

কাট্ টু।

পদ্ম দরজার আড়ালে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে, জিভ কাটে।

কাট্ টু।

যতীন সোজা পদ্মর কাছে চলে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মর কাছে এগিয়ে আসে যতীন।

যতীন : সেই তখন থেকে খালি দেখে যাচ্ছি!... খোলো! ....খোলো!... ঘোমটা!... খোলো!

ঝুপ্ করে মাথা নীচু করে যতীন পদ্মর পায়ে হাত দেয়, প্রণাম করে। পদ্ম যেন লাফিয়ে ওঠে।

পদ্ম : হেই মা!

যতীন : (পুনরুক্তি করে) হেই মা!! (তারপর জোর দিয়ে) হ্যাঁ মা!...এখন থেকে তুমি আমারও মা মণি! কি?...থাকবে মনে?

ক্যামেরা পদ্মর আনন্দউজ্জ্বল মুখের ওপর চার্জ করে। সঙ্গীত বেজে ওঠে। আনন্দে, উত্তেজনায় পদ্মর গলা আটকে যায়।

যতীন (off) : এ্যাই! কি যেন নাম তোর?

উচ্চিংড়ে (off) : উচ্চিংড়ে।

যতীন (off) : চল্‌তো রান্নাঘরে।

ওরা দুজন বারান্দায় নেমে আসে। যতীন মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মকে বলে—

যতীন : ও কি!....খিদে পায় না বুঝি?....এসো।

পদ্ম রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭০

স্থান—ছিরু পালের গোলা ঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দাসজী ছিরু পালের সঙ্গে দাবা খেলছে। ছিরু পালের দিকে সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

দাসজী : এঁ্যা? বলো কি হে?

ছিরু : "মা",...বুঝলেন—"মা"!....একবারে না বিইয়েই গণেশ জননী!

দাসজী : (চোখ টিপে) তা, ...গণেশটির বয়েস কতো?

ছিরু : হেঁ হেঁ....বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!

দাসজী : (   ) ই!!... কম্মকার কিছু বলে না?

ছিরু : কাকে বলবে?...উদিকে কামারশালে তালাচাবি ইদিকে কঁচিমালের থাঁই!....ঘরে ফিরে তবে তো?

(চলবে)

CHITRA-BIKSHAN ::

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 September 1979 Vol. 12 No. 12

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র
ত্রয়োদশ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
অক্টোবর, '৭৯
চিত্রবীক্ষণ
বিষয়সূচী
বাংলা চলচ্চিত্রের ষাট বছর / তিন
টালিগঞ্জের সেলুলয়েড বই :
আমাদের সকলের ভাবনা ও কর্তব্য /
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় / পাঁচ
তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', চিত্রনাট্য :
রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার / একুশ
সম্পাদক : অনিল সেন
প্রচ্ছদচিত্র : প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবির একটি দৃশ্য
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুষ্পপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প ষাট বছর পেরিয়ে গেল। এই বছরের হিসাবটা ১৯১৯ সালে প্রথম কাহিনীচিত্র 'বিল্বমঙ্গল'-এর মুক্তিলাভের সময়টিকে ধরে। এর আগে অবশ্যই কিছু কিছু খণ্ড বা স্বল্পদৈর্ঘের ছবি তৈরী হয়েছে, হীরালাল সেন প্রমুখ পুরোধারা নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যুগে কিছু কিছু কাজ করেছেন যদিও সেগুলির বেশীরভাগই ছিল আধা সংবাদচিত্র বা নাটকের সিনেমাটোগ্রাফ। কাজেই ১৯১৯ সালের প্রথম কাহিনী চিত্র নির্মাণের প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

বয়সের হিসাবে বাংলা ছবি যথেষ্ট প্রাচীনতার দাবী রাখলেও, আজ ষাট বছর পরে আমরা যদি সেই নির্বাক যুগের মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে দেখা যাবে চলচ্চিত্রের শুরু নিঃসন্দেহে এক technological advancement (অবশ্য যা এখানে বিদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়) এবং সেটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও কলকাতায় তৈরী নির্বাক যুগের বিশেষ কোন ছবি আজ আর অবশিষ্ট নেই তবুও একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় সেযুগে যা ছবি হয়েছে তা মনে রাখার মত নয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানের জার্মান বা সোভিয়েত নির্বাক ছবির সঙ্গে তুলনা করলে এই দৈন্য একান্তই প্রকট হয়ে ওঠে।

নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই এখানে চলচ্চিত্রশিল্পের শুরু, এর বিকাশপর্বও সেই ভাবেই হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে হয়তো কখনো দু-একটি ভালো ছবির চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্পভাবনার লক্ষণ এখানকার নির্বাক ছবিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

১৯৩১ সালে প্রথম সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তিলাভ করলো। শব্দ সংযোজন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পসংস্কৃতিসংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন সূচিত করলোনা। সেই পৌরাণিক বা আধা সামাজিক ছবিই তৈরী হয়ে চললো। সমকালীন সমাজ রাজনীতি বর্জিত বাংলা চলচ্চিত্রে তিরিশ দশকে কিছু ইতস্তত প্রচেষ্টা অবশ্যই শুরু হল—প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, দেবকী বসু, মধু বোস, হেমচন্দ্র, নীতিন বোস প্রমুখ পরিচালক কিছু কিছু ভালো ছবি তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন—নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে বাংলা এবং হিন্দী ছবি সারাভারত জুড়ে বক্স অফিস সফল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্র কখনোই জীবনধর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠলোনা, সমকালীন জীবন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলন কোনো কিছুই চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠলোনা। অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সেন্সরের কঠোর বিধিনিষেধ এব্যাপারে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিলো তবুও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়গত দীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই নিউ থিয়েটার্স ইত্যাদি প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো, যুদ্ধের বাজারে দুহাতে পয়সা লোটা কালোবাজারী নয়া মালিকদের চলচ্চিত্র-ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো বোম্বাই। কলকাতার প্রযোজকরা অসম প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে লাগলেন। দেশবিভাগ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে ক্রমশঃই দুর্বল করে তুললো।

এই রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এক নতুন সংস্কৃতিমনস্কতাকে সংঘবদ্ধ করে তুলছিলো। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল—শুরু হল ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। নিমাই ঘোষ তুললেন 'ছিন্নমূল', ঋত্বিক ঘটক 'নাগরিক' (অবশ্য সেই সময়ে নানা কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি)।

১৯৫৫ সালে মুক্তিলাভ করলো ষাট বছরের বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎ রায় পৃথিবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক অসাধারণ বাংলা ছবির সঙ্গে। ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন যুক্ত হলেন সৎ চলচ্চিত্রের আন্দোলনে।

এক নতুন সম্ভাবনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো বাংলা চলচ্চিত্র মূলত সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের শিল্পসৃষ্টিতে। এছাড়াও অংশতঃ তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রমুখ পরিচালকও এই সৃজনশীল চলচ্চিত্রে গতিবেগ সঞ্চারিত করছিলেন।

ষাটদশকের শেষাশেষি এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। বাংলা ছবি শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্রেই পিছু হঠতে শুরু করলো। নিজ প্রদেশেও বাংলা ছবি পরবাসী হয়ে উঠলো। সংখ্যাগত ও গুণগত এই দুই বিচারেই অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষার ছবির চেয়ে বাংলা ছবি পেছিয়ে গেলো।

এই পেছিয়ে যাওয়া এখনো চলেছে, চলেছে অপ্রতিহতভাবে। ষাট বছরেও নাবালক বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আজ পঙ্গু, মুমূর্ষু।

এই মুখ থোবড়ানো বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে আজ জরুরী কার্যক্রম নিতে হবে। আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়েছেন। সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যথার্থ ভূমিকায় বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সকল চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী— অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশাকরি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে যোগাযোগ করুন।**

(২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১)

টালীগঞ্জের সেলুলয়েড বই : আমাদের সকলের ভাবনা ও কর্তব্য

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে 'নবদিগন্ত' তৈরী করেছেন। প্রসঙ্গত উপন্যাসের নাম আর এই পর্দার বুকের ছবির নামও 'নবদিগন্ত'। ক্যামেরা নিয়ে সেলুলয়েডের ফিতেতে নির্মিত দীর্ঘক্ষণ ধরে দীর্ঘপরিশ্রমে দীর্ঘ টাকা পয়সা ব্যয় করে। বস্তুতঃ তার ফলে আমরা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে কেবল দেখে গেলাম এক অবাস্তব আদিমকালের থিয়েটারের থেকেও নড়াচড়াহীন অবস্থার কিছু ছবি। আজকের নবনাট্যের সময়েও, মানে পলাশবাবু যখন এই 'নবদিগন্ত' তৈরী করছেন, তখন এই মঞ্চে চরিত্রগুলো নড়াচড়া করে, জোন এ্যাকটিং-এর তীব্রতায় গতি আসে। এবং এই থিয়েটার সীমাহীনতার লজ্জাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসীম সীমাকে বুকে তুলে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছে, কতো গভীর কতো ব্যাপক ব্যঞ্জনা। আজকের নাটকের উপস্থাপনায় প্রয়োগের চাতুর্য তার ডাগর সাহস সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে এক সৃজনমূলক শিল্পময় আলোচনায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু পলাশবাবুর এই 'নবদিগন্ত' ছবি ওই লিমিটেশনেই আক্রান্ত। ফিল্ম একটি মস্ত বড় শক্তিশালী মুক্ত এবং গভীর শিল্প মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এখানে দেখা গেল না কোনো তীব্রতা কোনো গতি। অবিশ্বাস্য রকমের শ্লথ ও মন্থর এই 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েডের ফিতেতে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, এইটা কি ফিল্ম তৈরী করতে চেয়েছেন পলাশবাবু, না একটা বই তৈরী করতে চেয়েছেন ক্যামেরা নিয়ে? কোনো কিছু যদি ফিল্ম হতে হয়, মানে চলচ্চিত্র হতে হয় তার কতকগুলো নিজস্ব ব্যাপার তো আছেই—যেমন, চলচ্চিত্র মানে হচ্ছে একটি কম্পোজিট আর্ট ফর্ম। এর পাঁচটি উপাদান আছে, তা হলো, (১) সাহিত্য, (২) সঙ্গীত, (৩) অভিনয়, (৪) সময় পরিমিতি এবং (৫) ভিসুয়ালিটি। এখানে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার অন্য অর্থে নয়। অর্থ হচ্ছে সাহিত্যে জীবন রস ভীষণভাবে ধরা থাকে। যেহেতু এই চলচ্চিত্র মাধ্যমটি জীবনের কথা বলতে চায়, বাস্তব অবস্থাকে নিয়ে সৃজনমূলক ব্যাখ্যা করতে চায় তাই এইখানে সাহিত্য এই চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্র একটি উপাদান। সামগ্রিক উপাদান বা একমাত্র উপাদান নয়। এই জীবনের কথাতেই এই মাধ্যমের মধ্যে এসে সেই জীবনকেই বিশ্লেষণ করে এক দারুণ প্রকাশ মাধ্যমে। তার মানে এই নয় যে, সব সময়েই সাহিত্য থেকেই চলচ্চিত্র তৈরী হবে। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জন্যই চিত্রনাট্য তৈরী হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে ইতিমধ্যেই। আবার ব্রেঁসোর মত চলচ্চিত্রকাররা মোটেই চান না প্রচলিত অর্থের প্লট গঠন এবং তার শরীরকে নিয়ে চলচ্চিত্রে একটা নাটকীয় সংঘাতে নিয়ে এসে কিছু বলা, এটা ব্রেঁসো মোটেই চান না—তিনি বলেন—প্লট ব্যাপার যেটা সেটা কেবল একমাত্র ঔপন্যাসিকের একটা ট্রিকমাত্র। ব্রেঁসো এতখানি নির্দয় হয়েছেন এই ব্যাপারে যে এই প্লটের সঙ্গে সাব প্লট তৈরীর ব্যাপারও তিনি জীর্ণ বস্ত্রের মতোই পরিত্যাগ করেছেন। বস্তুতঃ ব্রেঁসোর চলচ্চিত্র সমস্ত নাটকীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো প্রচলিত অর্থের চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স না গড়ে দিয়েও এক মহান জীবনের সম্পদে চলচ্চিত্রকে ভরে দিতে পারে।

বাংলা ছবির আজ দারুণ এক সংকট সময় উপস্থিত। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে ছবি তৈরীর কারখানা সমেত ছবি তৈরীর ব্যাপারটা। এর সঙ্গে নিযুক্ত ল্যাবরেটরির অবস্থা সাংঘাতিক রকমের শোচনীয়। প্রাচীনকালের সেই বহু ব্যবহৃত ঝরঝরে যন্ত্রপাতি। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ'-এ কাজ করবার জন্য একজন বিদেশী অভিনেতা আসেন, আমাদের ইনডাস্ট্রির এই সব অবস্থা আর তার যন্ত্রপাতি দেখে স্টুডিওগুলো আস্তাবলের মতো অবস্থা দেখে তিনি বিস্ময়ে বৃক্ষের মতো নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি এই সব যন্ত্রপাতিতে বা এই ধরণের স্টুডিওগুলোর অবস্থার মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় কেমন করে। ওদের দেশে এই সব যন্ত্রপাতি এখন মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। এই ইনডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিকের আজ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকছে না ক্রমশঃই অত্যন্ত দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং দর্শকের সংখ্যা। বাগনান থেকে বর্দ্ধমান পর্যন্ত এই ছবির মানে এই ইনডাস্ট্রির মোটমাট বাজার। গোটা ভারতবর্ষব্যাপী এই ছবি ব্যাপক বাজার তৈরী করতে অক্ষম। কারণ, ভারতবর্ষের মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষই এই বাংলা ভাষা বোঝেন। অতএব প্রথম ব্যাপারটাতেই আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হই। এনং অবস্থায় প্রযোজকদের এই ব্যবসায় লগ্নীকৃত টাকা ফেরৎ দিতে হবে এই ছোট্ট বাজারের মধ্যে ব্যবসা করেই। আবার এই বাজারেই নানান প্রতিযোগিতা যেমন আছে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পতাও আছে মাথাপিছু মানুষের সংখ্যা হিসাবে। এই টাকা ফেরৎ না দিলে পরবর্তী ছবিতে এই প্রযোজক টাকা লগ্নী করতে আর উৎসাহ বোধ করবেন না স্বভাবতই। এদিকে আবার এই বাংলা ছবির একটি বিশেষ ইমেজ আছে সারা দেশব্যাপী। বাংলা ছবি বলতেই সকল মানুষ মোটামুটি একটি পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিদীপ্ত ছবিকে বোঝেন। যেখানে রসতত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্পর্কজনিত আকর্ষণ। একটা বিশেষ মানের ছবিকেই বোঝেন। কিন্তু সামান্য রুচির জ্ঞান এবং পরিচ্ছন্নতায় জ্ঞান বিশেষ

করে পারদর্শিতার জ্ঞান যদি ছবিতে না থাকে, দর্শক যদি তার মানসিক প্রতিফলন এই ছবিতে না পায়, যা বহুদিন ধরে সে পেয়ে এসেছে, একটা ঐতিহ্য তৈরী হয়েছে, সেখানে তার অতৃপ্তির কারণ ঘটলে স্বভাবতই তারা বিরক্ত হবে। এবং ক্রমশঃ এই বিরক্ত দর্শকের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

একটা কথা আমরা এই কমার্শিয়াল বাংলা ছবি দেখে বুঝি না যে সময় সত্যিই বদলাচ্ছে। মানসিক গঠন মানুষের সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতি দ্রুত একটি বিশেষ চোখ খুলে দিচ্ছে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের আমলে ঋত্বিক ঘটকের আমলে, মানে সেই উনিশ শো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে সুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি হলিউডের ছবির বাইরে খুব বেশী অন্য জায়গার ছবি এখানে আসতো না। মানে আমি কলকাতার কথা বলছি, সেখানে তার বাইরে অন্য কিছু দেখবার সুযোগ ছিলো না, কিন্তু এখন সময় পালটাচ্ছে। এখন আমরা বহু দেশের ছবি এই কলকাতাতেই ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হয়েও যেমন দেখি, তেমনিই সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল বাজারে খোলাখুলি বহু দেশের ছবি দেখি। তখন ফিল্ম সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাও এত তীব্র ছিলো না এখনকার মতো। কিন্তু এখন একটা আলোচনার সময় হয়েছে—যা মোটামুটি সুস্থ ও ব্যাপক। এর ফলেই মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারছে, ধরতে পারছে। নিউ থিয়েটার্স-এর যুগের দর্শক এখনো খুব অল্পসংখ্যক নয় অনেকসংখ্যকই বেঁচে আছেন। যদিও তাঁরা বয়সের ভারে জীর্ণ, তবুও তাঁদের কাছ থেকে অবিরাম গল্প কথা শুনে আমরা বাংলা ছবির প্রতি একটি বিশেষ মনোভঙ্গী তৈরী করেই নিয়েছি। (আর কেনা জানে পুরানো জিনিষের প্রতি আমাদের মমতা কী অসীম!)। মানে এই কমার্শিয়াল ছবির বিষয়ে। সত্যজিৎ বাবুদের জগৎ এখানে এক সঙ্গে আমরা দেখিনা। যেমন দেখিনা শম্ভু মিত্রের থিয়েটারের সঙ্গে রাসবিহারী সরকারের বা মহেন্দ্র গুপ্তের থিয়েটার একসঙ্গে। যেমন দেখিনা বাদল সরকারের নাটকের সঙ্গে কিম্বা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকের বা অমৃতলাল বসুর নাটকের। এরই ফাঁকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজনীতি, অর্থনীতি নানাভাবে বদলে বদলে একটা কিম্ভুত কিমাকার স্থানে এসে পৌঁছেছে। জীবনের নানান যাত্রাপথ গোলক ধাঁধার পথ নিচ্ছে। এর থেকে মানুষ বহু ভাবে নিজেকে শিক্ষিত করতে পারছে। তাই আজকে আর মিছিল করে আর বড়ো মিটিং করে রাজনৈতিক দলে ভোট দেবার প্রবণতা জাগানো যায় না, মানুষ নিজেই বুঝে নিয়ে সমগ্র ব্যাপারটা ভেবে নেয় সে প্রকৃত কী করবে। এবং তাই সে কাজে করেও, কোনো মিটিং আর মিছিলের বা অন্যান্য প্রচারের দ্বারা তাকে আর প্রভাবান্বিত করা যায় না। একটা কথা আমরা কিছুতেই বুঝি না এই পশ্চিমবাংলার মানুষ যে কোনো জায়গার মানুষের চাইতে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন এরা অনেক বেশী কথা কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে বুঝে নেন: এই গভীরতা তাদের সর্বত্র। শিল্প, সংস্কৃতিতেও, তাই চট করে বাজীমাৎ করে তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে তা হবার নয়। এরাই যদি দিনের পর দিন বাংলার টালীগঞ্জ থেকে নির্মিত সেলুলয়েড থেকে আঘাত পান মানসিকতায়, তাদের ন্যূনতম চেতনায় যদি এই সেলুলয়েড আঁচড় কাটতে না পারে, তা হলে তারা নিশ্চয় বিরক্ত হবেন। আর এই জন্যই আমরা অনেক দিন আগেই দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের মহান চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি'ও পয়সা তুলতে অক্ষম হয়েছে প্রথমে। তাব কারণ, ওই একটাই। দর্শক বাজে ছবি নির্বোধ ছবি দেখে বিরক্ত হয়েই কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি 'পথের পাঁচালির' মতো মহান চলচ্চিত্রে। সেই দুঃখ লজ্জা আমাদের সকলের, আর এখনও এই জিনিষ চলেই যাচ্ছে। এই অবস্থার বলি হয়ে যান ঋত্বিক ঘটক। 'বাবা তারকনাথ' কিম্বা 'সুনয়নী' যে হারে দর্শক দেখে, দেখেনা সেই হারে 'দৌড়' কিম্বা 'পরাজিত নায়ক' বা 'যদুবংশ'। 'মালঞ্চ'র মতো ছবি করবার জন্য এই জনসাধারণের কাছেই পূর্ণেন্দু পত্রীকে ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয়। মৃণাল সেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে চলবার চেষ্টা করেন, হালে পানি না পেয়ে চলে যেতে হয় হিন্দী ছবি জগতে। বহু তরুণ চলচ্চিত্রকার সাংঘাতিক চিত্রনাট্য নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ান পাগলের মতো, কেউ আবার পুরোপুরি বিজ্ঞাপনের ছবি তৈরীর দিকে চলে যান।

অথচ টালীগঞ্জ বসে নেই, ছবি নামক বই তৈরী হয়েই যাচ্ছে আর দর্শক ভাগাচ্ছে বাংলা ছবির জগৎ থেকে। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যখন হিন্দী ছবির রিলিজে রগড় বানানো নায়ক-নায়িকা বা সঙ্গীতকার নেই যা দর্শক চায়, তা নেই, ঠিক তখন-কার রিলিজ বাংলা ছবি মোটামুটি চলে বা হিট্‌ও করে যায়। এই অবস্থায় যদি কোনো বাংলা সেলুলয়েড বই যদি সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহ পার করে, তখন সেই আনন্দ অথবা কীর্তি কলকাতা স্টেট বাস করপোরেশনের লাভ হবার মতোই বড়ো করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতোই হয়ে দাঁড়ায়। আবার এও আমরা দেখেছি বহু টাকা ব্যয়ে এবং ভারত এবং আমেরিকার যুগ্মভাবে প্রযোজিত 'শালিমার'-এর মতো হিন্দী ছবি কলকাতায় পাত্তা না পেয়ে গুটিয়ে নেয় অথচ এই 'শালিমার'-এর মধ্যে কি যে ছিলো না পয়সা তোলার উপকরণ সেইটাই ভাববার। রগরগে সব উপকরণের বড় আকারই সেখানে উপস্থিত থেকেও তাকে পাল গুটিয়ে সরতে হয়েছে। এইগুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কেন হয় এইরকম। এইসব নিয়ে ভাবতে পারলেই সমস্যার উৎসে যাওয়া যাবে। এই ভাবনাতেই বোঝা যাবে কেন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আর এই সুযোগই ব্যবসায়িক থিয়েটার নামক ন্যাকারজনক বেনিয়া বুদ্ধির নাটক একরকম পদার্থ শতশত রজনী অবলীলায় পার হয়ে যায়। কেন 'এক্ষণ' পত্রিকার

প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে যেতে থাকে। অনিয়মিত প্রকাশই নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। কেন 'এক্ষণ'-এর সম্পাদককে লিখতে হয় বর্তমানে গ্রাহক করা বন্ধ। কারণ, পত্রিকা কখন এবং কবে প্রকাশ হবে, বছরে কটা সংখ্যা প্রকাশ হবে বা আদৌ প্রকাশ হবে কিনা তার ভাগ্য জানতে হলে ফুটপাতে জ্যোতিষীরই হাতের কর মেলাতে হবে। কেন 'চিত্রবীক্ষণ'-এর মতো চলচ্চিত্রের গভীর ভাবনার পত্রিকা বারবার হোঁচট খায়। 'চিত্রধ্বনি' নামক চলচ্চিত্রের ত্রৈমাসিক পত্রিকা লিখেই দেয় তার দ্বিতীয় সংখ্যায়—'চিত্রধ্বনি' অনিয়মিত হবে বলাই বাহুল্য, পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে কি-না ভবিষ্যতই বলতে পারে'। কেন 'পরিচয়' পত্রিকার স্বাস্থ্য দিন দিন শীর্ণ হয়। বহু লিটল ম্যাগাজিন সমৃদ্ধতর ভাবনায় প্রকাশ হয়েই দুদিনেই মৃত্যুর চাদর বুকে জড়িয়ে নেয়। শীর্ণ থেকে আরও শীর্ণ হবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে যায় কেন বহু লিটল ম্যাগাজিন। আর বিপরীতে স্থূলকায় থেকে আরও স্থূলকায় হয়ে নানান বর্ণে নিজেকে সাজায় 'আনন্দলোক', 'ঘরোয়া', 'উল্টোরথ' 'নবকল্লোল-'এর মতো কাগজ। যে নির্ভরতায় একটা 'পরিবর্তন'-এর মতো একেবারেই জোলো পত্রিকা বার হতে পারে, এই অসীম কাগজের দুর্মূল্যতার সময়ে, ঠিক সেই স্থির নির্ভরতায় আজ এই অবস্থায় একটা 'চিত্রবীক্ষণ' বা 'চিত্রধ্বনি', 'মুভিমনতাজ', বা 'গ্রুপ থিয়েটার' বার হতে পারে না!

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, বিশ্রী একধরণের মেক আপ এবং তার ততোধিক কুশ্রী দাড়ি। বয়স্ক নায়ককে বয়সের দিক থেকে কমিয়ে আনবার জন্য চড়া মেকআপ সর্বত্র লক্ষিত। আমরা জানি আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ইংগমার বেয়ারিমান পছন্দ করেন অনেক বেশী পরিমাণে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনেতারা চড়া মেক-আপ নিক। কিন্তু তার পেছনে তাঁর এক প্রচণ্ড যুক্তি যেমন আছে তেমনিই আছে তাঁর কাজ চলচ্চিত্রেও সেই সাংঘাতিক যুক্তির তীব্র প্রতিফলন যা আমরা দেখে যাচ্ছি। পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনায় হরিচরণের এই মেক-আপ-এর কোনো বিন্দুমাত্র যুক্তিও কিছু নেই যেমন, তার উদাহরণও কিছু নেই। তার উদাহরণ পাওয়া যায় পাড়ায় অল্পবয়স্করা অপরিণত মানসিকতার চেতনায় মাঝে মাঝে মাঠে মাঁচা বেঁধে যে থিয়েটার নামক খেলা করে, তাতেই। একটি কোর্টের দৃশ্য নিয়ে এই 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েড 'বইটি' সুরু (ফিল্ম বলতে কলমে বাধছে, লজ্জা হচ্ছে।)। উত্তমকুমার, সেই বিখ্যাত রূপকথার মানুষটি, যিনি আমাদের মা-বোনদের দুপুরের ভাত-ঘুম কেড়ে নিয়ে তাদের দেহে অথবা মেদ জমে যেতে দেননি, সেই সাত রাজার ধন উত্তমকুমার এই হরিচরণের ভূমিকায় ওই কুশ্রী মেকআপ নিয়েই পর্দায় প্রতিফলিত। থুড়ি—, এখন তিনি হ্যারি ব্যাণ্ডোর ভূমিকায় থেকে বলে চলেছেন কেন তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, কি তাঁর জ্বালা, কি তাঁর যন্ত্রণা, কি তাঁর বক্তব্য (কিছু আছে নাকি?), কি তিনি চান—(বস্তুত তাঁর চাওয়ার মতো গভীর কিছুই নেই।) এই সমাজে, এই সব ভ্যানতাড়ার জেলপুরী বলেই চলেন,—বলেই চলেন অবিরাম বক্‌বক্ করে। মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় ঘটনা তাঁর বক্‌বক্‌কে অনুসরণ করে,—যেকথা বহু ঘটনার (এগুলো কি কোনো ঘটনা?) সম্বলিত কাহিনী ব্যাণ্ডো বলে চলেছেন বিচারককে। (এই রকম ব্যবস্থা বোধহয় একমাত্র এই সব বিচারকের সামনে এই সব কোর্টেই হয়।) অবিচল ভাবে ক্যামেরা যেমন এই ব্যাণ্ডোকে ধরে একই ফোকাসে, আবার সেই অবিচল ভাবেই ক্যামেরা সেই পিছনের কাহিনীর একটা ছবি ক্লিক্-থ্রি ক্যামেরায় তোলা বাড়ীর বিয়ে উপনয়নের ছবির মতোই বলে চলে। আমরাও বাড়ীর এ্যালবাম্ খোলার স্মৃতি নিয়ে থাকি ওই অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে। অবিশ্বাস্য অবস্থায় অবাস্তব চড়া সেন্টিমেনটের আরকে ভেজানো এক আজগুবি গল্পের ঘটনা চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তার না আছে একটা মোটামুটি সুচারু কাহিনী বিন্যাসের ঢং, না আছে তার চরিত্র গঠনের ব্যক্তিত্ব। বোধহয় এর চাইতে অনেক বেশী একটা সুচারু রূপ পাওয়া যায় বাড়ীর সামান্য এ্যালবামে, অনেক বেশী বাস্তব রূপ। 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েডে না আছে সমাজগত ব্যাপার, না আছে তার অর্থনৈতিক ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারটায় কেবল ঘটনাগুলো সাজানো অবস্থায় জীবনহীন সমাজহীন বায়ুশূন্য থেকে নিরালম্বহীন হয়ে ঝুলে থাকে, বা ঘটে যায়। সত্যি এ এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্যরকম স্থিরতায় চিত্র-চিত্র খেলা। ক্যামেরার স্থিরতা নিয়েও কী আশ্চর্য্য রকমের প্রকৃত ফিল্ম গড়া যায়, জীবনের গভীরতম কী স্পন্দন গাঁথা যায় সেলুলয়েডের বুকে তার নিদর্শন আশ্চর্য্যরকম চলচ্চিত্রকার ওজুতে। ওজুর এই শিল্পকর্ম যেন গোটের ভাষায় গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করবে—একটি মহান স্থাপত্য অথচ জমাট বাঁধা সঙ্গীত। 'নবদিগন্ত' বইতে পলাশবাবু সেলুলয়েডে গাঁথতে গিয়ে একবারও বিন্দুমাত্র ভাবেননি ছবিটি দর্শকের কাছে বিশ্বাস্য এবং যোগ্য করে তুলতে হলে একটা সময়সীমা দরকার। কোন সময়ের ঘটনা এই 'নবদিগন্ত'? কোন সময়ের এই বইয়ের চরিত্রগুলো? কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় কষ্টকর অবস্থায় হরিচরণ এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করে, তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো সামান্য ইঙ্গিত নেই এই সেলুলয়েডের বইতে। এ এক আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপার। কলকাতার রাস্তায় একটা গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, মানুষ নেই কেবল হরিচরণ ছাড়া,—অথচ আধুনিক বাড়ী আছে—হরিচরণ সেই পরিত্যক্ত মানুষের নগরী কোলকাতা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে আর চলে। ঘোড়ার জল খাবার চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে মুখ-চোখে দেয়। এই ঘোড়ার জল খাবার চৌবাচ্চা এখনও কোলকাতার বুকে যত্রতত্র অবস্থান করছে আর তার থেকে জল নিয়ে ভবঘুরেরা ব্যবহার করছে, অথবা রিক্সাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা সেই জল নিয়ে গাড়ীও ধুচ্ছে এ্যাস্বাসাডার মার্ক থ্রি! এটা কোন সময়ের মানে কোন শতাব্দীর কলকাতা পলাশবাবু? জব চার্ণকের আগের? তারও পাঁচ হাজার বছর আগের শহর অথচ কলকাতা!

উপন্যাস থেকে নিয়ে সিনেমা তৈরীর ব্যাপারটা ভালোই। সাহিত্য শ্রীমণ্ডিত রুচিসম্মত সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি ইতিমধ্যেই আমরা বাংলা ছবির এই ভাঙ্গা হাটেই এই টালীগঞ্জের থেকেই নির্মিত হতে দেখেছি প্রবীণদের মাঝেও এবং নবীনদের মাঝেও। চলচ্চিত্রের মূল শিকড় সাহিত্যের কাছে দাসত্ব গ্রহণ করবে কি করবে না, এই প্রশ্ন অবান্তর আসল কথা হলো ফিল্ম তৈরীর মালমশলা তার গভীর চরিত্রের অথবা জীবনের এলিমেণ্ট সেই কাহিনী থেকে পাওয়া যাচ্ছে কি না, তার স্পন্দ-ছন্দ দোলা লাগাচ্ছে কি-না একজন চলচ্চিত্র ভাষা জানা চলচ্চিত্র-কারকে। ছবির ভাষায় ধরা দেবে কিনা একটা অন্তর যাত্রা ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনার জন্যই, এই মাত্রার অন্তর ক্ষেত্রের জন্যই একটি বহু পঠিত গল্প একজন পাঠক আবার দেখবার জন্যই প্রেক্ষাগৃহে এসে বসে টিকিট কিনে। এইটির সঙ্গে একমাত্র তুলনা বলে বোধ হয় সেই কথাটির যেমন সব কবিতাই শেষ পর্যন্ত গান হতে চায় এই ধ্বনি বৈচিত্র্য এই সঙ্গীতময়তাই হলো দর্শকের কাছে একটা ভীষণ অনুভূতির অনুভব, যা তাকে শেষ পর্য্যন্ত মূল ধরে নাড়া দিতে সক্ষম।

এখানে সব থেকে বড় কথা হয়ে দাঁড়ায় শিকড়ের এই ডানায় ফিল্মের নিজস্ব মেজাজে নিজস্ব চরিত্র গঠনে ব্যক্তিত্বেই লীন হয়ে যাবে কি না সেই কাহিনী, গল্প বা উপন্যাস যেভাবে পাতার পর পাতা কালি কলম দিয়ে একজন লেখক বয়ে নিয়ে যান, একজন ফিল্ম-মেকার যেভাবে ফিল্মকে বয়ে নিয়ে যান ক্যামেরার চোখ দিয়ে। এই ক্যামেরার নিজস্ব চরিত্র বা তার গঠন এই কলমের চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় জোরালো। ভের্তভের ভাষায়—দি ক্যামেরা ইজ দ্য সিনে-আই।—যেটাকে তিনি মনে করেছেন মানুষের বা এই কলমের চাইতে অনেক বেশী বাস্তব চোখ দিয়েই জন্মলাভ করেছে, ফলতঃ সে অনেক বেশী দেখতে ও দেখাতে সক্ষম। উপন্যাস বা গল্পের নিজস্ব একটা পরিমণ্ডল আছে সেখানে তার একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে যেহেতু ভাষা আছে বলেই। এইটি তার একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। যে ব্যাপারের সঙ্গে অন্য মাধ্যমের নিজস্ব মেজাজের ব্যাপার মিলতে কখনও পারেনা। এটা হয় না। হতে পারে না কিছুতেই। এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। অন্য একটা মাধ্যমের মধ্যে ফলতঃ এই গল্পকে বলতে গেলে, না—বলা ভালো বাঁধতে গেলে সেই ভাষায় সেই মাধ্যমের, সেই ব্যাকরণের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেই সেই ভাষাকে রক্ষা করতে হয়। আর সেটা না পারলে বা না করলে অবিশ্বাস্য রকমের আজগুবি ব্যাপার স্যাপার হবেই, হোঁচট খেতে হবেই—এ কেউ বাঁচাতে পারবে না,—এটাতো সহজ কথা শরৎকালের শিউলি ফুলের মতো, অতএব কিছু স্বাধীনতা ভোগ করার কথা তার অধিকারের কথা ফিল্ম-মেকার নিয়েই যাচ্ছেন সেখানে। এই গল্পটির মূল বক্তব্য একজন ফিল্ম মেকারকে ভাবিয়েছে, তাঁর, মনে হয়েছে এই বক্তব্য একই সঙ্গে লক্ষ সহস্র মানুষকে একই সঙ্গে দেখিয়ে কম্প্লিট মোচড় দেওয়া প্রয়োজন। আরও বৃহত্তর বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার। এই স্বাধীনতায় ফিল্ম-মেকারের মন্তব্য মতবাদ তার প্রতিবাদ একটা শারীরিক গঠন নিয়ে দাঁড়ায়। এখানে সাহিত্যিকের সঙ্গে তার মিলতে নাও পারে তার মন্তব্য তার প্রতিবাদ তার মতামতের কাঠিন্য। এই শারীরিক গঠনের মধ্যে ফিল্ম-মেকার মানুষকে মানে ওই বৃহত্তর মানুষকে বোঝানোর প্রয়োজন অনুভব করেন কি ভীষণ এক কষ্টকর পরিবেশের অবস্থার জন্য মানুষ তার ব্যক্তিত্ব নিয়েও স্বধর্মে স্বকর্মে নিয়োজিত বা সম্পৃক্ত থাকতে পারছেনা। বাস্তব অবস্থাকে এইখানে বিশ্লেষণ করা, দর্শককে তীব্রভাবে বোঝানো কি ভীষণ এক অবস্থার সে আজ দাস—এবং নতজানু, সংবেদনশীল মন নিয়ে সৃজনমূলক আলোচনার মধ্যে বাস্তব অবস্থাকে তার ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখানো। বাস্তব অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত একটা পার্স-পেকটিভে দাঁড় করাতে গভীরভাবে না পারছে, কিছুই হয়ে উঠছে না বস্তুতঃ। যা সে বলতে চাইছে তখনই হয়ে যাবে এলোমেলো-বিচ্ছিন্ন, শিকড়হীন এক অন্ধকার অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। এই পার্সপেকটিভেই দর্শক বুঝে নেবে তার সংগ্রামের তার জয়ের কথা আবার তার ব্যর্থতা আছে সেটাও সে বুঝে নেবে বিপরীতে। এইটা করতে গেলে যে তাকে কোনো বিশেষ পার্টির কথা বলতেই হবে এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি, বা কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তেই যে তাকে আসতে হবে এমনও কেউ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়নি তাকে। কেবল শিল্পীর হৃদয়ের মধ্যে সেই অনুভবের মধ্যে থেকে বাস্তব অবস্থাকে সৃজনমূলক আলোচনায় বা বিশ্লেষণে নিয়ে এলেই তার কাজ শেষ, বাকীটা দর্শকের। এবং ওই নিয়ে যারা লেখেন আলোচনা করে বোঝান মানুষকে, বাকীটা তাদের। ওইটা বোঝাতে গেলেই একটি দৃশ্যময়তার মাধ্যমে তার নিপুণ ছন্দে গাঁথতে গেলে তার মধ্যে অবশ্যই বাস্তব সমীকরণের প্রয়োজন হচ্ছেই হচ্ছে। বাস্তবের পরিবেশটিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে মানুষের জীবন যাত্রার প্রবাহ না ধরতে পারলে ওই আসল অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থেকে যে সময়কে ধরবার চেষ্টা এবং তার উত্তরণের চেষ্টা হচ্ছে তাকেই নিখুঁতভাবে পাওয়া যাবে না। এবং এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যাবে ক্রমশঃ বিস্তারিতভাবের ছন্দের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন বাস্তব-অবাস্তব শব্দের সমাহার। আমরা এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি প্রয়াত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রটিকে। এই চলচ্চিত্রের কাহিনী অংশ নেওয়া হয়েছে তৎকালীন 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তিপদ রাজগুরুর 'চেনা মুখ' নামক একটি অত্যন্ত অবাস্তব ও জোলো গল্প থেকে, যেখানে বুদ্ধির আর যুক্তির কোনো অংশই নেই। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক কিন্তু কাহিনীর সার বস্তুতে মুগ্ধ হয়ে যান। বুঝতে পারেন এই সারবস্তু কেবল সেলুলয়েডে বাঁধা পড়তে অপেক্ষা করছে তীব্র আকুলতায়। বুঝে নেন গোটা দেশের একটা পচন একটা অবক্ষয় আবার তার উত্তরণ এই সারবস্তুকে নিয়ে সেলুলয়েড বলতে পারবে বৃহত্তর মানুষের কাছে, যা শেষ পর্য্যন্ত তাকে

বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে মহৎ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবে তীব্র আঘাতে। ক্যামেরা তার সিনে আই নিয়ে প্রবেশ করে যায় অবলীলায় নির্মল ভালোবাসায় আবার সেই জীবনযাত্রার বিস্তারিত ভাবের ছন্দে, জীবন যাত্রার দৈনন্দিনতার বাস্তব-অবাস্তব শব্দের সমাহারে। ক্রমশঃ ছবি দানা বাঁধতে থাকে জীবনের দারুণ টগবগে রক্তস্রোতে। ভাত ফোটার মতো অতি সামান্য এবং শ্রুত শব্দও শেষ পর্যন্ত অসীম আকুলতায় এই চলচ্চিত্রে মানুষকে বোঝায় তার স্বধর্মের কথা-তার স্বকর্মের কথা। এই ছবিটিকে নিয়েই আমরা বুঝতে পারি শিল্পে সমাজতত্ত্বের মতো আবশ্যিক প্রসঙ্গটা কোনো রকম জোর-জার চেষ্টা-কষ্ট করে আনতে হয় না। চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের দেশ-কালের মধ্যে ফেলে বলতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতত্ত্বটা আপনা আপনি এসে যায়।

এই 'নবদিগন্ত' ছবিতে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেলুলয়েডে এর কিছুমাত্র কিছুই নেই। তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যারি ব্যাণ্ডোর জীবনের চূড়ান্ত রূপান্তর এবং উভয় ক্ষেত্রেই তার জীবনযাত্রার বিশ্বাসযোগ্য রূপ। তৎকালীন (কোনো কালকে বা সময়কে যদি ধরেই নেওয়া যায় জোর করে) মানুষের পুরোনো মূল্য-বোধের মৃত্যু ঘটেছে, কিভাবে সে দাস হচ্ছে ক্রমশঃ একটা কুশ্রী কুৎসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, একটা রাজনীতির একটা অর্থনীতির চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায়। যেখানে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সকল পথ রুদ্ধ, মনুষ্যত্বের শোচনীয় দুর্গতি ও তার নিষ্করুণ অপচয় যেখানে অনিবার্যতা লাভ করতে চায়। গল্পটির মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেখানে মোটামুটি পৌঁছতে পেরেছেন, (যদিও আমার অন্ততঃ মনে হয় এই 'নবদিগন্ত'-এ উচ্চতর সাহিত্যমূল্য নেই কিছু, যেমন তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে আছে।) কিন্তু তবুও এই যে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য স্থানে তিনি আনতে পারেন পাঠককে, এইটাই বড় কথা। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের চিন্তাধারার স্রোত বয়ে তিনি বলতে পেরেছেন কিছুটা মূল্যবোধের মৃত্যুর কথা। মোটামুটি যুক্তির ধারে ও ভারে গল্পের মেজাজে তিনি বলতে পেরেছেন মানুষ কি করে তার গভীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, কি করে তার আত্মহত্যা ঘটে যায় নীরবে স্রোতহীন অবস্থায়। একটা গ্রামীন ব্যাকগ্রাউণ্ড কিভাবে গল্পের মেজাজে আসছে তাও দেখবার মতো তারাশঙ্করে। এবং শুধু তাই নয়, গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে এই চরিত্রের যোগাযোগ, এইসব নিখুঁত একেবারে না হলেও বেশ কিছুটা স্পষ্টভাব আছে। অসহায় পরাজিত ভাবটি হরিচরনের গল্পে ভীষণ ভালো ভাবে ফুটে উঠেছে তারাশঙ্করে—যে অবস্থায় এসে সে নিজেকেও নিজে ঘৃণা করতে পারে। পলাশবাবুর সেলুলয়েড কর্মে এই সব কথা বিন্দু-মাত্র আসেনা। তিনি ভাবতেই পারেননি তিনি কলম নয়, ক্যামেরা দিয়ে জ্যান্ত কিছু মানুষ নিয়ে জ্যান্ত মানুষের সামনেই এই ছবিটাকে রাখবেন। এমন একটাও দৃশ্য পলাশবাবুর ছবিতে নেই যা বিন্দুমাত্র পরিচালককে বা চিত্রনাট্যকারকে নিষ্ঠাবান একজন চলচ্চিত্র প্রেমী বলতে উৎসাহী করবে। এমন একটা দৃশ্য নেই যার ফাঁক-ফোঁক দিয়েও নির্ভেজাল না হোক অন্তত কিছুটা গ্রামীন ব্যাক গ্রাউণ্ডের পটভূমি বিশ্বাসযোগ্য রূপ নিতে পেরেছে। এমন একটাও চরিত্র নেই, এমন একটাও ঘটনা নেই যেখানে এই সেলুলয়েডে গ্রাম্য মানুষের জীবনযাত্রার কিছু কথা অন্তত এসে পড়েছে। একটাও শব্দ নেই—যেখানে একটাও পাখীর শব্দ না হোক (অন্তত মনে করছি পলাশবাবুর স্যুটিং এর সময় সব গ্রামীন পাখীরা ছুটি কাটাতে গেছে দূর দেশে।) একটা কাক কি ডাকতে পারতো না। গৃহস্থের আঙিনায় কাক এসে বসেও না এমনি কোনো গ্রাম আছে কি বাংলাদেশে? একটাও গরু ছাগল বা চাষী কেউই যায় না, আসেনা। গ্রাম্য পরিবেশে কি আজকাল আর কোনো গরু বা পাখী বা কাক ডাকেও না, বা উড়েও যায় না? ঠিক এই জন্যই ওই রকম একটা ব্যাপারের জন্য ওই হরিচরনের বড় মেয়ে তারা বাবাকে তার বিয়ের পণ টাকার যোগাড় না করতে দেখে, বাবার অপমানকর লজ্জাকর অবস্থায় নিজেকে দায়ী হিসেবে ভেবে (যদি এরকম ভাবনা কষ্ট করে আমরা ভেবেই নিই তবে।) অসহায় হরিচরনের সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর হতে পারে না দর্শক। কারণ গোটা পরিবেশটিকে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। চরিত্রটিকে নিয়ে পরিবেশটিকে গড়া হয়নি। এবং সামগ্রিকভাবে এই সেলুলয়েড একটা স্ট্রাকচার এবং তাও ডেভলাপমেন্ট এবং তার স্রোত গড়তে অক্ষম হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, তা দর্শক বুঝে নিয়েছে। আজকের দর্শক জানে আধুনিক মানসিকতায় যে শিল্পকর্ম গড়ে ওঠে তা বস্তুনিষ্ঠ, নির্মম, স্পষ্ট। তা অবশ্যই মানুষের সমগ্র সত্তাটিকে অনাবৃত করে তুলে ধরতে চায়। সমাজের অবস্থাটা আর ওই গ্রাম্য পরিবেশ, তা পরিষ্কার স্পষ্ট আকারে ধাপে ধাপে সেলুলয়েডে গাঁথার প্রয়োজন ছিলো। তবেই যে কথাটা যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আদায় করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা গিয়ে আঘাত করতে সক্ষম হতো। এবং তা হলেই তার সঙ্গে দর্শক ইনভলভড্ হয়ে যেতোই, সেই বক্তব্য থেকে একটা প্রতিবাদ ফুটে বেরুত। (সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' ছবিতে সোমনাথ মিডলম্যান হবেই, এটা গোড়া থেকে অত্যন্ত সুচারুভাবে ধাপে ধাপে গড়া হয়েছে। পরীক্ষার হলে তার হাত দিয়েই পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর টোকার 'চোথা' চলে যায়, তার বাড়ীর পরিবেশ, সবকিছু মিলেমিশে একদম শেষে সে যখন সত্যিকারের মিডল ম্যান দালাল হলো, তা বিশ্বাস্য রূপ নিতে সহজেই সক্ষম হলো, তার সঙ্গেই জড়িয়ে গেল সমাজ-রাজনীতি অর্থনীতির মতো দারুন সব সতেজ প্রশ্ন যা দেশের ও দশের। সুকুমারের বাবা চরিত্রটি ওখানে উল্লেখযোগ্য। সামান্য নিম্নবিত্তের বিরক্তি তার মানসিকতা অকপটভাবে সেলুলয়েড গেঁথে নেয়। চাকরির জন্য চেষ্টার সাংঘাতিক পর্যায়ে নেমেও একজন তরুণ শিক্ষিত যুবক, কর্মঠ যুবক যে পরিবেশে চাকরী পায় না, নির্ভরতা পায়না ভবিষ্যতের, যেখানে সামান্য ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে হয়, যেখানে বন্ধুর বোনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার হতে দেখেও সোমনাথ শিক্ষিত

হৃদয়ে সব মেনে নিয়ে অর্ডারটা নিয়ে নেয়। কতো অসীম বিশ্বাস নিয়ে, কতো গভীর আন্তরিকতায় নিখুঁত চোখ আর অনুভূতি নিয়ে একটা দেশের—পোড়া দেশের, গোটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ধরে থাকে 'জন অরণ্য' ফিল্মটি যা উপন্যাসের মধ্যে শঙ্কর সাহিত্যিক হিসেবে বলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই পারলেন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এই ক্যামেরায়, এই সেলুলয়েডে, এই কলকাতার টালীগঞ্জেই।) পলাশবাবুর ওই ব্যর্থতার পথ বেয়েই হরিচরনের বড় মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার তীব্র গনগনে এক ঘটনা তার আবেগ নিয়েও দর্শকের কাছে সামান্য তরঙ্গ তুলতে অক্ষম হয়ে গেল। কারণ বহু আগের থেকেই অবিশ্বাস্য রকমের নড়বড়ে কাহিনী এলোমেলো চিন্তা স্থবির ক্যামেরার মধ্যে দর্শক বাসা বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যার জন্যই দর্শক এখন আর কিছুই বোধশক্তিতে আনতে পারে না। অথচ এই ব্যাপারটিকেই ঠিক মত করে গুছিয়ে বলতে পারলে, একটা তীব্র আবেদন রাখা যেতই, ড্রামাটিক হাইলাইটসকে বাড়িয়ে নিয়েও দরকার মতো মর্মস্পর্শী করা যেতো। তাতেই ফিজিওলজিক্যাল আর ড্রামাটিক এ্যানালিসিস করেও ঠিক জায়গায় যাওয়া যেত।

গল্পের মধ্যেই এর উপাদান ছিল। মানে, সমাজ ব্যবস্থার কুশ্রীতার রূপটা নিয়ে কিছু বলব তা হচ্ছে পলাশবাবুর 'নবদিগন্ত'-এ দেখেছি জমিদারের কাছে একদল চাষী এসেছে, চাষীর গায়ে সেই গামছা দেওয়া, এবং তা নতুন গামছা, হাঁটুর ওপর পরিষ্কার সুন্দর সাদা ধুতি পরা, চাষাগণ ওই গ্রামীন জমিদারের কাছে—গেঞ্জীপরা জমিদারের কাছে জমির নিজস্ব মালিকানা নিয়ে কথা বলতে এসেছে, জমিদার তাদের বলছে লাঠির জোর যার আছে তারই হবে জমি, আর সেই হবে জমির মালিক, জমিদার আরও বলেন, তিনি লাঠিয়াল পাঠাচ্ছেন, চাষীদের যদি লাঠির জোর থাকে তো তাদেরই হবে জমির মালিকানা। এই নতুন গামছা গায়ে দেওয়া চাষীগণ একবারও এই সেলুলয়েডের সাউণ্ড নেগেটিভে বিন্দুমাত্র কোনো শব্দ না রেখেই আগেও না পরেও না, চলে যায়। একবারও এই চাষীগণ ক্যামেরার দিকে সোজাসুজি তাকায় না। কি তাদের মানসিক ভঙ্গী হয় জমিদারের এই কথা শুনে তাও বোঝা গেল না. বুঝলো তারা, যারা পর্দার পিছনের দিকে রয়েছে। তারা পেছন ফিরে দর্শকের দিকে দাঁড়ায়, আর ওই পিছন ফিরেই চলে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিচরন বহুদিন পর (কতোদিন কতো বছর তা জিজ্ঞাসা করলে নিজের গালে থাপ্পড় দিতে হবে নিজেকেই।) উত্তমকুমার সেই রাত রাজার ধন এক মানিক, হয়ে ওই জমিদারের কাছে আসে— ওই ফ্রেমেই এসে তার বহুদিন আগে ফেলে রেখে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথা জমিদারের কাছে বলে। এবং এও বলে যে জমিদার যদি তার স্ত্রীকে না নিয়ে যেতে দেয় তাকে স্বামী হিসেবে, তাহলে সে আদালতের শরণাপন্ন হবে। এবং আরও বলে হরিচরন, (না উত্তমকুমার) সে আসবার সময় থানায় একটা জরুরী ডায়েরী করে এসেছে, কারণ,তার আশঙ্কা ছিল, যদি এই জমিদার তার ওপর জোর করে হামলা বা মারধোর করে জাতীয় আর কি। সেই জন্যই অত্যন্ত চালাক লোকের মতই, আইন জানা লোকের মতই (এই চালাকি করে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ হরিচরন আর ওই গোটা সেলুলয়েডে আর করতে পারেনি—বস্তুতঃ সে নির্বোধ থেকে নির্বোধতর হয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য নির্বোধ হয়ে যেতে থাকে ক্রমশঃই যত এই সেলুলয়েড শেষ হতে চলেছে।) এখন কথা হলো তাহলে নিশ্চয়ই তখন একটা প্রশাসন ছিল। সেই প্রশাসনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণভাবেই জমিদারকে মানতে হত। কারণ জমিদার এই থানার কথা শুনেই কিছু করতে পারে নি। তারপর সুমিত্রা মুখার্জী জমিদার কন্যা পায়ের কাছে এসে সব কিছু রেখে চলে আসে উত্তমকুমারের সঙ্গে জমিদারগৃহ ত্যাগ করে (ভাবা যায় উত্তমকুমারের এই বয়সের স্ত্রী কিনা সুমিত্রা মুখার্জী। এরপর যদি একটা ছবি করি এই উত্তমবাবুকে নিয়ে যেখানে পাঠশালায় অ-আ-ক-খ পড়ছেন উত্তমবাবু। তখন কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে বৃহত্তর সংগ্রাম করে নোবেল প্রাইজের চাইতেও বড় যদি কিছু ফিল্মের পুরস্কার থাকে সেটা আমাকেই দিতে হবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অবশ্যই ছবি হবে না সেটা।) সেই প্রশাসন স্বদেশী না বিদেশী? এই প্রশ্ন আসতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই। ১৮৯০ সাল বলে এই 'নবদিগন্ত' শুরুতেই আমাদের জানাচ্ছে। তাহলে যেখানে একজন সংস্কৃত ভাষা প্রিয় এবং অভিজ্ঞ গ্রাম্য মানুষ ভাবতে পারে (এখানে দেখানো হয়নি হরিচরন সেই রাত্রে জমিদারগৃহ ত্যাগ করার পর কোথায় ছিলো) তার নিরাপত্তার জন্য সক্রিয় থানার পুলিশ প্রশাসনকে সেখানে চাষীদের এই অপমানকর হেনস্থা, বা এই জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অথচ সেই সময়টায় জমিদারের শাসনই বড় শাসন। সেখানে থানা পুলিশ কিস্সু নয়। বস্তুতঃ এইতো আমরা জানি সেই শিল্পই মহৎ যাঁর চরিত্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে সমাজতাত্ত্বিক ধাঁচে ফেলে আলাদা মন নিয়ে বসে বিচার করতে হয় না। তাঁর শিল্পের মধ্যেই সেটা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পায়।

বস্তুতঃ তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে বহু কিছু উপাদানকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে বা দেখাতে পারলে ক্যামেরায় চোখ দিয়ে, তাহলেই চলে যাওয়া যেত কিছু মৌল সংকটের কাছে—যেখানে আছে মানুষের তীব্র লজ্জা, অসহায় জীবনযাপনের কথা, গ্রামীন অনুন্নত অবস্থার কথা। যেমন অজয়ের চরিত্রটি অনুসরণ করলে পাওয়া যেত কিছু সমকালীন প্রতিচ্ছবি। অজয়ের মুখে একটা দেশাত্মবোধক গান শুনেছি কারাগারে বন্দী অবস্থায় বসে। কে অজয়, কোথা থেকে এল, সে প্রকৃত কি করে, সময়টা কিরকম, এসব না জানিয়েই হঠাৎ দেখানো হল অজয় দেশাত্মবোধক গান গায় কারাগারে, আমার অন্ততঃ জানা নেই, এই রকম গান, এই রকম সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ পরে, এই রকমের কারাগারে কোনো-

দিন আমাদের দেশের কোনো শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী গেয়েছেন কি-না, এটা কি করে হয় যে অজয়ের মা অবলীলায় পুত্রের এই দেশাত্মবোধ মেনে নিচ্ছেন। এরকম ঘটনা একটাও নেই এই 'নবদিগন্ত' ছবিতে যেখানে অজয়ের মায়ের পুত্র এই ব্যাপারটায় কোনো কিছু বোধ আছে। তবুও যাই হোক, আমরা শিল্পে, মানে প্রকৃত শিল্প হলে তার মধ্যে কিছু ব্যাপার মেনে নিয়েই থাকি, এবং তা যদি সত্যি বাস্তবের বাইরের শরীরের হুবহু প্রতিরূপের সঙ্গে নাও মেলে। আমরা মেনে নিয়ে থাকি যা সে বলছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সম্পৃক্ততার চূড়ান্ত ব্যালেন্স যদি আমরা দেখি, যেখানে অন্য ধরনের একটা মাত্রা বা অন্য ধরনের একটা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে,—তখন আমরা আপত্তি তুলিনা, কিন্তু এখানে, এক অবিশ্বাস্য দুর্বল একটি জিনিষকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে যুক্তিহীন অবস্থায়। অজয় আদপেই ঠিক চরিত্রগত গঠন বা ঘটনা থেকে টানটান হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলো না কিছুতেই। এবং তাই জন্য ১৮৯০ বেরিয়ে এসে ১৯০০ সালের কি ১৯০৫ সালের (তা হলে আবার মৃণালের বয়স নিয়ে কি হবে?) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও প্রতিষ্ঠিত হলো না। ব্যাপারটা বোঝবার আছে, অজয় একবার বলেছে, আমরা সাউণ্ড নেগেটিভ থেকে শুনেছি যে সে নিজের দেশের মাকে নিজের মা বলেছে বলেই তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ এই চরিত্রটিকে ঘিরে সামান্যভাবেও সেটা ইংরেজ রাজত্ব বলা হয়নি, যেখানে একজন তরুণ ভাবে তার দেশ উদ্ধারের কথা, দেশটা স্বাধীন ছিল না পরাধীন ছিল তাও পরিষ্কার বোঝা গেলনা, অথচ এই চরিত্রটিকে ধরেই চলে যাওয়া যেত সময়ের অভ্যন্তরের শরীরে—যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক একটা তীব্র অভিজ্ঞতায় আমরা দেশের মূল ছবির একটা চালচিত্রের পটে সমস্যাটিকে বুঝতে পারতাম। এবং সেইখানেই ঢুকে পড়া যেত কৃষকদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবেই কৃষি ও ভূমি সমস্যার ওপর, তার সংকটের প্রকৃত শরীরের ওপর। এবং সেইখানেই হরিচরনের চতুষ্পার্শের শিকড়হীন গভীর অন্ধকার, তার ব্যবহারিক জীবন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার সংস্কৃত ভাষার প্রতি সময়ের বা দেশের মধ্যে একটা অকেজো ভাব' যার দ্বারা চাকুরী পাওয়া যায় না। তার জন্যেই শিখতে হয় ইংরেজী বা বিদেশী ভাষা, শিক্ষা ব্যবস্থার শরীরটা বুঝে নেওয়া যেতো। একবারও তো দেখলাম না সংস্কৃত ভাষা প্রেমী বা পণ্ডিত হরিচরন একটাও অং-বংজং অন্ততঃ বলেছে গোটা ছবির মধ্যে, থুড়ি বইয়ের মধ্যে। এই পটেই হরিচরনের মতো মানুষের, স্থিতধী পণ্ডিত মানুষের ব্যক্তিত্ব তার অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার দারুন চেহারাটা অত্যন্ত দীনভাবে সেলুলয়েডে গেঁথে দেওয়া যেতই।

বস্তুতঃ এখানে সামাজিক দৈন্যটাও প্রকাশ হত দেশের। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের বস্তুতঃ চারপাশের জগৎ কি ভীষণ এক শ্রেণী সমাজে বিভক্ত, যা শেষ পর্য্যন্ত শোষণভিত্তিক, সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে নতজানু। যেখানে হরিচরন একধরনের নির্লিপ্ততার ভূমিকা নিয়ে বসেছিল। কেবল ভাববাদী ভাবনায় নিজের দিকেই চেয়ে। অর্থাৎ আমরা দাঁড়াতে চাইতাম একটা সমাজ ব্যবস্থায় অমানবিকতার গভীরতর স্তরে। তার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে, রাজনৈতিক লাইনের যে বিরাট সংগ্রাম, এবং সেই রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের সঙ্গে মধ্য শ্রেণীর নেতাদের শ্রেণী অবস্থান তার বিরোধিতা, রাজনৈতিক দল সমূহের দ্বিধাবিভক্ত নেতৃত্ব, তার আভ্যন্তরীন লড়াই, যে লড়াইতে এই মধ্য শ্রেণীর মানুষেরাই দীর্ঘকাল ধরে থেকেছে, নড়েছে চড়েছে, তার ধ্যানধারণা বজায় রেখেই। যেখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ডাকেও এই শ্রেণীর দেশের মানুষ, অর্থাৎ জনগণ একত্রিত হয় না। ভাবে না নিজের কর্তব্যের ব্যাপারে। হরিচরন ও অজয় এই দুইয়ের মধ্যে একটা সূত্র আবিষ্কারের সুযোগ ছিলো। তাহলে ওখানে দাঁড়াতে হত হরিচরনের বিপরীতে। অর্থাৎ তার দারিদ্রটা বড় কথা নয় ভেবে, সেই দারিদ্রের মূল উৎস সন্ধানে আমরা ভেবেই চলে যেতাম সেইখানে। সেখানে দেখানো যেত অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মানুষের সত্যই কি ভীষণ সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার নয়, মাত্র টিঁকে থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। লুকোচুরি খেলতে হয় অবিরাম। এই অজয়ের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতাম সত্তরের দশকের সেই দামাল বাংলার দামাল তরুণ ছেলেগুলোকে, তাদের জীবন্ত শরীরের কথা—যারা প্রচণ্ডভাবে ভাবতে শেখাচ্ছিলো শোষণভিত্তিক সমাজকে বদলে দেবার কথা। ওই বয়সের ছেলেরাই এই সময়ে তাদের তরতাজা প্রাণ দিয়ে অকাতরে নিজের দেশকে মা বলে ভেবে তাকে প্রকৃত মায়ের রূপে সাজাতে তার পুত্রদের শোষণ থেকে, অরাজকতা থেকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, এবং তারাই শহীদের মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করেই অকাতরে প্রাণ দেয়। রক্ত ঢেলে দেয় দেশের মায়ের চরণে যা এই সময়ের মাপে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদের সম্মানজনক শ্রদ্ধাজনক মৃত্যুর চাইতে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাজটা ভুল কি ঠিক ছিল, তার বিচার আমরা সকলেই জানি এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপে। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে, কেউ অহিংসার পথে কেউ হিংসার পথে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছে। তাই ভুল কি ঠিক, সেটা কোনো প্রশ্নই নয়, বস্তুতঃ পলাশবাবুর বুদ্ধি তাঁর চেতনা, তাঁর ফিল্ম তৈরীর অদক্ষতা সব মিলেমিশে 'নবদিগন্ত' বই হয়ে কেবলই সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পটভূমিতে মানুষের জীবন প্রবাহকে আড়াল থেকে আরও আড়ালে নিয়ে গেছে অবিরাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা বিপজ্জনক এবং লজ্জাকর প্রান্তে। অজয়দের এই সময় বা হরিচরনদের এই সময় পলাশবাবুর 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েড বইতে বেন্থাম মিলের সময় না, অগস্ত কোঁতের পজেটিভিটির আদর্শ বলে বোঝা গেলনা কিছুতেই। মার্কসবাদ তো অনেক দূরের ব্যাপার।

এহেন অবস্থায় বাংলা সেলুলয়েড বই টালীগঞ্জ থেকে তৈরী হয়— ১৯৭৮ সালেই হয়েছে বত্রিশখানা (৩২)। এর মধ্যে দশটা ছবিও বাজারের থেকে পয়সা তুলতে পারে নি। সব টাকাই সব পরিশ্রমটাই জলে গেছে। যে সামান্য দুটো একটা ছবি পয়সা এনে দিতে পেরেছে, তার মধ্যে কোথাও চেতনায় নাড়া দেবার পদার্থ নেই। যেমন খুব হিট ছবি 'লালকুঠি'। একটাও একটুও বুদ্ধির কোনো ছাপ নয়, মননশীলতার ছাপ নিয়ে নয়, যত্ন নিয়ে নয়, কোনো আধুনিক ভাবনা নিয়েও নয়। বোঝা যাবে বাংলা ছবির অবস্থা কি দারুন সংকটজনক। একটা বাংলা সেলুলয়েডের দিকে সামান্য বুদ্ধি নিয়ে চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যাবে কি সাংঘাতিক অযত্ন, দায়িত্বজ্ঞাহীনতা, অপদার্থতা নিয়ে তৈরী হয় পয়সা তোলবার জন্য। ওরা না পারে ব্যবসা করতে, না পারে শিল্প করতে, এই ৭৮ সালেই কিন্তু বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়েছে যাতে মোটামুটি শিল্পত্ব বজায় রেখে সুস্থ ও বুদ্ধির ফিল্ম বানাবার চেষ্টা দেখা গেছে। যেমন 'জটায়ু' ছবিটি কায়রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল। একটি মোটামুটি পরিণত মানের ছবি হয়েও তা ব্যবসা করতে পারলো না। 'বারবধু' ছবিটার বিষয় এখানে তোলা যায়। এমন প্রোপাগাণ্ডা ছবিটির সম্পর্কে সুরু হয়ে গেল মঞ্চের 'বারবধু'র সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে যে, আসল ব্যাপারটাই মার খেয়ে গেল। ছবিটা যৌন বিষয় নিয়ে কি বলেছে না বলেছে তার চেয়েও আমার কাছে বড় মনে হয়েছে ছবি করার নিছক মেজাজটির একটা সুস্থতা দেখে। কিন্তু সেও পারলো না ব্যবসা করতে। অথচ এগুলো দারুনভাবেই ব্যবসায়িক ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পত্ব অর্জন করেনি। কিন্তু বেশ বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এখনও বৃটিশ চলচ্চিত্রে যেমনভাবে একটি প্রমোদ চলচ্চিত্র তৈরী হয়, সেখানে যা পরিণতির রূপ আমরা দেখি বা দক্ষতা দেখি টেকনিক্যাল ব্যাপারে বা চিন্তায়, কাজে, তার বিন্দুমাত্র টালীগঞ্জের এইসব ছবির মধ্যে নেই। দু-একটা সাধারণ উদাহরণ টালীগঞ্জ থেকে তুলে ধরবো আমি। এর প্রথমটা একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশ' থেকে। *এইজন্য* যে এই রিভিউ কোনো ফিল্ম সোসাইটির ত্যাঁদড় ইনটেলেকচুয়াল দ্বারা কৃত নয় বলেই। সামান্য একজন ফিল্ম দর্শক তার বুদ্ধি ও মেধাই ওখানে প্রমাণ পায়—"এ কাহিনী অতীব প্রাচীন। বুঝলাম কি করে বলুনতো? পরিচালক বুদ্ধি করে পুলিশ অফিসার দিলীপ রায়ের ঘরে বিলিতি রাজা রাণীর ছবি টাঙ্গিয়ে আরো বুদ্ধি করে সেটি ফোকাসের বাইরেও রেখেছেন—যাতে জর্জ বোঝা গেলেও পঞ্চম না ষষ্ঠ বোঝার উপায় নেই। সেই সঙ্গে দিলীপ বাবুর টেবিলে একটা পুরনো গড়নের টেলিফোনও দিয়ে দিয়েছেন, আর কি চাই? তরুণকুমারের হাতে কালো ডায়েলের স্টিলের ব্যাণ্ডওয়ালা এইচ-এম-টি? নেকটাইতে অ্যামেরিকান নট্? আরে দূর, ওসব কেউ দ্যাখেনা। কিন্তু জিপ গাড়ির মডেল? রাবিশ! কিন্তু পাহাড়ি ছেলেদের চুল ছাঁটা, তখনো কি তারা ক্রুসজির কায়দায় চুল ছাঁটতো?" এরপর অতীব সুন্দর একটা জায়গা "আরো একটি বিষয়ে আপনারা অবগত হবেন— সেটি হল কলেরা হচ্ছে একটি অতীব পরিচ্ছন্ন কাব্যিক অসুখের নাম। অসুখ না বলে সামান্য অসুস্থতা বললে ভাল হতো। উৎপল বাবুর মত অভিনেতাকে (চা বাগানের এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার) কলেরাক্রান্ত অবস্থায় কয়েক মিনিটের জন্য দেখা যায়। এই অতীব শান্তিময়, সুন্দর দৃশ্যের আমি একটি বর্ণনা দিচ্ছি। উৎপলবাবু একটি মূল্যবান র‍্যাগ্ গায়ে দিয়ে, একটি বর্ণময় বেডকভার আচ্ছাদিত বিছানায়, চোখ বুজে, চিৎ হয়ে বড় নিশ্চিন্তে কলেরাকে উপভোগ করছেন। তাঁর মসৃণ দাড়ি কামানো গাল, ভরপুর মুখমণ্ডল, কোথাও কষ্টের চিহ্ন নেই। উত্তমকুমার পাশে বসে তাঁকে মাঝে মধ্যে দুকুক ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। বমি করছে না, এবং তাঁকে বারবার ইয়ে করতেও হচ্ছে না। শিয়রের টেবিলে কমলালেবু ও আঙ্গুর রয়েছে—তিনি কলেরায় শুয়ে শুয়ে দু-একটা মুখে যোগাতে পারেন। এবং পরের দৃশ্যেই তিনি সোজা কলেরা থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি চালিয়ে মেয়ে ধরতে বেরিয়ে যান। তাঁকে বেশ স্বাস্থ্যবান লাগে। আমরা বুঝতে পারি কলেরা অতি প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর বস্তু।" এর পাশেই মনের মধ্যে উঁকি মারছে সত্যজিৎ রায়ের লক্ষ্ণৌতে 'শতরঞ্জ'-এর স্যুটিং-এর অভিজ্ঞতা। নবাবী আমলে লক্ষ্ণৌতে নিশ্চয় আধুনিক রেনপাইপ লাগানো ছিল না জল নিকাশনের জন্য বরাবর বাড়ীর ছাদ থেকে। তাই সেই সময়ের বাড়ী পেয়েই তিনি তৃপ্ত নন। চান রেনপাইপহীন বাড়ী। এরই অন্বেষণে তাঁকে কাটাতে হয়েছে লক্ষ্ণৌ শহরে দিনের পর দিন। আর সাহেবদের আমলের গল্পে 'ধনরাজ তামাং'-এ আমরা দেখি অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জীর পকেট এভারএডি কোম্পানীর একেবারে শেষ মডেলের টর্চ। কোথায় একটা পরাধীন অবস্থা দেশের। আর কোথায় সত্তর সালের স্বাধীন দেশ। প্রথম উদাহরণটি পীযুষ বসুর 'ধনরাজ তামাং' থেকে। দ্বিতীয় উদাহরণ ভোলা ময়রা। আমরা দেখলাম অশান্ত প্রকৃতির দারুণ এক দৃশ্য। দারুন ঝড় উঠেছে, মানে সেই ঝড় সাইক্লোনের মতোই আমরা পর্দায় দেখছি। এত তীব্র ঝড় আর তার গতি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানো। বারবার এই রকম পরিবেশ তীব্রভাবে বোঝানো হচ্ছে। ঠিক ওই শটেই এই পরিবেশেই নীচুর দিকে ক্যামেরা এসে দেখাচ্ছে ছোট ভোলা এঘর থেকে ওঘরে থাকে, মাঝখানের শূন্য উঠোনের মাটি পেরিয়ে, উঠোনের শূন্যতাকে বুকে নিয়ে চারিদিকে ধানের ক্ষেত অত্যন্ত বড়োভাবেই চোখে পড়ছে। সুন্দর ধানের নধর শীষগুলো নিয়ে ধানগাছগুলো স্থিরভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ধানগাছগুলো একটুও ওই ভীষণ ঝড়ে নড়ে না কিছুতেই। ভোলাময়রার এই পৃথিবীতে ওপরের ঝড় নীচে নামে না। তাই ধানগাছগুলো অনড় থেকে যায়। হায়রে টালীগঞ্জের পোড়াকপাল আর বাঙালীর দুর্ভাগ্য। হায়রে কমার্শিয়াল সেলুলয়েড বানানোর ধৃষ্টতা। এই রকম অজস্র উদাহরণ তুলে তুলে যে কেউ

দেখাতে পারেন। যার সংখ্যা এতই হবে যে একনজরে, এই লোড-শেডিং-এর তীব্রতর সময়ে, যা কাগজ উৎপাদন হবে তার সবটাই ভরিয়ে দেওয়া যাবে। এই রকমভাবেই তাতে বারবার প্রমাণিত হবে টালীগঞ্জের সেলুলয়েড বইয়ের নানান অসঙ্গতি, নানান অপদার্থতা, এমন কি নিজের মাতৃভাষা যে ফিল্মমেকারের সেই বাংলাভাষার প্রয়োগে এবং বানানের পিতৃ মাতৃহীনতার পরিচয়। এই অপদার্থতা দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা অবিরাম চলছে এবং চলবে।

বস্তুতঃ এরাই, এরাই আজকের বাংলা সিনেমার জগতে সর্বময়ব্যাপ্ত কর্মী। এরাই পরপর ছবি বানাবার টাকা পান. এদের তৈরী ওই সিনেমা জলছবি না চলচ্চিত্র সেটা একটা তাকের দাঁত আছে কিনা সেই জাতীয় গবেষণা হয়ে উঠবে। এদের ছবিই সব প্রেক্ষাগৃহগুলি জুড়ে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করতে হয় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে, সত্যজিৎ রায়কে। তাই দেখে দর্শক, দেখতে হয় অভিনেতা জোরে হেঁটে গেলে তার গায়ের ভারে ঘরের দেয়াল কাঁপে। একজন অভিনেতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্যামেরায় পড়ে থাকে। এখনও বাংলা ছবিতে দেখি ব্রাহ্ম হলেই হাতাওয়ালা ফুলো জামা পরবে মেয়েরা। পুরুষের গালে দাড়ি থাকবেই। এবং সেই ব্রাহ্ম গৃহে অবশ্যই পিয়ানো থাকা চাই। সব ব্রাহ্মরাই যে পিয়ানো বাজানোতে বিশেষ পারদর্শী ছিলো এইটাই প্রকাশিত। আজ পর্য্যন্ত এমন একটাও বাংলা ছবি আমরা দেখিনি যার মধ্যে একটাও পিয়ানো নেই, দাড়ি নেই, হাতা ফুলো এরকম জামা নেই। বাদশাহী আমলের কোনো চরিত্র হলেই তাকে যেই হোক না, সে অবশ্যই অহীন্দ্র চৌধুরীর কায়দায় বাঁ হাত মুড়ে পিঠে রাখবে, একটু ঝুঁকে পড়বে সামনের দিকে, ডান হাত দিয়ে গলার পুঁথির মালা চটকাবে। এমং অবস্থায় যদি দর্শক, বাঙ্গালী দর্শক এই অপদার্থ ছবি না দেখে, বাড়ীতে সেই সময় ঘুমিয়ে থাকে, পরিত্যাগ করে এই সব বাজে ছবি, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে। আমরা কি একবারও আমাদের ছবি তৈরীর মূর্খতা আর দোষের কথা ভাববো না। আমাদের ত্রুটির কথা ভাববো না। কেবল সব দোষ হিন্দী ছবির ওপর দেবো? কেন হিন্দী ছবি দেখছে তাই নিয়ে কেবল অভিযোগ আর অভিযোগ। এবং পালিয়ে বাঁচার জন্য হিন্দী ছবির, নয়া বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবির চটুল ভঙ্গীতে অবাস্তব ভঙ্গীতে কোমর ভাঙ্গা হাতে, নুলো হওয়া হাতে ক্যামেরা নিয়ে মরার হাত থেকে বাংলা ছবি বাঁচার পথ আবিষ্কার করবে। এবং তার অনুকরণ হবে একেবারেই আনস্মার্ট ভঙ্গীতে অযোগ্য দৃষ্টি আর কর্মেতে। এই ফর্মূলা থেকেই সুখেন দাস নামক একজন সামান্য অভিনেতা চলচ্চিত্র বানাবার স্পর্ধা রাখেন। নিউ থিয়েটার্স এর যুগ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রীয় নানান রগরগে (শরৎচন্দ্রকেও যদি জোর করে ছবির সাবজেক্ট করা যায় তার অসীম শক্তি থাকতে পারে। যেরূপ 'মামলার ফল, 'পল্লীসমাজ'কে নিয়ে দুর্দান্ত ছবি তৈরী করা যায়—যা একেবারেই আধুনিক হবে সর্বদিক থেকে।) ব্যাপার-স্যাপার—যা স্থূলকায় আবেগ, এবং তা নির্বোধ আবেগ, হিন্দী ছবির মারদাঙ্গা—ঠিক সময় মত সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া—এই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মুখরোচক, যা কান্না—আনন্দ, দুঃখ বেদনা মেয়েদের গায়ে হাত, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া, বড়লোক থেকে গরীব হয়ে যাওয়া, এই সব নানান নকুলদানার মুখরোচক প্যাকেট গরম গরম হাতে গেঁথে সুখেনবাবু এখনও এই 'সুনয়নী' পর্যন্ত বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে ব্যবসা বুঝেছেন। নিশ্চয় প্রাচীনকালের সেই বৃদ্ধ আচার্য্য প্রফুল্লবাবু বেঁচে থাকলে সুখেন দাস নামক তরুণ চলচ্চিত্রকারকে মাদার টেরেসার বহু আগেই নোবেল প্রাইজ এনে দেবার জন্য বিদেশে গিয়ে এক বিরাট লড়াই করতেন। আর সবাই এঁটে উঠতে পারছে না, হিন্দী ছবিকে অনুকরণ করতে গিয়ে আনস্মার্ট ভঙ্গী অযোগ্য দৃষ্টি আর কর্ম বড় হয়ে উঠছে।

আমরা একবারও ভাবছি না, এই বাংলা ছবি বাঙ্গালী দর্শক দেখছে না তার মূল কারণই হলো সে তার সম্মানের আর শ্রদ্ধার বাংলা ছবি নয়। আবার আর্ট ফিল্মও নয়। যা বিদেশ থেকে বিরাট আসন নিয়ে নেবে। এই ৭৮ সালেই সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অগ্রগামী, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, রাজেন তরফদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর (বেশ কয়েক বছর অনুপস্থিত) একটাও ছবি পর্দায় আসে নি। অথচ কয়েকজন দুটো করে ছবি পর্দায় এনেছেন। ঋত্বিক ঘটক এই অবস্থায় মরে বেঁচেছেন। —এছাড়া আর কি ভাবা যায়? নিউ থিয়েটার্স যে কর্মাশিয়াল ছবির একদা জন্ম দিয়েছিল—সেই সুস্থ ছবিও আজকে অবর্তমান। অথচ তখন সিনেমার মত কিছু আবিষ্কার আমাদের হাতে আসেনি। তবু এখনও এই-খানেই এই ছবি রিলিজ হলে তা দেখতে বেশ ভালো লাগে, তাও আজ দূর দিগন্তে। বাংলা ছবির কোনো নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় নি। না হলে সেই সময়ের একটা গল্প রি-মেক হলেও, তাবৎ বড়োবড়ো স্টার তার মধ্যে থাকলেও,—তা আর দর্শক টানে না। এই 'দেবদাস'ই তার উদাহরণ। কেবল গাল খায়। আজকের যে দর্শক সেতো আর সেই বড়ুয়ার 'দেবদাস' দেখেনি। তাদের ভালোও লাগেন। কেন? এইটা দিলীপ রায়কে প্রশ্ন করলেই মুখ সিঁদুরে রাঙ্গানো হবে। নানান কথার মধ্যে প্রমাণ করবেন যে এই দর্শকরা আসলে ফ্রাস্টেটেড,—দুপাতা ইংরেজী পড়ে, কফি হাউসে চার-মিনার এবং কফি খেয়ে, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্রের নাটক দেখে বড় বড় কথাই শুধু শিখেছে—আসলে এরা কিসস্যু বোঝেন না। চেনে না ফিল্মকে বা নিজের দেশকে। ব্যাস। হয়ে গেল। তারপরই আবার একটা ছবি তৈরীর জন্য ফ্লোরে ঢুকে যান দিলীপ রায়। এরা কিছুতেই স্বীকার করবেন না, এদের গলদটা, দুর্বলতাটা, অশিক্ষাটা। সোজা করে সোজা গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে এরা গুছিয়ে বলতে পারে না ক্যামেরা নিয়ে, যা আমি মনে করি নিউ থিয়েটার্স পারতো সাংঘাতিকভাবে। এদের কেবল পায়তাড়া, আগেই প্রশ্নকারীকে ছোট ভাবা, দীন ভাবা, অশিক্ষিত ভাবা।

নিজের দোষ না দেখে দর্শকের দোষ দেখা। আর তাই দর্শকও ক্ষোভ আর লজ্জায় এই জাতের ছবি দেখে না। হিন্দী ছবিই দেখে। যা অত্যন্ত নির্বোধ হলেও ভালো লাগে তার যৌবনের জন্য, তার স্মার্ট ভঙ্গীর জন্য।

আজকের বাংলার টালীগঞ্জ কি দিতে পারে পাঠক একবার ভাবুন। হিন্দী ছবির মানে ওই সেলুলয়েড নামক খেলা ছবিতেও দারুণ টেকনিক্যাল কাজ, এইসব কলা কৌশলের কাজে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পলাশবাবুরা আসতে পারবে না। অথচ এদের ছবিই দাবী করছে এরাই কমার্শিয়াল বাংলা ছবি তৈরী করবেন—টাকা দাও। আরো সুযোগ দাও ব্যবসার জন্য—রঙীন ছবি তৈরী করবো। ইতিমধ্যেই বাংলার টালীগঞ্জে রঙের মধ্যে চুবিয়ে যে গুটিকয়েক নিদর্শনে মহান চলচ্চিত্রকাররা আমাদের ব্যবসা দেখিয়েছেন তা দেখলে সকলেই লজ্জায় রঙীন হবে। হিন্দী ছবিতেও যে রঙের একটা দারুণ প্রয়োগ দেখা গেছে কমার্শিয়াল ছবিতে তা নয়, কিন্তু তার উন্নত মানের কলা কৌশলের কাজের সঙ্গে তার স্মার্ট ভঙ্গী আমাদের মন না কাড়লেও চোখ কাড়ে। 'দেশ পর দেশ', বা 'জনী মেরা নাম,' বা 'ডন', অথবা 'শোলে'র মতো ব্যবসায়িক দারুন সব ব্যাপার নিয়ে যে সাংঘাতিক টেকনিক্যাল স্মার্ট চেহারা তা ভাবতে পারবে টালীগঞ্জের সলিলবাবু, পলাশবাবু, পীযুষবাবু! এইসব হিন্দী ছবির দারুন স্মার্ট টেকনিক্যাল কাজ আমাদের প্রলুব্ধ না করে থাকতে পারে না। আমাদের টালীগঞ্জের তীব্র দীনতাকে উৎকট রূপে প্রকাশ করে যায়। কি দারুণ এডিটিং, কি দারুণ ঝরঝরে ফটোগ্রাফ, কি চঞ্চল ক্যামেরার কাজ, যেমন দেখুন না, রাজকাপুরের 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম' একটা ন্যক্কার জনক একটা উৎকট মানসিক রোগকেই প্রকাশ করে—যার নাম যৌনতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু এই ছবিটায় ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল কাজ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। বন্যার সময় শশীকাপুর ব্রীজের ওপর আসছে—এই সময় ক্যামেরার যে ভঙ্গী ভাবা যাবে না সেটা কি করে টেকিং করা হয়েছে। এবং ওই যে বন্যার সময়কার দৃশ্য গ্রহণের সময় ক্যামেরাকে যে ভাবে যে স্মার্ট ভঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়েছে—হাজারটা টালীগঞ্জের কমার্শিয়াল ছবিতে এই ভাবনা আসবে না। প্যান্ট আর নানা কাপড় বানাতেই তখন আমরা ব্যস্ত থাকবো। কমার্শিয়াল এইসব হিন্দী ছবির সব কিছু কমার্শিয়াল গন্ধে ভরপুর এবং তা নানাভাবে নানা বৈচিত্র্যে। পঞ্চাশটা হিন্দী ছবির একই গল্প। সতেজ ভরপুর কমার্শিয়াল ভঙ্গী ভালো লাগাতে বাধ্য করে এইটাই তো কমার্শিয়ালিটির চরম এবং প্রধান গুণ। বাংলা ছবি এটা ভাবতেই পারবে না। চম্বলের ডাকাত নিয়ে ওরাও ছবি তৈরী করে আমরাও তৈরী করি। কিন্তু কি নিদারুণ অপরিপক্কতা আর কি সাংঘাতিক লজ্জা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে আমাদের বাঙ্গালী ডাকাতরা পালায়। 'মুঝে জিনে দো' ছবিটার কথা একবার ভাবুন। তার পাশে শ্রীমতি মঞ্জু দের 'অভিশপ্ত চম্বল'-এর কথা ভাবুন। দুটো ছবিরই একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। একই সাবজেক্ট নিয়ে। কিন্তু দুটোর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় কি নিদারুণ আলস্য আর দারিদ্র-জ্ঞানহীনতা আমাদের আক্রমণ করে আছে। তারপর দেখুন না ওদের ব্যবসা করবার জন্য 'সন্তোষী মা'-র মতো ছবি বা সেলুলয়েড গল্প তৈরী হয়। এবং তা কি প্রচণ্ড ব্যবসা এনে দেয় তা আমরা সকলেই জানি। কমার্শিয়াল হিন্দী ছবি ছবির জগতে 'সন্তোষী মা' ওয়েস্ট ইনডিজের ওয়েলেসলি হলের বাম্পারের সঙ্গেই তুলনীয়। এই পথ ধরেই আমাদের দেব দেবীদের নিয়ে আসা হয় টালীগঞ্জের ফ্লোরে, তৈরী হয় 'বাবা তারকনাথ'। 'বাবা তারকনাথ' সত্যিই মুমূর্ষু টালীগঞ্জের ব্যবসার জগতে দক্ষযজ্ঞ দেখায়, এর প্রধান কারণই এই ছবিটার ভালো গান এবং এ ছবিতে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তার প্রসঙ্গে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবেই গুছিয়ে তা পরিচালক বলতে পেরেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ভাবলেন ব্যাস এইতো দাওয়াই পেয়েছি—তৈরী হলো 'মা লক্ষ্মী'—রত্না ঘোষাল মা লক্ষ্মী সাজলেন, বাপরে বাপ। ক্যালেণ্ডারে অহরহ দেখা লক্ষ্মীর এইরকম রূপ দেখে লক্ষ্মীর ওপর মেজাজ রইলো না বাঙ্গালী দর্শকের। এই পথ ধরে 'তারা মা' তৈরী হল। তাতে দেখা গেল মোহন চ্যাটার্জীর অসহ্য মহাদেব। সে যে কি অসহ্য অভিনয় মহাদেবের চরিত্রে তা ভাবা যাবে না। 'তারা মা'-এর এই রকম একটা সুন্দর গুছানো কাহিনীকে ধরতে পারলেন না পরিচালক সেলুলয়েডে। অথচ কাহিনী একটু অনুসরণ করলে, বুঝলে, এবং সামান্য টেকনিক্যাল জ্ঞানগম্যি থাকলে এই কাহিনীকে নিয়েই একটা ব্যবসায়িক ছবি তৈরী করা যেতই যেত—এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। আমরা ভাবতে পারিনা কাঁথির সমুদ্রের ধারে বালির ওপর এই রকম শিবের গড়াগড়ি। এই ছবিটাকে দেখলেই বোঝা যাবে টেকনিক্যালভাবে কলা কৌশলের দিক থেকে আমাদের কি দারুন শোচনীয় অবস্থা। বোম্বের থেকে শিল্পী এনে কাজ করা টালীগঞ্জে বহুদিন ধরে চলছে। অশোককুমার, দিলীপকুমার, সায়রা বানু, ওয়াহিদা রেহমান এইসব অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে কাজ হয়েছে। এই অশোককুমার হিন্দী ছবির জগতে কি আসনে এখনও বসে আছে ভারতের সকলেই তা জানে। আর গোটা ভারতেই অশোককুমারের দর্শক বহু। ওই অশোককুমারকে নিয়ে 'হাসপাতাল' ছবিটার কথা ভাবুন, সঙ্গে বাংলার সেই ভীষণ সুচিত্রা সেন, কাহিনী আবার সেই নীহার রঞ্জন গুপ্তের, পাঠক ভাবুন কি ব্যবসা, সে এই ভীষণ ব্যবসায়িক পশরা সাজিয়ে। হালের ওয়াহিদা রেহমানকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে তৈরী হয় 'জীবন যে রকম'। পাঠক ভাবুন কতো ব্যবসা সে করতে পেরেছে! আমরা কেবল হিন্দী ছবির সাফল্য দেখে ঈর্ষা-কাতর হই। আর ভাবি এতে যে অভিনেতারা আছেন তাদের জন্যই এই সাফল্য। কিন্তু তা আংশিক সত্য। অভিনেতাদের জন্য যেমন এই সাফল্য, তেমনিই আবার এর সঙ্গীত পরিচালক, এবং সাংঘাতিক কলাকৌশলের জন্যও। একথা তো সত্যি একটা দোকানে ঢুকে যাই

যখন দেখি, সেই দোকানটার ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো একটা সপ্রতিভ ভঙ্গী। সেই দোকানেই ঢুকে আমরা কেনাকাটা করতে ভালোবাসি। আমরা জানি সে অন্য একটা সাধারণ দোকান থেকে বেশী দাম নিচ্ছে কিন্তু তবুও আমরা সেই দোকানেই যাই।

এরই ফাঁকে হিন্দীর বোম্বাই এক শ্রেণীর মনোরঞ্জক ফিল্মী গান তৈরী করেছে। যার আয়ু মাত্র সামান্য কদিনের। তার জন্যই হয় দ্রুত দ্রুতই সে আবার ফুরিয়ে যায়—তার আপন ধর্ম অনুযায়ী। কিন্তু যতক্ষণ যে বাঁচে, সাহসেই, ডাগর সাহসে সে বেঁচে থাকে। কত রকমের ভীষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা,—কতো যন্ত্রের ব্যবহার, কি নিপুণ ছন্দের জন্য অন্বেষণ, এইগুলো কি ফেলে দেবার! আর বাংলা ছবির গান যেন একটা চাঁদসীর ডাক্তারখানা,—যেখানে বুড়ো কতকগুলো লোক কেবল হাঁপানী নিয়ে অবিরাম কেশে যাচ্ছে, আর সমাজে কার বউ কার মেয়ে কার ছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে, এইসব আলোচনা করছে।

সেই ভ্যাদভদে একটা ব্যাপার। সেই চর্বিত চর্বন। পপ খোঁজা নেই। চেষ্টা নেই বৈচিত্র্যের জন্য, কিস্‌স্যু নেই। আছে শুধু দর্শকের দোষ ধরা। সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শেষ পারানের কড়ি তোলবার জন্য এখনও বর্তমান। এর থেকে আর নিস্তার নেই আমাদের। ফলতঃ তরুণ বাঙ্গালী দর্শক কেন স্কুল কলেজ পালিয়ে বাংলা ছবি দেখবে? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের কোনো উত্তরণ নেই। গ্রামীণ পটভূমিতেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর বহু ব্যবহৃত সুর—আর ছড়া কাটা, পাঁচালী পড়া। যার সবটাই ভুল। একটাও পল্লী বাংলার প্রকৃত সুর আমরা বাঙ্গালী হয়েও পাইনি। এটা দিলেও ভালো লাগে। না হলে কি করে 'বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল', 'ঠাকুরঝি ভুমুঠো চাল ফেলেদে হাঁড়িতে', 'সাধের লাউ', কি করে এমন ভীষণভাবে মুখে মুখে আর প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘোরে? আজ থেকে পনের বছর আগে হেমন্তবাবুর যে ব্যাপার, পনেরো বছর পরেও সেই একই ব্যাপার। সেই একই সুর, একই চরিত্র, একই গায়কী। এগুলো বোঝবার জন্যে পনেরো বছর আগে এবং পনেরো বছর পরের রেকর্ড রাখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। সময় বসে নেই। দ্রুতই পাক খাচ্ছে সময় পৃথিবীর সঙ্গে। কত কিছু বদলে যাচ্ছে দ্রুত, অথচ সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু হিন্দী ছবির গানের সুর-ছন্দ তার প্রয়োগ সব কিছুতেই নিজেকে বদলেছে। তারা কমার্শিয়াল মার্কেট পাবে না তো কি আমরা পাবো! ছবি যখন কথা না বলতো, বোবা ছিল সে, তখনও এই সঙ্গীতের, এই গানের চরিত্র ছিল ভীষণভাবে। তখন থেকেই সঙ্গীতের ব্যাপারটা ফিল্মের সঙ্গে জড়িত। আজকে কতো পরিবর্তন হয়েছে সবদিক থেকে। আজকে সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাপারটাই যখন একটা বিশেষ ফর্মূলার মধ্যে যাচ্ছে তখন গানটাকে নিয়ে ভাবতে হবে বৈকি ভীষণভাবে। কি করে আরও বেশী কাজ করা যায় সেটা ভাবা প্রয়োজন। জীবনের মধ্যে যতো অস্থিরতা আসছে, জটিলতার শিকড় যতই জড়াচ্ছে, ততই বেশীক্ষণ প্যানপ্যানানি নির্বোধ মার্কা অসাড়তা আর ভালো লাগবে না। তখনই চাই ছন্দ—রিদম্—যা, অল্প সময়ের মধ্যে দোলা দেবে। ভালো লাগাতে বাধ্য করবে। এই রকম কাজ কিছু হয় নি, তা বলা যাবে না, হয়েছে,—যেমন, সলিল চৌধুরী মহাশয়, সুধীন দাশগুপ্ত মহাশয়, আরও মাত্র কয়েকজন। আমরা ভুলে যাই পূজো সংখ্যায় একটা গানে সুর দেওয়া আর সিনেমার জন্য একটা গানে সুর করা তার সিচুয়েশন অনুযায়ী, এক ব্যাপার নয় কিছুতেই। 'ছদ্মবেশী'তে—'এবার আমি লেংচে মরি', এই সব গান এই সিচুয়েশনটাকে শুধু বলছে না, বলছে আরও কিছু, সেটাই হচ্ছে কমার্শিয়াল সাকসেস। (আমি কিন্তু ছবির গান নিয়েই বলছি বা তার মিউজিক নিয়েই বলছি। গান না থেকেও কেবল ভীষণ ভাবে ব্যাকগ্রাউণ্ড ব্যবহারের মধ্যে এনে করা যায় সেটা কিন্তু অন্য ক্ষেত্র। সেটা ঠিক এই কমার্শিয়াল মতে মেলে না।) আমরা ভাবি, যেই দেখলাম ছবিতে আজকের তরুণদের অশান্ত অবস্থা অমনি চলে গেলাম বিদেশী যন্ত্রের কাছে—এটা আমার মনে হয় এই হিন্দী ছবির অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে কোনো সৃজনমূলক ব্যাপার মোটেই থাকে না। আমাদের দেশেরই সঙ্গীত যন্ত্র,—সরোদ, সেতার, তবলা, ঢাক, এই সব নিয়েই এই এফেক্টে চলে যাওয়া যায় অবলীলায়। কিন্তু তার জন্যে সিচুয়েশন স্টাডি করার, চরিত্র স্টাডি করার যে ভীষণ প্রয়োজন, সেটা কি আমাদের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা শ্যামল মিত্র করতে পারবে! এখানেই চরম কমার্শিয়াল হয়েও দেশের ঐতিহ্যময় কিছু খুঁড়ে দেখার একটা তীব্র প্রবণতা বা আকুলতা অথবা নিজের দেশের জন্য চূড়ান্ত ভালোবাসা প্রয়োজন। যেটা আছে সলিল চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে, আছে সুধীন দাশগুপ্তের মধ্যে, (কিছুটা ছিল নচিকেতা ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে।) অবিরাম এঁরা চেষ্টা করছেন নিজস্ব সৃজনশীলতাকে, প্রকাশ করবার। দেশীয় যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সহজভাবে ঘরোয়া ভঙ্গী থেকে সেই ঝাড়লণ্ঠনের নীচে থেকে বার করে এনে জনগণের মধ্যে মিশিয়ে দিতে। তাই একটা গ্রামীন সুর বা সেই ছন্দটিতে সাংঘাতিক কাজ হয় যেমন, তেমনি গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী সঙ্গীতের রাগ রাগিনী থেকে নিয়ে ব্যবহারের গুণে একটা ভীষণ কাণ্ড যে হয় তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক অর্কেস্ট্রা মিউজিক যে কাজ করেছে,—টোনাল মিউজিক ও মেলডি মিউজিক এবং তার সুরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো অথবা একই সঙ্গে যা এ্যাটোনাল অথবা স্বরহীন সুরের ছন্দের যে কাজ তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কি আমাদের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীত পরিচালকদের। যেমন আমাদের দেশে আনন্দশঙ্কর কিছুটা এর মধ্যে থেকে বার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও তাঁর কাজ ব্যাপক হয়নি—তাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুই বলা সমীচীন নয়। এই এ্যাটোনাল অথচ স্বরহীনতার তীব্র প্রভাব আমরা যেমন পড়তে

দেখেছি, সোয়েনবার্গ, ডেবুসি, স্টারভনস্কি আরও কয়েকজনের মধ্যে, তেমনি এরই মধ্যে সিনেমার মিউজিক ব্যাপারটার ইতিহাস, তার ক্রম পরিবর্তন, তার বিবর্তন সবই বাসা বেঁধে আছে। আমাদের দেশে এই টোনাল মিউজিক এবং সমগ্র ব্যাপারটায় যে বৈচিত্র্য আনা যায়, অথচ চূড়ান্ত মিউজিক্যাল স্কোর থেকেই, তার সামান্য প্রভাব অথবা সেই নিয়ে সামান্য কাজ করবার প্রবণতা আমরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারুর মধ্যেই দেখিনি! সামান্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' খুঁজে দেখলে আমরা অনেক কিছুই পেয়ে যেতাম। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে বিলাতি সঙ্গীত থেকে একটু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, —"য়ুরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে, আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না।" এখানে আমি শুধুমাত্র সঙ্গীত পরিচালকেরই মানসিকতা কাজ করে না দেখেছি, তাই নয়—দেখেছি ফিল্মমেকার পলাশবাবু, পীযূষবাবু, সলিলবাবুদের মধ্যেও। তাঁরাও জানেন না কি করে সঙ্গীত চলচ্চিত্রের কাজে আসে।

ভবিষ্যতে সিনেমার মধ্যে আবহ সঙ্গীত জিনিষটা থাকবে কি থাকবে না তা ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়েছে। কারণ নিস্তব্ধতা যে বিরাট এক সঙ্গীত এটা প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু গুণী জ্ঞানীজন প্রচণ্ড কাজ করে দেখাচ্ছেন। সরোদ, সেতার, তবলা, বঙ্গোর আওয়াজ নয়, এফেক্ট্-এর জন্য এই সব সঙ্গীত পরিচালক পার্শ্ববর্তী শব্দ অনুষঙ্গকেই ধরতে চাইছেন তীব্রভাবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে, 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ফিল্মে সত্যজিৎ রায় দেখাচ্ছেন, 'কাপুরুষ' অংশে—সৌমিত্রের (সিনেমার নামটা মনে পড়ছে না) কাছে এসেছে মাধবী—এসে বলছে এই তোমার সেই তেকোনা ঘর ইত্যাদি। এরপর ওরা ওদের প্রেমের বিষয় নিয়ে এবং শেষকালে বিয়ের জন্য পাত্র দেখছে মাধবীর বাবা—এই গুলো বলছে। সৌমিত্র তখনও বিয়ের দায়িত্ব নিতে পারে না। কারণ তার অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছল্য। এই ভাবনাটার সময়, এই কথাটার সময়তেই আমরা শুনলাম রাস্তা দিয়ে একটা দমকল ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে সৌমিত্রের তীব্র মানসিকতার ছবিটা এই পারিপার্শ্ব আবহ অনুষঙ্গের মধ্যে থেকে বার করা হয়ে গেল। হেমন্তবাবু, শ্যামলবাবু নির্ঘাৎ এই দৃশ্যে হলপ করে বলা যায়—একটা বেহালাকে চড়াসুরে বাজিয়ে বেদনা প্রকাশ করতেন। রাত বিরেতে একটা বেড়ালের ডাক, একটা ট্রামের ঘন্টা, লোহাপেটার শব্দ, একটা চাবুকের শব্দ, শাঁখের শব্দ, একটা কুকুরের ডাক যে কি ভীষণ কাজ দিতে পারে, একটা চলচ্চিত্রের শরীরে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখেছি। কিন্তু তাঁরা এইসব সঙ্গীত পরিচালক নন। টালীগঞ্জের আবহসঙ্গীতের সাধারণ ব্যাপারটা ভুলে থাকাই ভালো। কারণ, আবহসঙ্গীতের মধ্যে আজও এই বই নামক সেলুলয়েডে সেই দুঃখের দৃশ্যে বেহালার ক্যাঁচ-কোঁচ, ('দুর্গা মারা যাবার সময় 'পথের পাঁচালী'র ঢাকের শব্দ মনে করুন পাঠক, কিম্বা হরিহর সর্বজয়ার কাছে লক্ষ্মীর ছবি, তেঁতুল কাঠের পিঁড়ে দিচ্ছে বাইরে থেকে অনেকদিন পর এসে, দুর্গার জন্য একটা কাপড়ও এনেছে হরিহর, সে জানেনা দুর্গা ইতিমধ্যেই মারা গেছে। সর্বজয়ার হাতে কাপড়টা তুলে দিতেই তারসানাই-এর চূড়ান্ত প্রয়োগ—কিন্তু কোনো কিছু মাত্র ক্যাঁচ কোঁচ নয়, বা কোনো বিশেষ রাগ নয়, চড়াসুরে হঠাৎ সর্বজয়ার যন্ত্রণাকে সেই স্কোরের সঙ্গে হরিহরের ব্যাপারটা সব মিলিয়ে বিদীর্ণ হাহাকার ছবিতে গেঁথে দিলো।) প্রেমের দৃশ্যে সেতারের মালা। অথবা সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। একটি ছবির আবহসঙ্গীত অন্য একটি ছবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। অথচ ভালো কাজ হচ্ছে বহুদিন ধরে। এই কলকাতাতেই চিৎপুরের জোড়াসাঁকোতে বসে। বহুদিন আগে ঠাকুর বাড়ীর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রাজকাহিনী'তে মানে এই গল্পেতেই এই আবহসঙ্গীতের চূড়ান্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। এরা পড়েও না, তাই জানেও না পূর্বসূরীরা আমাদের হাতে কি দিয়ে গেছেন।—একজন ভাই অন্য ভাইয়ের পরিচয় জানে না। দুজনেই দুজনের কাছ থেকে পৃথক। এক ভাই ঘরে একা ঘুমোচ্ছিলো। এক ভাই ঢুকে একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল। অবনীন্দ্রনাথ 'রাজকাহিনী'র মধ্যে বলছেন, ঠিক এই সময়ে বাইরে একপাল শেয়াল কেঁদে উঠলো,—হায়-হায়-হায় করে। ব্যাপারটা বোঝবার আছে। এই শিয়ালের ডাক একটা পরিবেশের জন্য তো দিলোই দারুনভাবে, সঙ্গে সঙ্গে একজন বিখ্যাত সুরকার যা করতে পারে তাঁর সৃজনমূলক উদভাবনীয় ভাবনায় তাই করলো। পলাশবাবুর দল বুঝবেন কি, হেমন্তবাবু, কালীপদবাবুর দল কি বুঝবেন—এই স্কোর বা তার কম্পোজিশন কিভাবে অত্যন্ত সাধারণভাবেই আনা যায়। পলাশবাবুরাও এই স্কোর এই কম্পোজিশনে যেতে পারবে না, আর কালীপদ সেনের দল ওই স্কোর ওই কম্পোজিশনকে আগিয়ে দেখিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারবে না। চরিত্রের যে পটভূমি, যে ব্যাকগ্রাউণ্ড, যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পরিবেশগত ভাবনা থেকে যে একটা ডাইরেক্টরস্ পারসপেকটিভে গিয়ে পৌঁছনো যায়। সলিল চৌধুরী কিন্তু সুশীল মজুমদারের 'লাল পাথর'-এর মত বাজে একটা সেলুলয়েডে বাঁধা নিয়মেই, যন্ত্র নির্বাচনের চতুরতায় একটা ভিন্ন স্কোর বা কম্পোজিশনকে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সানাই দিয়ে যা খুবই প্রচলিত, আশাবরী আর কলাবতী কিম্বা কিছুটা পূরবী রাগের ছোঁয়া দিয়ে কি সাংঘাতিক কাজ তা ভাবা যাবে না—ছবিটা হিট করেছিল সেই সময়। আবার বিপরীতে একবার ভাবা যাক মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' নামক কমার্শিয়াল ছবিতে বা ফিল্মে (আমি এটাকে ফিল্মই বলছি এবং বলবেনও সবাই।) গান বাদ দিয়েই ছবিটা তৈরী করেছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। গান নেই অথচ সমস্ত ছবিটার লিরিক্যাল মেজাজ, মিউজিক্যাল টোন সবই এসেছে দারুণভাবে। ওখানে

ওই স্কোর আর কম্পোজিশনের ব্যাপারটা আছে। 'ডাক হরকরা' নামক একটা অতি সাধারণ মানের ছবিতে যা সেলুলয়েড বইতেও সুধীনবাবু একটা অন্য মেজাজ এনেছিলেন। গল্পের এবং চরিত্রের পটভূমি তার বিস্তারের রিয়ালিটিকে ধরবার জন্য প্রফেশনালভাবে করেও একটা অন্য স্তরে পৌঁছনো গিয়েছিলো. মান্না দের গলায় 'আমি তোর বিচারের আশায় বসে আছি'—গানটির কথা ভাবুন এবং ওই সঙ্গে সার্বিক আবহের কথাটাও ভাবুন। অবশ্যই স্বীকার করছি দারুন ইনটেলেকচুয়াল কিছু হয়তো নয় আবহ ব্যাপারটা এখানে তবুও একটা সাধারণ স্কোর আর তার কম্পোজিশন পটভূমিকে জড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা গ্রামীন পটভূমিতে 'ফুলেশ্বরী' নামক একটি ছবিতে দেখলাম ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী করে কান্না জোড়া। সেই একই সুর সেই একই পদ্ধতি, সেই একই ভাবনায় বহুদিন ধরে কেবল ঘুরপাক আর ঘুরপাক, কোনো ডেভলাপমেণ্ট নেই, কোনো কিছু নেই।

আবহের ব্যাপারে সঙ্গীতের চরিত্র যে কি, তার অস্তিত্ব কি প্রকাশ করে, আমাদের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (মানুষটিকে দারুন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পারলে চলচ্চিত্র জগৎ, এই কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র জগৎ অনেক কিছু বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণ-সম্পদে ভরপুর কিছু পেত, আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি।) সলিল চৌধুরী, সুধীন দাসগুপ্ত, রবিশঙ্কর ভেবেছেন, তাঁদের একটা স্বতন্ত্র ভাবনাই ছিলো ফিল্মের মিউজিক সম্পর্কে। আর বাংলা দেশের নবনাট্যোতো এতো ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য, উৎপল দত্ত, শ্যামল ঘোষ, অজিতেশ ব্যানার্জী, রুদ্রপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ, বিভাস চক্রবর্তী এবং খালেদ চৌধুরী আর রবীন্দ্রসঙ্গীতকার দেবব্রত বিশ্বাসের মধ্যে তার উদাহরণ দিলে এই হেমন্তবাবুর দল আর পীযুষবাবুর দল তাঁতকে উঠবেন। (প্রসঙ্গত বলতে ইচ্ছে করছে, এই দেবব্রতবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কি নিদারুণ মনো-গ্রাহ্য এবং জনতার সবখানে রবীন্দ্রভাবনাকে পৌঁছে দিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, বস্তুতঃ দেবব্রতবাবু জানেন পরীক্ষা নিরীক্ষা জিনিসটা কি আসলে। সেটা কি করে কোনখান থেকে কিরকম করে ভাবতে হয়, কাজ করতে হয়। এত ষড়যন্ত্রের চাপে গুঁড়িয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর রেকর্ড সবথেকে বেশী বিক্রী হয়, কে কেন সেই ডিস্ক ? দেশের সাধারণ মানুষই কেনে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আন্তরিকতার ব্যাপারটা যদি ঠিক হয়, সৎ হয়, শক্তি যদি ঠিক থাকে, তাহলে সবদিক থেকেই জয় আনতে পারে, দেবব্রতবাবুকে দেশের ইনটেলেকচুয়াল গ্রুপ যেমন মানে, তেমনি সাধারণ লোকও। এখানেই নিহিত আছে তাঁর অসীম ভাবনা, এতে কি তাঁর কমার্শিয়াল মার্কেট পেতে অসুবিধে হয়েছে কিছু ?) যদি ঈশ্বর তাই দিতেন অসীম করুণাময় হয়ে, তা হলে এই হেমন্তবাবু, স্বদেশ স্বরকার, শ্যামল মিত্র, সলিল সেন, সলিল দত্ত, পলাশবাবু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এই মানুষটি এই সেলুলয়েডে এখনও যে গুটিকয়েক কাজ করেছেন তাতে তার আবহ বিচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কিন্তু সঙ্গীতের অর্থাৎ গানের সুরের মিক্সিং, স্কোর, কম্পোজিশন, প্রয়োগ, গান গাওয়ার পদ্ধতি, এইসব বেশ কিছুটা উন্নত মানের, এবং একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধর্মী। এতেই কাজ করে এখনও পর্যন্ত তিনি যে কাজের সুযোগ করেছেন, প্রত্যেকটিই সাফল্য এনে দিয়েছে। অবশ্যই সেই কাজ হেমন্তবাবুদের মত প্রবল সংখ্যক না হয়েও।), কালীপদ সেন, অখিল বাগচি, রবিন চট্টোপাধ্যায় (এই মানুষটি আমাদের ছেড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর গানে সুর একটা সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আবহ সঙ্গীত এতই নিকৃষ্ট মানের যে বিচার করবার দরকার হয় না।) দীর্ঘদিনের এত প্রবল সংখ্যক কাজের মধ্যেও অন্ততঃ সামান্য একটা দৃশ্যেও আমাদের কাছে তীব্রভাবে ফুটে বেরিয়ে এসে একটা স্বর-নির্মাণ করতে পারেনি। বারবার প্রমাণ হয়েছে এঁদের কাজের মধ্যে যে ভালো ব্যাটসম্যান হলেই সে ভালো ফিল্ডার বা ক্যাপ্টেন হয় না। এমন একটাও সেলুলয়েড নেই আমাদের হাতের কাছে যাতে বলা যাবে ছবির স্পন্দ ছন্দের সঙ্গে একই তালে গান বেরিয়ে এসেছে। পাঠক ভাবুন সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিটার কথা, কিম্বা ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা', 'কোমলগান্ধার'।

নতুনদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো স্থান নেই এই টালীগঞ্জের সেলুলয়েডে। টালীগঞ্জ কমার্শিয়াল জগৎ বারবারই প্রমাণ করতে চায় নতুনেরা বন্ধ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাদের দুচোখে দেখতে পারে না। তা হলে হৃদয় কুশারী, দরবার ভাদুড়ি, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একটাও কাজ করতে পারেন না কেন ? কেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় একটাও কাজ পান না টালীগঞ্জে ? কেন ? সাংঘাতিক গায়ক অখিলবন্ধু ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় দূরেই থেকে যান, আমরা তো কমার্শিয়াল সেলুলয়েড তৈরী করতেই চাইছি, তবে সেই যজ্ঞে এঁদের মতো মানুষের কাজ নেবো না কেন এটাই বোঝা যায় না। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, চিন্ময় লাহিড়ীকে দিয়েও এই কমার্শিয়াল সেলুলয়েডে অনেক কাজ করানো যায়। যেমন নৌসাদকে হিন্দী ফিল্মের কমার্শিয়াল গ্রুপই কাজে লাগায়, শচীন কর্তাকে কাজে লাগায়, জয়দেবকে কাজে লাগায়, রোশনকে কাজে লাগাতো। টালীগঞ্জে কিন্তু এরকম কোনো প্রবণতা নেই, টালীগঞ্জ দুচোখে এদের দেখতে পারে না। অথচ নতুনদের মধ্যেই আজকের বিখ্যাত অনুপ ঘোষাল ছিলেন, সত্যজিৎ রায়ই তাঁকে আবিষ্কার করেন 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিতে এবং তিনি বিখ্যাত হন। এই তো মাত্র কিছুদিন আগেই কলকাতার গণেশ টকিকে থাকতো আজকের হিন্দী কমার্শিয়াল ফিল্মের গানের দুনিয়ার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্র জৈন, টালীগঞ্জ তার খোঁজ পায় নি, অথচ কত ফাংশান যত্রতত্র তিনি করেছেন। এই 'নবদিগন্ত'তেই দেখা গেছে সঙ্গীতের দারুণ ব্যর্থতা, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি (আবহ

বিচারের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছি এখানে) হরিচরণের বড় মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পর তার মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করতে আনা হয়েছে, ওইখানে নজরুলের গান—শূন্য ও বুকে পাখী মোর ফিরে আয়, গানটি ব্যবহার করা হয়েছে, উত্তমকুমার চড়া মেকআপ নিয়ে হাতে জ্বলন্ত প্যাকাটি নিয়ে মুখাগ্নি করছেন, ঠিক এই সময় থেকেই গানটি ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে হচ্ছে। আমাদের বোঝানো হচ্ছে যেন হরিচরণের বিবেক বা মানসিকতার এই কথাগুলো তার কন্যার ভালোবাসার স্থলে বিয়োগ ব্যথা থেকে আসছে, কি ভীষণ তিনি তাঁর মেয়েকে ভালো-বাসতেন এটা তারই নজির, (এইরকম ভাবনা আমাদের গুছিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে, তবে,) আমরা সকলেই বাঙ্গালী দর্শক হিসেবে এই গানটিকে ভালোবাসি এবং তাকে চিনি। গানটি এখন প্রবাদ বাক্যের মতই হয়েছে যেমন—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। কারণ, নজরুল বড় পুত্র মারা যাবার পর দারুণ রক্তাক্ত হৃদয়ে ব্যথার শরীর ও মানসিকতা নিয়ে ওই শূন্য বুকের গানটি রচনা করেছিলেন। এবং গানটির দারুন ভয়ানক সুন্দর গায়কী ইতিমধ্যেই গ্রামাফোন ডিস্কে শুনেছি, যেটি শুনলেই কিছুক্ষণ থমকে যেতে হয়। এইখানে এই 'নবদিগন্ত'-এ এইরকম দৃশ্যময়তায়ও ওই চমৎকার গানটি সুপ্রযুক্ত বাণী নিয়েও কোনো বিশেষ মাত্রা সংযোজন করতে পারলো না, কেন? এর মূলের ব্যাপারটাই পলাশবাবু এবং সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন বুঝে উঠতে পারেন নি। এবং যিনি গেয়েছেন সম্ভবত মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও, সেই বেদনা, সেই চাপা আর্তি, অব্যক্ততার শূন্যতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেননি। অতএব এমন সুন্দর ও চমৎকার গানটি ইতিমধ্যেই যা জনপ্রিয়তার শিখরে, সেই গানটিও ব্যর্থ হয়ে গেল, এই সঙ্গে যোগ হবে দৃশ্য গ্রহণের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, এরকম বহু কমার্শিয়াল সেলুলয়েড থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়।

আমাদের টালীগঞ্জে সেলুলয়েডের বইতে কমার্শিয়ালের নাম করে দিনের পর দিন এইসব কাণ্ডকারখানা চলেই যাচ্ছে। বহু টাকাও ব্যয় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, আর জলেও চলে যাচ্ছে, ইনডাস্ট্রিও ধুঁকছে। এইসব ইনডাস্ট্রির মানুষ এই ইনডাস্ট্রিকে বাঁচাতে চান, অথচ এই ইনডাস্ট্রি যে বাঁচছে তাও দেখা যাচ্ছে না। ক্রমশঃই তার স্বাস্থ্য ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, এরাই গালাগালি দেন আর্ট ফিল্মমেকারদের, বা একটু বুদ্ধি খরচ করে ছবি তৈরী করতে চান তাদের। বলে বেড়ায় ওসব বুদ্ধি-জীবীদের বানানো ব্যাপার, কেউ দেখবে না, কারণ, দেশের মানুষের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ নেই। আবার পরক্ষণেই দেখা যায় শ্লোগান তোলা হচ্ছে, পোস্টার দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ছবি বাঁচান বলে। এই ক্ষীণদেহ জীর্ণ অসুস্থ ইনডাস্ট্রিকে বাঁচাবার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থলগ্নী করার মতো বহু ধনী প্রযোজককে এই ইনডাস্ট্রি আগেই ফতুর করে দিয়েছে আপন প্রতিভার গুণে। আবার বলা হচ্ছে এখন রঙ্গীন ছবি তৈরী করার ল্যাবোরেটরি করে দিলে এক হাত নিতে পারতো এই ফিল্ম মেকাররা, আমার তো মনে হয়, সরকার যদি এইসব 'নবদিগন্ত' মার্কা ছবিতে, না, সেলুলয়েড বইতে বছরে ১০০ কোটি টাকা ঢালেন, তবুও বাঁচবে না এই ইনডাস্ট্রি। কারণ, গোড়াতেই তো অজস্র গলদ রয়ে গেছে। আর সেই গলদের সমুদ্রে টাকা নিয়ে নামলে নুনের পুতুলের মতই গলে যেতে হবে। আর এই গলদের বন্যাতেই শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'দৌড়'-এর মত সুস্থ মানের উন্নত মানসিকতার স্পষ্ট ছবি বা ফিল্ম, যা বই নয়, তাই ভেসে যায় অবলীলায়, দর্শক নিতে পারে না। এইসব 'নবদিগন্ত' মার্কা সেলুলয়েডের বই যতক্ষণ না বন্ধ হবে, ততক্ষণ 'দৌড়'-এর মতো পরিপূর্ণ ছবিও বাঁচবে না কিছুতেই, এর আগে বাঁচেনি 'যদুবংশ', 'ছায়াসূর্য' পার্থপ্রতিমের, বাঁচেনি 'ছেঁড়া তমসুক', 'স্বপ্ন নিয়ে', 'স্ত্রীর পত্র' পূর্ণেন্দু পত্রীর, 'তের নদীর পারে' বারীন সাহার। সুস্থ কমার্শিয়াল ছবিই যে কত উন্নত মানের হতে পারে মৃণাল সেন 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটাতে বলিষ্ঠভাবে তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। অজয় কর পেরেছিলেন 'সাত পাকে বাঁধা'-তে, তপন সিংহ 'জতু গৃহতে', তরুণ মজুমদার 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' ও 'বালিকা বধূ'-তে।

প্রসঙ্গত এই 'দৌড়' ছবিটার বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন আছে অল্প কথায়, যে বিষয়টি বলবার জন্য এই প্রবন্ধে বার বার চেষ্টা হচ্ছে সেইটা আরও স্পষ্টতর করার জন্য। প্রসঙ্গত 'নবদিগন্ত'-এর মতোই এই 'দৌড়' কাহিনীটাও একটি উপন্যাস থেকেই নেওয়া। শঙ্কর ভট্টাচার্য্য সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়' উপন্যাসটি থেকে বেছে নেন সিনেমা তৈরীর এলিমেন্ট, বা মালমশলা। মূল উপন্যাসটি থেকে কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের নামগুলো ছাড়া আর তেমন কিছুই কাহিনীকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, শঙ্করবাবুকে এই কাহিনী নির্বাচনের সময় ভিস্যুয়াল আর্ট ফর্মের কথাটি ভাবতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সিনেমার মূল ভাবনা তাকে গ্রাস করছে বলেই ঘটনা ও চরিত্রের এবং তার পরিবেশ ও সময়ের গ্রোথ এবং বিশেষ ডেভলাপমেন্ট ক্যামেরার বিশেষ ভাষায় বলবার চেষ্টা দেখা গেছে। এখানে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বস্তুতঃ সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের বক্তব্য বা চিত্রণ আর শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'দৌড়'-এর বক্তব্য, মানে সিনেমার বক্তব্য অনেকটাই বিপরীত। উপন্যাসের মূল চরিত্র রাকেশ যে একজন সমকালীন যুবক যার জীবনে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বস্তু তার প্রেম, এই রাকেশ বেপরোয়া সুবিধাবাদী জীবনটাকে নিতান্তই জুয়া খেলার দানেই ভাবে। কিন্তু সিনেমার রাকেশ একজন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। বহু স্বপ্ন বহু ইচ্ছা তাকে ঘিরে থাকে, সে কিন্তু লোভী নয়, সংসারের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও, সে তার যোগ্যতা আর অযোগ্যতার দোলনের মাঝে থেকে চাকরী করে খেয়ে পরে কোনো রকমে

টিঁকে থাকতে চায় এই সমাজ ব্যবস্থায়। কোনো ঝামেলায় যায় না। কোনো বিশেষ রাজনীতি রাকেশকে মোটেই টানে না, আকৃষ্ট করেনা কোনো বিশেষ ইজ্‌মে। এই রাকেশ রাজপথের তীব্র উত্তপ্ত মিছিলেও যায় না, আখেরে যেখানে তারই মতো চাকুরীজীবীদের দাবী আদায়ে ভালো হবে। উপন্যাসের রাকেশ ঘোড়ার পিছনে দান দেয় বহু টাকা ঢালে ও পায়। ফিল্মের রাকেশ এই পথেই যায় না, অন্যকে ঘোড়ার খবর দেয়। এই রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে রাকেশের একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে শঙ্করবাবু ঢুকে পড়েন সমকালীন উচ্চমহলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত গৃহ থেকে নীচের মহলের দুর্গন্ধ আর ভ্যাপসা গরমে, যেখানে রয়েছে দেশব্যাপী এক তীব্র অসুস্থতা দরজায়-দরজায়। ভীরু, দুর্বল, লোভহীন রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করেন, এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের ভীরুতা কোথায় টেনে নিয়ে যায় বা যাচ্ছে। এই সমাজের মানুষের কোনো রাগ নেই, তাই সবকিছুকেই সে মেনে নেয় বিনা বাধায়। অবস্থার দাসত্ব গ্রহণ করে। তাই তাদের বৃহত্তর কোনো বিপ্লবী চরিত্র নেই, সেই বৃহত্তর লক্ষ্য, চাকরী আর বাড়ী, এই লক্ষ্যে কোনো এনার্কিস্ট রাগ তাদের আসে না. আবার বিপরীতে এই দেশের সমস্ত আন্দোলনে বিশেষ করে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী আন্দোলনে এবং সাংস্কৃতিক জগতে এই শ্রেণীর মানুষেরাই দীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এইসবের মধ্যে তাদের শ্রেণীগত ধ্যান ধারণা তার অনুভব বজায় থেকেই যায় বা যাচ্ছে সর্ব সময়েই। তাই বড় রকমের কোনো বিপ্লবের বা সংগ্রামের টানটান ঘটনা বা চরিত্র আমরা এইখানে দেখিনা। ফলতঃ এই ধারায় কাজ করেও বিপ্লবী নামাবলী গায়ে দিয়েও ছদ্ম বিপ্লবী ছদ্ম সংগ্রামী নেতা সেজে, সে আখেরে ভেতরে ভেতরে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতায় বন্দী। এবং নিজের ক্যারিয়ার সুষ্ঠুভাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আরামকেদারায় রাখবার জন্য সে কাজ করে আবার সে ছাড়তেও পারে সব কিছু। সুহাসের চরিত্রটি (অনিল চ্যাটার্জী অভিনীত) বিশ্লেষণ করলে এই প্রবণতা ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। একজন সরকারী কর্মচারী মিস্টার রায় (বিকাশ রায় অভিনীত) তার আচরণ, ব্যবহারিক জীবন কাজকর্ম সব কিছুতেই দুর্নীতি, অরাজকতা, অশালীনতা, ধূর্ততা সব কিছুকেই ধরা হয়, বোঝাতে চাইছেন পরিচালক বা ফিল্মমেকার, এই সরকারী কর্মচারীর মাইনের মাসিক আয়ের নির্দিষ্টতার বাইরেও নিশ্চয়ই একটা কিছু মোটা পাওনার ব্যাপার আছেই, না হলে এই বিশাল খরচের পর্বত বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরই ফাঁকে এরই তলে রাকেশরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই চাকরী বাঁচিয়ে পেটের ভাত যোগাড়ের ব্যাপারটা একদম অম্লান রাখতে চায়, আবার এই সময়েতেই, এই সমাজ ব্যবস্থায় এই রাকেশের সঙ্গে পড়ে অন্য একজন রাকেশ, যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো এই দুই রাকেশের সঙ্গে আজকের সুহাসদা ; সেই রাকেশ পচা-গলা সমাজ ব্যবস্থার, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দুর্নীতিকে মুক্ত করতে বৃদ্ধা মাকে একাকী রেখে বার হয়ে পড়ে সার্বিক মাকে এবং তার সন্তান-দের শোষণ মুক্ত করবার জন্য। চাকরীর রাকেশ ভুলে যায় অবলীলায় এই রাকেশের কথা, ঠিক এইখান থেকে জটিলতাকে কনটেনটের মধ্যে রেখে আগাগোড়া ফিল্মটি তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু তবুও শঙ্কর ভট্টাচার্য, আমাদের দেখান অনবরত খোঁচা খেতে খেতে এই সব রাকেশ একবার ফোঁস করে ওঠে। যদিও এই ফোঁস-এর ব্যাপারটা প্রচণ্ড ভাববাদী বিষয়। তবুও ভালো লাগে বিষয়টি সাজানোর গুণে ও নিষ্ঠার এবং যত্নের ব্যাপারে। অদ্ভুত আত্মমগ্ন নিস্তরঙ্গ জগৎকে একবারও অন্তত রাকেশ ছিঁড়তে পারছে এটাও ভালো লাগে। কিন্তু সে যদিও ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক কাঠামোটাকে ভাঙ্‌বার চেষ্টা করেনা, তার সেই রকম প্রবল ইচ্ছাও নেই, কিন্তু তবুও ছবির পরদায় তাকে চিনে নিতে আমাদের দ্বিধা অথবা ভুল হয় না। চলচ্চিত্রকার হিসেবে শঙ্করবাবুর কোনো বিশেষ সহানুভূতি নেই রাকেশকে জিতিয়ে দেবার। ঘটনাস্রোত আর জীবন-প্রবাহ যেরকম হতে চায়, তাতেই আস্থা রাখা হয়েছে। যদি সহানুভূতি থাকতো, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হত শ্রেণীর প্রকট একটা স্বার্থকেই, যা ভীষণ বিপজ্জনক একটা ব্যাপার এই নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, চেতনাহীন দেশে ছবি-করিয়ে হিসেবে। এই ছবিতে যে কারণে রাকেশের রাগ ফুটে উঠেছে, এবং সে কারণেই সে "শুয়োরের বাচ্ছা" বলছে এস্টাবলিশমেন্টের মিস্টার রায়কে, জীবনের দীর্ঘ দৌড় লম্বা সফরে বার বার হোঁচট খাচ্ছে যেখানে জীবন, সেই পরিস্থিতিতে রাকেশ রীনাকে দেখতে পায়, যে রাকেশ একদিন অনিশ্চিত নড়বড়ে ভবিষ্যতের জন্য তাকে গ্রহণ করতে পারেনি জীবনে। সেই রীনাকে শরীরের রোগ থেকে এবার বাঁচাতে চায় রাকেশ এই চূড়ান্ত মিডলম্যানের অবস্থার মধ্যে থেকেও। এই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যেই তার সবকিছুকে ঘিরেই ছবি শেষ হয়। আবারও বলছি, তার এই বিদ্রোহ বা রুখে ওঠা সম্পূর্ণ এক ভাববাদী ব্যাপার। কিন্তু তবুও এই ছবির বিশেষ সিনেমার গন্ধ, বিশেষ তাৎপর্য, সব কিছুকে ঢাকা দিয়ে দেয়। যেখানে সিনেমার ফর্মে ধরা পড়েছে এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীটা টাইটে পরিণত হচ্ছে ক্রমশই এই বিশ্রী সমাজব্যবস্থায়। এই ছবিতে তারিফ করতে হয় ঘটনার সময়কে যে ভাবে ধরা হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ৮ থেকে ১৫ই আগস্ট। মোট সাত থেকে আট দিনের বিস্তারে এই সিনেমার কাহিনী বিস্তৃত। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের নতুন দিগন্ত ব্রিটিশ শাসনের থেকে মুক্তি। আর এই ১৫ই আগস্ট ১৯৭৪ সালে রাকেশের অর্থনৈতিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্তির দিন, রাজনৈতিক সংসারের হেঁসেলের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে ছবিটিকে এক বিশেষ তাৎপর্যে বেঁধে দিয়েছেন শঙ্করবাবু। ছবির শট্ ডিভিসন, ক্যামেরার কাজ, আলোর ব্যবহার, সঙ্গীতের ব্যবহার, শব্দ অনুষঙ্গ ব্যবহার, পাত্রপাত্রী নির্বাচন; স্থান নির্বাচন, সবই এককথায় অপূর্ব। একটা শট্ মনে আসছে এক্ষুনি যা ভীষণ, দারুণ লেগেছে, যেখানে পঙ্গু নীরার (মহুয়া রায়চৌধুরী

অভিনীত) সামনে ক্যামেরা ধরেই জুম ব্যাক করে আসে আবার তৎক্ষণাৎ কাট না করেই টিলট্ ডাউন করে আসে বারান্দায়, সিঁড়িকে দ্রুত ঘর্ষণে দেখিয়ে রাকেশের প্রবেশ হয়,—অপূর্ব শট্‌টি। এই পঙ্গু প্রেমিকা নীরার পঙ্গুত্ব যেন রাকেশের পঙ্গু মানসিকতার প্রতীক। ওর পঙ্গুতা যত বেড়েছে ততই রাকেশের মানসিকতার জড়তার জট বেড়েছে। এইখানে প্রসঙ্গত আরনল্ড ওয়েস্কারের 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি' নাটকের হ্যারির পক্ষাঘাতের প্রতীক চিন্তার গভীরতা মনে পড়ে যায়।

ছবিটি নিঃসন্দেহে ব্যাণাত্মক ছবি। প্রচলিত অর্থে কমার্শিয়াল ছবি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার টালিগঞ্জের সিনেমার তথাকথিত জগতে দারুন স্বতন্ত্র চরিত্রের। ছবিটি যেমন একদিকে দারুন আনন্দদায়ক তেমনিই আবার তীব্রভাবে উদ্দেশ্যমূলক। যে উদ্দেশ্য অত্যন্ত সৎ ও আন্তরিক ভাবনা। যা শিল্পীর নিজ দায়িত্বের গভীর কথা। আনন্দদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তা যে ভীষণ শিক্ষা ও বুদ্ধির চেতনার গভীরে তরঙ্গ তুলতে পারে এই ছবি তারই নিদর্শন। যেমন ব্রেখটের নাটক। একধারে চূড়ান্ত আনন্দদায়ক, আবার বিপরীতে শিক্ষামূলক চেতনাসমৃদ্ধ।

'দৌড়' ছবিটি মোল প্রশ্নে নিজেকে জড়ায় বলেই এবং সিনেমার নিজস্ব-ভাষায় অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে বলেই ছবিটিকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে। ভাবাই যায়না, ফিল্মমেকার শঙ্করবাবুর এই ছবিটি দ্বিতীয় ছবি। দুর্ভাগ্যবশত এই ছবি তেমন চলেনি। বহুদিন কাজহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয় এইসব ফিল্মমেকারকে। এইরকম একজন সৈকত ভট্টাচার্য্য 'অবতার'-এর মতো চমৎকার ভাবনার এত সুন্দর চলচ্চিত্র তৈরী করতে পারলেও তা চলে না। কত কম টাকায় এই ছবিটি তৈরী হয়েছে। অথচ কত বিস্তৃত ভাবনা আর দক্ষতা এখানে রয়েছে। তবুও ফ্লপ্ করে যায়। কাজহীন অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। অথচ বিশ্বের সমস্ত দেশের চাইতে সব থেকে দরিদ্র দেশ হয়েও এই আমাদের দেশ, আবার যেখানে যে দেশে সব থেকে সেলুলয়েড বই তৈরি হয়। যে দেশের শতকরা সত্তর জন মানুষ এখনও নিরক্ষর। শতকরা পঁয়ত্রিশ জন মানুষ মাটির ঘরে বাস করে। গড়পড়তা আয় যেখানে মাত্র দুটাকার মত, কৃষকদের পঁয়ষট্টি (৬৫) পয়সার মতো। শেষ পরিসংখ্যানে আবার জানা যায় একটাকার মূল্য এই মুহূর্তে মাত্র দশ পয়সা। যেখানে যে দেশের বৃহত্তর মানুষ সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগহীন। সেইখানে সেই মানুষকে সচেতন করবার জন্য তৈরি হচ্ছে 'নবদিগন্ত', 'ভোলা ময়রা', 'চামেলী মেমসাব', 'প্রণয়পাশা', 'ফরিয়াদ', 'বহ্নিশিখা', 'স্ত্রী', 'সন্ন্যাসী রাজা', গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মা করুণাময়ীর আদর্শ, তারক নাথের আদর্শ। যেখানে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিকে ছোট করা হচ্ছে। মগজ ধোলাই হচ্ছে. সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বারবার সরানোর বিরাট এক কৌশল তৈরী হচ্ছে। একটা ভুল পথে জড়ানো হচ্ছে মানুষকে, অলস অকর্মণ্য করা হচ্ছে। হায়রে সিনেমার প্রকৃত শক্তির কথা।

এই হচ্ছে যখন অবস্থা, তখন একমাত্র জনগণের সাথী ও বন্ধু হয়ে তার জীবন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার গ্রুপ থিয়েটার। সমাজের পচাগলা সিস্টেমকে বদলে দেবার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় অথচ চেতনার কথা তারা বলে চলেছে। নাটকের মধ্যে তারা জীবন-যাপনের প্রবাহের কথা যেমন বলছে ঠিক তেমনি শিল্পও করছে। যোগ্যতার প্রশ্নে বারবার পরীক্ষিত হচ্ছে। যে যোগ্যতার অভাব টালিগঞ্জের সব ক্ষেত্রেই। ঠিক এই জন্যই আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের মতো কিছুটা নির্দয় ও নির্মম হতে হবে। কারণ, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না আমরা যদি দায়িত্ব ভার না নিই, প্রতিকার না করি। বস্তুতঃ আমরা কেউই চাইনা দেশের সবাই রাতারাতি আর্ট ফিল্ম-মেকার হয়ে যান। এটা পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবে না। বিদেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখবো যে সেখানেও আর্ট ফিল্ম, কমার্শিয়াল ফিল্ম দুটোই পাশাপাশি হয়, হয়ে থাকে। একটা দেশের সবাই গোদার-এর মতো, ক্রুফোর মতো, আন্তোনিওনির মতো, সত্যজিৎ রায়ের মত, বার্তোলুচির মত ছবি তৈরী করবে এতো ভাবাই যায় না। কিন্তু একটা প্রভাব একটা উন্নত রুচির পরিশীলিত মানবিকতার দাগ চলচ্চিত্র সহজেই রাখতে পারে। আর তাই থেকেই কমার্শিয়াল ফিল্ম বাঁচবার রসদ পায়। সুন্দর মার্জিত ও রুচির যুক্তিগ্রাহ্য এবং বুদ্ধির মানসিকতায় ছবি তৈরী হতে বাধাটা কোথায়! এখন যদি আমরা দেখি সিমলার মানে এই কলকাতার সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ B.A. পাশ করে শহর কলকাতার বুকে চাকরী খুঁজছেন, তবুও পাচ্ছেন না। এখন এটিকে টালিগঞ্জ যদি আমাদের সেলুলয়েডে দেখায় নরেন্দ্রনাথ চাকরী খুঁজতে খুঁজতে টাটা সেন্টারের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে?

আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।

চিত্রবীক্ষণে
লেখা পাঠান।
চলচ্চিত্র-বিষয়ক যে কোনো
লেখা।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২১

পাতু : এই দুগ্‌গা… !…দুগ্‌গা !

দুর্গা ঘুরে দাঁড়ায়। পাগলাটে চেহারা হয়েছে পাতুর। অবিন্যস্ত চুলদাড়িতে ভয় পাবার মত চেহারা। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে—

পাতু : (ফিস্ ফিস্ করে) কুথা যেছিস রে ?…কঙ্কনা ?

দুর্গা : (এক মুহূর্ত তাকে দেখে) ক্যানে ?

পাতু তার ধুতির খুটো থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বার করে।

পাতু : আজ রেতে…ইটা…বাবুদের গেলাসে মিশিয়ে দিবি ?

দুর্গা : কি উটা ?

পাতু : (আনন্দের স্বরে) গরুমারা বিষ !…আমাদের জমিটা লিয়ে লিলে…দিবি ?

পদ্ম বৌ ও অনিরুদ্ধ (মাধবী চক্রবর্তী ও শমিত ভঞ্জ)
ছবি : ধীরেন দেব

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

কোর গ্রাউণ্ডে ঢুকেই ছুটে আসে। ছায়ামূর্তিটা পাতু বায়েনের। বিছানায় যতীন নেই।

পদ্ম : ও মা !…গেল কুথা ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৬

স্থান—নদীর পাড়ে শালের জঙ্গল।

সময়—সকাল।

যতীন আর উচ্চিংড়ে পাশাপাশি হাঁটছে।

যতীন : তোদের গাঁ-টা না…অ-সা-ধা-র-ণ— !

উচ্চিংড়ে : (খিল্ খিল্ করে) হেঁ হেঁ…

যতীন : হাসছিস যে ? কি বুঝলি ?

উচ্চিংড়ে : তোমার জামা উল্টো।

যতীনের জামাটাকে দেখায়।

যতীন : আরে ! তাই তো !

দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে। উচ্চিংড়ে নদীর দিকে তাকায়। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

উচ্চিংড়ে : বাবা !

সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

শোন্‌রে বলি
শুন হে সুজন
তোর জীবন রাধা
মনটি বাঁশি
মরণ বৃন্দাবন।
শুন হে সুজন
নিশির ডাকে হারালি রে
গহিন আঁধারে
পাখির ডাকে আসলি ফিরে
আবার নিজের ঘরে
ঘুমের নেশায় দেখিস না রে
তোর আঙিনায় কখন আসর
পাতল হে আগুন
শোন্ রে বলি
সময় যখন ফুরাবে রে
বেচাকেনার হাটে
নিজের কথা ভেবে ভেবে
ফিরবি নিজের ঘাটে
তখন, বুঝবি না তুই কেন ওরে
তুলসী তলায় রেখে মাথা
কানতে করে মন।
শোন্ রে বলি
শুন হে সুজন

দৃশ্য—২২৭

স্থান—নদীর পাড় ও চড়া।

সময়—সকাল।

প্রায় শুকনো নদীর ওপর দিয়ে তারিনী এই গান গাইতে গাইতে আসে। কয়েকটি ছোট ছোট শটে দেখান হয় যতীন গান শুনে মুগ্ধ। দুর্গা সারারাত্রির ক্লান্তি শেষে ভাঙা চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসে। গানের কোন কোন লাইনে রি-অ্যাক্ট করে সকলে।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা নদী পেরিয়ে এপারে যতীনের মুখোমুখি। একমুহূর্ত দ্বিধার পর সে কথা বলে—

দুর্গা : ও মা !…এত সকালে বাবু ?

যতীন : (নদীর দিকে তাকিয়ে) কি অদ্ভুত—না ?

দুর্গাও ঘুরে নদীটাকে দেখে।

কাট্ টু।

লং শটে দেখা যায় তারিনী নদীটা পেরিয়ে অন্য পারে চলে যাচ্ছে। উচ্চিংড়ে তখনও এপারে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

দুর্গা : উচ্চিংড়ের বাপ।

যতীন : মা নেই ?

দুর্গা : উঁ ?

যতীন : উচ্চিংড়ের মা নেই ?

দুর্গা : (একটু থেমে, হেসে) ও মা, থাকবে না ক্যানে ?

যতীন : তবে যে ও এমনি করে পরের বাড়ীতে পড়ে থাকে ?

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করে, হাসি বন্ধ হয়ে যায়। যতীন দুর্গার দিকে তাকায়।

দুর্গা : ঐ তারিনীকে আজ অমন দেখছেন তো…আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে…উয়রও একটা জমি ছিল…ঘর ছিল…তারপর সব গিয়ে ঢুকলো ঐ ছিরে পালের গভ্ভে !…জমি গেল…ঘর গেল… একদিন বৌটাও গেল।…এখন…ঐ জংশনে গিয়ে…বাজারের খাতায় নাম লিখাইছে।

যতীন : খাতা ?…কিসের খাতা ?

দুর্গা যতীনের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

যতীন সরল চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দুর্গা : সে আপনি বুঝবেন না। উ খাতায় একবার নাম লিখাইলে—

বলতে বলতে থেমে যায় দুর্গা। অস্বস্তি হয় তার। হঠাৎ ছুটে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা ট্র্যাক ফরোয়ার্ড করে যতীনের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৮

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় পদ্ম একবাটি মুড়ি হাতে নিয়ে চারদিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাচ্ছে।

পদ্ম : উচ্চিংগে—!…উচ্চিংগে—! না, আর পারিনে বাপু! সকাল-সন্ধ্যে এই ছেলের পেছনে টৈ-টৈ-টৈ-টৈ…

আবার পদ্ম উঠোনে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

একটা বাটি মুড়ি হাতে নিয়ে পদ্ম উঠোনে ঢুকে উচ্চিংড়েকে দেখতে পায় ও বলে—

পদ্ম : সকাল-সন্ধ্যে এই ছেলের পেছনে টৈ-টৈ-টৈ-টৈ—

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে সামনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে।

পদ্ম : এই যে!…কুথা গিয়িছিলি বল্ তো?

যতীন : (off) মা-মণি!…মা-মণি!

হাতে একটা গাছের চারা নিয়ে উঠোনে ঢোকে যতীন।

যতীন শিগ্‌গির এক ঘটি জল, আর একটা শাবল! (চারাটা নিয়ে উঠোনের মধ্যিখানে বসে) এইখানেই লাগাই—কি বল্, উচ্চিংড়ে?

পদ্ম (এগিয়ে এসে) ও কি?

যতীন হুঁ হুঁ, বলো দেখি!….আসবার সময় দেখি রাস্তার ধারে এমনিই হয়ে আছে! (উচ্চিংড়েকে) কৈ রে—এলি?…যখন বড় হবে, ছায়া তো হবেই—আর থোকা থোকা লাল লাল ফুলে সারাটা উঠোন একবারে আগুন—বুঝলে—আগুন!…তখন মনে পড়বে আমার কথা!

পদ্ম : (গালে হাত দিয়ে) ও মা…তেঁতুল গাছে আবার লাল লাল ফুল কি গো?

যতীন : তেঁতুল…এটা তেঁতুল?

পদ্ম : তবে কি?

যতীন : (গম্ভীর হয়ে) হেঃ!…দিস ইজ 'সিজালপিনিয়া পাল্‌চেরিমা'।

পদ্ম : কি!!

যতীন : "সি-জা-ল-পি-নি-য়া পা-ল্-চে-রি-মা…" মানে তোমরা বলো কৃষ্ণচূড়া!…বোটানীর বই তো আর পড়োনি!

পদ্ম : ওসব বোটা-ফোঁটা বুঝিনে বাপু! দেখি—

হঠাৎ পদ্ম চারা গাছের পাতা ছিঁড়তে উদ্যত হয়।

যতীন : আরে, ও কি! ও কি!!…কি করছ?

পদ্ম কতগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। তারপর আরও কিছু পাতা ছিঁড়ে যতীনের মুখে গুঁজে দেয়।

পদ্ম : দেখি,—চিবোও, চিবোও—

যতীন একটু চিবিয়েই থেমে যায়।

পদ্ম : কি, কেমন?…কেমন লাগছে?

যতীন : ট…ক্…

পদ্ম হাসিতে ফেটে পড়ে। এমন সময় ভূপাল চৌকিদারকে দেখা যায় দরজার সামনে।

ভূপাল : নজরবন্দীবাবু—! এই যে,…চলেন গো একবার থানাটা হাজরে দিয়ে আসবেন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩০

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

ছিরু এবং দাসজী পাশা খেলছে।

পদ্ম : (off) সকাল সকাল ফিরো কিন্তু—

পদ্মর গলা শুনে দুজনে সেদিকে তাকায়। ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় দূরে পদ্ম, যতীন ও ভূপাল।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩১

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশে খিড়কি পুকুর ও রাস্তা।

সময়—দিন।

দেখা যায় পদ্ম বাড়ীর পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে, ভূপাল ও যতীন বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে যায়।

পদ্ম : বেশী দেরী কোরো না যেন!

যতীন : আচ্ছা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩২

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

দাসজী : ব্বাবা!…এ যে সাক্ষাৎ রাধাকিস্টের লীলে হে!

ছিরু : উদিকে আয়ান ঘোষ!

বলেই সে উল্টোদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৩

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশে খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

পুকুরের উল্টো পার থেকে লো-অ্যাঙ্গেল শট্। অনিরুদ্ধ উল্টোদিক থেকে আসছে। সে রীতিমত টলছে তখন।

অনিরুদ্ধ : এ্যা ও! (তারপর যতীনের দিকে হাত নেড়ে) ইদিক্ ইদিক্…ইদিক্ ইদিক্—

যতীন এগিয়ে আসতে অনিরুদ্ধ তার জামা চেপে ধরে।

অনিরুদ্ধ : হ্যাঃ…উদিক কোথা?…আমার ঘরে সেঁধাই-ছিলি কেনে,—এ্যাঁ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর পেছন।

সময়—দিন।

পদ্ম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় অনিরুদ্ধ যতীনের জামা চেপে ধরেছে। সে প্রচণ্ড রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে বাঁশঝাড়।

সময়—দিন।

ভূপাল : আহা, কম্মকার!…নজরবন্দীবাবু! তোমার ঘর ভাড়া লিছে যে গো—

অনিরুদ্ধ : ভাড়া লিছে!…কিসের ভাড়া?…আমি জানলাম না,—আমার ঘর ভাড়া লিছে!

হঠাৎ পদ্ম ফ্রেমে ঢুকে পড়ে অনিরুদ্ধর মুঠো থেকে যতীনকে কেড়ে নেয়।

পদ্ম : দেখি, দেখি,—যাও তো!…চলে যাও তোমরা!

যতীন সম্পূর্ণ হতভম্ব, পিছিয়ে যায় সে।

অনিরুদ্ধ : উঁ—! "চলে যাও"! আমার ঘরে উসব বেন্দাবন লীলে চলবে না—

কাট্ টু।

চকিতে পদ্ম ঘুরে দাঁড়ায় এবং অনিরুদ্ধর দিকে রক্তচোখে তাকায়। একটু বাদেই ঘরের দিকে চলে যেতে থাকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : এ্যা-ও! উ কি!…তু কোথা চল্লি? ইদিক্… ইদিক্…

পদ্ম থেমে যায়, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসে। অনিরুদ্ধর মুখোমুখি ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বোকার মত হেসে ওঠে।

অনিরুদ্ধ : চার আনা পয়সা দিবি?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ জামার পকেট থেকে একটা খালি মদের বোতল বার করে।

অনিরুদ্ধ : দে না!…এই ছ্যাখ্!

পদ্ম : না!!

এবার পদ্ম আর থামে না। সোজা বাড়ীর উঠোনে ঢুকে যায়। পদ্মর অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অনিরুদ্ধ অপেক্ষা করে।

অনিরুদ্ধ : ঠিক আছে, ঠিক আছে! কে তোর পয়সার ধার ধারে!…নবাবজাদী!

আবার উল্টোদিকে চলতে থাকে অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৬

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

দাসজী : আবার চল্ল যে হে!

ছিরু : হুঁ…

দাসজী : তা দাও না,—এই মওকায় ব্যাটার একেবারে হাঁড়ি শুদ্দু এঁটো করে!

দাসজীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ছিরু পাল তার দিকে তাকায়।

দাসজী : কামারনী…কামারনী…(মিচ্কে হাসে)

ছিরু : নাঃ!…না দাসজী…

দাসজী : কেন ?
ছিরু : ক'টা দিন…ওসব—
দাসজী : সে কি হে ? বেড়ালের মুখে হঠাৎ হবিষ্যির গন্ধ !
ছিরু : 'পাল' কেটে 'ঘোষ' হয়েছি।…শালারা এখনো আড়ালে-আড়ালে হাসে। তাছাড়া, নজর এখন আমার অনেক ওপরে…
দাসজী : উদিকে ওপরের নজরও যে এখন তোমার দিকে হে—
ছিরু পাল দাসজীর দিকে তাকায়।
দাসজী : (গলা নামিয়ে) জমিদারবাবু !…চোৎ কিস্তির আগে…মাথায় হাত !…যদি তরিয়ে দিতে পারো,…এক লাফে এ চাক্‌লার গোমস্তাগিরি !
ছিরু : দাসজী !
দাসজী : তবে হ্যাঁ, তার আগে কিছু সৎকাজ করে ফ্যালো দিকি !
ছিরু : সৎকাজ… ?
দাসজী : এই খুচরো ! ধরো একটা মন্দির সারালে…কি একটা খ্যাম্‌টা নাচালে…একটা হরিসভা খুললে…মানে পাঁচজন যাতে—(বলে, দুবার মুঠো খুলে বন্ধ করে) তবে হ্যাঁ,—যাই করো—এক ঢিলে দু পাখি !
ছিরু : কি রকম ?
দাসজী : এই মওকায় নিজের 'ঘোষ' নামটা একবারে পাকা করে ফ্যালো !…যেখানে যা কিছু করবে, পাথর খুদে লিখে দাও—
কাট্‌ টু।

দৃশ্য—২৩৭
স্থান—সাধারণ।
সময়—দিন।

চড়া সুরে হারমোনিয়াম বাজছে। কতগুলি মার্বেল পাথরের পর পর ক্লোজ শট্‌।

শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্ঠিতং
অত্র হরি মন্দির
স্থাপিত ১০ই কার্ত্তিক। সন ১৩৩৩

এই পুষ্করিণীর সংস্কার
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ কর্ত্তৃক
সাধিত
সন ১৩৩৩। ১৬ই অগ্রহায়ণ

অত্র শিববাটী নির্মাতা
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ
২২শে অগ্রহায়ণ। সন ১৩৩৩

শ্রী শ্রীহরি ঘোষের
অর্থ ও আনুকুল্যে
অত্র কূপ সন ১৩৩৩, ২রা পৌষ
তারিখে নির্মিত হইল

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—২৩৮
স্থান ঝুমুর নাচের আসর।
সময়—রাত্রি।

হারমোনিয়ামের ওপর থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখায় এক ঝুমুর গানের আসর চলছে।

দর্শকদের সামনের সারিতে বসে আছে দারোগা, ভবেশ, হরিশ, গরাই, দাসজী এবং ছিরু পাল। একটি সুদৃশ্য শূন্য চেয়ার, বোধ হয় মান্যগণ্য কোন অতিথি আসবেন।

আসরের মাঝখানে একদল মেয়ে নেচে নেচে গাইছে।

'ভালো ছিল শিশুবেলা
যৈবন ক্যানে আসিল—'

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—২৩৯
স্থান—ঝুমুর আসরের পাশের রাস্তা।
সময়—রাত্রি।

রাতের অভিসারে বেরিয়েছে দুর্গা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শুনতে পায় গান। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে আসরের দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪০

স্থান—ঝুমুর নাচের আসর।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা এগিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ায়। নাচ-গান চলতে থাকে।

কয়েক লাইন গান হবার পর মেয়েরা সরে গিয়ে বাজনদারদের জায়গা করে দেয় আসরে। সবাই এসে বাজনা বাজায়। ওদের মধ্যে আছে একজন ঢোলবাদক 'পীতাম্বর'।

কাট্ টু।

দুর্গা পীতাম্বরকে দেখে রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পীতাম্বর ঢোল বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দুর্গার ওপর, তার মুখভঙ্গি বদলে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে ঢোলের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—দিন।

ক্যামেরা অন্য একটা ঢোলের ওপর থেকে পিছিয়ে এসে দেখায় সানাইও বাজছে। ক্যামেরা প্যান্ করলে বোঝা যায় সেটা একটা বিয়ের আসর। পীতাম্বর দুর্গার কপালে সিঁদুর পরাচ্ছে।

পেছনে পাতু, গীতা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের হৈ-হল্লা হাসি ও টুকরো কথা শোনা যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪২

স্থান—ঝুমুর নাচের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঝুমুর দলের নাচ-গান চলছে। ঢোল বাজাচ্ছে পীতাম্বর।

কাট্ টু।

দুর্গা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে।

মেয়েরা পরের কলিগুলো গায়।

কাট্ টু।

ঘোড়ায় টানা একটা সুন্দর গাড়ী এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল, গড়াই, দাসজী সবাই সেদিকে ছুটে যায়।

কাট্ টু।

গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর দরজা খোলে। ছিরু পাল, গড়াই ও দাসজী ফ্রেমে ঢোকে অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে।

কাট্ টু।

দুর্গা উৎসুক চোখে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

জমিদারবাবু গাড়ী থেকে নামছেন।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ দুর্গা।

কাট্ টু।

ছিরু পাল, গড়াই ও দাসজী জমিদারকে আসরে নিয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দুর্গার ওপর। সাউণ্ড্‌ট্র্যাকে বেজে ওঠে দূরের ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৩

স্থান—জমিদারের কাছারি বারান্দা ও বাগান।

সময়—দিন।

সুদৃশ্য দেয়াল ঘড়ির ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় একটি বিরাট লম্বা বারান্দা। দুর্গা বিয়ের পরই এসেছে ঐ বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে। ন্যাতা দিয়ে সে মেঝে পরিষ্কার করছে।

আরো দুটি চরিত্র ফ্রেমে ঢোকে। একজন জমিদারের চাকর গগন, অন্যজন দুর্গার শাশুড়ি তার হাতে একটা ঝাঁটা।

গগন : বাঃ!...বৌ তোমার কম্মা আছে গো! পেথম দিনেই কেমন চেক্‌নাই তুলে দিয়েছে ছাখো!

শাশুড়ি : তবে? (দুর্গাকে) কি রে?...কষ্ট হ'চে?

দুর্গা মাথা নাড়ে।

শাশুড়ি : চল্! উদিকের একখান ঘর সারা কইল্লেই আজকের মত ছুটি—

ওরা চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৪

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা, গগন ও দুর্গার শাশুড়ি বারান্দা দিয়ে এসে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা খোলা।

শাশুড়ি : (ঝাঁটাটা হাতে দিয়ে) যা!

শাশুড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গা গগনের সঙ্গে ভেতরে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৫

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘর।

সময়—দিন।

ঘরখানি ঝাড়লণ্ঠন, বিভিন্ন ধরণের মূর্তি, পুরনো আসবাব দিয়ে সাজানো।

দুর্গা ঘরে ঢুকে একটু চমকে যায়।

গগন : ও মুড়ো থেকে এ মুড়ো—কোন ভয় নেই।

দুর্গাকে রেখে গগন বাইরে চলে যায়।

দুর্গা ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে ঘর মুছতে শুরু করে। হঠাৎ সে দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

গগন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা ছুটে দরজার দিকে যায়। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পেছন থেকে শাড়িতে টান অনুভব করে। পেছন ফিরে তাকায় দুর্গা।

কাট্ টু।

একটা সোফার পেছন থেকে শক্ত হাতে কে যেন দুর্গার আঁচল ধরে টানছে।

আস্তে আস্তে সোফার আড়াল থেকে মাথাটা দৃশ্য হয়, জমিদার।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ—দুর্গা।

কাট্ টু।

জমিদার : (হেসে) ভয় কি?

দুর্গা ভীতসন্ত্রস্ত, আবার সে ছুটে যায় দরজার দিকে। দুর্গা ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজার ওপর।

দুর্গা : মা!...মা গো!...দরজা খুলো!...মা—!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৬

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা।

সময়—দিন।

বন্ধ দরজার ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান করে দেখায় গগন দুর্গার শাশুড়ির কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে। শাশুড়ি খুব খুশী। গগন ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। দুর্গার শাশুড়ি মেঝেতে বসে, দোক্তা মুখে দেয় আয়েসের সঙ্গে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৭

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘর।

সময়—দিন।

ভেতরে চলছে তখন দুর্গা ও জমিদারের মারামারি। এক সময় দুর্গাকে মেঝেতে ফেলে দেয় জমিদার।

দুর্গার কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৮

স্থান—ঝুমুর গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঝুমুর দলের মেয়েরা গাইছে আর নাচছে।

"বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি
নরম হাতে ভাঙিল—"

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গার চোখে জল টল্ টল্ করছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৯

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

ঝোড়ো পাখির মত চেহারায় উস্কোখুস্কো দুর্গা নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। হাতের মুঠোয় যেন কি ধরা আছে।

পাতু উঠোনে বসে বাঁশ কাটছে। দুর্গার মা খাচ্ছে হাঁড়িয়া। দুর্গাকে ঐ অবস্থায় দেখে দুজনেই স্তম্ভিত।

দুর্গার মা : উ মা!...বলা নাই...কওয়া নাই...শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এলি যে!

পাতু : এই দুগ্‌গা! কি হইচে তোর? দুগ্‌গা! এ্যাই দুগ্‌গা!

দুর্গা হাতের মুঠোর জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চকিতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দুর্গার মা বিস্মিত। দুর্গার ছুঁড়ে ফেলা দলা পাকানো পাঁচ টাকার নোটটা তুলে নেয় সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পাঁচ টাকার নোট।

কাট্ টু।

দুর্গার মা যেন তখন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল। পাঁচ টাকার নোটের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে সে দুর্গার বন্ধ দরজার দিকে আবার তাকায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর চার্জ করে। দুর্গা কাঁদছে। ঝুমুর গানের কয়েকটা লাইন এই দৃশ্যের ওপর ওভার-ল্যাপ্ করে।

"ভালো ছিল শিশুবেলা
যৈবন ক্যানে আসিল—"

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫০

স্থান—ঝুমুর গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—দুর্গা, সে জোর করে চোখের জল থামাতে চেষ্টা করছে। ঝুমুর গানের আসর শেষ। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কাট্ টু।

লং শটে দেখা যায় ছিরু পালের চাকররা প্যাণ্ডেলের সবকিছু গোছগাছ করছে।

বাজিয়ের দল সব ঠিকঠাক করে আসর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। সবার শেষে যায় পীতাম্বর।

কাট্ টু।

দুর্গা আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫১

স্থান—ঝুমুর গানের আসরের পাশের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

ক্রেনের ওপর থেকে নেওয়া শট্। দুর্গা ফ্রেমে ঢোকে। সে চোখের জল থামাতে চেষ্টা করছে। কয়েক পা এগিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির তলায় সে বসে পড়ে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোয় বোঝা যায় এবার সে ছোট শিশুর মত কাঁদছে।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক করে।

কাট্ টু।

(চলবে

Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 October 1979 Vol. 13 No. 1

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13 Phone : 23-7911 & Printed by him at

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
নভেম্বর, '৭৯

চিত্রবীক্ষণ

সম্পাদক : অনিল সেন

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : 'ফার্স্ট চার্জ অফ দি ম্যাচেট' (কিউবা)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কেল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোট ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার আর্ট থিয়েটার প্রকল্প

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের শুরু। এই আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ চলচ্চিত্র বোধ তৈরী এবং ভালো ছবির দর্শক সৃষ্টি করা। এই আন্দোলন শুরু থেকেই উপলব্ধি করেছিল যে একমাত্র ব্যাপক সচেতন দর্শকই পারবে সুস্থ সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র তৈরীর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ক্রমশঃ সংগঠিত হয়েছে এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিগত দশ বারো বছর ধরে এ আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। সারা ভারত জুড়ে এই আন্দোলন আজ এক সংগঠিত শক্তি।

এই আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা বিগত বারো বছর ধরে সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরী করার কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে। দেশ বিদেশের ভালো ছবির নিয়মিত প্রদর্শন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার অনুষ্ঠান, জনমত সংগঠনে বিভিন্ন আনুসঙ্গিক বিষয়ে সভাসমিতির আয়োজন ইত্যাদি সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার কর্মসূচীকে প্রতিফলিত করছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে চলচ্চিত্রের বিবিধ বিষয়কে তুলে ধরার জন্য। এছাড়া গত বারো বছর ধরে আমরা চিত্রবীক্ষণ বার করে যাচ্ছি। একথা বলা সম্ভবত বাহুল্য হবে না যে চিত্রবীক্ষণ, সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র হিসাবে সুধী মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কলকাতা শহরে ফিল্ম সোসাইটির নিয়মিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহের নিদারুণ অভাব। এখানে সান্ধ্য প্রদর্শনীর জন্য হল পাওয়া যায় না। যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যায় তা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। মর্ণিং শো করে কোনক্রমে অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হয়। সেক্ষেত্রেও এখন প্রায় সমস্ত হলে নুন শো চালু হওয়ার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে।

এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা কলকাতা শহরে একটি 'আর্ট থিয়েটার' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছে। এই আর্ট থিয়েটার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে সুস্থ চলচ্চিত্রের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উচ্চ মানের সুস্থ রুচির ছবি যা সাধারণভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবার সুযোগ পায়না সে ধরণের চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী এখানে সম্ভবপর হতে পারে। নতুন চিন্তা ভাবনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে যে সব ছবি এখানে ওখানে তৈরী হচ্ছে সে সমস্ত ছবির প্রদর্শনী এভাবে নতুন এক সচেতন দর্শকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

কলকাতার সমস্ত ফিল্ম সোসাইটি এই আর্ট থিয়েটারে নিয়মিত তাঁদের ছবির অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন যাঁরা অনিয়মিতভাবে মাঝে মধ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন তাঁরাও এখানে ছবি দেখানোর সুযোগ পাবেন।

চলচ্চিত্র এবং আনুসঙ্গিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা সভা সমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা যাবে।

এখানে নিয়মিতভাবে দেখানো যাবে শিশু চলচ্চিত্র, সরকারী এবং বেসরকারী তথ্য চিত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা এবং সংস্কৃতির নানান ছবি।

এই প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার প্রাথমিক পরিকল্পনাগুলি মোটামুটি এইরকম—

(১) এই আর্ট থিয়েটারে থাকবে ৮০০ আসন বিশিষ্ট একটি হল যেখানে ১৬ মি. মি. ও ৩৫ মি. মি. দুজাতের ছবিই দেখানো যাবে। এই হলে নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী হবে।

(২) ১৫০ আসন বিশিষ্ট একটি ছোট হল যেখানে সেমিনার সিম্পোজিয়াম বিতর্ক সভা ইত্যাদির নিয়মিত অনুষ্ঠান হবে। এখানে ১৬ মি. মি. ও ৮ মি. মি. ছবি দেখানোরও ব্যবস্থা থাকবে।

(৩) এখানে থাকবে রীডিং রুম ও লাইব্রেরী যেখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সিরিয়াস পড়াশুনার সুযোগ পাবেন।

(৪) চারটি প্রদর্শনী কক্ষ এই আর্ট থিয়েটারে থাকবে। এর মধ্যে তিনটি হবে স্থায়ী প্রদর্শনী যেখানে বাংলা ও ভারতীয় ছবির ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা থাকবে। এ ছাড়া যেখানে থাকবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুগোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এ ছাড়া একটি প্রদর্শনী কক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

প্রস্তাবিত এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা দুটি। একটি নিঃসন্দেহে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ, এছাড়া একান্ত প্রয়োজন কলকাতার কেন্দ্রীয় কোনো অঞ্চলে উপযুক্ত একখণ্ড জমি। এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘমেয়াদী, এই পথে যথেষ্ট প্রতিকূলতা।

১৯৭৭ সালের শেষ দিক থেকে বিভিন্ন সময় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করে সিনে সেন্ট্রাল; ক্যালকাটা এর মধ্যে ১ লক্ষ টাকারও বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সংস্থার প থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এক খণ্ড জমির আবেদন রাখা হয়েছে।

আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজস্ব একটি আর্ট থিয়েটার তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন। সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার আর্ট থিয়েটার প্রকল্প একটি সহযোগী প্রচেষ্টা, কাজেই এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য চলচ্চিত্রপ্রেমী সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার 'আর্ট থিয়েটার' তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন।

চেক পাঠান এই নামে—

Cine Central, Calcutta, A/c, Art Theatre Fund

ও এই ঠিকানায়—

Cine Central, Calcutta
2, Chowringee Road, Calcutta-700013

টালিগঞ্জের সেলুলয়েড বই ঃ
আমাদের সকলের ভাবনা ও কর্তব্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার মনে হয় এই ধরণের 'নবদিগন্ত' মার্কা কাজকর্ম যারা করেছেন তাদের হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিতে হবে। আমাদের নির্দয় হতে হবে, উপায় নেই ছবি তৈরীর ন্যূনতম জ্ঞান বা দক্ষতা যদি না থাকে, ক্যামেরা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যদি না থাকে, কলাকৌশলের জ্ঞান যদি না থাকে, যন্ত্রপাতির চেহারা এবং চরিত্র যদি তারা না জানে, জীবন সমাজ সম্পর্কে যদি তাদের বোধ না থাকে, তবে আমরা তাদের কাজ করতে দেবো কেন ? এই ভীষণ সঙ্কটের সময় এইসব অদক্ষ লোককে কাজ করতে দেয়ার অর্থই হল ইণ্ডাস্ট্রিকে আরো দুর্বল করা, আরো পঙ্গু করে তোলা, ভালো ছবির জন্মকে আরো বিলম্বিত করা, নষ্ট করা তার বাজার। অতএব ভালো সুস্থ মানের ছবি তৈরী হোক টালিগঞ্জে। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হোক। কমার্শিয়াল ছবিই তৈরী হোক অনেক বেশী মাত্রায়, সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে বেরোবার চেষ্টা হোক। হিন্দী সিনেমার কুৎসিত যৌন আবেদন আর মারদাঙ্গার আক্রমণে বিধ্বস্ত শ্রমিকাঞ্চল উদ্ধার হোক, বাংলা ছবির বলার ভঙ্গী, দেখার ভঙ্গী প্রেজেণ্টেসনের মধ্যে অভিনবত্ব আসুক, চমৎকারিত্ব আসুক। বুদ্ধির কিছু ব্যাপার স্যাপার সেখানে থাকুক। আমার মনে হয়, লক্ষ্য যদি স্পষ্ট হয়, গভীর হয়, যদি আমাদের মধ্যে অর্থাৎ যারা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করি তাদের মধ্যে বোঝাপড়াকে আন্তরিক এবং শক্তিমান করে তোলা যায়, তবে অনেক জট খুলে যাবে, সমস্ত কিছুকে একটা আন্দোলনের নির্দিষ্ট চেহারায় আনা যাবে।

এই তপন সিংহ ('সফেদ হাতী', 'গল্প হলেও সত্যি' 'জতুগৃহ'; পাঠক মনে করুন সেই 'কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী সাংঘাতিক সেলুলয়েড। আজও মনে পড়ে মিনির মায়ের হাত দিয়ে কাবুলিওয়ালাকে টাকা তুলে দেওয়া নিয়ে কি ভীষণ হৈ-চৈ হয়েছিলো বিশ্বভারতী থেকে। কারণ মূল গল্পে ছিলো মিনির বাবা কাবুলিওয়ালার হাতে টাকা দিচ্ছে। ছবিটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাক্সেস আমাদের গর্বিত করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ওই বিশ্বভারতী শম্ভু মিত্রকেও তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকটি প্রযোজনার জন্য বহু বিরূপ সমালোচনা করেছে। শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' নাকি রবীন্দ্রভাবনার অনুসারী নয় এই ছিলো বিশ্বভারতীর অভিযোগ। তাঁরা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন 'রক্তকরবী'র অভিনয়। সিনেমা যে মূল গল্পের কার্বন কপি নয় তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প 'নষ্টনীড়'কে ভেঙে সত্যজিৎ রায় তৈরী করেছিলেন 'চারুলতা', এ নিয়েও কম ঝড় ওঠেনি। বিভুতিষণের 'অশনি সংকেত' নিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবি করেন, তখন কি একটা সাংঘাতিক কথা তিনি ছবির একেবারে শেষে বলতে পারেন গল্পটাকে পালটে অনঙ্গবৌকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রেখে। যারাই বিভুতিভূষণের এই মূল গল্পটি পড়েছেন তারাই জানেন বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই আছে অনঙ্গবৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়স এগারো বছর, তার ডাক নাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে এসব তরিতরকারীর ক্ষেত সেই সব করেছে বাড়ীতে—ইত্যাদি ইত্যাদি) এই রকম বহু কমার্শিয়াল দারুণ সেলুলয়েড দিয়েছেন তিনি, সাফল্যও এসেছে। ফলতঃ ছবি করবার ডাকও তিনি পেয়েছেন বারবার। অজয় কর 'সাত পাকে বাঁধা'র মতো আর একটাও ছবি তৈরী করতে পারলেন না। শেষকালে ওই সেদিন শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে যে ছবিটা তিনি তৈরী করলেন তাতে তার বয়সের ভার, চিন্তার ও কাজের দক্ষতায় ভাঁটাই প্রমাণ করে। আগে তিনি সুন্দর-সুন্দর কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করেছেন, 'সপ্তপদী', 'জীবন প্রভাত' এই রকম বেশ কিছু। মানু সেন বেশ কিছু কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করেছেন। তপন সিংহ বা অজয় করের সঙ্গে যদিও তাঁর তুলনাই হয়না তবুও তাঁর ছবিতে সুস্থতা ও বলার ভঙ্গীটি ভালো না লেগে উপায় নেই। 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর মতো সুন্দর হাসির ছবি তৈরী করে তিনি আমাদের দেখান কমার্শিয়াল সাক্সেসের জন্য কতো বৈচিত্র্য প্রয়োজন। এখনতো টালিগঞ্জ থেকে হাসির ছবি করার মেজাজটাই উঠে গেছে। অথচ এককালে এই টালিগঞ্জই যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে হাসির ছবি তৈরী করতো, যেমন 'পাশের বাড়ী', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'গণশার বিয়ে'। বস্তুতঃ টালিগঞ্জ থেকে হাসির ছবি করবার প্রবণতাই একেবারে উঠে গেছে। যা দু-একটা তৈরী হয় সেগুলি এতোই নির্বুদ্ধিতা আর একঘেঁয়েমিতে প্রবেশ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগে তৈরী 'যমালয়ে

জীবন্ত মানুষ'-এর মতো সরল ফ্যানটাসির ছবিও তৈরী হলোনা। আমাদের টালিগঞ্জ সেই একই চর্বিত চর্বনে দিন কাটাচ্ছে। এখনও হাসির জন্য ব্যবহার হয় বাঙাল ভাষা, নয়তো ওড়িয়া ভাষা। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই একই চেহারা, সেই একই অভিনয় ভঙ্গী, একই কথার ঢং যে কত বিরক্তিকর হতে পারে, তা যে কত ভোঁতা হয়ে গেছে তা কি একবারও টালিগঞ্জ ভাববে। রবি ঘোষকে দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ছবি করা যায় তার প্রমাণও ইতিমধ্যে দেখা গেছে। তুলসী চক্রবর্তীর মতো অভিনেতা আজকে বিরল সারা দেশে। অমন রিজার্ভ অ্যাক্টিং যে হাসির চরিত্রে করা যায় তা ভাবা যায় না। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তিনি সাংঘাতিকভাবে ঝলসে উঠেছিলেন। বহু নির্বোধ ছবিতেও তিনি অবশ্য দারুণ কাজ করেছিলেন। হাসি যে ভাঁড়ামো নয়, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী নয়, বোকা কথা নয় সেটি একমাত্র তুলসী চক্রবর্তীই বহু দিন ধরে অভিনয় করে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন। কিছুদিন আগে 'ধন্যি মেয়ে' নামে একটা হাসির ছবি তৈরী হয়েছিল। ছবিটির মধ্যে অন্য ধরণের হাসির ছবির উপকরণ জড়ো করা হয়েছিল। নচিকেতা ঘোষের মজাদার সঙ্গীত ছবিটিকে সাংঘাতিক গতি দিয়েছিলো, ছবিটা বক্স অফিস সফল হয়েছিলো। বেশ কিছুদিন আগে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তুলেছিলেন 'রায়বাহাদুর' নামে একটি সুন্দর মার্জিত রুচির হাসির ছবি। তরুণ মজুমদার 'এতটুকু বাসা' নামে যে সুন্দর হাসির ছবি তৈরী করেছিলেন, স্মৃতিতে তা আজও জ্বলজ্বল করছে।

হিন্দী ছবির ফর্মুলার মধ্যে হাস্যরসকে কাজে লাগানো হয় কমার্শিয়াল সাক্সেসের জন্য। আমাদের টালিগঞ্জ তা করলোনা। একটা জায়গা ভরাট করার দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসির অভিনেতাদের। তারা যা পারলো করলো তাতে সাক্সেস এলো এলো, না এলো না এলো। কোনো বিশেষ পরিকল্পনা টালিগঞ্জে কাজ করে না। নবদ্বীপ হালদারের সেই গলা ভাঙার কাজ একদা বাঙালীর ভালো লেগেছিলো তাই বলে এখনও যে তা বাঙালীর ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই। নতুন অভিনেতা কেউই এখন আর কৌতুকাভিনেতা হতে চাননা। এর কারণ হল অনিশ্চয়তা, সিনেমা থেকে যদি নিশ্চয়তা পেতে পারতো তাহলে নতুন অভিনেতারা প্রেরণা পেতো। কাজ করতে ঔৎসুক্য বোধ করতো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন জলসায় যত কৌতুকাভিনেতাকে দেখা যায় তার সিকির সিকিকেও টালিগঞ্জের চত্বরে দেখা যায় না। বস্তুতঃ জলসায় একটা নির্ভরতা বা নিশ্চয়তার জায়গা আছে যেটা টালিগঞ্জে নেই। পলিটিক্যাল স্যাটায়ার ধর্মী হাসির ছবি তৈরীর ব্যাপারটা একেবারেই দূর অস্ত টালিগঞ্জে। এই ধরণের ছবি করতে গেলে সার্বিক ব্যাপারটার ওপর দারুণ জ্ঞান থাকা দরকার, মিডিয়ামটি জানা চাই। তবেই একটা পলিটিক্যাল স্যাটায়ার তৈরী হতে পারে, সৈকত ভট্টাচার্যের 'অবতার' এক অত্যন্ত সীরিয়াস কাজ। কিন্তু একটা হাসির ছবির সাবজেক্ট যে পলিটিক্যাল হতে পারে তা আমরাও দেখিনি টালিগঞ্জে।

হাসির ছবির জগতে একসময়ে মদত দিতে পারতেন গঙ্গাপদ বসু। তিনি কিন্তু টালিগঞ্জে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন। অথচ এই মানুষটিকে সামান্য ব্যবহার করেছিলেন চরিত্র কিরকম রূপ নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট চেহারা বহু দেখা গেছে। এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণ অনেকদিন দেখা যায়নি। বহুদিন পর শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' ছবিতে মিস্টার রায়ের চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় ভালো লাগে। এই বিকাশ রায় বহুদিন ধরে একইভাবে অভিনয় করে চলেছেন। সেই একই ঢং-য়ে স্বরক্ষেপণ, একভাবে চোখ ফেরানো। এসবই বহু ব্যবহারে একেবারে মলিন একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে তা যারা বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শক তারাই ভালোভাবে জানেন। জানেনা কেবল টালিগঞ্জ সেলুলয়েড।

হিন্দী ছবির দিকে তাকালে দেখা যায় সেই কে. এন. সিং-এর বাজার বহুদিন হল চলে গেছে। ওরা বুঝেছে সেই এক ধরণের চোখ কোঁচকানো, মাথাটা নীচুর দিকে করে একই ঢং-য়ে অভিনয় বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং তা ক্রমশঃই দর্শককে ক্লান্ত করছে। এতেই কমার্শিয়াল বাজারে মন্দা আসতে পারে। তাই হিন্দী কমার্শিয়াল জগৎ ধরণ পালটালো, এলেন প্রাণ, এলেন মদনপুরী, নতুন ধরণের শয়তানির পথ খোঁজা চললো। টালি-গঞ্জের কমার্শিয়াল জগৎ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছিলো। তপন সিংহ 'হাটেবাজারে' ছবিতে তাঁকে ভিলেন চরিত্রে ব্যবহার করলেন সফলভাবে। এরপরেও তিনি কিন্তু বহুদিন টালিগঞ্জে কাজ পাননি। 'গণদেবতা' ছবিতে অজিতেশ ছিরু পালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—এই অভিনয় অবশ্যই ভীষণ নাটকীয় গন্ধে ভরপুর। ভীষণ চড়াসুর আর জার্ক চোখে লাগে। পরিচালকের নির্দেশ মতোই তিনি এই চড়াসুরে অভিনয় করেছেন কিন্তু তবুও এই নাটকীয়তা সত্ত্বেও অজিতেশবাবু যেভাবে চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

অরবিন্দ মুখার্জী একসময়ে 'কিছুক্ষণ' নামে বনফুলের একটি গল্পকে আশ্রয় করে একটি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ছবি টালিগঞ্জের ফ্লোর থেকে বার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অরবিন্দবাবুর আর কোনো ছবিতে এই জাতীয় মেজাজ আমরা পেলাম না। 'ধন্যি মেয়ে', 'আনন্দমেলা' এরই প্রমাণ—কমার্শিয়াল সাক্সেস এলেও শিল্পীহৃদয়টি এখানে চাপা পড়ে গেছে। ইন্দর সেন একসময়ে মৃণাল সেনের সহকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বাধীনভাবে তৈরী একটি ছবিতেও সামান্য উন্নত মানসিকতার চেহারা আমরা দেখিনি। অথচ বাংলা সাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে তিনি বেছে নিয়েছেন ছবি করার জন্য। যেমন 'অসময়' বিমল করের

ভয়ানক ভালো এক উপন্যাস। উপন্যাসটি তার কাব্যঝংকার, লিরিকভাব নিয়েও একটা ভায়োলেন্সের ছায়ায় আমাদের দোলাতে থাকে, (উপন্যাসটি আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত) যেন একটা অনড় কিছু ভাঙছে বা ভাঙবেই—এই ব্যাপারটা বিমল করের উপন্যাসে আছে। কিন্তু 'অসময়' ছবিতে সে ভাবটা মোটেই জাগে নি। গোড়া থেকেই তিনি এতো সিরিয়াস হয়ে গেছেন ক্যামেরা নিয়ে তার জন্য চরিত্রগুলির অন্তর্জগৎ বা পরিবেশটির জট ছাড়ানোর কোনো ভূমিকাই তিনি রাখতে পারেন না। আর একটি গল্প সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন'। এখানেও সেই ভ্রান্ত বিবেচনা, সেই একই ব্যাপার কাজ করেছে। মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, তার আশ্রয় খুঁজে পাওয়া, তাকে রক্ষা করা, জীবনের বিস্তার, সেই জীবনপ্রবাহের গতি প্রকৃতি তিনি সেটা ছবিতে ধরতে পারেন নি। অথচ এ দুটি গল্পই ভীষণ ফিল্মের জন্ম দিতে পারতো সহজেই।

বলাই সেন, বিজয় বসু, নারায়ণ চক্রবর্তী ছবি করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন নানান ভ্রান্ত অবিবেচনার জন্য, অদক্ষতার জন্য। রাজেন তরফদার অন্যের জন্য চিত্রনাট্য লিখতেই ব্যস্ত। অবশ্য বর্তমানে তিনি সরকারী অনুদান নিয়ে নতুন ছবি করার কাজে হাত দিয়েছেন। আমরা চাই তিনি আরো ছবি করুন। আমরা ভুলতে পারি না 'পালঙ্ক' ছবিটার কথা, যেমন আমরা ভুলিনি 'গঙ্গা' ছবিটিকে। বিমল ভৌমিক 'দিবারাত্রির কাব্য'-য়ের মত একটি ছবি তৈরী করেও বসে থাকেন, বসে থাকতে বাধ্য হন। অথচ অজস্র বাজে ছবির ছবি ছবি খেলা চলতেই থাকে অব্যাহত ভাবে। দিলীপ মুখোপাধ্যায় 'চাঁদের কাছাকাছি' নামক বাজে ছবি তৈরী করে জল ঘোলা করে চলেন, জল আরো ঘোলা করতে এগিয়ে আসেন সলিল দত্ত, সলিল সেন প্রমুখেরা।

বাংলা ছবির কমার্শিয়াল সাক্সেসের ক্ষেত্রে তরুণ মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এতো ব্যস্ত ফিল্মমেকার এখন আর কেউ নেই। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো ডেভলাপমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একই জায়গায় বাঁধা তাঁর সব কাজ। পাঁচখানা গানের ছবির সঙ্গে একদম শেষের ছবি এবং একেবারে প্রথম ছবি 'কাঁচের স্বর্গ' স্বরচিত গল্প অবলম্বনে যা তৈরী হয়েছিলো, সবই একই জায়গায় বাঁধা। কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের অনেক আশা ছিলো, আমরা ভেবেছিলাম তিনি পুরোপুরি কমার্শিয়াল আওতার মধ্যে থেকেও কিছু গভীর কাজ করবেন, কিন্তু আমাদের সেই আশা ফলবতী হয় নি। 'গণদেবতা' একটি পুরোপুরি বাণিজ্যিক ছবি, সাফল্যও পেয়েছেন তিনি, কিন্তু এটি সিনেমার কোনো বড়ো কাজ নয়। রঙের ব্যবহার হতাশাব্যঞ্জক, সঙ্গীতের ব্যবহারও ওই রকমই। মূল বিষয়টির মধ্যে থেকে যে লড়াকু অস্তিত্ব বার করবার চিন্তা তা অত্যন্ত অগোছালো। এবং গোটা ছবিটাই যেন সস্তা প্রমোদের তরণীতে গা ভাসিয়েছে, অথচ একটু চেষ্টা করলেই বৃহত্তর খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশার কাছে পৌঁছানো যেতো এবং বক্তব্য গভীর হয়ে উঠতো। এমনি আর একজন তপন সিংহ। এঁর ছবিতে এমন কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই যা প্রকৃত চলচ্চিত্রবোধে ভরপুর। এঁদের শিল্পবোধ, কারিগরী কলাকৌশল কিছুতেই উন্নততর পর্যায়ে যায় না এতো কাজ করা সত্বেও। তবুও একথা অনস্বীকার্য তপন সিংহ বা তরুণ মজুমদার যথেষ্ট কৃতী পরিচালক এবং তাঁদের কাজ যথেষ্ট জনপ্রিয়। চিদানন্দ দাশগুপ্ত কেন যে ছবি করেন না, তা বোঝা যায় না। ছবি করার ক্ষমতা তাঁর আছে অথচ ছবি করার ব্যাপার তিনি বোধ হয় ছেড়েই দিয়েছেন।

এই সব মানুষ, মানুষের কাছে শিল্পীর হৃদয় নিয়ে কিছু বলার জন্য আসেন। সুতরাং এই সব চলচ্চিত্রকার যতো বেশী মাত্রায় শৈল্পিক ছবি করার সুযোগ পাবেন ততোই দর্শকের কাছে তুলে ধরা যাবে জীবননিষ্ঠ কিছু ভাবনা। বস্তুতঃ এর মধ্যেই ধরা পড়বে আজকের আধুনিক জীবনের শিল্পকর্ম যা শুধু কোনো বিশেষ গল্পকেই বলে চলে না। সেই গল্পকে অবলম্বন করে একটা সময়, একটা পরিবেশ কিছু যন্ত্রণার কথা আঁকে। জীবনকে ব্যাখ্যা করে যায়। আজকের শিল্পকর্ম বিবরণধর্মী নয়। আজকের শিল্পকর্ম বক্তব্যধর্মী। বহুকাল আগে যেভাবে নাটকীয় ঢং-য়ে সিনেমার কাহিনীকে বলা হতো, সেই পদ্ধতি আজ পরিত্যক্ত। মঞ্চের ওপর অভিনেতা-অভিনেত্রীকে রেখে একটা নির্দিষ্ট ওঠাবসার মধ্যে একই ভাবে একই ফ্রেমে ক্যামেরা একই জায়গায় বসিয়ে ছবি তোলার দিন আমরা অনেকদিন আগেই ফেলে এসেছি। যতোই বিজ্ঞান এগোচ্ছে, প্রযুক্তির নানান দিক খুলে যাচ্ছে, ততোই এই সিনেমা শিল্প নিজেকে আরো গভীর করে রাখতে চাইছে মানুষের কাছে।

এযাবৎকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করে আর কোনো শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠেনি। বিপরীতে এই চলচ্চিত্রের ভাবনাই খুলে দিচ্ছে অন্য শিল্পকর্মের গভীর গোপন ভাবনা-চিন্তার ব্যাপ্তি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকের উপন্যাস আগেকার উপন্যাসের সেই গণ্ডী ধরে পাক খাচ্ছে না—চলচ্চিত্রের নানান ব্যাপার স্যাপার বিষয়বস্তু অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশউন্মুখ করে তুলছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ক্লোজ আপের ভঙ্গী, ফেড আউট, ফেড ইন, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড, জাম্প কাট—সবই উপন্যাসের মধ্যে মিলে মিশে সতেজ টানটান স্মার্ট ভঙ্গী নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের সংলাপের আদলে আদল নিচ্ছে উপন্যাসের সংলাপ। এডনা ও ব্রাউনের দারুণ সতেজ সংলাপের কথা ভাবুন, কিম্বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের ঋজুতা। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে তরুণ কবি শ্যামল পুরকায়স্থের কবিতার ভঙ্গী এবং বিন্যাসের কথা। মনে পড়ছে দিব্যেন্দু পালিতের 'চরিত্র' কিম্বা প্যান্টোমাইমের মতো উপন্যাসের কথা।

এর থেকে থিয়েটারও পিছিয়ে নেই। ১৮৮৬ সালের পটভূমি

বিষয়বস্তু ছিলো পিসকাটারের 'ফ্ল্যাগস' নাটকের। সেই দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে যে আন্দোলন তাকে ঘিরেই ঐ নাট্য প্রযোজনা পিসকাটারের, সময় ১৯২৪ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পিসকাটার এই 'ফ্ল্যাগস' নাটককেই প্রথম অভিধা দেন এপিক নাটক বলে। এই নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চের বাম দিকে এবং ডান দিকে সরু সরু সাদা পর্দা আটকে দেয়া হয়েছিলো। এই সাদা পর্দায় সিনেমার পদ্ধতিতে প্রোজেকশনে প্রোলোগের সময়কার প্রধান চরিত্রের ঘটনাকে বলা হয় এবং এও তিনি করেছেন দৃশ্যের শুরুতে ও শেষে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য সাবটাইটেলে সেই পর্দায় সিনেমার মতোই ফেলে যা সিনেমা বা ফিল্ম ছাড়া আঙ্গিক দিক থেকে অন্য কিছু নয়। ব্রেখট্ অন থিয়েটারে ব্রেখটের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"মঞ্চোপকরণের একেবারে অভিন্ন আত্মা ও তার আত্মারূপে চলচ্চিত্র এবং তার প্রদর্শন, এই যে আয়োজন পিসকাটারের, যা তাঁর আবিষ্কারের সবকিছুর মধ্যে অন্যতম। এইভাবে মঞ্চ নিশ্চল হয় না, মঞ্চক্ষেত্র ব্যাপ্তি পায়, জীবন্ত হয় এবং তার নিজস্ব সফল ভূমিকা নিয়ে জীবনের আরও কাছে আসতে পারে।" ব্রেখট বলছেন, "এই চলচ্চিত্র এই নাট্য প্রযোজনায় হয়ে উঠেছে নতুন শক্তিশালী এক অভিনেতা। এরই সাহায্যে দৃশ্যপটের একান্ত অঙ্গরূপে দলিলপত্র, সংখ্যা পরিসংখ্যানের নতুন ভাষ্যকে প্রদর্শন করিয়ে দর্শককে তার স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করানো সম্ভব হলো।" একই সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানের একই বিষয়কে ঘিরে যে ঘটনা ঘটছে বা ঘটানোর চেষ্টা করছে একদল মানুষ, তা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। প্রসঙ্গত বলা উচিত, জার্মানীতে মুরনাউ, পাবস্ট, রবার্ট ভাইনে, ফ্রিজ্ ল্যাঙ্ চলচ্চিত্রে তার অসীম ক্ষমতার যে শক্তি তার প্রমাণ রাখছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের এই সাংঘাতিক শক্তির কথা প্রমাণ করেছিলেন বড়ো আকারে। ব্রেখট এই চলচ্চিত্রকে তাঁর থিয়েটারে ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। পিসকাটার যেমন চেয়েছেন আধুনিক জটিল জীবন-বিন্যাসকে ধরতে এই যন্ত্রায়ণের মধ্যে, তেমনি ব্রেখটও চেয়েছেন। সস্তা প্রতীকতার যান্ত্রিক উপকরণকে কাজে লাগানোর ঝোঁকের প্রতিবাদ তিনি করেছেন, ভুলভাবে প্রয়োগ করতে বারবার নিষেধ করেছেন। সঠিক প্রয়োগ যে কিরকম, তা তিনি তাঁর কাজে বারবার প্রমাণ করেছেন অত্যন্ত বড়ো আকারে, যা নতুন জনগণের থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। আন্তর্জাতিক থিয়েটার ও ফিল্মের আজ যে গভীরতা এবং তীব্র ব্যাপকতা আমরা লক্ষ্য করি তার মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক শক্তি, বিজ্ঞানের সতেজ সমৃদ্ধতা যা মানুষের মননের অগ্রগতির বিকাশকেই প্রমাণ করে। সমস্ত শিল্পমাধ্যমগুলি এই সমৃদ্ধতাকে বুকে করে নিয়েই এগিয়ে যায়, অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে নব নব দিগন্ত।

বস্তুতঃ এঁদের হাতে—তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার, ইন্দর সেন, তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী ('মেঘ ও রৌদ্র' ছবিটি স্মর্তব্য), অজয় কর, প্রভৃতি কয়েকজনের হাতেই ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচে। এঁরাই ইণ্ডাস্ট্রি নামক গাড়ীটির তেল যোগাড় করেন, চাকাটাকে সচল ও গতিময় রাখার জন্য, যে গাড়ীতে চেপে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ এগিয়ে যেতে পারেন। ছবির সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাবে, এই বৃদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী ততো বেশী পরিমাণে বলিষ্ঠ ভাষায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বক্তব্য রাখা যাবে। তাতে নতুন নতুন দিক খুলে যাবে, দর্শক আকৃষ্ট হবে, পয়সা দেবে, কারণ চলচ্চিত্র এখনো সবচেয়ে কম পয়সায় আনন্দদানের মাধ্যম। এভাবে যতো বেশী টাকার লেনদেনের সুযোগ হবে ততো বেশী পরিমাণে ইণ্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ হবে। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নানান কারিগরী ব্যাপার-স্যাপার এসে পৌঁছে যাবে ল্যাবরেটরীতে। এর ফলে কলা-কুশলী, শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ফিরবে। সংঘবদ্ধ এক বিরাট সংগ্রাম এক নতুন উদ্দীপনায় অদম্য উৎসাহে সমগ্র ইণ্ডাস্ট্রিকে বসন্তের বাতাসে স্নিগ্ধ করবে নতুন জীবনে। ব্যবসায়ীদের যদি একবার বোঝানো যায় এখানে টাকা লগ্নী করাটা অনেক বেশী লাভজনক তেমনি অনেক বেশী শ্রদ্ধার ও সম্মানজনক তাহলেই বেশী মাত্রায় কাজ হবে।

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল দত্ত, পীযূষ বসুর দল চলচ্চিত্রের ভীষণ শক্তির যে ন্যক্কারজনক অবমাননা শুরু করেছেন তাকে বন্ধ করতেই হবে। আমাদের ভাবা দরকার 'কল্পতরু' গোষ্ঠী নামে একজন-দুজন থিয়েটারের ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র তৈরীর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন, যাঁরা এখনও থিয়েটারের নিজস্বতাই বোঝেন না, তাঁরা আসছেন ছবি তৈরীর জগতে। কারণ, আজকের ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র জগৎ এমনিই এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা ফেলে ছড়িয়ে লুটে পুটে খাই'-এর মানসিকতার সঙ্গেই তুলনীয়। এইসব অদক্ষ চিন্তার মানসিকতায় হাবুডুবু খাওয়া অশিল্পীরাই প্রমাণ করেছেন যৌনতা নিয়ে ছবি করা হলো জীবন বিরোধী কাজ যা এক চূড়ান্ত ন্যক্কারজনক অবস্থায় গিয়ে মানুষকে বিপাকে ফেলে। এরা জানেন না এই যৌনতা নিয়েও পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারেরা মননশীল জীবন বোধে সমৃদ্ধ ছবি তৈরী করেছেন। যেমন ব্রেঁসো করেছেন 'মুশেত', মার্গারেত দুরাস করেছেন 'লা মিউজিকা' ক্লাক্লো রোসি করেছেন 'এরোজ ফর এভ্রিওয়ান'। এইসব ছবির মূল বিষয় কিন্তু যৌনতা, অথচ ছবিগুলি জীবনের সম্পদে বলীয়ান হয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। এ ছবিগুলি অসুস্থ চিন্তাধারার প্রতিফলন নয়, ছবিগুলিকে ক্লেদাক্ত পথে নিয়ে গিয়ে অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়নি। আমার মনে পড়ছে ইয়াং জার্মান চলচ্চিত্র আন্দোলনের নেতা আলেকজাণ্ডার ক্লুগের কথা—ছবি তোলা হচ্ছে আদালতের সওয়াল জবাব। সমাজ এখানে

আসামী, কাঠগড়ায় রেখে সমাজকে বিচার করা হচ্ছে। আর ফিল্মমেকার হচ্ছেন এই আদালতের এই আসামীর বিচারক। ঘটনার সাক্ষী সাবুদ এই শিল্পীরা (ক্লুগের বক্তব্যের ধরণটা এই রকম, কথাগুলি অবিকল মনে পড়ছেনা)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পিসকাটার চেয়েছিলেন থিয়েটার যেন পার্লামেন্ট হয়, দর্শকমণ্ডলী যেখানে হয়ে উঠবে আইন প্রণেতা। এই পার্লামেন্টেই পিসকাটার জনগণের বৃহত্তম প্রকল্পগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যে উত্তরগুলো সকলকে দিতে বাধ্য করা হবে। এক অসহনীয় অমানবিকতা, অনাচারের ভীষণ কাণ্ডকারখানা যখন এই মঞ্চে বলা হচ্ছে, যা গাঁথা হচ্ছে এক শিল্পসম্মত মানসিকতায় অনুরূপ অনুভূতি বজায় রেখে মঞ্চে। তখন কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ভাষণ দিতে ডাকা হয় নি। এই মঞ্চের দায় তখন এই যে, ভিন্নার্থে এই পার্লামেন্টের দর্শকমণ্ডলীকে এমন সব সংখ্যা পরিসংখ্যান ঘটনা, পরিবেশ অনবরত বলবে, এবং তার সঙ্গে স্লোগান যোগাবে এই দর্শকমণ্ডলীকে যা ওই দর্শককে এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে। এর মধ্যে থেকে তিনি এক লড়াকু মানুষের চেহারা তার সিদ্ধান্ত জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন তীব্রভাবে। এই প্রসঙ্গ ধরেই এগিয়ে গিয়ে বলা যায় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের কথা, যিনি জঁা লুক গোদার। গোদার কখনই একইভাবে তাঁর ফিল্ম তৈরী করার জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনী তুলে নেন না। বারবার তিনি নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরাটাই বড়ো কাজ মনে করেছেন, এরই জন্য রুশোর কাহিনী নিয়ে 'এমিলি' নামে বিখ্যাত ছবিটি তৈরী করতে পারেন যার মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে নিদারুন চাবুক মারা হয়েছে (আমাদের দেশে এই রকম একটি দারুণ সমস্যা ও সাবজেক্ট থাকা সত্বেও একটিও ছবি তৈরী হয় না—রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' নিয়ে ফ্যান্টাসী আর ফেবলের মধ্যে থেকে এই অবস্থাকে চাবুক মারা যায় সজোরে)। আবার ওই গোদারই অতি সস্তা আমেরিকান থ্রিলার নিয়েও ছবির মতো দারুণ ছবি করতে চান। অথচ তিনি নিজেই জানান তাঁর প্রিয় উপন্যাস 'দি উইণ্ড প্লামস' তাঁর ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু তবুও তিনি তাই নিয়ে ছবি তৈরী করতে উৎসাহ পান না। আমাদের ছবির জগৎ এর থেকে অনেক দূরে।

বস্তুতঃ টালিগঞ্জের এই নিদারুণ গতি প্রকৃতি দেখে আমার মনে হয় আমাদের কমার্শিয়াল ফিল্ম মেকাররা কেউই আদপে শিল্পী নন। যদি তাঁরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হতেন তাহলে দর্শক তাদের থেকে কিছুতেই সরে আসতো না। সত্যিকারের শিল্পী জানেন কাজটা নিজের মতের মধ্যে রেখেও আনন্দদায়ক করে তোলা যায়। দর্শককে কাছে পাওয়া যায়। একটু আগে এ প্রসঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের উদাহরণ দিয়েছি। উদাহরণ হিসেবে ব্রেখটকেও ভাবা যেতে পারে। এঁরা মনে প্রাণে প্রকৃত শিল্পী, দর্শককেও কাছে পেতে তাঁদের কোনো অসুবিধে নেই। তার কারণ একটাই যা রেঁনোয়ার কথাতে প্রতিফলিত—দর্শককে আনন্দ দিতে হলে সবার আগে নিজেকে শিল্পীর প্রকৃত সিংহাসনে বসাতে হয়। সেখানে ফাঁকি থাকলে, কোন কিছুর কার্পণ্য থাকলে ওই জায়গায় ফাঁকি আর কার্পণ্য আসতে বাধ্য।

তুলি দিয়ে যখন ছবি আঁকতে হয়, সেই ছবিরও নিজস্ব চরিত্রের একটা বর্ণ আছে। যা এই চিত্রকরকে বুঝতে হয়, তারপর তার প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে হয়। ছবি আঁকতে গেলে তাই প্রাথমিক ব্যাপারটা শিখে নিয়েই শুরু করতে হয়, আয়ত্ত করতে হয় কেমন করে তুলির আঁচড় দিলে আস্তে আস্তে একটি শূন্য সাদা ক্যানভাসে এক বৃহত্তর জীবন ধরা পড়ে। আমি সেতার বাজাতে জানিনা, আমার সামনে সেতার দিলে আমি বাজাবো কেমন করে? তাই আগে ছবিটাকে ছবি বলে গড়তে হবে, তারপরে অন্য সব ভাবনা। অতএব কোনো করুণা নয়, কোনো ক্ষমা নয়, যে পারবে সেই আঁচড়ের দক্ষতা দেখাতে, তাকেই আমরা ছবি করতে দেবো, তা না হলে তাকে বিদায় করবো। ঐসব অপদার্থ ছবি করিয়ের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা একসঙ্গে জোট বেঁধে তোমার ছবি দেখবো না, দল বেঁধে যাবো তোমার টাকা পাওয়ার সোর্সকে নিরস্ত করতে, এর জন্য ব্যাপক জনমত তৈরী করবো। এদের আমরা স্টুডিও ভাড়া নিতে দেবোনা—পিকেটিং করবো। ল্যাবরেটরীতে কাজের সুযোগ দেবোনা, কলা-কুশলীদের বোঝাবো, তাদের মতামত নেবো এবং দেবো। সরকারের কাছে দাবী জানাবো যাতে ছবি তৈরী করতে না পারে। জনগণকে বোঝাবো আপনারাই দর্শক, সিনেমার ক্ষেত্রে আপনারাই প্রথম কথা বলবেন, আপনারাই শেষ কথা বলবেন। ঋত্বিক ঘটকের শেষ উদ্ধৃতি—"কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে দর্শক। আপনারা কি করছেন? আপনাদের কি কোনো দায়িত্ববোধ নেই? বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারায় বইছে, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র (এবং আমার সংযোজন গ্রুপ থিয়েটার), তার একটাকে আপনারা এইভাবে পঙ্গু রাখবেন? আমাদের বিকৃত রুচিকে আরও বিকৃত করার জন্য আপনারাই তো দায়ী। ঘৃণ্য জিনিষকে বর্জন করুন। ভদ্র যা তাকে গ্রহণ করুন। এই সমস্ত সমস্যা এক ফুঁয়ে—'মিলি মিলি যাও সাগর লহরী সমান।' আপনাদের হাতেই তো চাবিকাঠি।'

১৯৭০ সালে লেখা ঋত্বিক ঘটকের লেখা একটি মহামূল্যবান চিঠি আমরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবো।—"এককালে আমরা ভেবেছিলাম যে যদি সেন্সর অনুসারে প্রকাশ করা যায়, তাহলে ছবির জগতে কিছু উন্নতি হয়। সাধারণতঃ পরীক্ষা, নিরীক্ষামূলক ছবি বেরোনোর পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতো ছবি মুক্তির প্রশ্নটা। আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমার প্রথম ছবি 'নাগরিক' নানা প্রকার ডামা-

ভোজে পড়ে প্রকাশ পেতেই পারলো না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই ধরণের কত ছবি যে মার খেয়েছে তার হিসেব নেই। (অন্যত্র জানাচ্ছেন—ঠিক হিসেব বলতে পারবো না, তবে আন্দাজে একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বছরে গড়ে ৬০ খানা করে বাংলা ছবি তৈরী হয়েছে। সেখানে তখন হিসেব করলে দেখবেন, আপনারা যাদেরকে প্রগতিশীল বলেন, সেই সমস্ত পরিচালক ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন, ভালো বা মন্দ যাই হোক। যেখানে ১৯৬৭-তে মাত্র ২৪টা ছবি হয়েছে, এবং এবছরে [১৯৬৮ সালের কথা বলছেন—এই লেখার সময়টা মে-জুন মাস] ১০টার বেশী ছবি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই দুর্ভিক্ষের বলি কারা? যারা গতানুগতিক ছবি করে যান তাঁরা কেউ নন, ঐ নতুন ধরণের ছবি করিয়েরা। তাদের মধ্যে কেউ দু'বছর, কেউ পাঁচ বছর বসে আছেন। এবং ঘটনাটা ঘটছে ঐ দশকদের অঙ্গুলি হেলনে।"

"কিন্তু এই চিন্তাধারায় আমার ভুল ছিলো। আমাদের প্রযোজকরা শুধু ছবির মুক্তির পথই খোঁজেন না, তাঁরা ভালো জায়গায় ছবির মুক্তির পথ খোঁজেন। অবশ্য তাঁদের মতে। ঘটনা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে সেন্সর করা মাত্রই ছবিকে প্রকাশ করা আজ আর সম্ভব নয়। আজকে কে কার কোলে ঝোল টানবেন, সেইটে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফল দাঁড়িয়েছে ওই যে বাংলা ছবি বছর কয়েক আগেও গোটা পঁচিশ ত্রিশ হতো, এখন সেটা গোটা কুড়িতে দাঁড়িয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে সেটা পাঁচ, দশটায় পৌঁছে যাবে, ফল হবে ভয়াবহ। ব্যবসাদাররা, যারা দুটো পয়সা জোটার লোভে ছবি করে, তারাও একে একে বিদায় নেবে। শিল্পীদের বড়ো বড়ো কথা বলা এবং চালিয়াতি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ কলাকুশলীরা না খেয়ে পরে মারা যাবে। এর কি কোনো পথ নেই? সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন অনেক করা হয়েছে। হয়তো তাঁরা কিছু করবেন, হয়তো কিছু করবেন না। সমস্যাটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ আর কতোদিন এই সব উত্তমমার্কা ছবি দেখবেন। নিজেদের জীবনের শরিক হিসেবে কি ছবিকে গ্রহণ করতে পারবেন? সে ক্ষমতা এঁরা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছেন বলে মনে হয়। আঘাত করার দরকার। সে আঘাত সহ্য করার মতন মানসিক স্থৈর্য এবং ধৈর্য এদের আছে কিনা, সে বিষয়েও চিন্তার অবকাশ আছে। এরা দিনগত পাপক্ষয়ের অংশ হিসেবে ছবি দেখে থাকেন। তাই নিয়েই ব্যাপৃত হোন। নিজের জীবনের গভীরতম কথার অংশীদার হবার দয়া করে চেষ্টা করবেন না। আমার আক্রমণ সম্পূর্ণ দেশের মানুষের উপরে। তাঁরা দয়া করে ভালোবাসতে শিখুন। ভালো না বাসলে কিছুই দাঁড়াবে না। রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভিন্ন স্তর বিন্যাস আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে এইটি আমার প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। আশা করি, আপনারা আমাকে ক্ষমা [illegible]।"

পাঠক যখন এই লেখাটি পড়ছেন তখন কলকাতা, বর্ধমান ও রাণাঘাট এই ত্রয়ী বাজার থেকে 'শ্রীকান্তের উইল' নামক উত্তম মার্কা সেলুলয়েড বই অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু এখনো অর্থাৎ এই লেখার সময় তা চলছে। গল্পটি শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'জন্মান্তর' থেকে নেয়া। কিন্তু দুটো পয়সা জোটার লোভে লোভী ব্যবসায়ী যাঁর গল্প অনুসরণ করে এই সেলুলয়েডের জন্ম তাঁরই নাম বিজ্ঞাপনে বাদ দিয়েছেন। এই নাম বাদ দেওয়ার মধ্যে মুখ্য ব্যবসায়ী লোভ কাজ করেছে, গল্পটি শরৎচন্দ্রের না বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শককে এই দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে ব্যবসার লোভ। ছবির গল্পও যেমন, তেমনই জঘন্য ক্যামেরার কাজ, এডিটিং এবং কারিগরী কলাকৌশল। কাজেই ঋত্বিক ঘটকের ক্ষোভ-জ্বালা এবং অভিযোগকে আশ্রয় করে আমাদের এজাতীয় ছবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে।

ঋত্বিক ঘটক এই চিঠিতে লিখেছেন সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের কথা। তিনি এও বলেছেন সরকার হয়তো কিছু করবেন, হয়তো কিছুই করবেন না। এই চিঠির সময় ১৯৭০ সাল। তৎকালীন সরকার কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি অনেক বেশী দিয়েছেন, কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কাগজে প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট এগারোজনকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে, রঙিন ছবির জন্য দেড় লক্ষ টাকা, সাদা কালো ছবির জন্য একলক্ষ টাকা। যদিও প্রাথমিক পরিকল্পনায় এই টাকার পরিমাণ ও অনুদানের সংখ্যা বেশী নির্ধারিত হয়েছিলো তবুও ভয়ংকরী বন্যার জন্য বাজেটের কাটছাঁট করতে হয়েছে। একথা ঠিক যে এই অনুদান সকলেই পাচ্ছেন না তাহলেও এই বন্ধ্যা ইণ্ডাস্ট্রিতে এই আর্থিক সাহায্য যথেষ্ঠ প্রেরণার কাজ করছে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। অবশ্যই এই সরকারকেও প্রচলিত রীতি-নীতি এবং সিস্টেমের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে ফলে স্বভাবতঃই সার্বিকভাবে যতটা অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিলো ততটা এই আড়াই বছরে এই সরকারের পক্ষে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এছাড়া রয়েছে পরিবেশক-প্রদর্শকদের নানাবিধ কর্মকৌশল, যার ফলে প্রযোজক পড়ে পড়ে মার খান। এঁরা এই প্রদর্শক-পরিবেশক কম্বাইন মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলেন। ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় এঁরা হলেন "জগন্নাথের দল—ফালতু ফড়ে। এঁরা সাহেবদের স্যাণ্ডউইচের মতো দুপাশেতে দুই (একটা ছবি করার গোড়ার দিকে, অপরটি একেবারে শেষে) শোষণের

(পরবর্তী অংশ ৯৭ পৃষ্ঠায়)

'সবুজ দ্বীপের রাজা'র কলঙ্ক

শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি 'সবুজ দ্বীপের রাজা' নামে একটি বাংলা রঙিন ছবি নিয়ে কোলকাতার দর্শকদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ লক্ষ্য করা গিয়েছে, লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রভাতী দৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এ ছবির প্রশংসা কিন্তু লক্ষ্য করা যায় নি এ ছবির ক্ষতিকারক ভুমিকাটির আলোচনা। বিশেষত এ ধরণের জনপ্রিয় ছবির ক্ষেত্রে যা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

ছবির শুরু ১৯২৪ সালের সেলুলার জেল দিয়ে। সার বাঁধা বন্দীর মিছিলে চশমা পরা দীর্ঘদেহী ধুতী-সার্ট পরিহিত এক বাঙালী বন্দী সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনার কাজে বন্দীদের ব্যস্ত দেখা যায়। হঠাৎ এক ফাঁকে বন্দীটি কাজ থেকে পালায়।

চিড়িয়াখানায়

আরো পঞ্চাশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪-এ চিড়িয়াখানায় দাদার সাথে একদল ভাই। বার পাঁচেক স্কুল পেরোনোর চেষ্টায় বিফল দাদাটি এবার ভায়েদের সাথে ১০+২ শিক্ষাক্রমে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চান বলে সগর্বে জানান। ডেঁপো অথবা লোফার বলে মনে হলেও অবলীলাক্রমে জন্তু জানোয়ারদের ল্যাটিন নাম তিনি বলে চলেন। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির সাথে বদ্-রসিকতা করতেও ছাড়েন না। পড়া মুখস্ত করে সময় নষ্ট করতে উনি একেবারেই নারাজ। তবে তাঁকে দিয়ে হেলা ভরে জীব জন্তুর বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চারণ করিয়ে কি একথা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, পড়াশুনা না করেও জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে?

ইতিমধ্যে জনৈক পঞ্চাশোর্ধ স্যুট পরা জেন্টলম্যান বেঞ্চে বসা জনৈক ক্লান্ত প্রৌঢ়ের পাশে বসে পড়ে, মাঝে থাকে দুজনের অ্যাটাচী কেস দুটো। ক্যামেরা এগিয়ে এসে অ্যাটাচী দুটোকে ক্লোজ-আপে ধরে তাদের নিখুঁত সাদৃশ্যকে দেখায়। হঠাৎ পূর্বোক্ত ছেলের দলের মধ্য থেকে একজন 'উপেন জেঠু' বলে প্রৌঢ়কে সম্বোধন করলে অপ্রস্তুত প্রৌঢ় পালাতে উদ্যত হয়—ভুলক্রমে নিজের অ্যাটাচী কেস ফেলে রেখে যায়। এই সুযোগে জেন্টলম্যান আর অ্যাটাচী পাল্টে প্রৌঢ়কে দেয় এবং চাপা স্বরে নির্দেশ দেয় না পালিয়ে ছেলেটির কথার উত্তর দিতে—অর্থাৎ উভয়ে পূর্ব পরিচিত; তবে অ্যাটাচী পরিবর্তনটা এমন রহস্যজনকভাবে করতে হল কেন? অযথা নয় কি? অর্থাৎ অনর্থক দর্শককে উদ্বিগ্ন করে তোলা। তবে নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য হত যদি দর্শককে একথাটি বোঝান যেত যে আমাদের আশেপাশের অনেক উপেন জেঠুই অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার ফলে এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং আমরা 'চিনতেই পারলো না' বলে বিস্মিত হই। এ রকম বুঝিয়ে থাকেন গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক সত্যজিৎ রায়—

> ....কত ভবানন্দ, মন্দার বোস, মছলিবাবারূপী ফেরারী আসামী, একদিকে আর অন্য দিকে জমিদার বংশের মহীতোষ সিংহ রায়, এ্যাডভোকেট মহেশ চৌধুরী, প্রেসিডেন্সী কলেজে গোল্ড মেডেল পাওয়া গিরীন্দ্র বিশ্বাস, বোম্বের চলচ্চিত্র প্রযোজক জি গোরে, ল্যান্স-ডাউন রোডের পাণ্ডুলিপি চোর নরেশচন্দ্র পাকড়াশী, দীননাথ লাহিড়ীর বেকার ভাইপো, উমানাথ ঘোষালের সেক্রেটারী বিকাশ সিংহ, সন্ন্যাসী বেশী ভণ্ড এরা তো আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সংগী, এমন ভাবে এদের অন্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে আমরা কি জানতাম?*

কিন্তু এ সত্য ছবিতে ধরা পড়ার নয়, এর মূল অন্যত্র।

দুই কক্ষে

পরিবর্তিত অ্যাটাচী হাতে জেন্টল্‌ম্যান একটি বহুতল বাড়ীর এক অ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছল। এখানে পর পর ঘটে চলে কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা যা আমাদের পকেটমার, ছিনতাইকারী জাতীয় সমাজবিরোধীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, দেশের শত্রু, বিশ্বব্যাপী যাদের চক্র ছড়ানো রয়েছে তাদের আচরণ এতো খেলো হবে—ভাবা যায় না। প্রকৃত ঘটনা হল—সংযমের তাগিদে সস্তা মাস্তানী পরিহার করলে ঘন ঘন হাততালি পাওয়া যায় না। অথচ এতে অযথা কিশোর তরুণদের উত্তেজিত করা হয়—তবে বর্তমান আলোচনা থেকে তাঁদের অনিবার্য কারণেই বাদ রাখা হল। এ ধরণের অকারণ উত্তেজনা অপরিণত ছেলে-মেয়েদের যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তববাদী না করে আবেগ প্রবণ, কল্পনা বিলাসী করে তোলে, অসামাজিক রোমান্টিকতায় উৎসাহ যোগায়। রুদ্ধশ্বাস রহস্যচিত্র করে তোলার চেষ্টায় কোমল মনে ঐ ধরণের চাপ সৃষ্টি করা স্পষ্টতই অন্যায়।

এরপর দর্শককে নিয়ে আসা হল অন্য এক কক্ষে যেখানে প্রাক্তন আই, বি, অফিসর মি· রায়চৌধুরী কোন এক জায়গায়

* বর্ণমালা/সত্যজিৎ রায় সংখ্যায় নন্দরাণী চৌধুরীর 'ফেলুদার সঙ্গে ভুলভুলাইয়ায়' রচনা দ্রষ্টব্য।

রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্তে জনৈক (অধস্তন) সরকারী কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন তাঁর রওনা হবার খবর হোম ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে রওনা হবার চব্বিশ ঘন্টা পর—এ ধরণের নির্দেশ দান কি অবাস্তব নয়? অথচ নিছক রহস্য জমিয়ে তোলার তাড়নায় এই অযৌক্তিক দূরভাষণের অবতারণা করা হল। এরকম অসঙ্গতির উদাহরণ ছবির সর্বত্র রয়েছে, আমরা তার বিশেষ কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। মি. রায়চৌধুরীকে খাবার দিতে এসে তাঁর বৌদি, সন্তুর মা তাঁকে সন্তুর দিনরাত ঐসব 'ক্যারাটে-ম্যারাটে' চর্চা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দিতে বলতে বলেন। সরকারী উচ্চ-পদের প্রাক্তন অফিসার, সন্তুর প্রাক্তন কাকা সন্তুর মা-কে জানালেন যে আজকের দিনে ওগুলোর বিশেষ দরকার। অর্থাৎ? লেখা-পড়া ছেড়ে বালকের দল এক্ষুণি ক্যারাটে নিয়ে লেগে পড়? 'এন্টার দ্য ড্রাগন' ছবির পর হঠাৎ কোলকাতার যুবকদের মধ্যে ক্যারাটে-কুংকুর মহড়া চলতে লাগল পথে-ঘাটে, বইয়ের দোকানে শো-কেসে একাধিক বাংলা বইও এ বিষয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারল। ছবিটি সে প্রচারে আর একটু এগিয়ে গেলে তাকে শিক্ষার ওপরে স্থান দিয়ে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে চিড়িয়াখানায় 'দাদা'টির পড়াশুনা সম্পর্কে অভিমত। মায়ের কথায় এবং ভঙ্গীতে মধ্যবিত্ত মায়ের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার মানসিকতা—যদিও কথাবার্তা, আচার-আচরণে পরিবারটিকে ধনী বলেই মনে হয়, তা ছাড়া দার্জিলিংয়ের শৈলশিখরে ভ্রমণ, ছেলের ক্যারাটেপ্রিয়তার মেয়াদ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বড়জোর দুদিন—ফুটে ওঠে। অথচ কাকার জবাবের পর মায়ের নীরবতা প্রেক্ষাগৃহে রব তোলে—সাবাশ কাকা, এই তো চাই! বিষয়টি দশ থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েদের ভীষণভাবে আলোড়িত করে।

জাহাজে

আন্দামানগামী জাহাজে সন্তুকে একসময়ে ছদ্মবেশধারী দুজন অপরাধী জলে ফেলে দেবার উপক্রম করলে সন্তুর অনগল বলে যাওয়া অপরাধীদের প্রতি সাবধানবাণী, তাদের (অপরাধীদের) পরিচিতি, ডায়েরীর বিষয়বস্তু, কাকার পরিচয় আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। অথচ ছবির নায়ককে বাঁচিয়ে রাখতেই এই উদ্ভট দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হল। দলপতির নির্দেশে সন্তু রক্ষা পেল। এ সময়ে, পরে সিকিওরিটি বলে জানা গেছে এমন, একজনের যথেষ্ট দূর থেকে দৃশ্যটি উপভোগ করা রীতিমতো অবাস্তব। সিকিওরিটি লোকটির সন্তুদের কেবিন দেখে যাওয়াও ছিল অস্বাভাবিক।

আন্দামানে পদার্পণ

আন্দামানে পৌঁছে জনৈক সরকারী কর্মী মি. দাশগুপ্তের দেওয়া বর্ণনার—পরাধীন ভারতবর্ষে মেয়ে কয়েদীদের ঐ দ্বীপে ফাঁসি দেওয়া হত—আদৌ সত্য নয়। কারণ, ১৯৫৭ সাল থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে যে কয়জন বন্দীকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তাদের নামের যে তালিকাটি আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে [মুক্তিতীর্থ আন্দামান।। গণেশ ঘোষ / ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] তার মধ্যে একজনও নারী কয়েদীর নাম পাওয়া যায় না। তার অন্যতম কারণ শ্রীমতী বীণা দাস প্রণীত 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'-এ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৬৮), "—যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, মা বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে যাঁদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয়—তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আরেকজন সি. এফ. এণ্ড্রুস।"১

মি. দাশগুপ্ত স্বাভাবিক উৎসাহভরে আন্দামানের বর্ণনা দিয়ে চললে. মি. রায়চৌধুরী উচ্চপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মতো তাতে বাধা দেন, যুক্তি—'আমি এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আসিনি।' কর্তব্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত এ নয়, আবার এতে মি. রায়চৌধুরীর কর্ম জগতের অমানুষিক রূপটিরও প্রকাশ ঘটে না। সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়াবার সময় শিখ-এর ছদ্মবেশী অপরাধীর সাথে সন্তুর মারামারির ঘটনাটি কাকার ক্যারাটে শিক্ষার (অ)বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষার অধিকতর প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। হাততালিতে ফেটে পড়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ—কারণ সন্তু জয়ী।

সেলুলার জেল পরিদর্শনরত মি. রায়চৌধুরী বলে চলেন এক আজন্ম বিপ্লবীর কথা, যিনি জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশী সরকারের রিপোর্ট বলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ সম্পর্কে জেলের ফাইলগুলো তিনি দেখতে চাইলে জানা গেল সমস্ত ফাইল দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা—

> আন্দামানে কত সহস্র রাজবন্দীকে তারা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করেছে আজও তা' সঠিকভাবে জানা যায়নি এবং কখনই তা' জানা যাবে না; কেন না ১৯৪৭ সালে ভারত পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময়ে তারা খুব সতর্কভাবে এই বিষয় সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র একেবারে নষ্ট করে গিয়েছে।২

অথবা

> তাদের এই নৃশংস বর্বরতার কথা যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মানুষ জেনে ফেলে এই ভয়ে ইংরেজ-

---

১। মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৬৬-তে শ্রীসমর ভাদুড়ী লিখিত 'রাজনৈতিক বন্দিনী' শীর্ষক পত্র দ্রষ্টব্য।

২। ভূমিকা ঃ মুক্তিতীর্থ আন্দামান।

দস্যুরা ভারতের সেই সকল দেশপ্রেমিক শহীদদের অথবা সেই নির্বাসিত স্বাধীনতা সৈনিকদের নামের কোন তালিকাও রেখে যায়নি। ভারত ত্যাগের পূর্বে সেই দীর্ঘ তালিকা তারা পরিকল্পিতভাবেই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলেছে।[১]

এরপর চিত্রনির্মাতা পরিবেশন করেন আরেকটি ভ্রান্ত তথ্য—মিডল্ আন্দামানে সেন্টিনেলিসরা থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বসবাস করে সেন্টিনেল দ্বীপের মধ্যেই, এই সেন্টিনেল দ্বীপ দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ সমূহের একটি। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চারটি বড় দ্বীপ আছে—উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং নিকোবর।

অজানা রহস্যের সন্ধানে

মি· রায়চৌধুরীর আন্দামানে আসার উদ্দেশ্য অপরাধীদের গ্রেফতার নয়, আরো সাংঘাতিক কোন রহস্যের সমাধান করা। তাঁর নিজের কথায়—পৃথিবীতে এমন কিছু রহস্য আছে যার আজও মানুষ সমাধান করতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান সাংহাইয়ের এক দোকান থেকে দুটো এক ইঞ্চি লম্বা দাঁত পাওয়া গিয়েছে ; ও দুটো মানুষেরই। কিন্তু অতবড় মানুষ পৃথিবীতে কোনদিন ছিল না। পাঠক সাধারণ একটু মিলিয়ে নিলে দেখতে পাবেন এখানে 'দানিকেন তত্ত্বে'র আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এরিক ফন দানিকেন তাঁর 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ৩৮] লিখেছেন ঃ

> সৌরিয়ার সাক্তিতা থেকে চার মাইল দূরে সাসনীখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পাথরের যে সব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তাদের ওজন চার সেরের মতন। পূর্ব মরক্কোর আয়ন ক্লিতিশায় যেগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোও ফেলনা নয়। লম্বায় ১২½ ইঞ্চি, চওড়া ৮½ ইঞ্চি আর ওজনও প্রায় সাড়ে চার সের। যদি সাধারণ মানুষের উচ্চতা আর তার গঠনের ওপর নির্ভর করে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাবো, ওই জ্যাবড়া জবর হাতিয়ার ব্যবহার করতে গেলে মানুষটাকে অন্তত বারো ফুট লম্বা হতে হবে।*

অথবা, দক্ষিণ আমেরিকার গোলক রহস্য—দানিকেনের গোলক রহস্যের অবিজ্ঞানমুখী ব্যাখ্যা সুবিদিত। অর্থাৎ তাঁর উদাহরণগুলো দানিকেনের আবিষ্কারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মি. রায়চৌধুরী বলতে চান এই দিকে কিছু বিদেশী বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন সময়ে কোন অনুসন্ধান কার্যে এসে আর ফিরে যেতে পারেননি। এ-ও ঐ একই ধরণের এক রহস্য। এ রহস্য উন্মোচনেই তাঁর আন্দামানে আগমন। দুর্ধর্ষ জারোয়াদের প্রসঙ্গ উঠলে জানা গেল জনৈক প্রীতম সিংকে কোন এক বিশেষ কারণে জারোয়ারা হত্যা করেনি, কিন্তু দ্বীপের ভেতরেও প্রবেশ করতে দেয়নি। কেবল খাদ্য আর লাল কাপড় চাইত আর তা নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিত। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হল, দ্বীপের ভেতরে এমন কিছু আছে যা তারা বিদেশীদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় এবং এটিকে তারা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এর একাধিক অসত্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রথমত প্রীতম সিং প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়ত জারোয়াদের লাল কাপড়-প্রিয়তা এবং সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণ বা সভ্য মানুষ বিদ্বেষ।

প্রীতম সিং নয় "এপ্রিল মাসের (১৯৫৮) ২৩শে তারিখে দুধনাথ তেওয়ারী আরও ৯০ জন বিদ্রোহী বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে 'রস' দ্বীপ থেকে পলায়ন করে সরে যায়।....দুধনাথকে আহত করে বন্য মানুষেরা তাদের নিজস্ব পল্লীতে নিয়ে যায় এবং.... একটি বন্য কন্যাকে বিবাহ দেয়। দুধনাথ প্রায় একবছর তাদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের ভাষা শিখে নেয়।"[২] বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদের তালিকা ঘেঁটে শ্রীদিলীপ মজুমদার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে 'কারা-শহীদদের তালিকা' প্রস্তুত করেছেন তাতে প্রীতম সিং নামটি পাওয়া যায় নাভা জেলের বন্দী হিসাবে।[৩] আর এবারডিন অঞ্চল আক্রমণ (আন্দামানীদের একটি উল্লেখযোগ্য সভ্যতা-বিরোধী অভিযান)-এর পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকাকালীন দুধনাথ পালিয়ে এসে পরিকল্পনার কথা ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে বলে দেয়। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে দুধনাথের জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু দুধনাথকে কারা আটকেছিল—জারোয়ারা কি ? তাকে তারা দ্বীপের ভেতরে একবছর রেখে দেয়, অর্থাৎ দ্বীপের ভেতরের কোন রহস্য তাদের সভ্যতা-বিরোধী করে তোলেনি। শেষ পর্যন্ত দুধনাথের পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতা 'প্রীতম সিং তথ্যে'র বিরোধিতাই করে। ইতিহাস মেনে দুধনাথের ঘটনা বিবৃত করা হলে চলচ্চিত্রকারের গোটা অলীক পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যেত। তাই এখানেও তাঁকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এরপর আসে জারোয়াদের লাল কাপড়-প্রিয়তার কথা। লাল কাপড়ের সাথে হিন্দু ধর্মের শাক্ত সম্প্রদায়ের একটা যোগ আছে, কিন্তু গীতা-ভক্ত বৈষ্ণবের লাল কাপড়-প্রিয়তা খানিকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এখানে বলা হল যেন সেই লাল কাপড়ের প্রতি অনুরাগ গড়ে ওঠে সেই সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যাঁকে তারা

১। পৃষ্ঠা ১ ঃ ঐ।

* অনুবাদ / অজিত দত্ত ঃ লোকায়ত প্রকাশন।

২। পৃষ্ঠা ১৩ ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩। দিলীপ মজুমদার প্রণীত 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' নবাঙ্কুর প্রকাশনীর পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য।

'রাজা' বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'জারোয়ারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে।'[১]

সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণ হিসাবে যে সন্দেহ এ ছবিতে কারণে পরিণত করা হয়েছে তা ঐতিহাসিক নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হল :

> জারোয়ারা অত্যন্ত দুর্দমনীয় এবং সভ্য মানুষ মাত্রকেই ওরা শত্রু বলে মনে করে ও বিষাক্ত তীর দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। ওদের বর্তমানের এই অনমনীয় জেদ ও সভ্যতাবিরোধী মনোভাবের কিছুটা বাস্তব কারণও আছে ; ওরা সভ্য মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ বিনা কারণে যথেষ্ট প্ররোচনা পেয়েছে। ১৯২১ সালে আন্দামানের ইংরেজ শাসকেরা অবিবেচকের ন্যায় শুধুমাত্র কৌতুকপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে জারোয়াদের কিছু সংখ্যক মানুষকে ধরে নিয়ে আটক করে রাখে। এর ফলে জারোয়ারা উত্তেজিত হয়ে কিছু কিছু এমন কাজ করে, যার জন্য স্থানীয় শাসকেরা মনে ভাবে যে তাদের সম্ভ্রম হানি হচ্ছে। তাই জারোয়াদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং ইংরেজ সরকার যে অপরিসীম শক্তির অধিকারী সেকথা ঐ সকল অসভ্য বন্য জারোয়াদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য ১৯২৩ সালে ৩৭ জন জারোয়াকে ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে জারোয়ারা আর সভ্য মানুষদের বিশ্বাস করে না এবং সভ্য জগতে আসবার ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছে। তাদের এই মনোভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে।*

তাহলে দেখা যাচ্ছে বার বার দর্শককে টেনে আনা হয়েছে শিক্ষা থেকে অশিক্ষায়, বাস্তব থেকে অবাস্তবে, যুক্তি থেকে আবেগে—যার পরিণতিতে কোন সুস্থ-সভ্য-প্রগতিশীল সমাজ পাওয়া অসম্ভব।

নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহ ও সমুদ্র অঞ্চল পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ মি. রায়চৌধুরী ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ জারোয়াদের জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপে নামতে চাইলেন। লিখিতভাবে নামার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে, পিস্তল উঁচিয়ে নেমে গেলেন সেই ভয়ংকর দ্বীপে, সঙ্গে গেল সন্তু। দ্বীপে নামার সময়ে সরকারী অনুমতির কথা উঠলে মি. রায়চৌধুরী জানান, ভারতবর্ষের কোন নিষিদ্ধ জায়গায় যেতে তাঁর অনুমতি লাগে না। 'কোন ভারতীয় নাগরিক বা বিদেশীর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সরকারী ছাড় আছে? কথাটি যত না ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীর মত ততটা পাড়ার 'হিরো'দের মত। সেই সস্তায় বাজীমাৎ-এর ইচ্ছা।

দ্বীপে নামার পর একটি ঘটনায় দেখা যায় জনৈক জারোয়ার তীরকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যায় সন্তু এবং ক্যারাটে শিক্ষার জোরে জারোয়াটিকে হত্যা করে ক্যারাটে শিক্ষার মাহাত্ম্য আবার প্রতিষ্ঠা করে।

আগুন রহস্য

ঘটনাক্রম দর্শককে পৌঁছে দেয় সেই চরম জায়গায় যেখানে লাল কাপড় পরা সারিবদ্ধ তীরন্দাজ জারোয়া দলের সামনে দাঁড়িয়ে এক হিন্দু যোগী (?)। বৈদিক ঋষিদের মত তাঁর পক্ক কেশ, শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মুখমণ্ডল, পরিধানে লাল কাপড়, ঘাড়ের ওপর দিয়ে আজানুলম্বিত আর এক লাল কাপড়। মুখোমুখি বসে আছে চারজন অপরাধী, তাদের হাত পেছনে জোড়া করে বাঁধা। পাশে একটু উঁচু ঢিপির মধ্যে নীলাভ আগুন জ্বলছে। একে একে অপরাধীদের অস্ত্রগুলো সন্ন্যাসী সেই অগ্নি-গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করলেন। এই সময়ে উদ্যত রিভলবার হাতে মি. রায়চৌধুরীর ঘটনাস্থলে প্রবেশ। কিছু উত্তেজনাকর ঘটনার পর সন্ন্যাসী অপরাধী চতুষ্টয় এবং কাকা-ভাইপোর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হলেন। জানলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সেখানে বিপ্লবী গুণদা তালুকদারের জন্মদিন পালিত হয়—স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ (?) উপায় জন্মদিন পালন। সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে জেগে ওঠে অতীত, তিনি বলে চলেন, জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে ছ'মাস ধরে একটু একটু করে তিনি একটি ভেলা তৈরী করেন, তাতে চড়ে এই জারোয়াদের দ্বীপে এসে পড়েন। যখন তিনি এখানে এলেন তখন ছিলেন অজ্ঞান। কি জানি, কেন তারা তাঁকে হত্যা না করে সুস্থ করে তুলল। এখন তাঁকে জারোয়ারা 'রাজা' বলে।

ছ'মাস ধরে ভেলা তৈরী করলেন গুণদা তালুকদার অথচ ইংরেজ নায়ক টের পেল না—একথা হাস্যকর। জারোয়াদের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন অজ্ঞান থেকে।

পরবর্তী এবং শেষ প্রসঙ্গ—আগুন; সমস্ত রহস্য, সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত ফলাফল এই আগুনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। প্রথমে যখন পর্দায় অগ্নি-গহ্বরটি দেখা গেল তখন ভেতরে নীল রঙের আগুন জ্বলছে, কিছুক্ষণ পর দুষ্ট চতুষ্টয়ের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করার পর তা লাল হয়ে যায় এবং পরে আবার নীল। এর অর্থ কি অলৌকিকত্ব? তাই এর কোন শিখা নেই? গহ্বরের ভেতরে ঠিক মধ্যস্থল বরাবর দেখা যায় সাদা গোলাকৃতি একটি পদার্থ। একটা ধাতু নাকি ভেতরে রয়েছে যার ফলে এই আগুন। সন্ন্যাসীর ভাষায়—রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে, শীতে এ নেভেনা, আত্মার মতো এর বিনাশ নেই। হাজার বছর ধরে

১। পৃষ্ঠা ৫ : মুক্তিতীর্থ আন্দামান।

* পৃষ্ঠা ৪-৫ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

এই আগুন জ্বলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এ আগুন জারোয়াদের রক্ষা করে (কিভাবে?)। বার বার বিদেশীরা এ আগুন চুরি করতে এসেছে, কিন্তু পারে নি। বিদেশের কাছে 'টাকা খেয়ে' এই দুর্বৃত্তরাও এসেছিল।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা নাটকীয়ভাবে ঘটে যার ফলে একজন দুর্বৃত্ত অগ্নিউৎপাদক ধাতু কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়।

মি. রায় চৌধুরী সন্ন্যাসীর তুলনায় বিজ্ঞানে অগ্রিকতর অগ্রসর। এতক্ষণ তিনি জানতেন না কি রহস্য যার খোঁজে তিনি এসেছেন, বিজ্ঞানীরা আসেন কিন্তু ফিরতে পারেন না, জারোয়ারা সভ্যতা বিমুখ ইত্যাদি। কিন্তু এখন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে তিনি এক বৈজ্ঞানিক (?) ব্যাখ্যা জুড়ে দিলেন সন্ন্যাসীর পাশে, হয়ে উঠলেন রহস্য সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ। তিনি জানালেন—এ আগুন পৃথিবীর আগুন নয়, ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে উল্কার মতো ধাতুপিণ্ড, যার জন্য এ আগুন অনির্বাণ। এর প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তি পৃথিবীর সব ধাতুকে আকর্ষণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে চায়। হয়ত ধাতুটা থেকে ওরা এমন বোমা বানাতে পারবে যা সমস্ত পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) প্রযোজিত শিশুবর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি কি সাংঘাতিক অবিজ্ঞানের বিষ ছড়াতে পারে! ছোটদের জন্য ছবি যে দেশে প্রায় হয় না সে দেশের তৃষ্ণার্ত কিশোরের সামনে এ ধরণের পানীয় পরিবেশন নিঃসন্দেহে অপরাধ। টিকিটের সর্বোচ্চ হার এক টাকা হওয়ায় প্রায় সকলের কাছেই দ্বার ছিল অবারিত। তাই সকলেই আকণ্ঠ পান করেছে।

গীতায় আত্মা সম্পর্কে বলা আছে আত্মাকে অস্ত্রে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, বায়ুতে শুকানো যায় না। [২৩/২] গীতা বুকে করে যাঁর পঞ্চাশাধিক বৎসরকাল অতিবাহিত হল সেই শাস্ত্রজ্ঞ আত্মার মতো অবিনশ্বর আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি? প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের শাশ্বত চিন্তা অবিজ্ঞান প্রসূত। এখানে সেই অবৈজ্ঞানিক কল্পনাকে অপরিণত কিশোরদের 'নিক্ষেপ করার ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিশ্বাসের এ অসঙ্গতির মূল আমরা খুঁজে পাব মি. রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যায়।

মি. রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যা—গ্রহান্তর থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড—দানিকেনের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসারী। একবার তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন'-এর একাত্তর পৃষ্ঠায় আসুন। এখানে বলা হয়েছে কোস্টারিকায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন: পঁয়তাল্লিশটা গোলক জ্বলন্ত রোদে পুড়ছে, কোন মান্ধাতার কাল থেকে, কে জানে আগুন গরম ডিকুইস নদীর পাড়ে।

আর তাই দানিকেনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন জারোয়াদের সভ্য মানুষ বিদ্বেষের কারণ হিসাবে। দানিকেনের অভিজ্ঞতা হল: ইচ্ছে হল ওই 'গোলক' ধাঁধার একটা সমাধান বের করি কিন্তু আদিবাসীদেরকে সেগুলোর উৎস এবং উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞেস করতে, তারা বোবা মেরে গেল। আমাকে যেন ওরা সন্দেহ করতে লাগল। মিশনারীরা বারে বারে গেছে তাদের কাছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক আদান প্রদান মারফত আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে তারা, তবু অন্তরের অন্তঃস্থলে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন থেকে গেছে।....আদিবাসীদের কাছে গোলক রহস্য নিষিদ্ধ কথা, ট্যাবু। কিন্তু কেন ট্যাবু তা আমার বুদ্ধির অগোচর।[১]

'ট্যাবু'র কারণ দানিকেনের বুদ্ধির অগোচর হতে পারে আলোচ্য চিত্রের নির্মাতার কাছে নয়। তিনি তা ছবিতে ব্যাখা করেছেন। এখন প্রশ্ন এমন কোন চুম্বকের কথা বিজ্ঞানের জানা আছে কি যা বিশ্বের সমস্ত ধাতুকেই আকর্ষণ করে? না, এমন চুম্বক নেই। আর চুম্বক টেনে নিয়ে পুড়িয়েও দেয়? স্কুলের বিজ্ঞানের ছাত্রও জানে "চুম্বককে উত্তপ্ত করলে তার চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থের এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বিভিন্ন। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় কুরী-বিন্দু (curie point)।"[২] অথচ এ চুম্বক যেমন প্রচণ্ড গরম যেমন প্রচণ্ড এর আকর্ষণী শক্তি—এমনকি মানুষকেও টেনে নেয়। তবে এর আওতায় মি. রায়চৌধুরীর পিস্তল কাজ করল কি করে? সবশেষে বৈজ্ঞানিকদের এর প্রতি আগ্রহের কারণ হিসেবে মি. রায়চৌধুরীর মনে হয়েছে এর ধ্বংস করার ক্ষমতার কথা, অমঙ্গলের ক্ষমতা—মঙ্গলের নয়।

দানিকেনের আশঙ্কাকে রূপ দিতে হলে এ জিনিসের অবতারণা না করলে চলে না, আবার গীতার ব্যাখ্যা এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যদিও দানিকেনকে ঘেঁটে বেড়াতে হচ্ছে সারা জগতের ধর্মগ্রন্থাবলী—তবু দানিকেনের নয়া পদ্ধতি। ফলে, ধর্মীয় বিশ্বাসে অসঙ্গতি আনতে হয়েছে। বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র দানিকেন প্রচার করছে; পত্রপত্রিকা এ ছবির গুণগান গাইছে। অথচ দর্শকের মনের অগোচরে তার চিন্তারাজ্যে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে এই ফ্যাসিস্ট ছবি।

পরিশেষে জানিয়ে রাখি দস্যুদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল সন্তুর জন্যই। তার অতর্কিত আক্রমণ সম্ভব করে তুলেছিল দস্যুদের পরাজয়। আরও একবার প্রমাণিত হল শিক্ষা নয় ক্যারাটে, মননশীলতা নয় পশুবৃত্তিই শ্রেষ্ঠতর।

১। পৃষ্ঠা ৭৩: নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন।

২। পদার্থ বিজ্ঞান/অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পৃষ্ঠা ২৪৪ দ্রষ্টব্য।

রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বিশ্বসাহিত্যকে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দান করেছে। বাঙালী পাঠক দীর্ঘ দিন থেকেই জুল ভার্ন-এর সাথে পরিচিত। সম্প্রতি 'সমকালীন কলকাতা' পত্রিকা 'সর্বাধিক বিক্রির চাবিকাঠি কুড়িয়ে' নেওয়া পুস্তক প্রণেতাদ্বয়ের মধ্যে জুল ভার্ন অন্যতম। মনে রাখা দরকার তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিন। আর আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। সত্যজিৎ রায়ও বিকৃত করেন নি বিজ্ঞানকে কিংবা ইতিহাসকে। ফলে, কিশোর মনের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলে তাকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, ঠিক একজন 'কমিটেড' শিল্পীর মতই; কারণ তাঁর রহস্যঘন কাহিনীগুলো গড়ে ওঠে নির্ভেজাল কল্পনার জগতে। কিন্তু আলোচ্য ছবিটিতে বাস্তব সত্যের সাথে কাল্পনিক সত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে চিত্র নির্মাতা তপন সিংহ ছোটদের প্রতি করে বসলেন এক মারাত্মক অন্যায়। না হলে এভাবে আলোচনার প্রয়োজন ছিল না।

টালিগঞ্জের সেলুলয়েড

(১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বস্তু বা টিপির পাথা হয়ে আছেন। তবে স্যাণ্ডউইচের মধ্যভাগে সার পদার্থ থাকে এরা সে হিসেবে তার থেকেও নিকৃষ্ট।"

এই জন্যেই ঋত্বিক ঘটক চেয়েছিলেন সমস্ত কিছুর "জাতীয়করণ। সোজাসুজি দেশের সব কটি চিত্রগৃহ রাতারাতি সরকারী সম্পত্তি করে ফেলা এবং সেই সম্পত্তি স্বয়ংচালিত একটা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যেমন হয়েছে আমাদের জীবন বীমার সংস্থার ব্যাপার।"

সম্প্রতি দিনে টেকনিসিয়ান্স এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে একাধিক বক্তা বহুবিধ বক্তব্যের মধ্যে সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। এর মধ্যে প্রথম প্রস্তাব হল সরকারী উদ্যোগে একাধিক চিত্রগৃহ তৈরী করার আশু পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে ছবি মুক্তির সুসম পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা করা যায়। কলকাতায় অন্তত পক্ষে একটা রিলিজ চেনও সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনা গেলে প্রদর্শক, পরিবেশকদের ছবি মুক্তির ব্যাপারে একচেটিয়া কর্তৃত্বকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। বাংলা ছবির জন্য সরকার কি করতে পারেন সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিবরণ সরকার কিছুদিন আগে আমাদের সামনে রেখেছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে শুধু কিছু ছবিকে আর্থিক অনুদানের বিষয়টিই নেই, রয়েছে কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরী তৈরী, স্টুডিও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট বেতনহার, সমস্ত চিত্রগৃহে পশ্চিমবঙ্গে তৈরী ছবির আবশ্যিক প্রদর্শনী, ছোটদের জন্য স্বল্প দৈর্ঘের কাহিনীচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন, ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, আর্ট-ফিল্ম-থিয়েটার তৈরী ইত্যাদি। এছাড়াও সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু চিত্রগৃহ নির্মাণের কর্মসূচীও সরকার নিয়েছেন। এভাবে এখানে তৈরী ছবি দেখানোর জায়গা ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে উঠবে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সিনেমাহলের সংখ্যা মাত্র ৩৮০, শহর কলকাতায় ৮৫টি এবং বাকী ২৯৫টি গোটা রাজ্যে। এর মধ্যে বেশ কিছু হলে নিয়মিতভাবে এবং তার চেয়েও বেশী সংখ্যক হলে মিলিয়ে মিশিয়ে ভিন রাজ্যে তৈরী ছবি দেখানো হয়ে থাকে। কাজেই এরাজ্যে তৈরী ছবির প্রদর্শনের ব্যাপারটাকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে রেখে নতুন নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের সরকারী কর্মসূচী নেওয়া একান্তই জরুরী।

সরকারী অনুদান নিয়ে যাঁরা ছবি করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানেশ মুখার্জী, অমল দত্ত, অশোক দাস, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, নীতিশ মুখার্জী, মঞ্জু দে, যান্ত্রিক, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে বা হয়েছে—উৎপল দত্তের 'ঝড়', মৃণাল সেনের 'পরশুরাম', সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ'। এছাড়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'দূরত্ব' ছবির প্রিন্টের জন্য এবং মৃণাল সেন 'ওকা উরি কথা'র হিন্দী ভার্সানের জন্য অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। বেনেগাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিত্র করবেন। এছাড়া বেশ কিছু শিশু চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে যেমন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত করছেন 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পূর্ণেন্দু পত্রী 'ক্ষীরের পুতুল, শঙ্কর ভট্টাচার্য 'তোতাকাহিনী', মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'মেঘের খেলা', রঞ্জিত ঘোষাল 'ছেলেটা' পট্টভিরামা রেড্ডি 'ডাকঘর' বিজয়া মূলে পাপেট ছবি ইত্যাদি। কাজেই বেশ কিছু কাজ হচ্ছে যা আমাদের আশান্বিত করে তুলছে।

এ রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন সুস্থ চলচ্চিত্রের সপক্ষে যে ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান সরকার এই আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এই সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র আলোচনার সংকলন প্রকাশ এবং লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য। এই রাজ্যে প্রথম একটি ফিল্ম সোসাইটি সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা সরকারী তথ্যচিত্র নির্মাণের সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন সরকারী উৎসবে ফিল্ম সোসাইটিগুলির সক্রিয় সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। কাজেই এটাও একটা নতুন সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে এবং এভাবে সুস্থ চলচ্চিত্রের জন্য যৌথ সংগ্রামের ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

আজ এক ভীষণ অভিভাবকহীন অবস্থা টালিগঞ্জের—চিত্র ভাষা বর্জিত এক আত্মঘাতী কণ্ঠস্বর মর্মভেদী হয়ে সারা দেশের ওপর পড়ছে। তাই এই রাজ্যের মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে কোমর বাঁধতে হবে। সীরিয়াস হতে হবে জীবন সম্পর্কে, শিল্প সম্পর্কে, ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে। যাঁরা ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষভাবে, যাঁরা এই সব নিয়ে ভাবেন, আলোচনা করেন, লেখেন তাঁদের সকলের ভালোবাসাই বাঁচাতে পারে এই রুগ্ন, ক্ষয়ে যাওয়া হৃতগৌরব ইণ্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে। এই ভালোবাসাই শেষ রক্ষাকবচ—যা গোড়া ধরে নাড়া দেবে।

ভবিষ্যত সবসময়েই উজ্বল
সূর্যময় সবক্ষেত্রেই।
কোনো বিশেষ অবস্থাই চিরন্তন নয়।
প্রগতির শক্তি নিশ্চিতভাবেই অগ্রগামী।
বাংলা ছবির জগৎ বিস্তারিত হোক।
বাংলার ছবি গৌরবময় হোক।
বাংলা ছবি জীবনবাদী হোক।
জয় হোক বাংলা ছবির।
দীর্ঘজীবী হোক বাংলা ছবির শিল্পী,
কলাকুশলী, দর্শক এবং পৃষ্ঠপোষকগণ।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৫২

স্থান—নদীর ধারের রাস্তা।

সময়—দিন।

উচ্ছল ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের তালে তালে ক্যামেরা রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

ক্যামেরা বাঁ দিকে ঘুরতেই দেখা যায় দূরে গ্রাম। কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—মুড্ডো। ক্যামেরার দিকে তাকিয়েই সে চমকে ওঠে। পেছন ফিরে সে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫৩

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

কয়েকজন গ্রামের লোক একটা গাছের তলায় বসে পাশা খেলছিল। মুড্ডো চিৎকার করতে করতে বাঁ দিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে।

মুড্ডো : পণ্ডি—ত!…পণ্ডিত আসচে গো!….পণ্ডিত…

গ্রামের লোকগুলো তার কাছে দৌড়ে আসে। অনেকে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মুড্ডোকে সবাই জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে।

কাট্ টু।

টপ্ লং শট। মুড্ডোকে সবাই ঘিরে আছে। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে জবাব দিতে।

কাট্ টু।

(২৫৩ থেকে ২৫৭ দৃশ্য নেই)

দৃশ্য—২৫৮

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—জেল ফেরৎ দেবু পণ্ডিত ফিরছে। এক মুখ দাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে সে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

চণ্ডীমণ্ডপ নতুন চেহারায়। যেন অপরিচিত। বাঁধানো মেঝে, ধবধবে, সাদা থাম, নতুন চালা।

কাট্ টু।

দেবু প্রথমটায় বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। একটু পরে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে প্রণাম করে।

কাট্ টু।

হঠাৎ সে থেমে যায়। ক্যামেরা সরে এসে দেখায় পুরনো শ্বেতপাথরের জায়গায় নতুন পাথর বসানো হয়েছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—শ্বেতপাথর, তাতে লেখা।

সেবক
শ্রী শ্রীহরি ঘোষেন
প্রতিষ্ঠিতং

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু। বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

জুম্ ফরোয়ার্ড শট্ একটু দূরে পুরনো পাথরটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

কাট্ টু।

দেবু এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরটা ছোঁয়।

এই সময় গ্রামের দিক একদল লোক ছুটতে ছুটতে আসে।

—দেবু— !

—পণ্ডিত— !

—দেবু ভাই— !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫৯

স্থান—দেবুর বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

বিলু দরজার কাছে ছুটে আসছে।

বিলু : (মুড্ডোকে) কি হয়েছে রে, এই ?
মুড্ডো : পণ্ডিত ! পণ্ডিত এসেচে সজিব্যান !
বিলু : এঁ্যা ?
মুড্ডো : হাঁ্যা গো,…ঐ শোন ক্যানে !

শঙ্খধ্বনি শোনা যায় দূরে। কি করবে বিলু বুঝতে পারে না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ফুঁপিয়ে ওঠে বিলু।

মুড্ডো : কি হল ?…ও সজিব্যান ?…সজিব্যান ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬০
সময়—দিন।
স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেবু পণ্ডিত গ্রামের দিকে আসছে।

—এসো এসো, এই সব্ গা…ভিড়টা একটু ছাড় ক্যানে !
—কেমন আছ দেবু ভাই ?

দুর্গা ছুটে আসে।

দুর্গা : জামাই পণ্ডিত !

দেবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

জগন : তুমি জেলে থাকতে ও রোজ রাতে ওর মাকে পাঠাত তোমার বাড়ি শুতে
হরেন : As your wife's bodyguard
জগন : এদিকে জানতো, চণ্ডীমণ্ডপ এখন ছিরুর কাচারী !
দেবু : সে কি ?
হরেন : Yes ! and we have also given মুখের মত জবাব। প্রজাসমিতি তৈরি করেছি আমরা।
জগন : গাঁয়ে প্রজাসমিতি তৈরি করেছি আমরা।

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত কিছু একটা দেখে থমকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬১
স্থান—গ্রামের নতুন স্কুল।
সময়—দিন।

লং শটে গ্রামের নতুন স্কুলটি দেখা যায়। ছাত্ররা নতুন মাস্টারমশাইকে নিয়ে বারান্দায় বসে।

স্কুলের সামনে একটা বড় সাইনবোর্ড
শ্রীহরি বিদ্যামন্দির
প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রীহরি ঘোষ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬২
স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।
সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত স্কুলটির দিকে তাকিয়ে আছে।

জগন : চণ্ডীমণ্ডপ থেকে পাঠশালা উঠিয়ে দিয়েছে ছিরু…

এই সময় রাঙাদিদি ছুটে এগিয়ে আসে।

রাঙাদিদি : কৈ রে ?…দেবা কৈ ?…অ দেবা !
দেবু : রাঙাদিদি !

রাঙাদিদির পায়ে নমস্কার করতে যেতেই তাকে সে টেনে তোলে।

রাঙাদিদি : পণ্ডিত না মুণ্ডু !…আয় !…ই ছোঁড়ার কুনো আক্কেল নাই—
দেবু : দাঁড়াও আগে পেন্নাম করি—
রাঙাদিদি : নিকুচি তোর পেন্নাম ! আয় বলছি !…আয় আয়…

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৩
স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।
সময়—দিন।

উঠোনে পড়শী মেয়ে-বৌদের ভিড়।

রাঙাদিদি দেবু পণ্ডিতকে টানতে টানতে নিয়ে আসে।

রাঙাদিদি : এ্যাই !…এ্যাই ছুঁড়িরা !…যা ভাগ্, ভাগ্ সব ইখান থেকে…নইলে এক্ষুণি মুখ ছোটাবো বুল্লাম !…পালা !…

ওরা সবাই বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৪
স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।
সময়—দিন।

রাঙাদিদি দেবু পণ্ডিতকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বিলুর দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বলে—

রাঙাদিদি : লে !

সে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দেবু পণ্ডিত ঘরে ঢোকে, বিলুর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে। পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—বিলু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—বিলু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

দেবু : (হেসে) কি? কি হয়েচে?

কাট্ টু।

বিলুর চোখে জল। দেবুর বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

দেবু : (গভীর স্নেহে) বিলু!

বিলু : এত রোগা হয়ে গ্যাছো কেন?

দেবু বিলুর মাথায় চুম্বন করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৫

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—যতীনের হাতে একটা চারা 'সিজালপিনিয়া পাল্‌চেরিমা'। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

কাট্ টু।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে একটি খাটিয়ায় ছিরু পাল, ভবেশ, হরিশ, দাসজী, গরাই বসে আছে। কাছারির আলোচনা চলছে। কয়েকজন গরীব গ্রামবাসী সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

ছিরু : (একটা ফর্দ পড়তে পড়তে) গনেশ পাল,... ন'টাকা সাত আনা—, ভবহরি মণ্ডল...ছ'টাকা ছ'আনা তিন পয়সা,...অনিরুদ্ধ কম্মকার—

দাসজী : (ফোঁড়ন কেটে) হিসেবের বাইরে...লিখে রাখো তামাদি...

যতীনকে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসতে দেখা যায়।

যতীন : নমস্কার, ঘোষ মশাই!

ছিরু : নমস্কার। হাওয়া খেতে বুঝি!

যতীন : না। (হাতের চারাটা দেখিয়ে) সিজাল-পিনিয়া পাল্‌চেরিমা!

ছিরু : এ্যাঁ?

যতীন : সিজালপিনিয়া পালচেরিমা—

ছিরু পাল ও দাসজী অবাক হয়ে দুজনে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

এই সময় দেখা যায় ভুপাল চৌকিদার ও লোটন পাতু বায়েনকে টানতে টানতে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে আসছে।

ভুপাল : আয়! আয়!...আয় শালা!—

পাতু : ছেড়ে দে বুলছি!...ছেড়ে দে—

ধস্তাধস্তি করতে করতে পাতু নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

পাতু : এ্যাঁ—! খুটোর জোরে ম্যাড়া!...মনিবকে দেখে খু-উ-ব তেজ বাড়িছে,—না?

লোটন : খবদ্দার।

ছিরু : কি হইছে?

ভুপাল : ছ্যাখেন না, সাতদিন হল খবর দিছি, "নবান গেইছে, এবার আয়—চালগুলোন সারা",—তা নিজে তো আসবেই না—পাড়া শুদ্দ্ বিগড়াইছে। বুলছে, ইবার থেকে চণ্ডীমণ্ডপে আর ব্যাগার দিবে না কেউ।

কাট্ টু।

ছিরু : (উঠে দাঁড়ায়) ক্যানে?

কাট্ টু।

পাতু : কেনে দুব মশাই? চণ্ডীমণ্ডপ এখুন কার কি? উ তো এখন আপনার কাচারি!

হঠাৎ ফ্রেমের বাইরে থেকে একটা হাত এসে পাতুকে চড় মারে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল।

কাট্ টু।

দেবু একটু দূর থেকে ফ্রেমে ইন্ করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—যতীন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পাতু, তার চোখ চাপা রাগে যেন জ্বলতে থাকে।

কাট্ টু।

ছিরু : হারামজাদা!

কাট্ টু।

পাতু হাসতে থাকে।

পাতু : হে হে হে...মারেন...কাটেন...আর ফাঁসিই লটকান...ভবী ভোলবার লয়!...পেজা সমিতির হুকুম!

ছিরু : চুপ্ কর্!

হঠাৎ দূরে কাউকে দেখে ছিরু পালের মূর্তি বদলে যায়।

ছিরু : আরে, কখন?...কখ্‌খন?

কাট্ টু।

যতীনকে পাশ কাটিয়ে দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসে।

দেবু : কি ব্যাপার?

যতীন : নমস্কার। আপনিই তো দেবুবাবু।

দেবু : আপনি?

যতীন : আমার নাম যতীন,—যতীন মুখুজ্যে।... আপনাদের গ্রাম শাসন দেখছিলাম।

এই বলে সে ছিরু পালের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল যতীনের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

যতীন : (দেবুকে) আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে, এ্যাঁ?

সে চলে যায়। দেবু পণ্ডিত যতীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পালও যতীনের যাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৬

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—একটা থালার ওপর ৫/৬ কাপ ধূমায়িত চা।

ছিরু পাল একটা চায়ের কাপ তুলে দেবুকে দেয়। তার পাশে খাটিয়ায় বসে আছে ভবেশ, হরিশ, গরাই ও অন্যান্যরা।

ছিরু : শোন খুড়ো, দৈবের বিপাকে তো মেলা কষ্ট পেলে! আর যেন ওসব পথে যেয়ো না বাবা তুমি!...কি দরকার...সংসার রইছে...Home family রইছে...বাড়ীঘরদোর রইছে...তাছাড়া গাঁয়ের যা অবস্থা...তোমার মতো ঠাণ্ডা-মাথা লোকের খুবই দরকার,—বুঝলে না?

ভবেশ : ছিরু তো বলছিল—"খুড়োকে আসতে দাও,—দেখবে জোয্য ব্যাপারে আর কেউ ট্যাঁ-ফোঁটি করবে না।"

হরিশ : খাজনাবৃদ্ধি! আরে বাবা, ধম্মতঃ যা মানবার সে তো মানতেই হবে! বুল্লে তো হবে না!

ভবেশ : তাছাড়া নিজে বুঝদার, পাঁচজনকে মানাইতে পারে...তুমি ছাড়া...হেঁ হেঁ...

ছিরু : ও ইস্কুলের চাকরির লেগে তুমি কিছু ভেবো না। ও ধরো তোমারই রইছে। তুমি শুধু কাল-পরশু একবার থানায় যাবে...ও ছোটবাবুর সঙ্গে সব কথা বলা রইছে। একটা মুচলেকা মতো—

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ছিরু : আর হ্যাঁ, ঐ যে ছোকরা গো...নজরবন্দী...যেন্নী ধারে কাছে ঘেঁষো না যেন—বুঝলে?

দেবু : (হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে) বুঝলাম!

হরিশ : ও কি? হয়ে গেল?

দেবু : হ্যাঁ, চলি!

ছিরু : তাহলে থানার ব্যাপারটা কাল-পরশুর মধ্যেই—

দেবু : না ছিরু, ওসব মুচলেকা-টুচলেকা...আমার দ্বারা আর হবে না—

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে দেবু পণ্ডিত চলে যায়।

ছিরু পাল ও তার দল সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৭

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিতের পাশাপাশি ট্রলি করে ক্যামেরা একটু লো অ্যাঙ্গেলে তাকে অনুসরণ করে। হঠাৎ সে শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

একটু দূরে মাতাল অনিরুদ্ধ এগিয়ে আসতে চাইছে। আর দুর্গা তাকে প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে।

অনিরুদ্ধ : ছাড়্...ছেড়ে দে!...ছেড়ে দে আমাকে! আমি খুন করব শালাকে—

দুর্গা : খবদ্দার! খবদ্দার যেতে পারবে ওর কাছে! আচ্ছা, তুমি কি গো?...তোমার বৌকে সে মা বলে,...পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করে...নরকে থাকতে থাকতে তুমিও নরকের পোকা হয়ে গেলে!

অনিরুদ্ধ : চুপ্!!

দুর্গাকে সে আঘাত করে।

দুর্গা : উঃ!

এই সময় অনিরুদ্ধ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দেবু পণ্ডিতকে দেখতে পায়। টলতে টলতে সে এগিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধ : দেবু ভাই!...দেবু ভাই!...কখন এলে দেবু ভাই?

দেবু : ছিঃ!...ছিঃ অনিভাই!...এ তুমি কি হয়ে গ্যাছো?...ছি ছি ছি—

অনিরুদ্ধকে ফেলে সে চলে যায়।

অনিরুদ্ধ : (একটু বাদে) এ্যাঁ?

কাট্ টু।

(চলবে)

সুস্থ অসুস্থ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

অসুস্থ চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে অপসংস্কৃতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করার জন্য দেশের প্রগতিশীল মানুষ ও রাজ্য সরকার চিন্তা শুরু করেছেন। চলচ্চিত্র সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় শিল্প—যার মাধ্যমে দেশের মানুষের চিন্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন প্রভাবিত হয়। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক জগতের রাষ্ট্রচালকদের এক রকম চিন্তাধারা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যরকম চিন্তাধারা। বর্তমান জগতে আমরা তিন রকমের চলচ্চিত্র দেখতে পাই। ধনতান্ত্রিক জগতের পণ্যচিত্র, সমাজতান্ত্রিক জগতের বাস্তবধর্মী ছবি এবং তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র—যার মধ্যে আমরা বিপ্লবী চলচ্চিত্রের প্রভাব দেখতে পাই।

সারা জগৎব্যাপী ধনতান্ত্রিক জগতের অর্থাৎ হলিউড ছবির প্রাধান্য রয়েছে। যদিও জগৎটা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক—দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এবং সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। বিশ্বের এই তিন ভাগেই নিজের নিজের চলচ্চিত্র শিল্প ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধরন-ধারণ আছে। তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ছবির প্রাধান্য এখনো রয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে হলিউড ছবির বাজার। সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক জগতের ছবির নতুন কিছু দেবার মত আজ আর শক্তি নেই, ধনতন্ত্র আজ বিদায় নেবার পথে। অবক্ষয়ী সংস্কৃতি তার অবলম্বন, তাই দর্শকদের তাৎক্ষণিক আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কী দিতে পারে! চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের প্রধান উদ্দেশ্য, মুনাফা করা। মুনাফার উদ্দেশ্যে তারা দেশে দেশে চলচ্চিত্র ফেরী করে। ওদের ছবি যত জৌলুসদার হবে তত কাটতি। রঙচঙে বাহার দেখে দর্শকরা মজা পায়। কিন্তু বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে কিছু করে না। ওরা শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি দেখায় অথচ ওদের ছবি ব্যবসার জন্য পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, নৃত্য এক উচ্চাঙ্গের শিল্প। কিন্তু বুর্জোয়ারা সেই শিল্প সৌন্দর্যকে বিবস্ত্রা নর্তকীর পায়ের তলায় টেনে নামিয়ে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে আর দর্শকদের রুচি বিকৃত করে মুনাফা করে। নরনারীর সম্পর্ককে যৌনতার ঊর্ধ্বে ওরা ভাবতে পারে না, তাই ওদের ছবিতে যৌনজীবন হল প্রধান কথা। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা মনোরম ভঙ্গীতে পরিবেশন করে। ধর্ম, অলৌকিকতা, ব্যক্তিপূজা, কুসংস্কার ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে ভাগ্যনির্ভর হতে উৎসাহ যোগায়। হতাশাগ্রস্ত জনতার মনে এসব ছবি আফিমের কাজ করে। মানুষকে সমাজবিমুখ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। গত ক'বছর হলিউডের এমন বহু ছবি আমাদের দেশে দেখানো হয়েছে যেগুলি আরো ভয়ঙ্কর—আমাদের দেশের ঐতিহ্য বিরোধী। কিন্তু কংগ্রেসের ইন্দিরা সরকার ওসব ছবি নির্বিঘ্নে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দিয়েছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে ছিল 'উম্যান ইন নাইট' বা বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক দেশে নাইট ক্লাবে নারীদের বিভিন্ন দেহভঙ্গীর স্থূল ছবি—যা কেবল যৌন বাসনা জাগিয়ে তোলে এমন নারীদেহের প্রদর্শনী মাত্র। তার পরে দেখানো হয়েছিল বিশেষ ধরনের গোয়েন্দা ছবি, যাতে সি-আই-এ সম্পর্কে ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল এবং বিশ্ব শান্তির শত্রু হিসাবে দেখানো হতো যে দুটি দেশকে, যাতে দর্শকদের বুঝতে বাকি থাকত না যে, এ দুটি দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন। বিদেশ নীতিতে নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে অবাধে এই ছবির ছাড়পত্র দেওয়া হত। এই সঙ্গে খুন করার নানা পদ্ধতি দেখানো হতো এবং মানুষ হত্যা যে গুরুতর কিছু নয়—এই ধারণা জাগাতো। পরে আরেক ধরনের ছবি দেখান শুরু হল যাতে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সমাজ বিরোধী বা দস্যুদলকে ব্যবহার করা ও তাদের বীর হিসাবে দেখান হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে এই ছবিগুলির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময় মনে হতো এই ছবিগুলি যেন খুন-খারাবির ট্রেনিং দিয়ে গেছে। দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জগতে সমাজবিরোধীরা অংশগ্রহণ করছে। রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে তারা মানুষ খুন করছে। 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি দিয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাড়ি চড়াও হচ্ছে, নারীদের অসম্মান করছে, বলাৎকার করছে। পথে ঘাটে নারীদের সম্মান করার যে চিরাচরিত রীতি-নীতি আমাদের দেশে ছিল, রাতারাতি তাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বেড়ে গেল, যুবক ও ছাত্ররা পর্যন্ত তার শিকার হয়েছিল। ছবিতে যে রকমটি দেখা গিয়েছিল সেই ধরনের খুন, যুবকদের পোষাক সব ছিল একই রকম। তাই প্রশ্ন জেগেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি এই ছবিগুলি আমদানি করা হয়েছিল, যে ছবিগুলি এই রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, এদেশের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চেতনার সর্বনাশ

করেছে? এই ছবিগুলি ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসন রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেমন কেড়ে নিয়েছিল, তেমনি আমাদের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, অপসংস্কৃতির প্রবাহ আমদানি করেছিল। এ কারণে বলছি—যদিও বুর্জোয়ারা মুনাফার জন্য চলচ্চিত্র ব্যবসা করে, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে অর্থাৎ শোষণ করার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তারা চলচ্চিত্র এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকৃতি আনে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। গতানুগতিকতা মানতে চান না এমন মানুষও থাকেন—যাঁরা শিল্প সংস্কৃতিকে মানুষের কল্যাণের উপচার মনে করেন। যেমন—আমেরিকায় গ্রিফিথ 'ইনটলারেন্স'-এর মত ছবি করেছিলেন বুর্জোয়া মানবিকতার মুখোস খুলে দিয়ে। সে বহু বছর আগে ১৯১৬ সালে। চার্লি চ্যাপলিন সারাটা জীবন একটা আদর্শবোধ নিয়ে ছবি করেছেন। তার জন্য চ্যাপলিনকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে মানবতাকে, মহৎ আদর্শকে তিনি যে-ভাবে শিল্প-সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন, যে ভাবে শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। চলচ্চিত্র, নাটক ও সাহিত্য সুস্থ সমাজ গঠনে সাহায্য করে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস জাগায়, সুস্থ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উপরোক্ত ভাবাদর্শে অনেক ভাল ছবি তৈরি হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবী মানবিক আদর্শ নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র কেবল পণ্যচিত্র নয়—তা আনন্দময় গণশিক্ষার মাধ্যম। চলচ্চিত্র শিল্প সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জগতের বিরাট এক অংশের মানুষ নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে রূপদান করেছে। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির নানা বিভাগে এই নতুন আদর্শের বিকাশ ঘটেছে। নরনারীর প্রেম ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এসব ছবিতেও প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। কিন্তু প্রেম সেখানে নেহাৎ যৌন কামনা ও দৈহিক মিলন দৃশ্যে অবনমিত নয়। যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে তা ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি। সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের পরে। রুশ বিপ্লবের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী এবং নতুন সমাজ সংগঠনের ক্রিয়া-পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক ছবির বিস্তার ঘটেছে। গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সভ্যতার বিকাশের পথে বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দ্রুত চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠেছে এবং প্রধানত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবী চলচ্চিত্রের পথ অনুসরণ করছে। কিউবা, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের ছবিগুলি মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় এবং বিপ্লবের দেশ গঠনের সমস্যা ও সাফল্যকে প্রকাশ করেছে। এসব ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি তাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কথা এবং কি অসাধারণ কৃতিত্বে দ্রুতগতিতে তাঁরা নতুন এক সমাজ গড়ে তুলছেন। সেই সমাজ নতুন মানব সভ্যতার বিজয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ এখনো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত নয়। সে কারণে সে-সব দেশের ছবি মুক্ত দুনিয়ার বার্তাবাহী বা আঙ্গিক সৌন্দর্যে সমভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন কালে। স্বভাবতই এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প হলিউড ও ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের প্রভাবে বড় হয়েছে। সেই প্রভাব থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী ত্রিশ বছরেও মুক্ত হতে পারেনি। যদিও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সমতা রেখে কয়েকজন চলচ্চিত্র স্রষ্টা ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ছবিতে দেশ ও মানুষ প্রতিফলিত হয়েছে, সমস্যা ও স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। কলকাতায় নিউথিয়েটার্স, বোম্বাইতে মেহবুব, ভি. শান্তারাম প্রভৃতির ছবি জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন উদ্যোগ। স্বাধীনতার পরে সত্যিকার জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বাংলায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে ছবি করার পথপ্রদর্শক ঋত্বিক ঘটক। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বাঙালীর জাতীয় চেতনার সঙ্গে বাস্তববাদ ও নন্দনতত্ত্বের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা গেছে, যা বাংলা ছবিকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। বর্তমানে ভারত চলচ্চিত্র নির্মাণে শীর্ষ স্থানে রয়েছে এবং বোম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের কোন জাতীয় রূপ নেই, সেগুলি হলিউড বা ধনতান্ত্রিক দেশের অন্ধ অনুকরণ। দেশ, মানুষের জীবন, সমস্যা স্বপ্ন বা দেশের অগ্রগতির কোনরূপ প্রকাশ এসব ছবিতে নেই, থাকলেও তা কৃত্রিমতায় ভরা। মানুষকে সংগ্রাম-বিমুখ করে তোলা, শোষকশ্রেণীর প্রতি মোহ সৃষ্টি করা, ভাগ্য-নির্ভর করা এবং বিকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে অধিকাংশ হিন্দী ছবি। এসব ছবি যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে, স্বদেশ-চেতনাহীন স্থূলজীবন-পথে টেনে নামাচ্ছে। সন্ত্রাসের সমর্থে

স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই হিন্দী ছবিগুলির ভূমিকা বড় কম ছিল না।

যদিও বাংলা চলচ্চিত্র সুস্থ চিন্তা ও আঙ্গিকের সুস্থ ঐতিহ্যের দাবী করে, কিন্তু অধিকাংশ ছবির দেশ পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। বাংলায় সংলাপ ও পোশাক পরিচ্ছদে বাঙালী হলেও এই ছবিগুলিতে বাঙালীর জীবনবোধের বলিষ্ঠতা থাকে না। এমন সব কাহিনী এসব ছবির অবলম্বন যা সাজানো, জীবনবোধ, ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যার তেমন সঙ্গতি নেই। তাই এসব ছবি বোম্বাইয়েরও হয় না—আবার বাঙালীরও হয় না। সুতরাং সমাজজীবনে বা সুস্থ সমাজ গঠনে ও মানবিকতা বিকাশে এসব ছবির ভূমিকা কী থাকতে পারে? বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাস পরাজিত হয়েছে—গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের সহায়ক শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছে এবং কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ত্রিশ বছরে রাজ্য সরকার আর চলচ্চিত্র শিল্প এত কাছাকাছি আসেনি। চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে বাংলা ছবিকে যথার্থ জাতীয় চলচ্চিত্রে উন্নীত করা, হলিউড বা বোম্বাইয়ের অবক্ষয়ী চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার জাতীয় ছবি তৈরি করা। বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর ঐতিহ্য ও দেশপ্রেম, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, আমাদের দেশের মানুষের সুস্থ জীবনবোধকে চলচ্চিত্র-কাহিনীতে রূপ দেবার সময় উপস্থিত হয়েছে। সমাজ গঠনে চলচ্চিত্রের যে ভূমিকা আছে তা যথার্থভাবে পালন করা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য, যাতে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশাভিমান জাগিয়ে তোলা যায়। দেশপ্রেম ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে অনুপ্রাণিত চিত্রনির্মাতাদের আজ এগিয়ে আসতে হবে—যাতে তাঁরা সোস্যাল ইঞ্জিনীয়ার বা কারিগরের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততঃপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নূতন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে যোগাযোগ করুন** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ ॥ ফোন: ২৩-৭৯১১)।

CHITRA-BIKSHAN
Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 November 1979 Vol. 13 No. 2

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12.
Cover : De-Luxe Printers.

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
ডিসেম্বর, '৭৯

চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও চলচ্চিত্রশিল্প

বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্প এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বহুবিধ সমস্যায় আক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকট থেকে চলচ্চিত্রশিল্পকে মুক্ত করার জন্য কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা কার্যকরী পরিকল্পনা এর আগে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি কার্য্যকলাপ ব্যতিরেকে চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মত।

সেই ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী' ছবি নির্মাণে প্রত্যক্ষ এবং আর্থিক সহায়তা দেয়া ছাড়া পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার সমূহ চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য কোন কিছু করেছেন কিনা সন্দেহ। শেষ কয়েক বছর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেশ কিছু ছবিকে করমুক্ত করা এবং সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে 'সোনার কেল্লা' ও তরুণ মজুমদারকে দিয়ে 'গণদেবতা' (ছবিটি অবশ্য বর্তমান সরকারের সময় শেষ হয়) ছবি করানো ছাড়া চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কিত কোন কাজকর্ম কংগ্রেসী সরকারগুলির ছিল কিনা সন্দেহ।

১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সুস্পষ্ট কার্যক্রম নিয়ে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সরকারকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে খারিজ করে দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বিপুল জনসমর্থনে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকটের গভীরতা বুঝতে চেয়েছেন সততার সঙ্গে এবং এই শিল্প-সম্পর্কিত সামগ্রিক জটিল সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছেন সাহসের সঙ্গে।

ছবির জগতে শিল্পবোধের নিদারুণ অভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসছিল তা মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার প্রথমেই বেশ কিছু ছবি তৈরীর কাজে হাত দিলেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ও উৎপল দত্তের 'ঝড়', আরো দুটি ছবির কাজও অনেক দূর এগিয়ে গেছে—ছবি দুটি হল সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ', শ্যাম বেনেগালও রাজ্য সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করবেন. সে ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হওয়ার পথে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঁচিশজন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে ছবির জন্য সরাসরি অনুদান দিচ্ছেন যার অর্থমূল্য সাদাকালো ছবির জন্য ১ লক্ষ এবং রঙীন ছবির জন্য ২ লক্ষ টাকা। ছবিগুলি এখন নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে। সাহায্যপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অশোক দাস, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও শঙ্কর ভট্টাচার্য। সরকারী অনুদান নিয়ে শুধু এখানকার চলচ্চিত্রকাররাই ছবি করছেন না, ছবি করছেন দিল্লীর কবিতা নাগপাল, বাঙ্গালোরের এম, এস, সথ্যু।

সরকারের পক্ষ থেকে সহজতম শর্তে ঋণ দেয়া হয়েছে মৃণাল সেনকে 'ওকা উরি কথা' ছবির হিন্দী ডাবিং করার জন্য এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে 'দূরত্ব' ছবির ইংলিশ সাব-টাইটেলিং করার জন্য।

তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের নিদর্শন রেখেছেন, বিশেষ করে বিষয় নির্বাচনে এই প্রথম সরকারী তথ্যচিত্র জনজীবনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র এই আড়াই বছরে তৈরী হয়েছে—যেমন 'জরুরী অবস্থার দুঃস্বপ্ন', 'নিরক্ষরতার অভিশাপ', 'বেকার যুবকের আত্মকথা', 'কুলি সে মজদুর'। এছাড়া ছ-টি স্বল্পদৈর্ঘের ছবি সরকার কিনেছেন। নিয়মিত নিউজরীলও তৈরী হয়ে চলেছে উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীকে তুলে ধরে। স্বল্পদৈর্ঘের ছবির ব্যাপারে ফিল্মস্ ডিভিসন গঠনের পরিকল্পনা চলছে, ১৬ মি, মি, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে সরকারী তরফে।

শিশুচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যক্রম রীতিমত যুগান্তকারী, আটটি মাঝারি মাপের ছবি তৈরী হচ্ছে যার মধ্যে কয়েকটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শিশুচিত্র-প্রেক্ষাগার নির্মাণের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেছেন।

সরকারের উদ্যোগে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরী নির্মাণের উদ্যোগ-আয়োজন প্রস্তুতির পর্বে। সরকারী অধিগৃহীত নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে, সম্প্রতি টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওটিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা শহরে এবং বিশেষ করে মফঃস্বলে চিত্রগৃহ নির্মাণে ব্যাপক আর্থিক সহযোগিতার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার একটি আর্ট ফিল্ম-থিয়েটার কমপ্লেক্স গঠনের কাজও শুরু করছেন।

সবমিলিয়ে যথেষ্ট আশাপ্রদ কর্মকাণ্ডের এক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন—একমাত্র এই কর্মসূচীর সাফল্যই পশ্চিমবাংলার মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে এই কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)— এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে--এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১) **যোগাযোগ করুন।**

হলিউডের এক বিস্মৃতপ্রায় বামপন্থী চলচ্চিত্রকার ঃ লিউস্ মাইলস্টোন

রজত রায়

"একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে আমার কাজ হওয়া উচিত সৃষ্টি করে যাওয়া। তবুও আজকের দিনে চলচ্চিত্র নির্মাণের নান্দনিক নীতিগুলি ছাড়াও আমাকে অবশ্যই আরও অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হবে।— সুতরাং একজন পরিচালক হিসেবে আমাকে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের কারিগরী প্রকৌশল এবং শিল্পের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে না, যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয় সেই পরিবেশ সম্বন্ধেও সজাগ আগ্রহ থাকাটা আমার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। হলিউডের পরিকল্পিত হিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা অবশ্যই আমাকে করতে হবে।" ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উপরের এই কথাগুলি যিনি বলেছিলেন তিনি হলেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকের হলিউডে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বামপন্থী চলচ্চিত্রকার (সংখ্যায় এঁরা প্রায় এগারজন) মোটামুটি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদেরই একজন,—লিউস্ মাইলস্টোন (১৮৯৫-)।

হলিউডের প্রযোজক-অধ্যুষিত এবং বড় বড় পুঁজিবাদী সংস্থা নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র উৎপাদনের রাজত্বে বাস করেও লিউস্ মাইলস্টোন কোনমতেই প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বাধীন শিল্পীসত্তাকে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি টিঁকিয়ে রেখেছিলেন যার জন্য হলিউডের গতানুগতিক ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র উৎপাদনের ধারায় লিউস্ মাইলস্টোন কিছুটা ব্যতিক্রম, এ কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

১৯২৫ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই সাঁইত্রিশ বছরে তিনি বাইশটিরও বেশী পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তুলেছেন যার ভেতরে গোড়াকার চারটি ছবি হল নির্বাক এবং বাদবাকি আঠারোটি ছবি সবাক। তা ছাড়া ১৯৪১ সালে বিখ্যাত মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্সের সঙ্গে একসাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্রও তিনি তৈরী করেছিলেন, যার নাম 'আওয়ার রাশিয়ান ফ্রন্ট'।

আজকের দিনে লিউস্ মাইলস্টোনের ছবি বিশেষ কোথাও আর দেখানো হয় না। তাঁর সর্বশেষ ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত, ১৯৮০ সালের মার্চ মাসেও পঁচাশি বছর বয়সের এই প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারটি জীবিত আছেন, যদিও গত আঠারো বছর তাঁর কর্মজীবনকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়ই বলা যায়।

১৮৯৫ সালে লিউস্ মাইলস্টোনের জন্ম হয় রাশিয়ায়। তাঁর কৈশোর ও ছাত্রজীবন রাশিয়াতেই কাটে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সম্পাদনার ক্ষেত্রে, প্রাথমিক শিক্ষাও বলতে গেলে রাশিয়াতেই। চিত্র সম্পাদনার কাজে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করবার পর ১৯১৯ সালের শেষ দিকে, চব্বিশ বছর বয়সে তিনি হলিউডে চলে আসেন এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। বেশ কিছু নির্বাক ছবিতে সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার পর পরিচালক হিসেবে তিনি প্রথম যে নির্বাক ছবিটি তোলেন তার নাম 'দি কেভ ম্যান' (১৯২৫)। পরবর্তী ছবি 'টু অ্যারাবিয়ান নাইট্স্' একটি পরিচ্ছন্ন কমেডি চিত্র। প্রথম দিককার এই দুটি ছবিতেই সুনির্বাচিত ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ও হাফ লাইটিং-এর ব্যবহারে মাইলস্টোনের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। ঘটনার নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও তাঁর ক্ষমতা অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তৃতীয় নির্বাক ছবি 'দি র‍্যাকেট' (১৯২৮) বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোলা একটি গ্যাংস্টার ছবি। পরবর্তী কালে আমেরিকায় যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাংস্টার ছবি তোলা হয়েছে এটিকে তারই এক পূর্বসূরী বলা চলে। বারলেট কোরম্যাক নামে একজন সাংবাদিকের লেখা একটি জনপ্রিয় নাটকের কাহিনী নিয়ে এই সামাজিক সমালোচনার ছবিটি তৈরী হয়েছিল। রাজনৈতিক স্তর, প্রশাসনিক স্তর এবং পুলিশের ওপর মহল—সমাজের এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যে প্রচণ্ড দুর্নীতি এবং শঠতা বিরাজমান তাকে এই ছবিতে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছিল। কাহিনীর ঘটনাস্থল শিকাগো শহর এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মদের চোরা চালানকারী একটি গুণ্ডা। এই গুণ্ডাটি রাজনৈতিক নেতা এবং বড় বড় আমলাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে, কেন না ভোটের জন্য নেতাদের এই গুণ্ডাটিরই শরণাপন্ন হতে হয়। গুণ্ডাটি প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে শহরের সর্বত্র চোলাই করা মদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। একবার পুলিশের হাতে সে ধরাও পড়ে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতার সুপারিশে সে মুক্তি পেয়ে যায়। পুলিশেরই একজন সৎ অফিসার গুণ্ডাটির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হন না। একবার এই সমাজবিরোধী লোকটি একজন পুলিশ কর্মচারীকে খুনও করে এবং নিরাপদে গা ঢাকা দিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু সৎ পুলিশ অফিসারটি তাকে একদিন ঠিকই ধরে ফেলেন এবং গুলি করে তাকে হত্যা করেন। কারণ তিনি জানতেন যে এই সমাজে আইনের বিচার একটি প্রহসন মাত্র। বিচারালয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং প্রভাবশালী নেতার হস্তক্ষেপে সে ঠিকই মুক্তি পেয়ে যাবে। শিকাগো শহরেরই মেয়রকে এই ছবিতে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং বড় বড় আমলাদেরও দেখানো হয়েছিল অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ এবং

ঘুষখোর হিসেবে। স্বভাবতই ছবিটি তোলা শেষ হয়ে যাবার পর এটি সেন্সর কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ডালাস এবং পোর্টল্যাণ্ডের সেন্সর ছবিটিকে প্রচণ্ড কাটাকুটি করে তবে ছাড়পত্র দেন। গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে ভোটপ্রার্থী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের গোপন আঁতাত প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের গাত্রদাহের কারণ হয়। পুলিশকে ঘুষ দিয়েই যে পুঁজিবাদী সমাজে সব কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় এই বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে যেমন রুষ্ট করে তোলে, তেমনই তা সাধারণ দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৫২ সালে আমেরিকাতেই ছবিটি আর একবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

চতুর্থ ও শেষ নির্বাক ছবি 'বিট্রেয়াল'-এ (১৯২৯) অভিনয় করেছিলেন সেকালের দিনের বিখ্যাত অভিনেতাদ্বয় এমিল জ্যানিংস্ এবং গ্যারি কুপার।

১৯৩০ সালে 'নিউ ইয়র্ক নাইটস্' নামে প্রথম যে সবাক ছবিটি মাইলস্টোন তোলেন তাতে ছবিতে শব্দের ব্যবহারের বিষয়ে তিনি বেশ ভালো রকমেরই নিপুণতা দেখান। ঐ একই বছরে তোলা হয় তাঁর জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' (১৯৩০)। এরিখ মারিয়া রেমার্কের একটি অতি বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে তোলা আড়াই ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের এই ছবিটির আবেদন যুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্যে সমৃদ্ধ। মহৎ মানবিক আবেদনের এই চলচ্চিত্রটি তার বাস্তবতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্য মূল উপন্যাসটির মতোই আজও একটি স্মরণীয় সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ছবির মূল চরিত্রগুলি সকলেই জার্মান। স্কুলের সাতটি বালককে তাদের বিদ্যালয় থেকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশপ্রেমের উত্তেজনায় তাদের উদ্দীপিত করে তোলা হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ট্রেঞ্চে বাস করবার ভয়াবহ পরিচয় লাভ করবার পর ছেলে সাতটির মন থেকে যুদ্ধের যাথার্থ্য সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন বাদে বাকি ছয়টি ছেলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালো। ট্রেঞ্চ যুদ্ধের যথাযথ এবং বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের জন্য ছবিটি ব্যাপকভাবে দর্শকমহলে সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই ছবি দেখেই সাধারণ দর্শকরা সর্বপ্রথম একটি ধারণা করতে পারেন যে এক একটি ট্রেঞ্চে কী নিষ্ঠুর অমানবিক পরিবেশের মধ্যে সৈন্যদের দিন কাটাতে হয়।

ইউনিভার্সাল পিকচার্স প্রযোজিত ব্যয়বহুল এই ছবিটিতে লিউস্ মাইলস্টোন কাজ করবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন প্রচুর এবং সেই স্বাধীনতার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। বহু একর জমির উপর যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে তুলে যেভাবে যুদ্ধের দৃশ্য তোলা হয়েছিল তা এতই বাস্তবানুগ এবং যথাযথ হয়েছিল যে অনেক তথ্যচিত্রেও বাস্তবের এমন নিপুণ প্রতিরূপ দেখা যায় না। জার্মানীতে নাৎসীরা তখনও ক্ষমতায় আসেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ছবিটির বিরুদ্ধে সেখানে তারা এমন প্রবল আন্দোলন এবং বিক্ষোভ শুরু করে দেয় যে সে দেশে ছবিটি দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন।

একটি মাত্র সাউণ্ড ট্র্যাকের সাহায্যে শব্দগ্রহণের দ্বারা এই ছবিতে ধ্বনি ও সংলাপ ব্যবহারে যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায় তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল যে আধুনিক কালের যে কোন সবাক ছবিতেই সাধারণত চার, পাঁচ বা ততোধিক সাউণ্ড ট্র্যাকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালে যান্ত্রিক কলাকৌশলের ততটা উন্নতি হয়নি বলেই মাইলস্টোনকে বাধ্য হয়ে মাত্র একটি ট্র্যাকের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুসম্পাদিত আকারে শব্দ ও সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এই ছবিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রপরিচালকের মর্যাদা এনে দেয়। একটি দৃশ্যের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। একটি দীর্ঘ ট্র্যাকিং শট্ শুরু হয় রাস্তার উপর জার্মান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ট্রেনিং এবং মিলিটারি ব্যাণ্ডের দৃশ্য দিয়ে। ক্যামেরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ঢুকে একটি স্কুলের ক্লাসরুমে প্রবেশ করে। সেখানে দেখা যায় একজন শিক্ষক উত্তেজিত ভাষণের মাধ্যমে ছাত্রদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্দীপিত করে তুলছেন। ক্যামেরা ক্লাসরুমের পেছন থেকে গোটা দৃশ্যটি একটি লং শটে দেখাতে থাকে। সেকালের দিনের কোন সবাক ছবিতে মাইক্রোফোন সহ ক্যামেরাকে নাড়াতে কোন পরিচালক ভয় পেতেন। তখনকার সময়ে মাইক্রোফোনকে বিশেষ নড়াচড়া করানো যেত না বলে ছবির দৃশ্যগুলিও বেশীর ভাগই হত নিশ্চল। সেক্ষেত্রে সবাক ছবির গোড়ার যুগেই ট্র্যাকিং শটের ব্যবহার করে লিউস্ মাইলস্টোন বেশ কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই দৃশ্যে ক্যামেরা যখন ধীরে ধীরে ক্লাস ঘরে প্রবেশ করে তখনও মাইক্রোফোনটি রয়ে যায় রাস্তার উপরেই। যার ফলে কেবলমাত্র মিলিটারি ব্যাণ্ডের বাজনাই শোনা যায়, শিক্ষকটির কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অশ্রুতই থাকে। আজকের দিনে হলে বিভিন্ন সাউণ্ড ট্র্যাকের সাহায্যে এই দৃশ্যটিতে মিলিটারি ব্যাণ্ডের আওয়াজের সঙ্গে শিক্ষকটির উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের যথাযথ সংমিশ্রণ করে তাকে আরও বাস্তবধর্মী করে তোলা যেত।

ছবিটিতে যুদ্ধের দৃশ্যের আওয়াজও তোলা হয়েছিল অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে। সেকালের দিনের গতিহীন দৃশ্যাবলীর চিত্রায়িত নাটকের যুগে 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' ছবির ক্যামেরার সচলতা এবং জটিল সম্পাদনা রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ছবির শেষের সিকোয়েন্সটি অসাধারণ চিত্রভাষায় সমৃদ্ধ। সেখানে দেখা যায় পল নামে জার্মান সৈনিকটি একজন ফরাসী স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়। একটি শট্-এ দেখা যায় স্নাইপারটি সতর্কভাবে তার রাইফেল তাক করে চলেছে। পরের শটে দেখা যায় পলের একটি হাত একটি প্রজাপতি ধরবার চেষ্টা করছে। হাতটি যে পলেরই তা বোঝা যায় এই কারণে যে আমরা আগেই জেনেছি যে পল হচ্ছে একজন প্রজাপতি-সংগ্রাহক। স্নাইপারের রাইফেল এবং পলের হাত ও প্রজাপতি দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে দর্শকের উৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে তোলা হয়। তারপরেই একটি

গুলির আওয়াজ। হাতটি কাঁপতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পড়ে যায়। পলের গোটা শরীরটা না দেখিয়ে কেবলমাত্র তার হাতের গতি এবং স্থির নিশ্চলতার মাধ্যমে তার মৃত্যুর দৃশ্যকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই দৃশ্যটির ইঙ্গিতধর্মিতার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবির একটি দৃশ্যের তুলনা করেছেন র‍্যাল্‌ফ স্টিফেনসন এবং জঁা দেব্রিক্স তাঁদের 'দি সিনেমা অ্যাজ আর্ট' বইটিতে। 'মহানগর'-এর বৃদ্ধ হেডমাস্টারটি এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন একটি বাড়ির তিন তলায়। বৃদ্ধটি একটি লাঠি হাতে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। যখন তিনি সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপটিতে গিয়ে পৌঁছেছেন তখনই কাট্ করে দেখানো হয় যে কোন একজন লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে আসছেন। পর মুহূর্তেই লোকটির চোখমুখে এক আশঙ্কার ভাব ফুটে ওঠে। তারপরে নিচু থেকে তোলা একটি শটে দেখা যায় যে বৃদ্ধের লাঠিটি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমরা কখনই বৃদ্ধ মানুষটিকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখি না, কিন্তু তাঁর এই দুর্ঘটনার দৃশ্যটি ইঙ্গিতের সাহায্যে দেখানো হয়েছে বলেই সেটা আরও বেশী শক্তিশালী ও শিল্পসম্মত হয়েছে।

মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবিটিও একটি বিখ্যাত সৃষ্টি—'দি ফ্রন্ট পেজ' (১৯৩১)। পৌনে দু ঘণ্টার এই সবাক ছবিটি বেন হেচ্ট এবং চার্লস ম্যাক আর্থার লিখিত একটি নাটকের কাহিনীকে ভিত্তি করে নির্মিত। এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছিলেন বার্টলেট কোরম্যাক এবং চার্লস লেডারার। অসাধু রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের জীবনের ঘটনা নিয়ে এই ছবিটির কাহিনীর বিস্তার। যদিও ছবির প্রধান চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই সাংবাদিক তবুও এই ছবিটির ঘটনাস্থল কোন সংবাদপত্রের অফিস ঘর নয়, তা হচ্ছে একটি ফৌজদারী আদালতের কক্ষ, যেখানে একটি খুনের মামলাকে কেন্দ্র করে একদল সাংবাদিক জড় হয়েছেন। একজন নৈরাজ্যবাদী বন্দী যাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুর জন্য দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাঁর বীরত্বের কাহিনী এবং তাঁর এই মামলাকে কেন্দ্র করে যতগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থানকে এই ছবিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবিতে মাইলস্টোনের পরিচালনা রীতির উপর সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার পুদোভকিনের প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুদোভকিনের রীতিতেই কাহিনী বলার চাইতেও চরিত্রগুলির সঙ্গে তাদের পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক স্থাপনের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪০ সালে এই একই কাহিনীকে নিয়েই আর একটি ভিন্ন নামের ছবি উঠেছিল, 'হিজ গার্ল ফ্রাইডে'। অবশ্য তাতে মূল চরিত্র পুরুষ সাংবাদিকটিকে স্ত্রী চরিত্রে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছিল। আরও পরবর্তীকালে, ১৯৭৪ সালে 'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবিটি আরো একবার পুনর্নির্মিত হয় বিল্লি ওয়াইল্ডারের পরিচালনায়। তাতে সাংবাদিকের চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা জ্যাক লেমন।

মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবি 'রেইন' (১৯৩২)। এতে নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ড। এই সময়েই পর পর দুটি ছবি তোলা হয়—'প্যারিস ইন স্প্রিঙ্' এবং 'এনিথিং গোস্'। কিন্তু এগুলির একটিও কোন উল্লেখযোগ্য কাজ নয়। ১৯৩৩ সালে তোলা হয় নিগ্রোদের নিয়ে একটি সঙ্গীত প্রধান ছবি 'হাল্লেলুজা, আই অ্যাম এ ব্যাম'। বেন হেচ্ট রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তোলা এই ছবিটির মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের বাণী প্রচারের কিছু সচেতন চেষ্টা ছিল। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসেবে ছবিটি বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

পরের বছর তোলা হল 'দি ক্যাপটেন হেটস্ দি সী' (১৯৩৪)। প্রমোদবিলাসীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক এই ছবিটি জন গিলবার্টের স্মরণীয় অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। 'দি জেনারেল ডায়েড অ্যাট ডন' (১৯৩৬) বামপন্থী গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেট্স্-এর লেখা একটি প্রগতিশীল নাটকের চিত্ররূপ। ওডেট্স্ ছিলেন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাঁর এই নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল বিস্তর সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমেরিকানদের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার পাশাপাশি এতে তৎকালীন চীন দেশের অধিবাসীদের একাংশের চতুরতা ও শয়তানির কিছু কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক চীনা সরকার এই ছবিটিকে চীন দেশে দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং প্রযোজক প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট পিকচার্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। ১৯৪২ সালে 'দি জেনারেল ডায়েড অ্যাট ডন'কে আবার চীন দেশে দেখাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেবারেও তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে ছবিটি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। পরিবেশক সংস্থা ১৯৪৯ সালে তৃতীয়বার চেষ্টা করেন চীনে ছবিটির মুক্তি দিতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তরফ থেকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবার নিজে থেকেই আপত্তি জানান। তাঁরা মনে করেন যে এই ধরনের ছবি নাকি জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতির সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে পারে।

এর পরে লিউস্ মাইলস্টোন যে ছবিটি পরিচালনা করেন সেটি হল জন স্টেইনবেক রচিত জনপ্রিয় একটি কাহিনী অবলম্বনে তোলা 'অফ মাইস অ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৯)। কিছু মানুষের আর্থিক লোভ ও শোষণের লালসার বিরুদ্ধে এতে সমগ্র মানবজাতির বিবেককে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তখন মাইলস্টোন বিখ্যাত মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্সের সঙ্গে যুগ্মভাবে পরিচালনা করেন একটি প্রামাণ্য চিত্র 'আওয়ার রাশিয়ান ফ্রন্ট' (১৯৪১)। ১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন

সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাইলস্টোন এবং ইভেন্স যৌথভাবে এই ছবিটি তোলা শুরু করে দেন। আমেরিকার 'রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটি'র প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় বারো চোদ্দ জন সোভিয়েত ক্যামেরাম্যানের একটি দল এই তথ্যচিত্রটির ছবিগুলি তুলেছিলেন। এতে বিখ্যাত সোভিয়েত সুরকার সোস্টাকোভিচ-এর সঙ্গীত থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কণ্ঠ সঙ্গীতগুলি গেয়েছিলেন রাশিয়ার রেড আর্মি কোরাস-এর দল। তথ্যচিত্রটি সম্পাদনার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময়েই জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার-এ বোমা বর্ষণ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তোলা মাইলস্টোন পরিচালিত তিনটি যুদ্ধ-বিষয়ক ছবি—'এজ অফ ডার্কনেস' (১৯৪৩), 'দি নর্থ স্টার' (১৯৪৪), 'দি পারপেল হার্ট' (১৯৪৪)—বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নয়, বরং এই ছবি তিনটি গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি—এ কথাই বলা চলে। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরে মাইলস্টোন যে ছবিটি তোলেন তাকে বরং কিছুটা ভাল কাজ বলা যেতে পারে। 'এ ওয়াক ইন দি সান' (১৯৪৫) ছবিতে সৈনিক চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ বাস্তবানুগ এবং প্রশংসার যোগ্য। এই ছবির কিছু কিছু অংশ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। পরের ছবি 'দি স্ট্রেঞ্জ লাভ অফ মার্থা ইভেরস্' (১৯৪৬) রবার্ট রোসেন রচিত চিত্রনাট্য নিয়ে নির্মিত।

আঠারো বছরের ব্যবধানে, ১৯৪৮ সালে মাইলস্টোন আবার ফিরে আসেন এরিথ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসে, তোলা হয় 'আর্ক অফ ট্রায়াম্ফ' (১৯৪৮)। এই ছবির পরেই মাইলস্টোনের পরিচালক জীবনে প্রায় এক যুগের বিরতি। এই সময়ে হলিউডের প্রযোজক সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর চলতে থাকে তুমুল বিরোধ। ইতিমধ্যে মার্কিন মুলুকে 'হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস্ কমিটি' চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যেও কমিউনিস্ট সন্দেহে জোর সন্ত্রাস শুরু করে দেয়। ফলে সৃজনশীল শিল্পীদের মধ্যে নেমে আসে নিষ্ক্রিয়তা ও কিছুটা ঔদাসীন্য। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ কোন প্রগতিশীল ছবি তৈরীর পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্য আরো অনেক চলচ্চিত্র কর্মীর মতো লিউস্ মাইলস্টোনের উপরেও এই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। এই সময়কার হলিউডের চলচ্চিত্র জগতে যে সংকটের কালো ছায়া নেমে আসে ১৯৪৮ সালে রচিত 'এক রুগ্ন দৈত্যের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা' (ফার্স্ট এইড ফর এ সিক জায়ান্ট) নামে একটি প্রবন্ধে মাইলস্টোন তার সুন্দর আলোচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল, যা এই পরিচালকের মানসিকতার পরিচয় পেতে অনেকখানি সাহায্য করবে।—

"ছবিতে কোন 'বাণী' থাকা চলবে না।...ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। হলিউডে মোট বারোশ অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে এখন মাত্র তিনশ সত্তর জন অভিনেতা স্টুডিওগুলির সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ। গত তিন বছরে চিত্রনাট্য রচনার কাজ করেছেন এমন প্রায় আঠারোশ লেখকের মধ্যে এখন মাত্র দুশো পঞ্চাশ জন কর্মে নিযুক্ত এবং তাঁদের ভেতরেও পঞ্চাশ জন দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে কাজ করছেন। হলিউড শহরে বেকার বীমার জন্য যত আবেদনকারী আছেন তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই হলেন স্টুডিওগুলির কর্মী। পরিচালকদের মধ্যেও বেকারের তালিকাটি সুদীর্ঘ।...হলিউডে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত এই হচ্ছে তাঁদের আজকের অবস্থা।

অতীতে হলিউডের যখন মোটামুটি সুদিন ছিল তখন সমস্ত সৃজনশীল শিল্পী—পরিচালক, লেখক, অভিনেতা, শিল্প নির্দেশক—একটা ছবি করার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করতেন। তখন আমাদের 'ফার্স্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট', ঝুঁকি বীমা, প্রধান কেশ প্রসাধকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, আণবিক বোমার গোপনীয়তা ফাঁস, অথবা নিউ জার্সির কংগ্রেস ম্যানদের বিষয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আদপেই মাথা ঘামাতে হত না। আমরা মনে করতাম যে সফল ছবি তুলতে গেলে সমস্ত কারিগরী শাখাগুলি—গিল্ড, ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ফ্রন্ট অফিস-এর মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা দরকার।...

আজকের দিনে চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক গল্প বনাম প্রকাশিত উপন্যাস, অথবা স্টার সিস্টেম বনাম অজানা গুণী শিল্পী, অথবা এই শিল্পের অন্যান্য কারিগরী প্রশ্ন ইত্যাদি যে সব বিষয় নিয়ে আমরা বিতর্ক চালাতাম সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা যেন নিছক অ্যাকাডেমিক বিষয় হয়ে গেছে। কি ধরনের প্রমোদ উপকরণ আমরা সৃষ্টি করব সেটা আজকের দিনে কোন প্রশ্নই নয়; আজকের প্রশ্ন হল—বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কি আদপেই কোন ছবি করতে পারব?...

যদি প্রযোজকেরা ভাল ছবি তৈরীর ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহী হয়ে থাকেন, এবং তাঁরা যদি মনে করেন যে ব্যয়বাহুল্যই প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরীর পক্ষে একমাত্র বাধা, তাহলে তাঁরা ব্যয় সংকোচের জন্য নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তাতে ছবির মান বিসর্জন দিতে হবে না, ইউনিয়ন ভাঙাভাঙিও করতে হবে না, ছাঁটাই কিংবা লে-অফেরও কোন প্রয়োজন হবে না।—

ক. গল্পের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে:—খুব কম ক্ষেত্রেই পরিচালককে তাঁর চিত্রনাট্য প্রস্তুত করে নেওয়ার সময় দেওয়া হয়। বিচক্ষণতার সঙ্গে চিত্রনাট্য প্রস্তুতির অর্থ হল যে পরিচালক লেখকের সহযোগিতায় কাহিনী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিত্র নির্মাণ শুরু করার 'আগেই' সমাধান করে ফেলবেন।

খ. প্রাক-স্যুটিং রিহার্সালের ক্ষেত্রে :—এর অর্থ হল পরিচালক, কুশীলব এবং মুখ্য কারিগরী কর্মীরা কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে বিকশিত করবার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারেন। ছবি তৈরী শুরু হয়ে যাবার পর তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

গ. মৌলিক গল্প ক্রয়ের ক্ষেত্রে :—স্টুডিওগুলি চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক গল্প নির্বাচনের বিষয়ে খুব কমই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। যদিও ব্যতিক্রম আছে, তবুও একথা বলা চলে না যে ব্রডওয়েতে যা সাফল্য অর্জন করেছে অথবা কোন বুক ক্লাব যে কাহিনী নির্বাচন করে দিয়েছে তা সিনেমায় তুললে আপনা আপনিই বক্স অফিসে সফল হয়ে পড়বে।

ঘ প্রযোজক নিয়োগের ক্ষেত্রে :— প্রযোজক পদ্ধতি যাতে একজন মানুষ গোটা বছর ধরে অনেকগুলি ছবি নির্মাণের তত্ত্বাবধান করে থাকেন— তা তৈরী হয়েছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রযোজক ছবি নির্মাণ শুরু হওয়ার আগেই তত্ত্বাবধায়কের কাজগুলি করবেন। এইভাবে প্রাক্ উৎপাদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পরিচালকের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যতগুলি ছবি প্রযোজনা করবেন সেই সব কটির মধ্যেই তাঁর বেতনের টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজকালকার প্রযোজক একজন ব্যবসাদারের চাইতে বেশী কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর নান্দনিক বোধ জন্মেছে এবং কখনো তাঁর একটি কাহিনীচিত্রের প্রস্তুতির কাজ সারতেই দুই বছরের মত লেগে যায়। যা কিনা প্রথমে অর্থ এবং সময় বাঁচাবার জন্য করা হয়েছিল, তাই এখন একটা অর্থনৈতিক জাঁতাকলে পরিণত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গড়ে বারোজন প্রযোজক এক বছরে হয়ত মাত্র তিনটি ছবি উৎপাদন করতে পেরেছেন।

ঙ. লোকেশন বা স্যুটিংয়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে :—গল্পের পটভূমি এবং পরিবেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায়শই বিশেষ চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্টুডিওর সেটের চাইতে যথাযথ বাস্তব পরিবেশ প্রায়ই অনেক ভাল এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ।

চ. কার্য্যকরী-কাহিনী বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে :—যখনই ব্যয় সংকোচনের প্রশ্ন ওঠে স্টুডিওগুলি তখনই রহস্যজনক কারণে প্রথমেই এই কাহিনী বিভাগটিকে ছেঁটে দেন। তাঁরা টাকা বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে পাণ্ডুলিপির পাঠক এবং কাহিনী বিশ্লেষকদের ছাঁটাই করে দেন। কাহিনী বিভাগের যাঁরা প্রধান তাঁরা চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের মান সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষিত অথচ খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁদের যথোচিত ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। যে কোন স্টুডিওর উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কাহিনী বিভাগটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।... ..

লিউস্ মাইলস্টোন লিখিত প্রবন্ধটি থেকে যে অংশটি উদ্ধার করা হল তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে হলিউডের বড় বড় স্টুডিও নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র প্রযোজনার জগতে তিনি বেশ কিছুটা প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে হলিউডের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন চলচ্চিত্রকার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তাঁরা হলেন উইলিয়ম ওয়েলম্যান (১৮৯৬—), কিং ভিডর (১৮৯৬—), ফ্রিজ ল্যাঙ্ (১৮৯০-১৯৭৬), এবং জন হাস্টন (১৯০৬—)। এঁরা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন হলিউডের ছকে ফেলা জগতেও নিজেদের কিছুটা ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে এবং ধ্যান ধারণাকে ও স্বকীয় স্টাইলকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বজায় রাখতে। এঁরা কখনোই ঠিক প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নি, আবার সব কিছুকেই নীরবে মেনেও নেন নি। হলিউডে বসেই ছবি তৈরীর কাজ করেও এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তাকে অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন। হলিউড কোনমতেই এঁদের পুরোপুরি মগজ ধোলাই করে উঠতে পারে নি অনেক চেষ্টা করেও। যেখানে বেশীর ভাগ চিত্র নির্মাতাই যখন কেবলমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত, সেখানে সামাজিক জটিলতা ও দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুকে রাজনীতির আলোয় বিশ্লেষণ করে ছবি তোলার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অভিনন্দনের যোগ্য। লিউস্ মাইলস্টোন ঠিক এই কাজটিই করেছেন, যদিও সব সময় সফল শিল্প সৃষ্টি হয়ত তিনি করে উঠতে পারেন নি।

এক যুগের বিরতি ও ব্যবধানের পর ১৯৬০ সালে মাইলস্টোন যে ছবিটি তুললেন তা তারকাসমৃদ্ধ একটি ছবি হলেও নিষ্প্রভ প্রয়াস। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ডীন মার্টিন, পিটার লফোর্ড, এবং স্যামি ডেভিস, জুনিয়ার- যাঁরা 'সিনাট্রা ক্ল্যান' নামে হলিউডে পরিচিত—একত্রে এই ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন।

মাইলস্টোনের জীবনের সর্বশেষ ছবির নাম হল 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি'র (১৯৬২) একটি নব সংস্করণ। ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্ক লয়েড-এর পরিচালনায় যে ছবি উঠেছিল, ১৯৬২ সালে সেই ছবিই লিউস্ মাইলস্টোনের পরিচালনায় পুনর্নির্মিত হয়। প্রথমে এটি পরিচালনা করছিলেন ক্যারল রীড। তাহিতি দ্বীপে দুই বছর লোকেশনে স্যুটিং করবার পর অভিনেতা মারলোন ব্র্যাণ্ডোর সঙ্গে রীডের মতবিরোধ হওয়ার দরুন ক্যারল রীডকে ছাড়িয়ে দিয়ে লিউস মাইলস্টোনকে পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। দুই কোটি সত্তর লক্ষ ডলার ব্যয় করে টেকনিকালারে এবং ৭০ মি. মি. প্যানাভিসনে যে ছবিটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হল, তা কিন্তু ১৯৩৫-এর প্রথম সংস্করণটির মতো আকর্ষণীয় হতে পারল না।

যা মনে হয় ভাবী যুগের চলচ্চিত্র রসিকেরা লিউস মাইলস্টোন পরিচালিত বেশীর ভাগ ছবির কথা মনে না রাখলেও কেবলমাত্র 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' এবং 'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবি দুটির জন্যই তিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলার শিশুচিত্র—
একটি সমালোচনামূলক ইতিবৃত্ত

নন্দন মিত্র

চিলড্রেন ফিল্ম

এই রকম একটি আলোচনা করতে যাওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে চিলড্রেন শব্দটি নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে সেটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন কারণ ইংরাজীতে চিলড্রেন শব্দটি যদিও একেবারে ছোট থেকে যে কোনও বয়সী অপরিণতদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয় বাংলা এর প্রতিশব্দ শিশু শুধুমাত্র ৭/৮ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকেই তাই শিশুচিত্র বলতে ঐ বয়স সীমার উপযোগী ছবির কথাই বোঝেন। তাই এই অসঙ্গতির কথা মনে রেখে 'চিলড্রেন ফিল্ম'-এর বঙ্গার্থ শিশুচিত্র শব্দটিকে চিলড্রেন শব্দটির মতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছবি বোঝাতে।

তবে চিলড্রেন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও একেবারে ছোটদের ও কিশোরদের জন্য পৃথক ছবির উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করেছে কারণ কিশোরদের উপযোগী বহু ছবি একেবারে ছোটদের বোধগম্য নাও হতে পারে যেমন ধরা যাক 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিটি।

৭/৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের যা ভাল লাগে তা হল রূপকথার গল্প, বনের জন্তু জানোয়ারের ওপর লোমহর্ষক ছবি, চিড়িয়াখানার পশুপক্ষীদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের ওপর ডকুমেন্টারি। সবচেয়ে ভাল হয় হিতোপোদেশের গল্প বা রুশী উপকথার ওপর তোলা কার্টুন বা পাপেট ছবি। এই ধরনের বিষয়বস্তুর সবচেয়ে সুবিধা হল পশুপক্ষী চরিত্র সম্বলিত এইসব ছবি দেখতে ছোট শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দলাভ করে অন্যদিকে গল্পচ্ছলে তাদের মনে অনেক প্রাথমিক শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করা যায়। অথচ আমাদের দেশে এই এজ গ্রুপদের জন্য ছবি হয়নি বললেই চলে। সত্যজিৎ-এর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', নিউ থিয়েটার্স নির্মিত কার্টুন ছবি 'মিচকে পটাশ' বা সাম্প্রতিককালে প্রদর্শিত 'একটি মোরগের কাহিনী' (সর্ট ফিল্ম) এইসব শিশুদের উপযোগী বলা যেতে পারে। অথচ বিদেশে ওয়াল্টার ডিজনির আমল (১৯২৭) থেকেই যে কত ধরণের ভূরি ভূরি শিশুচিত্র নির্মিত হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

বাংলা শিশু সাহিত্য

অথচ বাংলা শিশু সাহিত্যে এই ধরণের ছবি নির্মাণের প্রচুর উপাদান রয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা রাও বা লীলা মজুমদারের আধুনিক রূপকথার গল্প, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার ঝুলি', অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' বা 'বুড়ো আংলা', ত্রৈলোক্য মুখার্জির 'আজগুবি গল্প' বা সুকুমার রায়ের 'মজার ছড়া' থেকে ছোটদের ছবির আহরণ করার অনেক কিছুই আছে। আর এই সম্পদকে সঠিক ভাবে কাজে লাগালে তা যে একাধারে বড়দেরও উপভোগ্য হতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত সর্বাধিক সফল বাংলা ছবি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'।

কিশোরদের ছবি নির্মাণের ব্যাপারেও যা হয়েছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। অথচ বাংলায় এই এজ-গ্রুপদের জন্যও সাহিত্য কম রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ও অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' থেকে সুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, সত্যজিৎ-এর ফেলুদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, শিবরাম চক্রবর্ত্তির মজার গল্প বা অখিল নিয়োগী ও বিমল ঘোষের ছোট গল্পের মধ্যে কিশোরদের উপযোগী ছবির প্রচুর মালমশলা রয়েছে। এগুলিকে দু-একজন পরিচালক ছাড়া কেউ কাজে লাগান নি। তাছাড়া কিশোরদের জন্য নির্মিত শিক্ষামূলক ছবির সংখ্যাও নগণ্য। আর বিজ্ঞানধর্মী বা খেলাধুলার ওপর ছবি তো আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে।

তবে বাংলা চলচ্চিত্রে এমন কিছু সর্বজনীন আবেদনমূলক ছবি নির্মিত হয়েছে যেগুলি কিশোরদের দেখার উপযোগী কারণ 'পথের পাঁচালি' 'অপরাজিত, 'পোস্ট মাস্টার,' 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' বা 'হেডমাস্টার' প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে যে গভীর মানবিক আবেদন থাকে তা কিশোরদের মনে ঐসব অনুভূতিগুলির বিকাশে খুবই সাহায্য করে। আমার মনে হয় সেন্সর কর্তৃপক্ষের উচিত শুধুমাত্র এই ধরনের ছবিগুলিকে Universal Certificate দেওয়া। অন্যান্য ব্যবসায়িক ছবিগুলির জন্য আলাদা মান নির্দ্ধারিত হওয়া উচিৎ।

ইতিবৃত্ত :

যতদূর জানা যায় বাংলায় নির্মিত প্রথম শিশুচিত্র পঞ্চাশ দশকের প্রথমভাগে নির্মিত সত্যেন বসুর 'পরিবর্ত্তন'। সত্যেন বসু যিনি 'পথের পাঁচালি' নির্মাণের পূর্বেই 'ভোর হয়ে এল'-র মত প্রথা-বিরুদ্ধ ছবি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি 'পরিবর্ত্তন' নির্মাণের মাধ্যমে কিশোরদের জন্য ছবি নির্মাণে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনবত্ব আনতে পেরেছিলেন। একটি ছেলের দুরন্তপনা এর মূল উপজীব্য। পরে একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ছেলেটির মনের পরিবর্ত্তন দেখান হয়। অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম আধুনিক কিশোর-চিত্র হিসাবে প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়। এরপর বোম্বাই চলে যাবার পর সত্যেন বসু হিন্দীতে কয়েকটি শিশুচিত্র নির্মাণ করেন, যেগুলি ছিল আদর্শবাদ ও সেন্টিমেন্টে ভারাক্রান্ত।

এরপর নির্মিত হয় কিরণ সরকারের 'স্বপ্নপুরী'। এটিই বাংলায় সর্বপ্রথম রঙিন শিশুচিত্র। নাম শুনেই বোঝা যায় এটি একটি রূপকথার গল্প। এরপর নির্মিত হয় 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'। ছবিটি তখনকার দিনে (৫০ দশকের শেষাশেষি) অস্বাভাবিক ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। ছবিটি কিশোরদের জন্য নির্মিত হলেও বক্স-অফিসের দিকে তাকিয়ে ছবি করার ফলে পরিচালককে এমনকিছু সস্তার দৃশ্য ঢোকাতে হয় যা ছোটদের কুশিক্ষাই দেয়। ঐ ছবিতে 'কুমড়ো পটাশ খায় পেয়ারা' গানের দৃশ্যটি একটি মোটা ছেলেকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল। দৃশ্যটি যে অশোভন তা বলাই বাহুল্য।

এরপর নির্মিত হয় 'লালু ভুলু'। একটি পঙ্গু ও এক অন্ধের পরস্পর নির্ভরতার গল্পের মধ্যে শিশুচিত্রের উপাদান থাকলেও পরিচালকের লক্ষ্য ছিল দর্শকের চোখে জল আনা। ফলে সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। 'অবাক পৃথিবী'-ও ছিল সেন্টিমেন্টে ভারাক্রান্ত। এরপর ছেলেধরার কাণ্ড নিয়ে নির্মিত হয় 'মানিক' ও 'পান্নার' মত ছবি, বেশী মাত্রায় নাটকীয় উপাদান ও মেলোড্রামার আতিশয্যের ফলে কোনটাই আদর্শ শিশুচিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

অবশ্য এর পাশাপাশি 'পথের পাঁচালি'র পরবর্তি যুগে বাংলায় যে নতুন চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্মিত হয়েছিল ছোটদের বেশ কয়েকটি ভাল ছবি। এই ধরনের প্রথম ছবিটি নির্মিত হয় শিবরাম চক্রবর্ত্তির গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'। যদিও ছবির মূল সারমর্মটি ছোটদের উপযোগী নয় তবু এই ছবিটির মধ্য দিয়ে ছোটরা দেখল তাদেরই একটি সমবয়সী ছেলের গ্রামের বাড়ী থেকে সহরে পালিয়ে আসার অ্যাডভেঞ্চার। তার বহু তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা তাদের কাছেও শিক্ষণীয় হয়ে রইল। এরপর রঘুনাথ গোস্বামী নির্মিত 'হট্টগোল বিজয়' ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়।

ষাট দশকের শেষাশেষি মৃণাল সেন রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নির্মান করেন 'ইচ্ছাপূরণ'। রবীন্দ্রনাথের সেই বাবা-র ছেলে হওয়ার বায়না ও ছেলের বাবা হওয়ার বায়নার বিখ্যাত গল্পকে তিনি সফলভাবে চিত্ররূপ দেন। এই ছবিতে শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ছবিটি ব্যঙ্গাত্মক হলেও শিশুদের কাছে উপভোগ্য ও শিক্ষণীয়।

ঐ সময়ে লীলা মজুমদারের 'বক ধার্মিক' কাহিনী অবলম্বনে শান্তি প্রসাদ চৌধুরী নির্মাণ করেন 'হীরের প্রজাপতি'। ছবিটি '৬৮ সালের জন্য শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়। একটি হীরের প্রজাপতি হারিয়ে যাওয়া ও তা খুঁজে পাওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে এবং বক ধার্মিক গুরুদেবের ভণ্ডামি উন্মোচন (expose) করা এই ছবির উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা শিশুদের কাছে ভালভাবে তুলে ধরতে পরিচালক ব্যর্থ হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও ছবিটি শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হওয়া আমাদের দেশের শিশুচিত্রের দুরবস্থার দিকটাই তুলে ধরে।

এর কিছু আগে ষাটদশকের প্রথমদিকে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'টু', অবশ্য এটি ছিল একটি টেলিভিশন চিত্র। এই ছবির দুটি চরিত্র—একজন ধনী সন্তান যে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করে এবং যার ঘর ভর্ত্তি নানারকম আধুনিক খেলনা; অন্যজন গরীব সন্তান যে অট্টালিকার পাশেই একটি ভাঙ্গা কুঁড়েতে বাস করে। এদের দ্বন্দ্ব (সত্যজিৎ যাকে খুনসুটি বলেছেন) এই ছবির প্রধান উপজীব্য। ছবির শেষে ধনী সন্তানটি গরীব ছেলের ওড়ানো ঘুড়িকে এয়ারগান দিয়ে দিল ফাঁসিয়ে কিন্তু ধনী সন্তানের খেলনাগুলি গুঁড়িয়ে দিল তারই একটা রোবট। অবশেষে গরীব ছেলেটি আবার সুর তুলল তার বাঁশীতে। ছবিটি অবশ্য বিদেশের টেলিভিশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। আমাদের টি. ভি. কর্তৃপক্ষরা এই ছবিটি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

এরপরই '৬৯ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', এই ছবিটি সর্বদিক দিয়ে একটি শিশুচিত্র হয়ে উঠেছিল। সত্যজিৎ উক্ত ছবিটিতে ভূত নামক কুসংস্কার থেকে শিশুদের মুক্ত করতে না পারলেও পুরানো ধারণায় ভাঙ্গন এনেছিলেন। তার ছবির ভূত ভীতির সঞ্চার না করে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করল এবং গুপি বাঘার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটি তিনি ফ্যান্টাসির পর্য্যায়ে রাখলেই ভাল করতেন। কিন্তু ভূতের রাজার মাথায় বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করে তিনি এমন আভাস দিলেন (Science fiction) যে একদিন এইভাবে হয়তো মানুষের সঙ্গে ভূতের কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যোগযোগ ঘটবে। এইভাবে আত্মার অস্তিত্বের ব্যাপারটায় তিনি গুরুত্ব না দিলেই ভাল করতেন। অবশ্য বরফি নামক যাদুকর-এর যাদুবিদ্যা যে অলৌকিকতা নয় বরং বিজ্ঞান-নির্ভর তা তার ল্যাবরেটরি ও সম্মোহন করার ভঙ্গিতে দুহাত তোলা প্রমাণ করে।

সত্যজিৎ এই ছবিতে সাহিত্যের ভঙ্গিতে গল্প না বলে তাকে চলচ্চিত্রের ভাষাতেই বলেছেন অথচ এত মুন্সিয়ানার সঙ্গে যে তা শিশুদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে গুপি ও বাঘার মুখ তিনি ফ্রিজ শটে এঁকেছেন। আবার নির্জন বনে বাঘ আসার সময়ে শিশুদের মনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় বাঘার ঢোলের ওপর জল পড়ার আওয়াজ তার সঠিক পরিপূরক। ভূতের নাচের দৃশ্যটি এই ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই নাচের দৃশ্যটিতে তিনি যে টেকনিকের সাহায্য নেন তা আমাদের দেশে তো বটেই, সম্ভবত এর ব্যবহার অন্য কোথাও এর আগে হয়নি।

এই ছবির মেক্‌-আপও সত্যজিৎ রায় নিজে করেন। বিভিন্ন দেশের দূতদের পরিহিত জাতীয় পোষাক যেমন রাজসভাকে প্রকৃত রূপ দেয় তেমনি যাদুকর বরফির কালো চৌকো চশমা ঢাকা চোখ ও দাড়ি ঢাকা মুখ তাকে সহজেই শিশুদের কাছে রহস্যময় করে তোলে। এই ছবির সেট-সেটিংও রূপকথার কল্পনাকে প্রবলতর করে।

এই ছবির গানগুলির ভাষা ও সুর এত সহজ যে তা শিশুদের মনে চট্‌ করে দাগ কেটে ফেলে।

লীলা মজুমদারের গল্প অবলম্বনে নির্মিত অরুন্ধতী দেবীর 'পদি পিসির বর্মি বাক্স' শিশু থেকে কিশোর পর্য্যন্ত সকলের ভাল লাগবে যদিও ছোটদের ছবির বিচারে ছবিটা কোনও কোনও স্থানে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিকৃত রুচির সহায়ক যেমন বৃদ্ধদের মেয়ে সেজে নাচার দৃশ্যটি। তবে ডাকাতদের দৃশ্য রচনায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বাক্স উদ্ধারের দৃশ্যটিতেও তিনি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পদি পিসির ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় ছবিটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

পুরো ছবিটিকে রঙিন করার বদলে আংশিক রঙিন করার ফলে রঙের ব্যবহার খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। ছবিটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুনরায় সম্পাদনা করলে এটি একটি প্রকৃত শিশুচিত্র হতে পারে। ছবিটা ভাল না চলার এক বড় কারণ যে ছবিটি নভেম্বর-ডিসেম্বরে মুক্তি পায় যখন শিশু দর্শকরা পরীক্ষায় ব্যস্ত।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ না ঘটিয়ে উপর থেকে পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বুদ্ধিজীবিদের ভাবনা চিন্তাতেও এর প্রতিফলন ঘটছে। অন্ততঃ 'সফেদ হাতি' দেখে আমার সেই ধারণা হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন রোমাঞ্চকর শিকারের কাহিনী অথবা অরণ্যের জন্তু জানোয়ারের ওপর ছবি তোলা হয় এই ছবিতে তারই কিছুটা ধার নিয়ে তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মামা-মামীর অত্যাচারের বস্তাপচা কাহিনীর ওপর। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার থাকলেও, নেই কোনও অ্যাডভেঞ্চার এবং তার বদলে এসেছে সমস্যার অলৌকিক সমাধান। একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঐরাবত ও একটি ময়না পাখী কিভাবে একটি ভাই ও বোনকে তাদের মামা-মামীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করল তাই এই ছবির কাহিনী। অবশ্য উক্ত ছবিটিকে পরিচালক তপন সিংহ যদি ফ্যান্টাসির পর্য্যায়ে নিয়ে যেতেন তাহলে এ প্রসঙ্গ উঠত না। সমস্ত ছবিটাকেই তিনি বাস্তবের পটভূমিকায় দেখাতে চাইলেন। এই ধরণের ছবি দেখার ফলে ছোটদের মধ্যে অলৌকিকতার প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ছবিটি হিন্দীতে উঠলেও স্থানীয় পরিচালকের দ্বারা নির্মিত বলে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে কর রেহাই না দিয়ে উপযুক্ত কাজই করেছেন।

এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইদানিংকালে ক্রাইমকে ভিত্তি করে বাংলায় বেশ কয়েকটি ছোটদের ছবি গড়ে উঠেছে। ছোটদের ছবি ক্রাইম-ভিত্তিক না হওয়াই উচিত তবে বর্ত্তমান সমাজে অপরাধ যেহেতু একটি বাস্তবতা তাই এই বিষয়টি নিয়ে ছবি হবেই। সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক ব্যাপারগুলিকে কে কিভাবে দেখালেন তা অবশ্যই বিবেচ্য। সত্যজিৎ রায়ের অপরাধমূলক ছবিগুলিতে ভায়োলেন্সকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিশুমনে ভায়োলেন্সের প্রভাব যে ক্ষতিকারক সত্যজিৎ সে ব্যাপারে সজাগ। এর বদলে বুদ্ধির লড়াই যার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে তিনি সেটাকেই প্রাধান্য দেন। তাঁর রচিত সাহিত্যেও এটা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তিনি তাঁর গল্পে খুঁটিনাটি তথ্য দেন যেগুলি গল্পচ্ছলে ছোটদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

অবশ্য ছবির গল্পের মাধ্যমে যদি একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার পায় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে। 'সোনার কেল্লা' ছবি দেখে ছোটদের মধ্যে জাতিস্মরতা বা জন্মান্তরবাদের মত বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণিত ধারণা গেড়ে বসতে পারে যা তাদের এগিয়ে নেওয়ার বদলে পেছিয়ে দেবে। অন্যদিকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মত ছবির প্রচেষ্টা যা ধর্মীয় ভণ্ডামির মুখোস খুলে ফেলে তাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে।

শিশুদের মনের গহনে প্রবেশ করায় সত্যজিৎ-এর জুড়ি নেই। তাই ভণ্ড সাধুটার নাম দিলেন 'মছলি বাবা'-এর কারণ সে বলে যে সে এখানে সাঁতার কেটে এসেছিল। নামকরণটা এক দিকে যেমন শিশু মনের উপযোগী, অন্যদিকে এই নামের মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই চরিত্রটি সম্বন্ধে একটি সন্দেহের বীজ শিশুদের মনে অঙ্কুরিত হয়ে যায় কারণ এই নামটার সঙ্গে বক ধার্মিক কথাটার যেন একটা কোথায় সাদৃশ্য আছে। বেনারসের মত স্থানকে ঘটনার প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নেবার অন্যতম কারণ এই বলে মনে হয় যে এইখানেই বহু সাধু সন্ন্যাসীর নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের গল্প প্রচলিত আছে মছলিবাবা-র স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করলেন। ফেলুনাথের দৃষ্টি দিয়ে তিনি এও দেখালেন যে এইসব ভণ্ডরা যে শুধু প্রতারক তাই না এদের সঙ্গে underworld-এর ও যোগাযোগ থাকে। ঐ ছবিতে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন ঐ বডি-বিল্ডারের মাধ্যমে। ঐ বডি-বিল্ডারকে একটি মন্দিরের সঙ্গে ও তার পেশীগুলিকে মন্দিরের কারুকার্য্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি রুচি পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা করেছেন।

অথচ কিছুদিন পূর্বে প্রদর্শিত তপন সিংহের 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ছবিতে না আছে কোনও বুদ্ধির খেলা না আছে শিশুদের মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। বরং এই সব ছবি দেখে ছোটরা ভবিষ্যতে

গোয়েন্দা ও দুঃসাহসিক কাহিনী Actual Thriller-এর প্রতি আকর্ষিত হবে। জানিনা কি কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে শিশুদের ছবি হিসাবে বিদেশের [illegible] দিলেন।

অপরাধীদের ধরার জন্ত বুদ্ধির খেলার বদলে দেখা গেল যে কয়েকটি ঘটনাচক্র ও কাকতালীয় ব্যাপার ছেলেটিকে সাহায্য করল। সমস্ত ছবিটাতে অপরাধীদের খুব বোকা ও অসতর্ক বলে মনে হয়েছে। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে তারা ধরা পড়তেই এসব করছে। ছেলেটি অপরাধীদের কথাবার্তা যেভাবে আড়ি পেতে শুনেছে তা কখনো বাস্তবে সম্ভব নয় তবে ছোট ছেলেটি যেভাবে ক্যারেট ও যুযুৎসু চালিয়ে ছুটি পেশাদারী গুণ্ডাকে কাবু করেছে তাকে শুধু অবাস্তবোচিত-ই নয় হাস্যকরও মনে হয়েছে। এই ছবি দেখে ছোটদের বিপক্ষকে underestimaate করার প্রবৃত্তি জাগা অস্বাভাবিক নয়। পরিচালক শিশুচিত্র নির্মাণ করার সময়ও দর্শককে অহেতুক ভাবপ্রবণ করার পুরানো অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। পবিত্র [illegible] হাত থেকে [illegible] পড়ে যাওয়া ও তারপর একটি গাছের ডাল ব্যবহার করার ঘটনাটি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। কাবুলিওয়ালার পরিচালকের কাছ থেকে আমরা এর থেকে অনেক ভাল ছবি আশা [illegible] বাংলা শিশুচিত্রের মরুভূমিতে তিনি কিছু বারি সিঞ্চন করতে পারবেন কিন্তু তা মরীচিকায় পর্যবসিত হল।

বরং সেদিক দিয়ে টেনিদা-র গল্প অবলম্বনে নির্মিত উমানাথ ভট্টাচার্য্যের 'চার মূর্তি' অনেক উপভোগ্য। কিছু আধিক্য থাকলেও ছবিটি ছোটদের মন জয় করেছে।

সবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই 'হীরক রাজার দেশে'-এর মধ্য দিয়ে আমরা খুব ভাল একটা শিশুচিত্র দেখার আশা পোষণ করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

বাংলার নব-জাগৃতি যার সূচনা রামমোহন রায় এবং পরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথে—এই ধরণের একটি ধারণা এদেশে প্রচলিত। কিন্তু এই ধারণায়, বাংলার নবজাগৃতির যতটা মহত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে ততটা রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব সূচিত হয় কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার কারণ, যে কোন দেশের নব জাগৃতি বা রেনেসাঁ সৃষ্টি করে কিছু অবিস্মরণীয় প্রতিভাবান মানুষ, সেই হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি যে সব বড় মাপের মানুষ সে সময়ে অল্প কিছু বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে এসে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন এটা একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ঘটনা। ইউরোপীয় রেনেসাঁও এমনিভাবে জন্ম দিয়েছিল আশ্চর্য কয়েকজন বীরোচিত মানুষের—যাদের মধ্যে মানবোচিত পূর্ণতা এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে আজো তা আমাদের বিহ্বল করে, যেমন মুগ্ধ করেছিল মাকর্স এবং এঙ্গেলসকে। এই পূর্ণতার একটি দিক ছিল তাঁদের চিন্তার ও চরিত্রশক্তির বৈপ্লবিক দিক, তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে নূতন যুগের অগ্রগামী দূত এবং সংগ্রামী। এর কারণ, তাঁদের নব জাগরণ ঘটেছিল মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে পেরিয়ে আসার সংগ্রামের মধ্যে—দান্তের কাব্য ও কর্মসাধনার মধ্যে যা হয়েছিল মূর্ত। বাংলার নবজাগৃতির প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটাই অন্য রকমের। এখানে ইতিমধ্যেই নূতন যুগের আলোকপ্রাপ্ত একটি বিদেশী জাতি, এক্ষেত্রে ইংরেজ, তার ভাবধারার সংস্পর্শে এসে অনেক কাল ধরে থেমে থাকা, বা সত্য অর্থে, পিছিয়ে পড়া বাঙালী তথা ভারতীয় জাতি হঠাৎ তার সুপ্ত বা স্তব্ধ হয়ে পড়া সৃজনী শক্তির উৎস মুখ খুঁজে পেয়েছিল-বা আরো সত্য অর্থে তার জাতীয় সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এক নূতন বিশ্বকে গ্রহণ করতে পেরেছিল তুলনামূলকভাবে নূতন আলোকপ্রাপ্ত একটি বিদেশী জাতির চিন্তাধারার স্পর্শে—যে বিদেশী জাতি কিন্তু তার মানবিক প্রগতিশীল ভাবধারাই শুধু সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তা নয়, এনেছিল শোষণের সরঞ্জামও। তার এক হাতে ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ কমল, অন্য হাতে ছিল শৃঙ্খল। ইউরোপীয় রেনেসাঁর দেবীর এক হাতে যেখানে ছিল নূতন চিন্তারাশির গ্রন্থ, অন্য হাতে মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রামের তরবারি—বাংলার রেনেসাঁর হাতে সেই তরবারিটি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তাই বাংলার নবজাগৃতির দূতদের কণ্ঠে একদিকে যেমন মানবিকতার বাণী মন্ত্রিত হয়েছে, তেমনি কিছুটা সূক্ষ্মভাবে শৃঙ্খলের ঝনঝনও যে শোনা যায়নি তা নয়। রামমোহন দিয়ে গেছেন অনেক, কিন্তু ভারতবর্ষকে ইংরেজের কাছে সমর্পিত করার বিরুদ্ধে কিছু করেন নি, বরং কিছু কিছু কাজ এমন করেছেন—যাতে ইংরেজের এদেশে স্থায়ী হয়ে বসবার সুযোগ গিয়েছিল বেড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতিশীল অবদান আমাদের চিন্তার রক্তস্রোতে কিন্তু সেই মহাশিল্পী বঙ্কিমের কণ্ঠস্বরে একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কণ্ঠও শোনা গেছে, যেমন 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য। সেই যুগটির সীমাবদ্ধতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে (রামমোহন যখন ইংরেজদের কাছে আমাদের 'সম্মান বাড়িয়ে তুলছেন' বলে আমরা গর্বিত) কলকাতার কাছেই তিতুমীর যে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে—এই সমস্ত মানুষগুলির আশ্চর্য অসচেতনতা! অর্থাৎ বাংলার নবজাগৃতি বলতে আমরা যা বুঝি—তার মধ্যে কিন্তু তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহগুলির বা তিতুমীরের মত মানুষগুলির কোন অবদান স্বীকৃত হয়নি। তাই সামগ্রিক অর্থে, বাংলার নবজাগৃতি, যদিও নবজাগৃতি কিন্তু তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সত্য অর্থে জাগৃতির সূচক নয়। এই অর্থেই, বাংলার নবজাগৃতির প্রাণমূর্তি বা পরিণতি বলায় রবীন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ ততটা গৌরব বাড়ে না—যতটা আমাদের ভাবানো হয়েছে।

অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিভাবে দেখবো, শুধুমাত্র রামমোহণের উত্তরসূরী হিসেবেই—নবজাগৃতির পরিণতি হিসেবে অথবা একই সঙ্গে আরো একটা নূতনতর যুগের অগ্রগামী চিন্তার অগ্রদূত হিসেবে? আমার মতে দ্বিতীয় অর্থে দেখাটাই সত্যকার দেখা। যদিও বাঙালী লেখক শিল্পীর বৃহত্তর অংশই নবজাগৃতির পূর্ণাবয়ব মূর্তি হিসেবেই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেন।

যে কথা এখানে প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে—সত্যজিৎ রায়কেও বাংলার নব জাগৃতির পরবর্তীকালীন ধারক হিসেবে গ্রহণ করার একটা চেষ্টা হয়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত এদেশে, এবং বিদেশে মারী সীটন যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন। এটা এই মুহূর্তে আমার বিচার্য নয়, আমার বিচার্য সত্যজিৎ রায় নিজে রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে গ্রহণ করেন বা করেছেন তাঁর নিজের সৃষ্টিতে। এটা বাংলাদেশে প্রায় সর্বজনবিদিত যে সত্যজিৎ রায়দের পরিবার প্রায় দুই পুরুষ আগে থেকেই ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত, স্বভাবতই একজন রাবীন্দ্রিক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের একটা বিশেষ পরিচিতি আছে—আমার বিচার্য এটি নয়, আমার বিচার্য

আসল রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে না হয়নি সত্যজিতের রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক ছবিতে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে যখন বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ মাত্রই উদ্বেলিত তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাছে একটি সুযোগ এল, কেননা সত্যজিৎ রায় তখনই এই মহান ঘটনাকে স্মরণ করে প্রথম ছবি করলেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে—যে ছোট গল্প রবীন্দ্র প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ কমল। আমাদের আলোচনা সেই 'তিন কন্যা' ছবিটি নিয়ে, পরে 'চারুলতা' নিয়ে।

তিন কন্যা
(১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর তিনটি গল্প 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি'—অবলম্বনে রচিত সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা' ছবি। তিনটি গল্প ভিন্ন বক্তব্যের ও স্বাদের। কিন্তু তিনটি গল্পতেই কবি যাদের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেছেন তারা নারী, তাই সত্যজিৎ রায়ের ছবির নামকরণ যথার্থ। এর মধ্যে দুটি কন্যার বয়স কম। 'পোস্টমাস্টার'-এর রতন বালিকা বললেই হয়, কিন্তু তার মনস্তত্বে কবি কিশোরী মেয়ের মনের ছবি ধরেছেন, সুতরাং আকারে বালিকা হলেও প্রকৃতিতে সে কিশোরী। 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী অবশ্যই কিশোরী, যদিও তার নারীত্ব প্রাপ্তিই গল্পের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। একমাত্র 'মণিহারা'র নায়িকাকেই কবি পূর্ণবয়স্কা পরিণত নারী হিসেবে দেখিয়েছেন, অবশ্য এই নারী একটু বিশেষ ধরণের—এবং নারী মনস্তত্বের শুধু বিশেষ একটি দিক নিয়ে গল্পটি রচিত ; কিন্তু গল্পটি বলার সিরিও-কমিক ভঙ্গিমা ও বর্ণনাকারীর দ্বারা নারীমনস্তত্বের বিভিন্ন দিকগুলির ওপর রসাত্মক মন্তব্যগুলি গল্পটিকে অসামান্য করে তুলেছে।

তিনটি ছবির আলোচনা আলাদা আলাদাভাবে করা বাঞ্চনীয়, কেননা মূলতঃ এগুলি তিনটি ভিন্ন ছবি—যদিও একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার ঐক্যসূত্রে বিধৃত, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে ভাবনা। তিনটি সংক্ষিপ্ত গল্প নিয়ে এই ছবিটি যেন একটি খুদে 'চিত্রত্রয়ী' বা মিনিট্রিলজি—অবশ্যই ভাবনামূলক ট্রিলজি।

'তিন কন্যা' সম্পর্কে আর একটি নুতন তথ্য স্মর্তব্য, তা হচ্ছে এই ছবি থেকেই সত্যজিৎ রায় নিজেই তাঁর ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে আসছেন। অর্থাৎ 'তিন কন্যা'তেই তাঁকে প্রথম একজন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে পেলাম।

পোস্টমাস্টার

'পোস্টমাস্টার' গল্পের বিষয়বস্তু : কলকাতার একজন মধ্যবিত্ত 'বাবু' শ্রেণীর যুবক একটি অজ পাড়াগাঁয়ে পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে গেলে গ্রাম্য নির্জন পরিবেশের মধ্যে পড়ে, এবং সেই নিঃসঙ্গ পল্লী নির্জনতার মধ্যে একটি অনাথ কিশোরীর (যে মেয়েটি পোস্টমাস্টারবাবুর ঝি-এর কাজ করত) সঙ্গে অলক্ষ্য একটি মানবিক সম্পর্ক রচিত হয়, যে-সম্পর্ক যুবকটির দিক থেকে অবিমিশ্র স্নেহের সম্পর্ক, অথচ যা কিশোরীর দিক থেকে 'নারী হৃদয়ের রহস্য' সূত্রে জটিল। দুঃসহ নির্জনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগভোগ ইত্যাদির পর শহুরে কলকাতার বাবু অনিবার্য নিয়মে গ্রাম ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার সময় অজ্ঞাতসারে ছিন্ন করে দেয় অনাথ সর্বহারা কিশোরীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন ও জটিল রহস্যময় নারী অনুভূতির জগৎ। এবং একেবারে বিচ্ছেদের মুহূর্তে কিশোরীর হৃদয়ের বেদনা ও যন্ত্রণার মানবিক রূপটি প্রথম ধরা পড়ে পোস্টমাস্টার বাবুর কাছে। স্রোতোচ্ছল নদীবক্ষে নৌকো করে যেতে যেতে মধ্যবিত্ত পোস্টমাস্টার একবার ভাবে ফিরে গিয়ে এই অনাশ্রিত অনাথ গরীব মেয়েটিকে নিয়ে যায় কলকাতায় তাদের বাড়ীর একজন আশ্রিতা হিসেবে—কিন্তু যথারীতি মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নবাদী দার্শনিকতায় তার ক্ষণিক মানবিকতাবোধ চাপা দিয়ে যেমন আসছিল তেমনি চলে আসে। গল্পের শেষ অসাধারণ ছত্রটিতে অভ্রান্তভাবে দেখান হয় বাবুটির মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নপর স্বার্থপরতার বিপরীতে কিশোরীটির সর্বহারা-সুলভ মাটি ঘেঁসা রূঢ় বাস্তবতা, অথচ প্রায় অসম্ভব এক আশা নিয়ে বেঁচে থাকার নিগূঢ় যন্ত্রণা, নারী মনস্তত্বের রহস্যে যা আরো বিচিত্র ও জটিল। বলাবাহুল্যমাত্র মূল গল্পের শেষ দুটি ছত্রেই গল্পের প্রাণবস্তুটি ধরা পড়েছে অমোঘভবে, যার শিল্পকৃতির কোন তুলনা নেই। গল্পটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মানবচরিত্র নিরীক্ষণের তথা শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের এবং একটি কিশোরমেয়ের মধ্যে নারীচরিত্রের রহস্যের আলোছায়ার চিত্রণে—তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম।

মূল গল্পের এই বিষয়বস্তু যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তার সঙ্গে ছবির বিষয়বস্তুর অনেকটা মিল হয়না। হয়না বলেই একটি প্রশ্ন দেখা দেয় ছবিটি গল্পের মূল প্রাণবস্তুটি ধরতে পেরেছে না পারেনি।

এখানে একটি তর্ক উঠতে পারে, যে তর্ক সব সাহিত্য-ভিত্তিক ছবির ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উঠে থাকে। শুধু এই ছবির ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ ভাবেই প্রশ্নটি আলোচিত হওয়া উচিত। প্রশ্নটি হচ্ছে, কোন সাহিত্য-ভিত্তিক ছবিকে তার মূল গল্প বা উপন্যাসের প্রসঙ্গে বিচার করাটা আদৌ প্রয়োজনীয় কি না? সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্য, এবং চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র—সুতরাং চলচ্চিত্র কর্মটি রচিত হবার পর তা মূল সাহিত্যটির সঙ্গে আর কোন ভাবেই তুলনীয় হতে পারেনা—এটি আপাত দৃষ্টিতে একটি বলিষ্ঠ যুক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিল্প কর্ম হিসেবে যখন দেখা যায় কোন বিশেষ কারণ বা বক্তব্য না থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র রূপটি মূল সাহিত্য রূপটির অনেক গুণ, গভীরতা ও বক্তব্য বর্জন করেছে, বিনিময়ে নুতন কিছু গুণ, গভীরতা বা বক্তব্য সৃষ্টি করেনি—অর্থাৎ এক

কথায় মূল সাহিত্যের তুলনায় অনেক নিম্নমানের শিল্প হয়েছে—তখন 'ছবি ছবিই' এই যুক্তিটি কি যথেষ্ট বলিষ্ঠ বলে মনে হয়? তখন এটি তো একজন চলচ্চিত্রকারের ত্রুটির দোষস্খালনের জন্য ব্যবহৃত মুখোস হতে পারে।

প্রশ্নটি হচ্ছে; সাহিত্য ভিত্তিক ছবির বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত? আমার মতে, এই প্রশ্নটি অনেককাল আগেই মীমাংসিত হয়ে গেছে, এবং প্রশ্নাতীত ভাবে। তর্কের ধুনো তবু যাঁরা এখনো ওড়ান, তাঁরা হয় সেই মীমাংসার সূত্রটি জানেন না, নয়তো শিল্পে স্বাধীনতার নামে নৈরাজ্যবাদ তাঁদের পছন্দ। মীমাংসার সূত্রটি দিয়ে গেছেন স্বয়ং আইজেনস্টাইন, এবং সহমত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভক্ত ও সহকর্মী ইভর মন্টেগু তাঁর 'With Eisenstein in Hollywood" গ্রন্থে। আইজেনস্টাইন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছেও এই প্রশ্নটি উঠেছিল যখন আমেরিকায় থিয়োডর ড্রেজার-এর 'এ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' গ্রন্থ অবলম্বনে আইজেনস্টাইন একটি ছবি তৈরী করতে যান, এবং অনবদ্য চিত্রনাট্যটি রচনা করেন। অবশ্য ছবি নির্মিত হয়না, হলিউডের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তিনি ব্যর্থ হন। প্রযোজকরা চেয়েছিলেন মূল উপন্যাসের মূল বক্তব্যের কিছু পরিবর্তন। লেখক থিয়োডর ড্রেজার তাঁর উপন্যাসে মার্কিন পুঁজিবাদের যে সূক্ষ্ম কিন্তু নির্মম বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা স্বভাবতই হলিউডের প্রযোজকদের পক্ষে রুচিকর ছিলনা। আইজেনস্টাইন এই পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও এই বিশেষ প্রশ্নটির ক্ষেত্রে এই মূলানুগতার প্রশ্নটির বিতর্কটি ছিল একটি 'বিশেষ ঘটনা', সংঘাত অনিবার্য ছিল মার্কসবাদী আইজেনস্টাইন ও পুঁজিবাদী হলিউড প্রযোজকদের মধ্যে। কিন্তু চলচ্চিত্রতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে যা সর্বদা হয়েছে, এখানেও এই 'বিশেষ বিতর্কের' বিশেষ প্রশ্নটি বা 'ইস্যু'টি নিয়ে ভাবনার ফলে সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রের মূলানুগতার প্রশ্নের সমাধানের একটি সাধারণ শৈল্পিক সূত্র আইজেনস্টাইন দেন, যা তাঁর তৎকালীন সহযোগী ইভর মন্টেগু তাঁর নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেটি হচ্ছে এই :—

"**A minor** work has no claim to act as more than a spring-board when adapted for another medium, but a **major** deserves that any approach is made with respect for its essence...**The scenario must express the quintessence of the book**. It must emerge as clearly as possible, an honour to the original, to our process of transportation and to cinematic art" (ইভর মন্টেগু লিখিত 'উইথ আইজেনস্টাইন ইন হলিউড' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১১৫-১৬, পূর্ব জার্মানীর সেভেন সীস্ প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত)। বিশেষ চিহ্নিত করণ বর্তমান লেখকের)

অর্থাৎ আইজেনস্টাইন ও তাঁর সহযোগীদের মতে সাহিত্য ভিত্তিক ছবিকে দুটো ভাগে ভাগ করে বিচার করা উচিত—'মাইনর' বা সাধারণ সাহিত্য কর্মের ওপর রচিত ছবি, এবং 'মেজর' বা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-কর্মের ওপর রচিত ছবি। প্রথমটির ক্ষেত্রে উক্ত 'মাইনর' সাহিত্য কর্মটিকে চলচ্চিত্র রূপায়ণের জন্য ব্যবহৃত একটি ধাপ মাত্র ভাবলেই যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশি মূল্য দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু **যেখানে কোন চলচ্চিত্র রচিত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বা মহৎ সাহিত্য কর্মের ওপর ভিত্তি করে যেখানে মূল সাহিত্য কর্মের মূল তাৎপর্যটি ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারুর নেই**। এবং এটি এমনভাবে করা উচিত যেন ছবিটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—(১) মূল সাহিত্য কর্ম-টির প্রতি শ্রদ্ধা, (২) যে পদ্ধতিতে একটি শিল্প মাধ্যম থেকে অন্য শিল্প মাধ্যমে বক্তব্যটি স্থানান্তরিত হচ্ছে—সেই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং (৩) চলচ্চিত্রের শৈল্পিক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা।

আমার মনে হয় এর থেকে যে বক্তব্যটি স্পষ্ট প্রতীয়মান সেটি হচ্ছে : যদি পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে তবে তা বিশেষ কারণেই করা উচিত, এবং সে কারণ হতে পারে দুটি—এক, নূতন যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলের তাৎপর্যটি আরো বিশদভাবে নূতন চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে কুরোশোয়ার রচিত ছবি 'থ্রোন অব ব্লাড'—অথবা কোজিনৎসেভের 'ডন কুইকসোট' ছবি। দুই, মূল সাহিত্য-কর্মের কিছু নিকৃষ্ট অংশকে বর্জন বা পরিবর্তন করে মূলের উৎকৃষ্ট অংশের তাৎপর্যকে নূতনতর গভীরতায় মণ্ডিত করে মূলের চেয়েও উৎকৃষ্টতর চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য, যেমন পরিবর্তনের ফলে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' মূলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল।

যেহেতু সাহিত্যভিত্তিক ছবিই এখন পর্যন্ত এদেশে বেশি রচিত হয় এবং যেহেতু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প মাধ্যম বলে মূলানুগতার প্রশ্নটিকে একেবারে উড়িয়ে দেবার যথেচ্ছাচারী প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাই ওপরের আলোচনাটি বিশদভাবে করা হল। আশা করি, এই নিয়ে সব অনর্থক তর্কের ওপর যবনিকাপাত যে ঘটা উচিত, আইজেনস্টাইন তার পূর্ণ সমাধান করে গেছেন—এবিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অবশ্য কোন সাহিত্যকর্ম—'মেজর' না 'মাইনর', নূতন আলোকপাত সত্যিই পরিবর্তনের ফলে ঘটেছে না ঘটেনি—এ সব তর্ক ছবি বিশেষকে নিয়ে সর্বদাই থাকবে। কিন্তু তর্কের সাধারণ সমাধানটিও একটি বড় রকম পদক্ষেপ, চলচ্চিত্র তত্ত্বের প্রগতির দিক থেকে, একথা অনস্বীকার্য।

অবশ্যই প্রমোদ ব্যবসায়ী সুযোগ সন্ধানীরা কোন দিনই যুক্তি মেনে নেয়না, তার প্রমাণ, আইজেনস্টাইনকে হলিউড খালি হাতে বিদায় দেবার বেশ কিছুকাল পরে, ওই একই উপন্যাস অবলম্বনে মূল প্রাণবস্তুকে বিসর্জন

নিয়ে একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী রহস্য রোমাঞ্চের ছবি তৈরী হয় 'এ প্লেস ইন দ্য সান'—পরিচালক হলিউডের জর্জ স্টিভেন্স, প্রধান নায়িকা এলিজাবেথ টেলর। উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে পরিহার করা হয় বলে লেখক থিওডর ড্রেজার প্রবল প্রতিবাদ করেন, এবং এই ছবির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু তাতে কিছু হয় না, ছবিটি দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ডলার মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ যে ছবি হবার ছিল সমাজ সচেতনতার ছবি, সে ছবি হয়ে উঠেছিল শুধু প্রমোদ এবং তখনো হলিউডের প্রভুদের যুক্তি ছিল 'সিনেমা হচ্ছে সিনেমা ও সাহিত্য সাহিত্য—সুতরাং ছবি মূল গ্রন্থের তাৎপর্যকে রাখবে কি রাখবেনা সেটা কোন বিচার্য বস্তুই নয়'। এই অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ সর্বনাশা যুক্তির ফল কি হতে পারে এই ঘটনাটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে রচিত ছবির ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনের সূত্র আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখা দরকার। এবং 'চারুলতা' প্রসঙ্গে লিখিত আলোচনায় সত্যজিৎ রায় নিজেও তাঁর নিজস্ব যে মত প্রকাশ করেছেন তাও আইজেনস্টাইনের সূত্রের কাছাকাছি। তিনি লিখেছেন যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে মূল কাহিনীর যে পরিবর্তন করা হয়, তা বিশেষ অনিবার্য প্রয়োজনেই হয়, "খামখেয়াল বশতঃ নয়, বা পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরী করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়।" (বিষয় চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৮)

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে 'পোস্টমাস্টার' ছবির বিশ্লেষণে এলে তবেই আমরা দেখতে পাব (১) মূল গল্পের বক্তব্যটিই ছবিতে ফুটে উঠেছে কি ওঠেনি এবং (২) অন্তিম মুহূর্তের মানবিক বেদনার সুরটি খণ্ডিত হয়ে গেছে কি যায়নি।

আগে দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি আলোচিত হোক। রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের বিচ্ছেদের মুহূর্তটি নারী হৃদয়ের রহস্যে জটিল, অথচ এমন একটি মেয়ের যে এখনো পূর্ণ নারীত্ব অর্জন করেনি, যদি হ'ত তাহলে এটিকে সরলই বলা যেতে পারত। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের চরিত্রের জন্য। মূল গল্পে রতনের বয়সের উল্লেখ আছে—'বয়স বারো-তেরো'। এবং তার মনের যে ছবিটি রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কলমে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে একটি কিশোরীর মূর্তি পাই, যার মধ্যে নারীত্বের প্রাথমিক আভাষ দেখা দিয়েছে। তখনকার কালে গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী যার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।" কিন্তু ছবিতে যে মেয়েটিকে চাক্ষুষ দেখি তাকে দেখে বালিকা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয়না। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত রতনকে যদি রবীন্দ্রনাথ চাক্ষুষ দেখতে পারতেন তাহলে তাকেও হয় আমাদের এ-যুগের চোখে বালিকাই লাগত, কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমগত সুবিধে (এবং অন্যভাবে অসুবিধেও) এই যে সাহিত্যে কল্পিত চরিত্রের মনের ছবিটি যতটা স্পষ্ট ভাবে ফুঠে ওঠে, তার শরীরের ছবিটি সবসময়ে ততটা সৃষ্টি হয় না। চরিত্রের প্রকৃতিটা যতটা স্পষ্ট শরীরের আকৃতিটা ততটা নয়। এখানে আকৃতিটা পাঠকের নিজের কল্পনা শক্তির ব্যবহারের দ্বারা নিজের মনে গড়ে নেওয়ার অবকাশ থাকে, অন্ততঃ কিছুটা। ছবিতে তা অসম্ভব, সেখানে চলচ্চিত্রকারের কল্পনাই দর্শকের কল্পনা। সুতরাং এখানে সাহিত্যের চরিত্রকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের বেশ কিছু অসুবিধে ঘটতে পারে। রতনকে বারো বছরের মেয়ে হিসেবে দেখালে, তার মধ্যে যে 'নারী হৃদয়ের রহস্যে'র কথাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলার বেশ অসুবিধে হয়: কোন চোদ্দ বা পনেরো বছরের মেয়েকে রতন হিসেবে দেখালে হয়না। 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ীর ভূমিকায় অপর্ণাকে কিশোরী হিসেবে ঠিকই মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রতনের ভূমিকায় চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কিশোরী' হিসেবে মানায়না, তাকে মনে হয় বালিকা। হয়ত বাস্তবঃ তার সঙ্গে মূল গল্পের রতনের খুবই মিল আছে, কিন্তু গল্পের চরিত্রটির জটিল নারী রহস্যের ব্যাপারটি প্রকাশ করার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন দেখা দেয় চন্দনা উপযুক্ত "টাইপেজ" হয়ে উঠছেনা। 'টাইপেজ'-এর ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে জ্ঞানতঃ এই ভুল হওয়াটা বিস্ময়কর, সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রতনের 'নারী হৃদয়ের রহস্য'-এর ব্যাপারটাই হয় সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, নয় এটিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্কটি একটি মানবিক স্বাভাবিক স্নেহের ও প্রীতির সম্পর্কে হিসেবেই দেখেছেন আর তা যদি না হয়, তাহলে রতনের ভূমিকায় চন্দনার নির্বাচন অবশ্য ভুল নির্বাচন, অথবা এক্ষেত্রে আর যা যা করণীয় ছিল যাতে উক্ত 'নারী হৃদয়ের রহস্য'টি উন্মোচিত হয় তা ঠিক মত করেন নি। যেভাবেই হোক না কেন, এতে ছবিটি মূল গল্পের একটি প্রধান তাৎপর্যের দিক থেকে দরিদ্র হয়ে গেছে। এতে অন্তিম সিকোয়েন্সটি মূল গল্পের তুলনায় কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা লক্ষণীয়।

মূল গল্পে এই বিচ্ছেদের মুহূর্তটি 'নারী হৃদয়ের রহস্যে জটিল' এবং রবীন্দ্রনাথই সে সময়ের রতনের আচরণের 'অস্বাভাবিকতার' বর্ণনায় লিখেছেন, ..."**কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে**"। এই নারী হৃদয় রহস্যটি বোঝানোর জন্য রতনের দুটি 'বিচিত্র' আচরণ ও সংলাপ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি, যখন পোস্টমাস্টার বিদায়ের প্রাক্কালে বলল, "রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না", তখনকার রতনের আচরণ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, **কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে**।......(রতন)

একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।" অর্থাৎ এটি হচ্ছে রতনের অসহায় প্রতিবাদ, পোস্টমাস্টার যে রতনের হৃদয়টির কোন খবর নেয়নি, এবং তাকে এক গচ্ছিত সম্পত্তির মতই আর এক বদলি বাবুর হাতে হাত বদলি বা গচ্ছিত করে যাচ্ছে, এই অবমাননার বিরুদ্ধে দুঃখের অসহায় নারীসুলভ প্রতিবাদ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন ঠিক বিদায়ের মুহূর্তে পোস্টমাস্টার কিছু টাকা রতনকে দিতে গেল, 'তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া কহিল, "দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"—বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।'

ছবিটিতে এদুটিই পাল্টে ফেলা হয়েছে। ছবিতে দেখান হয় পোস্টমাস্টার রতনকে টাকা দেয়, রতন তা না নিয়ে সেইখানেই রেখে দেয়। পরে বিদায় মুহূর্তে পোস্টমাস্টার রতনের এই প্রত্যাখ্যাত টাকাটা দেখতে পায়, এবং রতনের এই টাকাটা প্রত্যাখ্যানের পিছনে যে কি পরিমাণ অভিমান আছে তা বুঝতে পারে, রতনের জন্য তার কষ্ট হয় ও চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে শুনতে পায় বাইরে রতনের কণ্ঠস্বর : "নতুন বাবু জল এনেছি।" এটি একটি মর্মান্তিক বাক্য, রতন যেন বুঝিয়ে দেয় সব শাস্তি সে মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে, কদিন সে এক নতুন বাবুর কাছে স্নেহ পেয়ে 'মানবকন্যা' হয়ে উঠেছিল. যাবার সময় নতুন বাবু তাকে বুঝিয়ে দিল সে আসলে ঝি পরিচারিকা মাত্র, তাই সে মেনে নিচ্ছে। এটি বেদনার তীব্রতায় ধাক্কা দেয় পোস্টমাস্টারের বুকে। ঠোঁট চেপে অশ্রুরুদ্ধ চোখে পোস্টমাস্টার এগিয়ে চলে। আমরা দেখি অদূরে রতন বালতি নামিয়ে অশ্রুসজল নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। অদূরে বসে আছে বিশে পাগলা. যাকে আগে সর্বদাই হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে দেখেছি—এবারেও প্রতিমুহূর্তে শঙ্কিত হই কখন সে চীৎকার করে উঠবে এই আশংকায় শেষ মুহূর্তের ট্রাজিক অনুভূতিটিও ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। বিশে পাগলাও এবার কিন্তু চীৎকার করে ওঠে না. বোধ হয় সেও মানবিক ট্রাজেডিটি উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তার অনর্থক উপস্থিতি-টাই আমাদের সেই অন্তিম করুণ মুহূর্তটিকে অনুভবে বিঘ্ন ঘটায়। (বস্তুতঃ এমন একটি অনর্থক চরিত্র সৃষ্টি কেন যে সত্যজিৎ রায় করলেন তা আজো আমার কাছে রহস্য—গল্পেও এই চরিত্র নেই, ছবিতেও তাকে সৃষ্টি করে যতটুকু কাজ হয়েছে তার চেয়ে অকাজ হয়েছে বেশি।)

রতনের শেষ নির্নিমেষ চাহনি—তার দুটি চোখের ভাষা অবশ্যই মানবিকতায় গভীর। এ নিয়ে পশ্চিমী আলোচকরা পঞ্চমুখ কিন্তু তারা তো রবীন্দ্রনাথ পড়েননি, প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে রতনের নারী চরিত্রের রহস্য ধরা পড়ে কি? আমার মনে হয় পড়ে না, তার বালিকা আকৃতিই একটা বাধা, তা ছাড়া শুধু চোখের ভাষা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যায় নি। এখানে চোখের ভাষা মানবিকতায় গভীর, কিন্তু এতে তার জটিল নারী হৃদয়ের রহস্যের ছায়া পড়েনি, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'নারী হৃদয় কে বুঝিবে'—এর কোন ছায়াপাতই ঘটেনি।

মূল গল্পে এর পরই আছে নদীর একটি অসামান্য ব্যবহার, যা এই বিচ্ছেদের করুণ রসের চিত্র প্রতিমার মতই, যেন চলচ্চিত্র ভাষার একটি সাহিত্যিক রূপ—"বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল।" মানবিক বেদনার চলচ্ছবি দেখানর জন্য এই ভাবেই নদীর স্রোতরাশির ছবির 'মন্তাজ' চলচ্চিত্রে রচিত হয়। যিনি সমগ্র 'অপু চিত্রত্রয়ী'তে জলের এমন অসামান্য চিত্রকল্পগুলি দিয়ে গেলেন, তিনি মূল গল্পে চলচ্চিত্র ভাষায় এমন সূত্র থাকা সত্ত্বেও কেন নদীকে পরিহার করলেন তা আমি বুঝতে পারিনি, এবং তাতে ছবিটি যে দরিদ্র হয়েছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু নদীর চিত্র প্রতিমাটি নয়, একটু পরে একটি শ্মশানের উল্লেখ আছে—নদী তীরবর্তী শ্মশান—সেটিও যেন অসাধারণ সিনেমাটিক প্রয়োগ—ছবিতে এসমস্তই বাদ।

'পোস্টমাস্টার' ছবির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটি আরো গুরুতর, এইখানেই ছবিটি মূল গল্পের প্রাণসত্তাটি ধরতে পারেনি বলে আমার ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করতে লাগিল। পোস্টমাস্টার তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল 'ফিরিয়া যাই জগতে ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল; জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

গল্পের এই ছত্রটি এবং পরের ছত্রটি মণিগর্ভ। গভীর বেদনা অনুভব হয়, যখন দেখি সত্যজিৎ রায় এই দুটি ছত্রের বক্তব্যটি একবারও অনুধাবন করলেন না। 'নদীবক্ষে ভাসমান পথিক' সেই পোস্টমাস্টারের মনস্তত্ত্বটি চমৎকার ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রথমদিকে পোস্টমাস্টার সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলির মধ্যে একটু স্নেহমিশ্রিত হলেও, শ্লেষ ছিল, যেমন সে যে 'বাবু' শ্রেণীর, সে যে 'কলকাতার বাবু' গ্রামের লোক যে তার সঙ্গে 'মিশবার উপযুক্ত নয়', গ্রামে তার অবস্থাটা যে 'জল হইতে তোলা ডাঙার মাছের মত'—এই সব ছোট ছোট উক্তির মধ্যে পোস্টমাস্টারের শহুরে শ্রেণীচরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্পষ্ট রাখেননি

এবং একথাও অস্পষ্ট রাখেন নি যে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে মানুষটা স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র। একটি বিশেষ অবস্থায় পড়লে একাধারে তার ব্যক্তিস্বরূপের দয়া ও মমতাবোধ, অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্তের দায়িত্ব-এড়ান স্বার্থমুখী পলায়নপরতা—এ দুটির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ই এবং তারই একটি চেহারা উক্ত গল্পে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন, এবং তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম স্নেহটুকু তুলনাহীন। পোস্টমাস্টার একবার ভাবল 'যাই জগতে ক্রোড়বিচ্যুত অনাথিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসি।' কিন্তু তার আজন্মলালিত মধ্যবিত্তসুলভ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হচ্ছে বিরুদ্ধগতির বিরুদ্ধাচরণ না করার, সে ক্ষমতা তার নেই, সুতরাং পালে যখন ততক্ষণে 'বাতাস পাইয়াছে', নদীর স্রোত 'খরতর বেগে বহিতেছে'—তখন ফিরে যাই ভাবলেও নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ফিরবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এটুকুই তার মনস্তত্ত্বের সব কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য স্নেহ ও নিপুণ বিশ্লেষণী কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন—বাক্যের শেষাংশে—শুধু পালে বাতাস লেগেছে, নদী খরতর বেগে বয়ে যাচ্ছেই নয়—"গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে"—শ্মশানের চিত্রকল্পটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এবং তখনি পোস্টমাস্টারের মধ্যবিত্ত মন নিজের স্বার্থপর পলায়নপরতাকে একটি সহজ দার্শনিকতার দ্বারা স্বচ্ছন্দে চাপা দিয়ে বিবেকের দংশনে শীতল করল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার?" এতো সেই মোহমুদ্গরের বাণী—কস্তে পুত্র? কা তব কান্তা? এই পোড়া দেশে আদর্শ পলায়নবাদী দার্শনিকতার যে মজুত ভাণ্ডারটি আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদের (শ্মশানের উল্লেখ সেই জন্যেই) আড়ালে আমাদের পোস্টমাস্টার বাবু বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির, স্নেহ ও মানবিকতার চরম পরিচয় এর পরের অর্থাৎ গল্পের শেষ লাইন কটিতে। রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারের মনে 'তত্ত্বের উদয় হইল' একথা জানিয়ে পরের ছত্রে লিখছেন, "কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না।.. সে সেই পোস্টঅফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে…"

অর্থাৎ 'বাবুদের' পালাবার ক্ষমতাও আছে, উপায়ও আছে, এবং মানবতাবোধে জাগলে তার জন্য ভাববাদী তত্ত্বও আছে, কিন্তু রতনদের কোন পালাবার স্থান নেই, তাদের মনে কোন 'তত্ত্বের' উদয় হয় না—চারিদিকে জন্ম থেকে মার খেতে খেতে, দারিদ্র্যের মার, অর্ধাশন অনশনের মার, রোগ শোকের মার—এবং কখনো কখনো রতনের মত 'ভালবাসার' মার খেতে খেতে তাদের মস্তিষ্কে কোন তত্ত্বের উদয় হতে পারেনা। তাদের কাছে কোন ভাববাদী তত্ত্বের কোন অবকাশ নেই, তারা রূঢ়-বাস্তবের মধ্যে মানুষ, তাদের চারিদিকে জ্বলন্ত বাস্তবতা, মূলতঃ বস্তু-তান্ত্রিক, এবং অজস্র ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আশাবাদী—সর্বহারা শ্রেণীচরিত্রের এই মানসিকতাটুকু পোস্টমাস্টারের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৈপরীত্যে কী অসামান্য ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর এই অমর ছোট গল্পটিতে।

বলা বাহুল্যমাত্র, সত্যজিৎ রায় মূল গল্পটির এই গূঢ় কিন্তু অভ্রান্ত বক্তব্যটি—দুটি শ্রেণীচেতনার বৈপরীত্য) ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বটি—তাঁর ছবিতে ধরতে পারেন নি। এটাই ছবির সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য। তা না হলে ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার, রতন, তার গ্রাম যেন জীবন্ত ধরা পড়েছিল—এমন অনবদ্য বহিরঙ্গের চিত্রণ তুলনাহীন, কিন্তু গল্পের essense বা সারবত্তা তো শুধু বহিরঙ্গে নয়, তার মূল বিষয়ে—এটাও স্মর্তব্য।

(চলবে)

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৬৮

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

সতীশ, তারিনী ও একদল বাউরি উঠোনে বসে। সতীশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকায়।

সতীশ : এই যে !…সেই কখন থেকে বসে আছি তোমার লেগে !

দেবু : কেন রে ?

সতীশ : আজ সনজেবেলায়…বুড়ো শিবতলায়…ঘেঁটুর আসর। আমাদের তারিনী গান বেঁধেছে গো—জব্বর গান !

বিলু : (বারান্দা থেকে) এবার কি নিয়ে,—সতীশ দাদা ?

সতীশ : হেঁ হেঁ এখন বুলব ক্যানে ?…আগে সনজে হোক—তোমরা সবাই এসো,—আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে…ফুলের মালা গলায় পইরে…ঢোলের ওপর যখন কাঠির চাটিটি পড়বে—

তাক্‌ধিনা ধিন্ তাক্‌ধিনা ধিন্

তাক্‌ধিনা ধিন্ তাক্‌ধিনা ধিন্…

বলেই সতীশ নাচতে আরম্ভ করে। ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৯

স্থান—বুড়ো বটতলায় ঘেঁটু গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঢোলের ক্লোজ শট্ থেকে ক্যামেরা সরে এসে সম্পূর্ণ আসরটিকে ধরে। বাউরিরা সব আসরে বসে। দ্বারকা চৌধুরী, বরেন, জগন সবাই সেখানে উপস্থিত। যতীন বসে আছে একটি চেয়ারে। জগন এবং বরেন দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে আরেকটি চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

গান :—

এক ঘেঁটু তার সাত বেটা

শিব শিব রাম রাম

সাত বেটা তার সাতান্ত

শিব শিব রাম রাম

… … …

… … …

… … …

ভূমিকা শেষ হবার পর তারিনী আর তার দল আসরে গাইতে নামে।

তারিনী :

দেশে আসিল জরিপ

দেশে আসিল জরিপ

রাজা পেজা ছেলে বুড়োর বুক ঢিপ্ ঢিপ্

দেশে আসিল জরিপ

কাট্ টু।

যতীন : বাঃ !…এ যে একেবারে খবরের কাগজের রিপোর্টিং !

দেবু : তাই নিয়ম। যে বছর যা ঘটে আর কি !

যতীন : আচ্ছা !

তারিনী গান গেয়েই চলে—

… … …

… … …

কুঁচবরণ রাঙা ঠোঁট তারার মত ঘোরে

দস্ত কড়মড়ি বলে "এই উল্লুক, ওরে !"

হায় কলিতে মাটি কাটে না

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

… … …

…ও সে আর সইতে পারে না

কাট্ টু

দেবু : এ কি ?

যতীন : (হেসে) যে বছর যা ঘটে আর কি !

কাট্ টু।

তারিনীর গান-

…দেবু কারো ধার ধারে না

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

… … …

…তবু ঘোষের মন টলে না

কাট্ টু।

ভিড়ের মধ্যে পদ্ম, বিলু, দুর্গা, অশ্রুসজল রাঙাদিদি। বিলুর চোখে একটু গর্বের ভাব।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

…দেবতা নইলে হায় এ কাজ কেউ পারে না-

কাট্ টু

অনিরুদ্ধর মুখের ওপর ক্যামেরা চার্জ করে। দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা সে যেন বুঝতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। গানও শেষ।

সতীশ, তারিনীর দল এসে দেবু পণ্ডিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

যতীন : বাঃ ভারি সুন্দর! তুমি বেঁধেছো?

জগন : খাসা হয়েছে!…কিন্তু এটা কি হল?

তারিনী : এজ্ঞে?

জগন : ফুলের মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম, এটা বাদ পড়ল কি করে? …মালা আছে…গলা আছে…অথচ আমি নাই!…বাঃ! বেশতো!

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

Mixes into

দৃশ্য—২৭০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

চোখ বাঁধা পদ্মর ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় সে উচ্চিংড়ে ও কতগুলো পাড়ার ছোট ছেলের সঙ্গে কানামাছি খেলছে।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ—

পদ্ম হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে যায়

এক হাতে কুড়ুল, আরেক হাতে দুটো নতুন বাঁশের খুঁটি নিয়ে ঢোকে অনিরুদ্ধ, থেমে দাঁড়িয়ে একবার পদ্মর দিকে তাকায় সে।

কাট্ টু।

পদ্ম অবাক।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ভাঙাচোরা কামারশালের কাছে গিয়ে খুঁটি দুটো রাখে। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা শাবল এনে গর্ত খুঁড়তে থাকে।

কাট্ টু।

পদ্ম এবং ছেলেরা অনিরুদ্ধকে দেখে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে সব চোখ এখন তার দিকে।

অনিরুদ্ধ : (এক মুহূর্ত থেমে) একটা ঝাঁটা।

কাট্ টু।

পদ্ম বারান্দা থেকে একটা ঝাঁটা এনে অনিরুদ্ধর কাছে যায়। মাটিতে রেখে দেবে কিনা ভাবে।

অনিরুদ্ধ : এখানে নয়। ভেতরটা সাফ্ কর। ফের কামারশাল বসাবো আমি।

কাট্ টু।

ক্যামেরা পদ্মর ওপর চার্জ করে। সে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক চোখে সে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : (ধমকের সুরে) হাঁ করে দেখছিস কি? পারি না, না কি?…ওপারের কাবলি চৌধুরী…ট্যাকা ধার দেবে বুলেছে। এক বছরের জন্যে জমিটা বাঁধা রইল তো কি হল?…এখনো গায়ে তাগদ আছে…খাজনাটা শুধে দেব…আর কলে একটা চাকরি লেব। সন্ঝেবেলা বাড়ি ফিরে এখানেই টুকটাক যা হোক—দেবু ভাই আজ গাঁয়ের রাজা…সবার মাথার মণি…আর আমি…কেশব কামারের ছেল্যা…ছিতু কামারের নাতি…মুখ দিয়ে যখন বলেছি বসাবো তো বসাবো।

অনিরুদ্ধর এই কথাগুলো বলার সময় পদ্ম আস্তে আস্তে কামারশালে ঢুকে পড়ে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

সে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে আবেগ সামলে নেয়।

তারপর কেঁদে ফেলে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭১

স্থান—পলাশ মহুয়ার জঙ্গল।

সময়—দিন।

মিষ্টি সুর বাজছে বাঁশিতে। থোকা থোকা ফুলে ঢাকা পলাশ গাছের ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান্ করে যায়। টিল্ট ডাউন করে দেখায় দুর্গা একটা ঝুড়িতে মহুয়া ফুল কুড়োচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—দুর্গার হাত মহুয়া ফুল কুড়োচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট-আপ করে দুর্গার মুখ দেখায়। দূরে কিছু দেখে সে থমকে যায় তারপর এগিয়ে চলে।

কাট্ টু।

লং শট। যতীন একটা গাছের তলায় বসে আছে। বাঁশিটা সেই বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—বিস্মিত দুর্গা।

কাট্ টু।

যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা যতীনকে দেখে।

কাট্ টু।

যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

একটু পরেই দুর্গা আবার ফুল কুড়োতে শুরু করে।

কাট্ টু।

যতীন হঠাৎ দুর্গাকে দেখতে পায়।

যতীন আরে!...কি কুড়চ্ছ?

দুর্গা মৌ-ফুল।

যতীন কি ফুল?

দুর্গা মহুয়া ফুল বাবু। আমরা বলি মৌ-ফুল।

যতীন (উঠে আসতে আসতে) কি হয়...ওতে?

দুর্গা গরুকে খাওয়ালে দুধ বাড়ে, আর—

যতীন আর?

দুর্গা (লজ্জার হাসি হেসে) সে আপনার শুনে কাজ নাই।

যতীন : কেন?

দুর্গা : আমরা একরকম খাবার জিনিষ তৈরী করি তো! ...কাঁচাও খাই...ভারি মিষ্টি—

যতীন : (হঠাৎ হাত পেতে) কৈ, দেখি—

দুর্গা : হেই মা!

যতীন : কি হল?

মুহূর্তের জন্য দুর্গা চমকে ওঠে। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে।

দুর্গা : হি হি...আপুনি বড় খ্যাপা বটে! আমার ছোঁয়া কি খেতে আছে?

যতীন কেন? নেই কেন?

দুর্গা (ম্লান হেসে) আমরা যে বায়েন!

যতীন বায়েন?

দুর্গা মুচী বাবু।

যতীন আরে ধুত্তোর মুচী!

হঠাৎ সে দুর্গাকে ছুঁয়ে ফেলে। ওর হাত থেকে কিছু মহুয়া ফুল তুলে নেয়।

দুর্গা : (বিস্মিত হয়ে) ই কি!!

যতীন : কেন?...ওসব জাত-টাত আমি মানিনে!...যে পরিষ্কার...তার ছোঁয়া খেতে কোনও দোষ নেই।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। কয়েক মুহূর্ত যতীনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় দুর্গা, তারপর বলে—

দুর্গা : আমি খুব পেস্কের নই বাবু!

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন দুর্গাকে দেখে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দুর্গা।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন। এই মুহূর্তে যতীন যেন দুর্গার আসল পরিচয়টা পেল।

কাট্ টু।

দুর্গা : এ দিগরের ভদ্দরনোকেরা...দিনমানে কক্ষণো আমাকে ছোঁয় না।...রাতে পায়ে গড় কত্তে কুনো দোষ নাই। আপনিই পেথম...দিনমানে ছুঁলেন। (যতীনের দিকে তাকিয়ে একটু এগিয়ে আসে) আমিও এট্টু ছোঁব বাবু?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন। সে দুর্গার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারে না।

হঠাৎ দুর্গা এগিয়ে এসে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে। তারপর

হঠাৎই যতীনকে ফেলে রেখে দ্রুত পায়ে চলে যায়। সে হতবাক।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭২

স্থান—কাবলি চৌধুরীর দোকান।

সময়—দিন।

কাবলি চৌধুরী একগোছা টাকা আর একটা স্ট্যাম্পড্ কাগজ এগিয়ে দেয়।

কাবলি : নে, এইটায় একটা টিপছাপ দে।

অনিরুদ্ধ : (টাকাটা পকেটে রেখে) আমি সই কত্তে জানি, ...দ্যান্, কলমটা দ্যান্।

সে কলমটা দেখিয়ে দেয়।

কাবলি : (চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে) অঁ।

অনিরুদ্ধর হাতে কলমটা দিয়ে সে বলে—

কাবলি : দেখিস, কলম ভাঙিস নে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭৩

স্থান—গ্রামের বাইরে কোন জায়গা, কালবৈশাখী ঝড়ের সময়।

সময়—দিন।

পাখোয়াজ বাজছে। ক্যামেরা কালো মেঘে ঢাকা আকাশের ওপর প্যান্ করে।

ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে দেখায় অনিরুদ্ধ দূর থেকে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ। সে আকাশের দিকে তাকায়। হাতে ধরা ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে।

কাট্ টু।

আকাশে মেঘের ভিড়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ হাসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কালবৈশাখী ঝড়ের অনেকগুলি দৃশ্য আছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭৪ থেকে ২৭৮ গ্রহণ করা হয়নি।

দৃশ্য—২৭৯

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ী।

সময়—দিন, ঝড় চলছে।

দেবু পণ্ডিত টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। বিলু ঘরে ঢুকে দেবুর হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যায় বাইরে।

বিলু : এসো,—মজা দেখবে এসো—

দেবু : ছাড়ো...ছাড়ো...দাও আমায় দাও...

বিলু : উঃ মা গো!

কাট্ টু।

তারা জানলার কাছে আসে।

রাধা-কৃষ্ণের বাঁধানো ছবিটা ঝড়ের বাতাসে দেয়াল থেকে পড়ে যায়।

দৃশ্য—২৮০-২৮২ গ্রহণ করা হয়নি।

দৃশ্য—২৮৩

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—দিন, ঝড় চলছে।

টপ্ শটে দেখা যায় বায়েনপাড়ার কুঁড়েঘরগুলোর চালা ঝড়ের বাতাসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে একসময় উড়ে যায়।

মেয়ে পুরুষ বাচ্চারা চীৎকার করতে করতে সেই সব ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

একটা লোক ডান দিকের ফ্রেমে ঢোকে।

সামাল!...সামা-ল—!!

মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে থাকে।

ধুলো আর শুকনো পাতায় ভরে যায় সারা ফ্রেম।

হঠাৎ একটা উড়ে আসা চাল ক্যামেরার লেন্সের সামনেই এসে পড়ে যায়।

বৃষ্টি শুরু হয়।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বাউড়ি মেয়ে পুরুষরা আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত।

মিক্সেস ইন্টু।

(চলবে)

CHITRA-BIKSHAN ::
Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 December 1979 Vol. 13 No. 3

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta-2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12.

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র
ত্রয়োদশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারী, '৮০
চিত্রবীক্ষণ
বিষয়সূচী
নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ পাচ্ছেনা কেন ? / তিন
লুই বুনুয়েলের প্রথম পর্বের ছবি, মগ্নচৈতন্যবাদ, মার্কসবাদ / র‍্যাণ্ডল কনরাড, অনুবাদ : পবিত্র বল্লভ / পাঁচ
সত্যজিৎ চলচ্চিত্র : রবীন্দ্র সাহিত্যভিত্তিক / অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় / উনিশ
তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার / তেইশ
সম্পাদক : অনিল সেন
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি, বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ পাচ্ছেনা কেন ?

বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলে বেশ কিছু ফিল্ম সোসাইটি কাজ করে চলেছেন যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে, আশাপ্রদ প্রত্যয়ের সঙ্গে। কলকাতা শহরেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে সক্রিয় শরিক হিসেবে এগিয়ে এসেছেন নতুন একটি সংস্থা। বিভিন্ন জেলা শহর ও সাব ডিভিসনাল টাউনে নতুন নতুন ফিল্ম সোসাইটি যথেষ্ট কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে।

নতুন উৎসাহ, নবীন প্রাণচাঞ্চল্য পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, চলচ্চিত্র মনস্কতা এক নতুন সম্ভাবনাকে আসন্ন করে তুলছে। কাজেই এখন প্রয়োজন এই আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ চেহারায় সংগঠিত করা। এবং এব্যাপারে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

অথচ আশ্চর্যের কথা ফেডারেশন এক নিস্পৃহ অনীহা নিয়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের এই ক্রমবিস্তারকে লক্ষ্য করছেন। শুধুমাত্র উদাসীন নিরাসক্তিই কিন্তু ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করছেনা, প্রায়শঃই ফেডারেশন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের এই বিস্তারকে এবং নতুন উদ্যোগগুলিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন সক্রিয়ভাবে।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা যখন নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দূতাবাসের ছবি আনিয়ে এবং সেন্সর করিয়ে এই জাতীয় সোসাইটিগুলির অনুষ্ঠান-সূচীকে অব্যাহত রাখতে সাধ্যমত সাহায্য করছেন তখন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাত তুলে এই প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চেষ্টা চালিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের কাছ থেকে সেন্সরসিপ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার একচেটিয়া অধিকারকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে ফেডারেশন নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলির কার্যক্রমকে বানচাল করার চেষ্টা করে এসেছেন এতদিন ধরে। ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয় এই অজুহাতে ফেডারেশন নতুন সোসাইটিগুলি যাতে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ থেকে ছবি না পান তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। নতুন সোসাইটিগুলি যাতে প্রমোদ কর থেকে অব্যাহতি পায় বা সহজে পুলিশ লাইসেন্স পেতে পারে এমন কোন সহায়ক প্রচেষ্টা ফেডারেশন থেকে নেয়া হয়নি একই অজুহাতে। বরং বহুক্ষেত্রে উল্টো প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

এই চিত্রটি কিন্তু একান্তভাবেই পূর্বাঞ্চলীয়। পশ্চিমবাংলা এবং পূর্বাঞ্চলীয় নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলিই এই বৈষম্য ও বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার হচ্ছেন। দক্ষিণ, উত্তর বা পশ্চিম অঞ্চলে এই চেহারাটা একেবারেই বিপরীত, ওই সব অঞ্চলে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আবেদনকারী নতুন সংস্থাগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ পেয়ে যাচ্ছেন। আর পূর্বাঞ্চলের চিত্রটি এই রকম, ফেডারেশনের সদস্যপদ পাননি এমন সংস্থা সমূহের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশটি। এঁদের মধ্যে এমন অনেক সংস্থা রয়েছেন যাঁরা প্রায় তিন বছর ধরে কাজ করে চলেছেন এবং যথেষ্ট ভালোভাবে।

কাজেই ফেডারেশনকে এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করে এখনই এই সোসাইটিগুলিকে সদস্যপদ দিতে হবে। ফেডারেশনের সংবিধানে দু-ধরনের সদস্যপদ রয়েছে পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য। সহযোগী সদস্যের সন্তোষজনক ছয়মাস কার্যকলাপই তাকে পূর্ণ সদস্য-পদের অধিকারী করে তোলে। কাজেই নতুন আবেদনকারী সংস্থাগুলিকে সহযোগী সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়।

আর ফেডারেশন যদি এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ না করেন তাহলে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং বাইরের সংস্থাগুলিকে এক ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম নিতে হবে, দৃঢ়ভাবে ফেডারেশনের কাছে দাবী জানাতে হবে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে ফেডারেশনের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে, কেননা ফেডারেশনের শুধু অধিকার থাকবে, কোন দায়িত্ব থাকবেনা—এ চলতে পারে না।

ফেডারেশন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপে ক্রমশঃই এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলছেন যে অন্তত পশ্চিমবাংলায় ফেডারেশন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন নয়। ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের সর্বনাশা নীতি কিন্তু ফেডারেশনে ভাঙনের পথকেই প্রশস্ত করছে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্ম সূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)— এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে— এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১) **যোগাযোগ করুন।**

লুই বুনুয়েলের প্রথম পর্বের ছবি, মগ্নচৈতন্যবাদ, মার্কসবাদ

র‍্যাণ্ডল কনরাড

অনুবাদ : পবিত্র বল্লভ

'দি গোল্ডেন এজ'-এর চূড়ান্ত দৃশ্যে দেখা যায় যে ছবির নায়ক নায়িকা—যারা পরস্পরের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক নিবৃত্তিতে সর্বদা বাধা পায় ও যাদের মাজোর্কান নামক এক বিধ্বস্ত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সবসময় হয়রান করে—চরম আঘাত পাচ্ছে। প্রচণ্ড ফর্মাল এক অভ্যর্থনায় অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত, তখন প্রণয়ীযুগল বাগানের গোপনীয়তায় চুপি চুপি সরে পড়ে এবং পারস্পরিক খামচাখামচি শুরু করে দেয়—বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তা বা নিজেদের জামাকাপড়ের অসুবিধে সত্ত্বেও, যদিও জামাকাপড় খোলার দিকে তাদের কারোরই নজর নেই। শীঘ্রই একজন ভৃত্য তাদের আনন্দে বাধা দেয়। ভৃত্যটি ঘোষণা করে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী (Minister of the Interior) ফোনে নায়কের সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে চান। প্রেমিকটি ক্রুদ্ধ হয়ে ফোনের দিকে এগোয়।

লাইনের অন্য প্রান্তে অবিশ্রান্ত অভিযোগ নিক্ষেপকারী রাগান্বিত এক শুভ্রশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এবম্বিধ আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে প্রেমিক প্রবরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কূটনৈতিক কর্তব্য অবহেলা করেছে এই অক্ষমনীয় বিচ্যুতির ফলে নির্দোষ স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বুনুয়েল কাট্ করে সংবাদচিত্রে চলে যান—দৃশ্য হয় মারদাঙ্গা জনতা জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে রণাক্রান্তদের পলায়ন। ক্রুদ্ধ প্রেমিকটি তড়পে ওঠে। "কেবল এই কথা বলার জন্য আমাকে বিরক্ত করলেন? আপনার প্যানপ্যানানির নিকুচি করেছে। আপনি মরে পড়ে থাকলেও আমার মাথাব্যথা নেই।" অসম্মানিত মন্ত্রী শেষ অপমান ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করলেন, কিন্তু গুলির শব্দ প্রেমিকটি শোনেইনি. ইতি-মধ্যেই তার একমাত্র বাস্তব প্রেমিকার কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে, তাদের আচরণ ক্রমশ অস্বস্তিজনক হয়ে দাঁড়ায়, পরস্পরকে আঘাত করতেই তখন ব্যস্ত তারা। প্রণয়যুদ্ধে ইনহিবিশনই জয়ী হয়, বয়স্ক এক মাজোর্কানের জন্য স্ত্রীলোকটি তার প্রেমিককে ত্যাগ করে। শেষ সিকোয়েন্সটি পরিণত হয় অক্ষমতা ও বিকৃতির প্রতীকে।

'দি গোল্ডেন এজ' (L'Age D'or, France 1930) লুই বুনুয়েলের প্রধান মগ্নচৈতন্যবাদী ছবি এবং টেলিফোনের দৃশ্যটি মগ্নচৈতন্যবাদ ও বুনুয়েলের ছবির কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

একটি সামাজিক বাস্তবের পুনর্সৃষ্টি এবং পর্দায় পরিচিত চরিত্রের উপস্থাপন—এরকম প্রথাসিদ্ধ ন্যারেটিভের বিপরীত প্রান্তে আমরা উপস্থিত হই। বুনুয়েলের নায়কের সঙ্গে নিজেদের আইডেন্টিফাই করার দরকার নেই। বুর্জোয়া গণ্যমান্যদের অপমান করার সময় নায়ককে কৌতুকপ্রদ মনে হয়, কিন্তু যখন সে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে, জনগণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় কিংবা এমন একটা প্রেমের দৃশ্যে গুছিয়ে বসে যেখানে রক্ত ও হত্যার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক তৈরি হয়, তখন আমরা শকড্ হই। বুনুয়েল চরিত্রগুলির উত্তেজিত ও বাস্তবরীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত আচরণ উপস্থাপিত করেন। প্রত্যেক সিকোয়েন্সের যতটা দরকার ততক্ষণই চরিত্রগুলি পর্দায় থাকে—যেন স্বপ্নে দেখা চরিত্র, বাস্তব পৃথিবী থেকে যারা আহরিত অথচ কোন না কোন প্রতীকী বৈশিষ্ট্যের জন্য যাদের স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে নির্বিকার সমাজের মধ্যে বুনুয়েলের নায়ক বন্ধুর অথচ মহান পথ তৈরি করে নেয়—সেটি নিশ্চিতই সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার সমাজ। কিন্তু বাস্তব আইডেন্টিফিকেশনের চেষ্টা বাধা পায় একপ্রকার উচ্ছ্বসিত প্রতীকীবাদে—ছবির ঘটনাটি ঘটে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রোমের শাসকশ্রেণী মাজোর্কানদের মধ্যে।

'দি গোল্ডেন এজ' ছবির জড়বস্তুও স্বপ্নবস্তুর দ্বৈত দ্যোতনা লাভ করে—স্পর্শযোগ্য জড়ত্ব যুক্ত হয় এমন এক প্রতীকীবাদের সঙ্গে যা একই সঙ্গে সহজ ও রহস্যময়। এই প্রতীকগুলিকে বুনুয়েল খুব প্রাধান্য দেন না, বাস্তবের ও ঘটনার অংশ হিসেবেই তাদের ব্যবহার করেন, প্রায়ই তারা যেন একটুকরো কমেডির মঞ্চোপকরণ। লাঙল, অগ্নিময় সবুজ প্রান্তর এবং খড় পোরা জিরাফ—এগুলি নিঃসন্দেহে হতাশ প্রেমিকের 'State of erection'-এর প্রতীক। (অন্তত যৌন প্রতীকের প্যারডি—মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার বিষয়ে আধুনিক প্রিটেনশনের বুনুয়েলকৃত বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ)। তবু সিনেমা হিসেবে তাদের কার্যকরী হবার কারণ এই যে বুনুয়েল তাদের অসমানুপাতিক আকার

ও তার, তাদের বাস্তবতা অনুভব করতে আমাদের বাধ্য করেন, যখন নায়ক সোৎসাহে ও অদ্ভুতভাবে সেগুলিকে অনুপস্থিত প্রেমিকার জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে।

'দি গোল্ডেন এজ'-এর সমাজের চিত্র এই দ্বিমুখী প্রতীকীবাদের ওপর নির্ভরশীল। আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বা প্রামাণ্য শহরচিত্র বা মাজোর্কানদের ককটেল রিসেপশন, যা-ই তিনি উপস্থাপিত করুন না কেন—এই বাস্তবগুলির অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ তাৎপর্য অথবা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়বিধ প্রতীকীবাদ আছে। আমাদের আলোচ্য আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। বাহ্যত তিনিই রাষ্ট্র, স্বাদেশিক কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য তিনিই বলবৎ করেন। একই সঙ্গে মন্ত্রীর আহ্বান যেন ব্যক্তির অপরাধী বিবেকের অনুতাপ প্রার্থী আন্তরকণ্ঠ।

এইভাবে বুনুয়েলের নায়কের রাজনৈতিক বিদ্রোহ প্রধানত ধর্ম-বিরোধী আচরণের একটি দিকই হয়ে দাঁড়ায়। চার্চের শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বর পৃথিবীর মুক্তির জন্যই মানব রূপ গ্রহণ করেছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। বুনুয়েলের ছবিতে প্রেমিকটি ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মন্ত্রীকে আত্মহত্যা করতে যে উত্তেজিত করে আবার মন্ত্রীর মৃত্যুকালীন কথাগুলো অবহেলাও করে (বস্তুত, ফোনটা সে ভেঙে ফেলে)। প্রত্যাখ্যাত মন্ত্রীই যে রাষ্ট্রশক্তি ও বিবেকের প্রতীক তার সূত্র আমরা পেয়ে যাই আত্মহত্যার দৃশ্যটির প্রয়োগের মধ্যে। রিসিভারটি পড়ে গিয়ে মাটির দিকে ঝুলতে থাকে কিন্তু মন্ত্রীর নিষ্প্রাণ দেহটি মাধ্যাকর্ষণকে তুচ্ছ করে একটি অলঙ্কৃত ঝাড়লণ্ঠনের পাশে সিলিংয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে—মন্ত্রী স্বর্গে দেহত্যাগ করেন। তার বাণী থেকে যায় অশ্রুত।

'দি গোল্ডেন এজ' নিপীড়ক সমাজকে আক্রমণ করে বটে, কিন্তু বুনুয়েলের কাছে সামাজিক নিপীড়ন আর ব্যক্তিগত সংস্কার (inhibition) একই বাস্তবের দুটি দিক মাত্র। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর দ্বিমুখী প্রতীকীবাদের সাহায্যে বুনুয়েল বাইরের বন্দীশালা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী রোম, খ্রীস্টীয় সভ্যতা, বুর্জোয়া সমাজ অন্তর্নিগড় ঃ এক অপরাধবোধ যা আনন্দকে অস্বীকার করে। প্রবৃত্তিকে দমন করে আর মানুষকে করে তোলে আপোষপ্রিয়—এই দুইয়ের মধ্যে এক ডায়ালেকটিককে প্রকাশ করেন। প্রতিটি দিকই অপর দিকটির প্রতিচ্ছবি ঃ উভয়ে তৈরি করে একটি অবিভাজ্য সমগ্র, আর বুনুয়েলের লক্ষ্যই হল এই সমগ্রটি।

বুনুয়েলের কাছে কামনাই মুক্তির চাবিকাঠি, কামনাই মানবিক আচরণের উৎসমুখ। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর নিখুঁত আদর্শগত পরিপূরক হল ফ্রয়েডের সমসাময়িক গবেষণা 'Civilisation and its Discontents'—যৌনকামনার শুদ্ধিকরণে যে সভ্যতার জন্ম, ব্যক্তির পরিণতিতে যে কার্যপ্রণালীর প্রকাশ। অশুদ্ধিকৃত যৌনতা সভ্যতার সমস্ত কীর্তিই নষ্ট করতে চায়, তাই তার বহিঃপ্রকাশকে দমন করার অবাঞ্ছিত অথচ অপরিহার্য দায়িত্ব সমাজকে নিতে হয়, অপরাধ-বোধ দিয়ে প্রবৃত্তিগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হয়। বুর্জোয়া তথা সর্বপ্রকার সমাজের কলঙ্কস্বরূপ এই সত্যকে উন্মোচিত করার মধ্যেই বুনুয়েলের মৌলিকত্ব নিহিত।

যাই হোক, যৌনতা রূপ পায় প্রতীকের, যে সব প্রতিষ্ঠান যৌনতার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে তাদেরই দেহে তা মূর্ত হয়ে ওঠে; যা সমানভাবে দেখা যায় শ্রদ্ধেয় স্মারকস্তম্ভে কিংবা রাস্তার সাইনবোর্ডে। 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে নায়ক, কিছুটা অচেতনভাবে কিছুটা প্রবৃত্তির তাড়নায়, সামনে যা পায়—হাতের ক্রিম, সিল্কের মোজা কিংবা কেশচর্চার শস্তা বিজ্ঞাপনও—তাকেই, সমাজ তার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে যাকে সেই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে যৌন হ্যালুশিনেশন উদ্দীপ্ত করার কাজে লাগায়। 'প্রখ্যাত নগরীর বিভিন্ন ছবির মত বৈশিষ্ট্য' শিরোনামায় একটি নকল ভ্রমণসংক্রান্ত সিকোয়েন্সে নাগরিক পরিবেশে প্রত্যহ দেখা স্মৃতিস্তম্ভগুলির যৌনচারিত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ এক জোড়া 'নিম্ফ' কিংবা 'কিউপিড' একটা মোটা স্তম্ভকে, যার থেকে ফোয়ারার মত জল বেরুচ্ছে, আদর করছে, পিছন থেকে একটি মূর্তিকে মনে হচ্ছে যেন পোষাক খুলছে; সদর, বেড়া, খোলা দরজা পুরুষ ও স্ত্রী দেহের অনুষঙ্গ আনে। একটি সাব-টাইটেল রাজতন্ত্রী রোমের কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে এই উপমাটি দিয়ে—'ভ্যাটিকান, ধর্মের দৃঢ়তম স্তম্ভ।'

সুতরাং চারপাশের এই ইঁট-কংক্রীটের নিপীড়ক সভ্যতাকে একমাত্র তখনই আঘাত করা সম্ভব যখন আমাদের দৃষ্টি প্যাশনে শানিয়ে ওঠে। নকল তথ্যচিত্রে দেখা যায় নির্জন রাস্তায় একসারি বাড়ির সামনের ভাগটা বিস্ফোরণের ঢেউয়ে ভেঙে পড়েছে। অবশ্য 'দি গোল্ডেন এজ'-এর অধিকাংশে সাম্রাজ্যবাদী রোমের অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ঃ যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই তাদের কাছে সমাজ অনড় অভেদ্য।

অভেদ্য, এবং অপরিবর্তনীয়ও বটে। মাজোর্কানরা তাদের আনুষ্ঠানিক উৎসব (self celebration) চালিয়ে যায়, ওদিকে তাদের ভৃত্যরা মাঝে মাঝে ঈশ্বরের শিশুবধ (মালীর দৃশ্য) কিংবা আত্মহত্যার (মন্ত্রীর দৃশ্য) আধ্যাত্মিকতাহীন রক্তাক্ত মিথের পুনরাভিনয় করে। প্রায়ই এই অপরিবর্তনীয় সমাজই হয়ে ওঠে বিস্ফোরণ, আক্রমণ, একটা দুর্বোধ্য ঘটনার ক্ষেত্র, যদিও মাজোর্কানরা থাকে অবিচলিত। যৌনতাতেই নিজের সৃষ্টি—এই সত্যটা আত্মসংরক্ষণের স্বার্থে সমাজ দৃঢ়ভাবে অবহেলা করে। তাদের একমাত্র শত্রু বুনুয়েলের অনুতাপহীন নায়ক কারণ যে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত, তথাপি সমাজকে

অতিক্রম করতে কিংবা নিজের প্যাশনের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে সেও ব্যর্থ।

'দি গোল্ডেন এজ'—এর আগে একই থিম ও প্রতীকীভাষায় 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' নামক একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি বুনুয়েল করেন। পুরুষ চরিত্রটি—পুরুষ হলেও যৌনাগম যার এখনো প্রতিহত—এক পরিণত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য নিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাস্যকর সহিংস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় (যদিও স্ত্রীলোকটি তার পাগলামিকে পাত্তা দেয় না)। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর নায়ক যেমন মন্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। তেমনি 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ'-এর নিজের সুপারইগোকে গুলি করে হত্যা করে, এই সুপার-ইগো তার নিজেরই প্রাপ্তবয়স্ক রূপ যে চায় সে বড় হোক, সঠিক আচরণ করুক। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর মতই। অবশ্য, আত্ম-মুক্তির এই অভিব্যক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাণিপ্রার্থীর মুখের ওপরই নায়িকা দরজা বন্ধ করে দেয় এবং একজন পরিণত, বিবেচক মানুষের সঙ্গে চলে যায়।

কেন্দ্রীয় দৃশ্যে দেখা যায় নায়ক ও স্ত্রীলোকটি ওপরের জানলা থেকে রাস্তা দেখছে। একটি দুর্ঘটনা দেখে স্ত্রীলোকটির জন্য নায়কের কামনা বেড়ে যায়। এটা আরো বেশী হয় কারণ লোকটি ঘটনার আগেই মৃত্যুর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য উত্তেজিত হয়েছিল।

জীবনীশক্তি ও অন্যের মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এই দৃশ্যটির তুলনায় একটি দৃশ্য 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে আছে। যেখানে মন্ত্রীর প্রতি নায়কের স্পর্ধিত প্রত্যুত্তর বহির্জগতে তার কামনার ফলে সংঘটিত মানুষের ধ্বংসের তথ্যচিত্রের মধ্যে বুনুয়েল ইন্টারকাট করেন।

'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' চিত্রে অন্যান্যদের মত মৃত চরিত্রটিও কোন ভিন্ন লোক নয়—নায়কেরই প্রোজেকশন। এক্ষেত্রে কাটাহাতটি ইন্দ্রিয়জ আনন্দ থেকে নায়কের বিচ্ছিন্নতার প্রতীক এবং মৃত লোকটি সেই প্রতীকের ওপর প্রোথিত এক অনিশ্চিত যৌনতার প্রাণী। যৌনপরিণতির জন্য নায়কের এই দিকটাকেই আগে মারতে হবে। অন্য দিকে, 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে, অতর্কিত ধ্বংসে যে জনতা বিনষ্ট হয় (যার কারণ নায়কের সক্রিয় বিসমকামিতা hetero sexuality) তারা নিশ্চিত অন্য মানুষ, নায়কের চেতনাবহির্ভূত; এবং তারা আরো বেশি বাস্তব, কারণ বুনুয়েল তাদের চিত্রায়ণে আসল ঘটনার ফুটেজ ব্যবহার করেন।

উল্লিখিত তুলনাটি 'আন্দালুসিয়ান ডগ' ও 'গোল্ডেন এজ'-এর প্রধান পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করে। 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' মনোজীবনের রূপক, এর প্রতীক আবেগানুভূতির একমাত্র সাবজেক্টিভ প্রান্তকে প্রতিভাত করে। অন্যদিকে, প্রতীকগুলির দ্বৈত চরিত্রের জন্য, 'দি গোল্ডেন এজ' হয়ে উঠেছে সমাজ ও তার স্বপ্নের পূর্ণ কিংবদন্তী। একই সময় ছবিটি সমাজকে আক্রমণ করে, সংঘাতগুলিকে করে পরিস্ফুট।

অধিকন্তু, যে সমাজকে তিনি আক্রমণ করেন সেটা আমাদেরই এই বুর্জোয়া সমাজ। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর অন্তর্ঘাতী মৌলিকতাকে প্রায়ই মার্কসবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। বুনুয়েলের শ্রেণীসচেতন বক্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিশেষ দৃশ্যকে নির্দেশ করা যায়। ককটেল, ডিনারের পোষাক, গার্ডেন, গম্ভীর আলাপ—রিসেপশনের সব কিছুই চলতে থাকে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে অকারণ বাধাও আসছে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ হচ্ছে বলক্রমে শস্তা মদ্যপানরত তিনজন শ্রমিক চালিত ঘোড়ায় টানা ক্ষেতের গাড়ির সশব্দ উপস্থিতি। পার্টির মধ্য দিয়ে শব্দ করতে করতে অপেক্ষাকৃত বড় ওয়াগনটি সোজা বিপরীত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু অতিথিরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন না। প্রত্যেকেই সেটাকেই দেখে, কিন্তু কেবল কয়েকজন কথাবার্তা না থামিয়ে একটু আলতো সরে দাঁড়ায়।

অবশ্য এটি একটি বিতর্কমূলক দৃশ্য। পরস্পর বিরোধী শ্রেণীগুলির বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সুপ্ত ক্ষমতার চিত্রকল্প হিসেবেই বুনুয়েল এটিকে এঁকেছেন। তবে সেই সুপ্ত ক্ষমতাকে মাজোর্কানরা মোটেই ভয় পায় না। তাছাড়া, সর্বহারার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি ব্যতিক্রম বই কিছু নয়। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেণীসম্বন্ধ মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক নয়, বরং সেটাকে বলা যেতে পারে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজকে বাস্তবতার পূর্ববর্তী পৃথিবীতে বর্তমান ক্ষমতা, আনুগত্য, সন্তোষবিধান ইত্যাদির ভূমিকার প্রতীকীকরণের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এক সম্পর্ক। সেই পৃথিবী অভিজাতের, অহংবোধের।

তবু বিদ্রোহী নায়ক ও তারই জন্য নিশ্চিহ্নপ্রায় জনসমষ্টির মধ্যে যে সম্পর্কটি বুনুয়েল প্রতিষ্ঠা করেন, মার্কসবাদী দর্শকের কাছে সেটিকে আরো বেশী সমস্যাসংকুল মনে হবে আশা করা যায়। তাদের পরিণতি তাকে কোনভাবেই বিচলিত করে না; "তোমার প্যানপ্যানানির নিকুচি করেছে।" কামনাদগ্ধ মানুষের কাছে অন্য মানুষের ভবিষ্যতের কোন গুরুত্বই নেই; কেবল প্রথাগত মানসিক বন্ধনই নয় (পরিবার, রাষ্ট্র, ক্রিশ্চিয়ান প্রেম), রাজনৈতিক ঐক্যও শূন্যতায় সংকুচিত।

যথাসম্ভব সহজভাবে বুনুয়েল এবম্বিধ বিরোধিতাকে চিহ্নিত করেছেন। তা সত্ত্বেও, তথ্যচিত্রের কিছু শটে দৃষ্ট, জনতা পুলিশের অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে—সম্ভবত এই ঘটনা থেকে

ইঙ্গিত দিয়ে একজন সমালোচক সামান্য অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিকোয়েন্সটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন ।

'হুতাশায় এই দৃশ্যের (প্রণয়ীযুগলের যৌন বিক্ষোভ) বিপরীতে আছে নায়কের কামনার সামাজিক পরিণতি—এই পরিণতি তার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায় ঃ যথা দাঙ্গার দৃশ্য ও মন্ত্রীর আত্মহত্যা। যে মুহূর্তে কামনা একটা যৌথ ও গতিশীল ক্ষমতা হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্ত থেকে তা মাজোর্কান সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।'

জনতার ভীড়কে নায়কের শিকার হিসেবে (অথচ, স্পষ্টত এইটিই সিকোয়েন্সটির মূল ভাব ; মন্ত্রীমহোদয় চীৎকার করেন, "তুমি খুনী। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী") না দেখে তার লিবিডোর সক্রিয় যৌথ সম্প্রসারণস্বরূপ দাঙ্গাবাজ জনতা হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত সমালোচক মাজোর্কান সমাজের বিপদকে' গণবিক্ষোভের ডায়া-লেকটিকের সঙ্গে সমীকরণ করে ফেলেছেন, এই ঐতিহাসিক ডাইনামিক মার্কসবাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক, কিন্তু 'দি গোল্ডেন এজ'-এর ক্ষেত্রে নয়।

একই সমালোচক ছবির ভূমিকাটিকে—বিছে, আর্চবিশপ, এবং দস্যুদলের বন্ধ্যাপ্রান্তরে একত্র অস্তিত্ব—প্রাগিতিহাস থেকে বুর্জোয়া সমাজের আরম্ভ পর্যন্ত সময়ের একপ্রকার ঐতিহাসিক বস্তুগত রূপকরূপে ব্যাখ্যা করেন। যেন ইতিহাস অর্থাৎ বৈপরীত্য সম্বলিত সমাজ শুরু হয় মাজোর্কানদের আবির্ভাবের সঙ্গে।

অবশ্য বুনুয়েলের ছবিকে বামপন্থী বলা সম্ভব। কতকগুলি অনুষঙ্গ জোর করে আরোপ করে কেউ কেউ ভূমিকাটিকে, বিপর্যয়ের সিকোয়েন্সের মত, মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করতে পারেন। তথাপি প্রতীকী ভূমিকাটিকে ইতিহাস-বিরোধী পদ্ধতিতেও ব্যাখ্যা করা যায়, সেটি সভ্যতার একটি ভূতাত্ত্বিক ক্রশ সেকশনের বেশি সদৃশ। এই ক্রশ সেকশন সেই সংঘাতগুলির উদ্ভব অনুসন্ধান করে যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে অথচ মনের ভিতর এখনো সক্রিয়।

'দি গোল্ডেন এজ'-এ সমাজের প্রকৃত ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তার অচেতন প্রেমিসগুলি চিরন্তন। যৌন কামনাই 'দি গোল্ডেন এজ'-এর একমাত্র গতিশীল শক্তি—যেখানে তা সভ্যতাকে অস্বীকার করে। পরিবর্তে, সভ্যতার সার হচ্ছে, এক কথায়, একজন মানুষের erection-এর প্রতি তার নির্বিরোধ প্রতিক্রিয়া। সভ্যতার নিজের কোন ইতিহাস বা শক্তি নেই—ইতিহাস কতকগুলি নিপীড়ক শক্তির সমাহার যাকে সাময়িক অভ্যুত্থান নাড়াতে পারে না। সর্বদা প্যাশনকে দমন করতে করতে বিস্ফোরণ ও স্ববিরোধের মধ্যে তার চলাচল।

অধুনা, 'দি গোল্ডেন এজ'-কে সভ্যতার দ্বৈতবাদী বস্তুতন্ত্র অপেক্ষা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার বেশি কাছাকাছি মনে হয়। বুনুয়েলের ছবির মার্কসীয় আলোচনা আবার আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা ব্যাখ্যাক্রিয়া শুরু করতে পারেন। অথচ সেই সময় ছবিটিকে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিনাবাধায় স্বীকার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বুনুয়েল ও মার্কসবাদের মধ্যে একটি সম্পর্কও রয়েছে ; সেটিকে ভাল করে বুঝতে গেলে তিনি যার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন মগ্নচৈতন্যবাদী আন্দোলনের রাজনীতিও বুঝতে হবে।

যেহেতু বর্তমানে মগ্নচৈতন্যবাদ (Surrealism) বলতে নীতিহীন আত্মমুখীনতা (Subjectivism) বোঝায়, সেই জন্য আমাদের স্মরণ করা দরকার যে প্রথম দিককার মগ্নচৈতন্য-বাদীরা তাদের কাজকে সনৈতিক যৌথ নিরীক্ষা—একই সঙ্গে বহিঃ ও অন্তর্বাস্তবপ্রধান বিষয়—হিসেবেই দেখেছিলেন। তাদের আবিষ্কারসমূহ যেন সব কিছুর ওপর চমকপ্রদ প্রতিশোধ নিতে মানুষের কল্পনাকে সক্ষম করে তুলবে। আন্দোলনের নেতা আন্দ্রে ব্রেতঁর প্রায়শঃ উদ্ধৃত কথাগুলিই মগ্নচৈতন্যবাদের এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা ঃ বাস্তব ও স্বপ্ন—আপাতবিপরীত এই দুই অবস্থা যে ভবিষ্যতে এক চরম রিয়ালিটিতে, বলা যেতে পারে মগ্নচৈতন্যে (Surreality), মিশে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি।" 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে বুনুয়েল, আমরা দেখেছি, অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ বাস্তবের এই মিলন ঘটিয়েছিলেন।

মগ্নচৈতন্যবাদ একটি নৈতিক অ্যাটিচুড, একটি 'Spirit of demoralisation', কোন নান্দনিক ঘরানা নয়। মগ্নচৈতন্য-বাদীর ক্রীড়াবৈশিষ্ট্যকে (Play element) মুক্ত করার চেষ্টা, অবচেতন চিত্রকল্পের অনুসন্ধান—এগুলিকে তারা শিল্প হিসেবে নয়, চিন্তাপদ্ধতির বৈপ্লবিক বিজ্ঞানে তাদের অবদান এমনকি মানুষের মুক্তি হিসেবেই দেখেছিলেন। যদি তাদের কাজকে অশ্রদ্ধা ও দুর্বোধ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের মৌলিক গুণেরই প্রমাণ, কারণ মগ্নচৈতন্যবাদের সব কিছুই—তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বৈপরীত্যের ভার, অসন্তান্ত পরিহাস ও শ্লেষ, যৌনতা, অনুকম্পা, অস্পষ্টতা—দমিত সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তিগুলির মুক্তি থেকে উৎসারিত এবং জনগণের ঐ প্রবৃত্তিগুলির প্রতিই নিবেদিত।

চরম রিয়ালিটি সত্ত্বেও মগ্নচৈতন্যবাদ কেবল মানসিক বিপ্লবই ছিল। কিন্তু স্বভাবত স্থিরনীতি মগ্নচৈতন্যবাদীরা বৈপ্লবিক শিল্পকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে সম্প্রসারিত করতে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পাশ্চাত্য শিল্পে avant-garde আন্দোলনের হয় কোন স্পষ্ট রাজনীতি ছিল না—এই চিন্তাধারাটাই রক্ষণশীল—নয়ত ইতালীয় ফিউচারিস্টদের মত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। একমাত্র সুররিয়া-লিস্টরাই বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। মার্কসবাদ

আবিষ্কার করার পর তারা ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি অনুসৃত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি গভীর ভাবে বিবেচনা করে।

সুররিয়ালিস্টদের মার্কসবাদী রাজনীতি গ্রহণকে কম্যুনিস্টরা প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। ব্রেত ও তার অনুগামীরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ এবং মগ্নচৈতন্যবাদের তাত্ত্বিক সমন্বয় সাধন করলেও বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী-উত্তর একটি নব্য শিল্প তারা সৃষ্টি করলেও কার্যত তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন, সংগ্রামে তাদের অবদান তাদেরই নিজস্ব শর্ত নির্ভর ছিল।

১৯২৭ সালে মার্কসবাদী ও বামপন্থী মগ্নচৈতন্যবাদীদের মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল, তাদের নীতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে ব্রেত ও অন্যান্যরা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন যদিও শিল্পগত স্বাতন্ত্র্যকেও তারা প্রাধান্য দেন। স্বাধীন মগ্নচৈতন্যবাদ ও বহির্জাগতিক বৈপ্লবিক আদর্শ—এই দুইয়ের সমন্বয়ের জন্য ব্রেতঁর নিরন্তর প্রচেষ্টাকে উপলক্ষ্য করে গোষ্ঠীটি সিরিয়াসলি দ্বিখণ্ড হয়। ব্রেত আদর্শ দুটির পারস্পরিক বৈপরীত্য স্বীকার করতেন না।

এই সময় কয়েকজন নতুন কবি ও শিল্পী গোষ্ঠীতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে দলের একমাত্র চিত্র-পরিচালক, 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ'-এর নির্মাতা, ফ্রান্সের অধিবাসী স্প্যানিশ লুই বুনুয়েলও ছিলেন। শীঘ্রই বুনুয়েল অন্যতম শ্রেষ্ঠ মগ্নচৈতন্যবাদী কীর্তি 'দি গোল্ডেন এজ' সৃষ্টি করেন এবং এই ছবিটির রাজনৈতিক ইতিহাস মগ্নচৈতন্যবাদ ও মার্কসবাদের কঠিন সম্পর্ককে আরো পরীক্ষার সামনে নিয়ে যায়।

ডিপ্রেশনের শুরুতে ১৯৩০ সালে 'দি গোল্ডেন এজ' মুক্তি পায়। ছবিটিকে মগ্নচৈতন্যবাদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রশংসা করে ব্রেত একটি দলীয় ইস্তাহার লেখেন। "(ছবিটি) মানবিক চৈতন্যের প্রতি উপস্থাপিত আত্যন্তিক প্রশ্নগুলির অন্যতম।" 'দি গোল্ডেন এজ' "অস্তাচলের আকাশে—পশ্চিমী আকাশে—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক শিকারী পাখি।"

'দি গোল্ডেন এজ' অবশ্য জিজ্ঞাসার চরম বিজ্ঞপ্তি—এত চরম যে মনে হতে পারে কম্যুনিস্টদের ব্যবহারিক রাজনীতির ওপর তার প্রস্তাবিত বিপ্লবের কোন প্রভাবই নেই। সম্পর্কটাকে সহজ করার জন্য ব্রেত ছবিটাকে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং বামপন্থীদের প্রতি একটি মূল্যবান অবদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—

'ব্যাংকব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, অস্ত্রাগার থেকে বের করা হচ্ছে বন্দুক—এরকম একটি সময়ে 'দি গোল্ডেন এজ' প্রদর্শিত হচ্ছে। যারা এখনো পর্যন্ত সেন্সরের দয়ায় ছাপা সংবাদপত্রের খবরটুকুনেও বিচলিত হয় তাদের ছবিটি দেখা উচিত। 'সমৃদ্ধির' যুগে, নিপীড়িত শ্রেণীর ধ্বংস করার প্রয়োজনকে তৃপ্ত করে এবং সম্ভবত, অত্যাচারীর ম্যাসোচিস্টসুলভ প্রবৃত্তিকে খুশি করে 'দি গোল্ডেন এজ'-এর সামাজিক যোগ্যতা-মূলক (use-value) প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।

এক অর্থে, সুররিয়ালিস্টদের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না। 'দি গোল্ডেন এজ' সে সময় একটি বড় কুৎসার জন্ম দেয়—পরিষ্কার রাজনীতি ঘেঁষা কুৎসা। প্যারিসে ছবিটি নির্বিঘ্নে কয়েক সপ্তাহ চলছিল, এক সন্ধ্যায় ক্যাথলিক, জাতীয়তাবাদী অ্যান্টিসেমেটিক 'লীগে'র সদস্য ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী বিক্ষোভকারী প্রদর্শনীকক্ষতে ভাঙচুর করে। এখান থেকে শুরু হয় 'দি গোল্ডেন এজ' ও অন্তর্ঘাতমূলক বিদেশী ছবির ওপর সরকারী নিষেধ দাবী করে দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রে আন্দোলন (ঐ বৎসর আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন'ও নিষিদ্ধ হয়)। প্রচার করা হয়, "এগুলি হচ্ছে আমাদের নষ্ট করার এক বিশেষ—সত্য সত্যই বিশেষ—এক বলশেভিক চক্রান্ত।"

বিতর্কটি ১৯৩০ সালের ফ্রান্সে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের এক প্রকাশ। মগ্নচৈতন্যবাদীরা সেটা জানতেন এবং সেইজন্যই এক দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা স্পষ্টতর ভাষায় বামপন্থীদের পক্ষ নিলেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে 'দি গোল্ডেন এজ' ও অন্যান্য ছবির ওপর দমন ও ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রকাশ্য মাথা চাড়া দেওয়া এবং ঐ আন্দোলনের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধপরিকল্পনা এক করে দেখানো হয়েছে।

নিজেদের ছবির পক্ষ সমর্থনে মগ্নচৈতন্যবাদীদের সঙ্গে একদল উদার ও বামপন্থী লেখক যোগদান করেছিলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন L' Humanite নামক কম্যুনিস্ট পার্টির সংবাদপত্রের চিত্রপরিচালক Leon Monssinac. "এর আগে কোন সিনেমায় কিংবা এত জোরের সঙ্গে, এত তীব্র ঘৃণা নিয়ে প্রথা, বুর্জোয়া সমাজ ও তার লেজুড়কে—পুলিশ, ধর্ম, সৈন্যবাহিনী, নৈতিকতা, পরিবার স্বয়ং রাষ্ট্র—কেউ কখনো আগাগোড়া আঘাত করেনি। আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল স্তর বা সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এই ইমেজগুলির প্রত্যক্ষ ধাক্কা আমাদের অনুভব করতে হয়।"

সেন্সরশিপ এড়ানোর মধ্যে পার্টির নিজেরও স্বার্থ ছিল। তবু বুনুয়েলের সমর্থকদের মধ্যে Monssinac-এর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির দৃঢ় আঁতাত জরুরী অবস্থায় সম্ভবপর।

১৯৩০ সালে বামপন্থী শিল্পের বেসরকারী মাপকাঠি বেশ উদার ছিল। Monssinac 'দি গোল্ডেন এজ'কে সেই ননকনফর্মিস্ট ছবির শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন যেগুলি অবশ্য একেবারে শ্রেণীসচেতন না হলেও পুঁজিবাদী সমাজ ও মতাদর্শের সমালোচক (তার উদাহরণে ছিল চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস', ক্লেয়ারের 'A Nons La Liberte'; এবং ভিগোর 'A Propos De

Nice' থেকে পাব্স্টের 'Kameradschaft'; ভুডো এবং ব্রেখ্টের 'Kuhle Wampe' ও ইভেন্সের তথ্যচিত্রগুলি)।

এটা প্রমাণিত ছিল যে দক্ষিণপন্থীরা আরো ভালোভাবে সংগঠিত শক্তি। ফ্যাসিস্ট সমর্থক পুলিশপ্রধান Jean Chiappe-এর আদেশে ১৯৩০ সালে 'দি গোল্ডেন এজ'কে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় (আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য ও চার্চের চাপে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে নিষেধাজ্ঞাটি বলবৎ আছে)। সুতরাং ছবিটির রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক মহিমা কিছুটা ছবিটি স্বয়ং ও অংশত ছবিটির আবির্ভাবকালের ঐতিহাসিক মুহূর্তের কার্যপরম্পরা দ্বারা সমর্থিত।

মার্কসবাদী ছবি না হলেও, 'দি গোল্ডেন এজ'-এর সঙ্গে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। বাস্তব পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির ওপর ছবিটা প্রাধান্য দিয়েছে। ধর্ম, রোমান্স, বুর্জোয়া যুক্তিবাদ—ইত্যাকার প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে ছবিটি আঘাত করে। ছবিটির শ্রেণী সচেতন ও ইতিহাস সচেতন ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে।

একই সময়, বুনুয়েলের ছবি, ও সাধারণভাবে শিল্পী হিসেবে তার রাজনীতি, এক অভূতপূর্ব আলোড়নের যুগের তথা রাজনৈতিক ও আদর্শগত সঙ্কটমুহূর্তের ফসল। ১৯৩০ সালেও বৈপ্লবিক শিল্প ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সমার্থক ছিল না (সম্পর্কটা ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে অননুমোদিত ছিল)। তখনো পর্যন্ত শিল্পীর বৈপ্লবিক যাথার্থ্যের মার্কসবাদী মাপকাঠি বলতে ছিল এঙ্গেলসের সরল নির্দেশটি :

যদি লেখক আমাদের কোন সমাধান না-ও দেন, কিংবা স্পষ্টভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন না-ও করেন, তবু, ঔপন্যাসিক তার কর্তব্য সম্মানজনকভাবে পালন করেছেন—একথা তখনই বলা যায় যখন তিনি, বিশ্বাসজনক সামাজিক সম্পর্কগুলির নিখুঁত চিত্রায়ণের মাধ্যমে, ঐ সম্পর্কগুলি প্রকৃতিসম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলিকে ধ্বংস করেন, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদকে চূর্ণ ক'রে বর্তমান সমাজব্যবস্থার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পাঠককে বাধ্য করেন।

'নন-কনফর্মিস্ট' শিল্পের ব্যাখ্যা এইটিই, এমনকি মগ্ন-চৈতন্যবাদও-এর অন্তর্গত। কয়েকবছর বাদে, পঞ্চাশের দশকে যখন শিল্পের সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল নীতির মধ্যে বিরোধিতা ১৯৩০ সালের থেকেও তীব্র, নিজের নীতি ব্যাখ্যার জন্য বুনুয়েলকে এঙ্গেলসের ফরমূলা উদ্ধৃত করতে হয়।

'দি গোল্ডেন এজ' সংক্রান্ত বিতর্ক যখন চলছিল, ঠিক সেই সময় সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটি অনপনেয় সীমারেখা টানা হচ্ছিল। খারকভে (ইউ. এস. এস. আর) কম্যুনিস্টদের আহূত বিপ্লবী লেখকদের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস পার্টির সাধারণ নীতি অনুসারে ফ্রয়েডীয়বাদকে বুর্জোয়া আদর্শবাদ ও মগ্নচৈতন্যবাদকে 'অন্তবিরোধ' (opposition from within) আখ্যা দিয়ে অভিযুক্ত করে। ফরাসী মগ্নচৈতন্যবাদের দুই মুখপাত্র আরাগঁ ও সাদুল স্বয়ং কম্যুনিস্টপক্ষে চলে যান নিজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থন ক'রে। ১৯২৭-২৯-এর বিবাদ সম্পূর্ণ হল, দুই বৈপ্লবিক মতবাদের ক্ষীণ সমন্বয় রক্ষা করা ব্রেতঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। কম্যুনিস্টরা বাম উদারপন্থী লেখকদের সম্মেলন-গঠন চালিয়ে যেতে লাগলেন (অ্যাসোসিয়েশন অফ রেভোল্যুশনারি রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস ১৯৩২ সালে জাঁ ভিগোকে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত ক'রে দেখান); ওদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে অতীত সম্পর্ক সুররিয়ালিস্টদের কোয়ালিশন রাজনীতি করতে দেয় নি। মগ্নচৈতন্যবাদ ও মার্কসবাদ পরস্পর পৃথক ধারণা রূপে চিহ্নিত হল।

এভাবে চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে মগ্নচৈতন্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে এপর্যন্ত সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক ফাটল ধরে ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালে। গোষ্ঠীর কয়েকজন মতবাদ ত্যাগ করে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন মগ্নচৈতন্য-বাদের অন্যতম প্রবর্তক লুই আরাগঁ, বুনুয়েলের ঘনিষ্ঠ দুজন—দুটি ছবিতে তার সহযোগী পিয়ের উনিক এবং জর্জ সাদুল যিনি পরে চিত্রঐতিহাসিক হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে এরা বুনুয়েলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

অবশিষ্ট মগ্নচৈতন্যবাদীরা ব্রেতঁর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে দূরে থাকেন যদিও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসেন না। বুনুয়েল ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে শুধু গোষ্ঠী ত্যাগ করলেন, তবে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, অন্তত নিজের, তিনি বজায় রাখেন। একটি আধুনিক জীবনীতে অবশ্য পাওয়া যায় যে যারা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সদস্যপদ রেখেছিলেন।

ব্রেতঁই 'দি গোল্ডেন এজ' সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটান। ১৯৩৭ সালে এক লেখায়, যে use-value কে তিনি নিজে বহুযত্নে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাকেই অস্বীকার ক'রে 'দি গোল্ডেন এজ'কে মগ্নচৈতন্যবাদের নামে আবার উদ্ধার করলেন :

"তাৎক্ষণিক প্রচারমূলক লক্ষ্যের কাছে সবকিছু সমর্পণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কয়েকজন তুচ্ছ বিপ্লবীদের প্ররোচনায় তিনি 'দি গোল্ডেন এজ'-এর একটি 'শুদ্ধকৃত' সংস্করণ "In the Icy Water of Egotistical Calculation-'এর মত ইঙ্গিতপূর্ণ নামে (কেবলমাত্র ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্য) শ্রমিক শ্রেণীর কাছে প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিংবা নিজের নীতি থেকে সরে এসেছিলেন—এসব কথা চিন্তা করে

আমি দুঃখ পাই। 'দি গোল্ডেন-এজ'এর মত একটি সৃষ্টি, যাকে মানুষের প্রকৃত দাবীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় না, তার মধ্যে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম কয়েকটি পাতা থেকে মার্কসের কিছু কথা ঢুকিয়ে দেওয়াটা কিছু লোকের কাছে শিশুসুলভ নিশ্চিন্তি এনে দিতে পারে সম্ভবত—এটা দেখিয়ে দেবার মত নিষ্ঠুর আমি নই।"

যে রহস্যময় ঘটনাটিকে ব্রের্তর স্মৃতি দাবী করছে তার যাথার্থ্য সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্তু মোদ্দা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সঠিক—'দি গোল্ডেন এজ' প্রথমত একটি মগ্নচৈতন্যবাদী ছবি এবং কেবল অনুষঙ্গে মার্কসবাদী।

বুনুয়েলের পরবর্তী এবং তার মগ্নচৈতন্যবাদী যুগের তৃতীয় শেষ ছবি 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' নামক স্বল্পদৈর্ঘ তথ্যচিত্র (Terre Sans Pain, France 1932)। শ্রেণীটির নির্বাচন বিস্ময়কর : সমস্ত প্রকরণের মধ্যে তথ্যচিত্রই রিয়াল পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারাটাকে গুরুত্ব দেয় সর্বাপেক্ষা বেশী; 'দি গোল্ডেন এজ'-এর ভিত্তি সাবজেকটিভিটির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার কোন স্থান তথ্যচিত্রে নেই। তবু বুনুয়েলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তথ্যচিত্রকে তার যুক্তিযুক্ত একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক data ব্যবহার করে এবং নিজেকে সাংবাদিকের ভূমিকায় আড়াল ক'রে বুনুয়েল রিয়ালিটির এমন একটি ছবি এঁকেছেন যেটি সম্ভবত তার শুদ্ধতম মগ্নচৈতন্যবাদী সৃষ্টি।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর নৈর্ব্যক্তিকতাই ছবিটিকে এক অসহনীয় অভিজ্ঞতা—মগ্নচৈতন্যবাদী অভিজ্ঞতা—করে তোলে। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর মত সাবজেকটিভ্ উত্তেজনা আর ছবিটির থিম নয়; এখানে দর্শকের সচেতনতাই উত্তেজিত হয়।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিতে বুনুয়েলের সাফল্যের কারণ যেমন বিষয় নির্বাচন—সমাজবিচ্ছিন্ন স্পেনের এক হতদরিদ্র অঞ্চল—তেমন ছবির গঠনও যা দর্শকের লজিকাল প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুগ বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে।

১৯৩২ সালে অল্প কয়েকজন কর্মী নিয়ে তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন এবং Las Hurdes-এর প্রকৃত ও তার অধিবাসীদের ছবি তুলেছিলেন। মাত্র এক বছর আগে তার স্বদেশভূমি দেশ-ব্যাপী হিংসার মধ্য দিয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র থেকে অস্থির বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। নিঃসঙ্গ পাবত্য অঞ্চলটিকে যেটি বুনুয়েলকে আকৃষ্ট করেছিল, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালা বদল থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। চিরকাল ক্ষুধার্ত দুর্বল কৃষকরা যেন সাময়িক ভাবে প্রাক-ইতিহাসে বাস করে। তাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, নিজেদের অবস্থা ভালো করার কোন উপায় নেই, গৃহপালিত পশু অথবা কোন যন্ত্র—কিছুই নেই।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর মূল থিম হচ্ছে শ্রমের চিত্রায়ণ। কিন্তু এ আমাদের পরিচিত সভ্যজগতের সেই শ্রম নয় যা একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থার সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। Las Hurdes -এর কৃষকদের শ্রম হচ্ছে প্রথমবারের জন্য এক বিরোধী প্রকৃতিকে বশ করার প্রচেষ্টা—যে প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাদের অসম্পূর্ণ সমাজ আবার শূন্যাবস্থায় ফিরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষকদের বন্ধ্যা নদীতীরে মাটির স্তর বিছিয়ে, আক্ষরিক অর্থে, কর্ষণযোগ্য ভূমি তৈরি করতে হয়. ছবিটি এই অবিশ্বাস্য পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক ডিটেলে ধরে রাখে, এমনকি স্তরগুলির ক্রশ-সেকসানগুলিকে পর্যন্ত আমরা ক্লোজ-আপে দেখতে পাই। কিন্তু ধারাবিবরণীটি যোগ ক'রে দেয়, "মাটি শীঘ্রই নাইট্রোজেন হারিয়ে ফেলে অনুর্বর হয়ে পড়ে।" এছাড়া, শীতকালে নদীগুলি প্রায়ই প্লাবিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা বছরের পরিশ্রম নিশ্চিহ্ন।" বুনুয়েলের ছবিটি প্রকৃতি—যাকে সভ্যতা এখনো বশ করতে পারে নি—এক বিধ্বংসী শক্তি; অন্নপূর্ণা নয়, কেবল ব্যাধি ও মৃত্যুপ্রদায়িণী।

বুনুয়েলের কাছে কৃষক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে ক্ষুধা। এ সে ক্ষুধা নয় যাকে তৃপ্ত করা যায় কিংবা যা ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক সিস্টেমের জন্ম দেয় (এবং সেই সিস্টেম প্রাথমিক প্রয়োজনকে আর মেটাতে না পারলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও সৃষ্টি করে)। এ ক্ষুধা চিরন্তন, অতৃপ্ত এ ক্ষুধাই জীবন। কৃষকদের দৈন্যদশা বুনুয়েলের অন্য ছবিতে দৃষ্ট কামনার সমতুল্য। অবশ্য কামনার মত এই অসুস্থ অবস্থা কখনো পজিটিভ শক্তি হয়ে উঠে না। কৃষকদের জীবন যেন ক্ষুধা ব্যাধি থেকে পঙ্গুত্ব ও মৃত্যু পর্যন্ত এক ভয়ঙ্কর—যদিও লজিকাল ও স্বাভাবিক—ক্রমপরিণতি। সময় কোন সমৃদ্ধি আনে না, আনে না মৃত্যু ব্যতীত কোন সংবাদ।

এই আগ্রাসী নিয়তিবাদের ওপর বুনুয়েল এমন এক গঠন প্রণালী আরোপ করেন যা আমাদের সেই ভয় থেকে মুক্ত তো করেই না, বরং সেই নীতির অনুধাবনে অবিশ্লেষ্য টেনশন ও বিরোধিতা তৈরী করে। এরকম একটি গঠনপ্রণালী চিত্রকল্প, ভাষ্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্তী টেনশনে তৈরী করা হয়েছে। আবেগহীন ধারাবিবরণী একজন আগ্রহী অথচ নিরপেক্ষ সমাজ-বিজ্ঞানীসুলভ 'মূল্যহীন' ধারণা থেকে কখনোই প্রায় সরে আসে না।

এর বিপরীতে চিত্রকল্পগুলি ভীতিপ্রদ; আরো বেশি ভীতিপ্রদ এই কারণে যে ক্যামেরা ঘটনাগুলিকে সরল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্ভবপর ক'রে দেখায়। একটা গাধাকে মৌমাছি কামড়ে মেরে ফেলে। গয়টার ও অন্যান্য ব্যাধি, সংক্রমণ ও জন্মগত মূর্খতা কৃষকদের পঙ্গু করে দেয়। একটি শিশু মারা যায়—গোরস্থান পর্যন্ত আমরা তার দেহকে অনুসরণ করি।

ছবিটির অসংযত গঠন প্রণালী কিংবা কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্য

ও কৌশলকৃত প্রকল্প (যেগুলি অবশ্য সেই যুগের পুনরভিনীত ডকুমেন্টারীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছিল) সত্ত্বেও সিনেমাটোগ্রাফী যে সর্বগ্রাসী ধারণা রেখে যায় সেটি হচ্ছে এই যে দৃষ্ট বিভীষিকাগুলি বাস্তবই ; ছবিতে বুনুয়েলের 'পরিত্যক্ত' অমসৃণ এডিটিংয়ের কিছু কিছু নমুনা থেকে এই ধারণা আরো জোরদার হয়।

অপরিবর্তনীয়তার বোধ থেকেই ভীতির জন্ম। সুতরাং যে সব দৃশ্যে দেখা যায় যে কৃষকদের আত্মোন্নতির চেষ্টা কেবল তাদের ধ্বংসই দ্রুত ক'রে তোলে—সেগুলিই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা-দায়ক। নিজের ফোলা ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা দেখাতে দেখাতে একজন কৃষক অপ্রতিভভাবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসে—এই দৃশ্যটির সঙ্গে নির্বিকার ভাষ্যকার জানান : 'সর্পদংশন এমনিতে মারাত্মক নয়, কিন্তু সেটাকে সারাতে গিয়ে কৃষকরা কখনো কখনো ক্ষতিটাতে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটিয়ে ফেলে।"

ডকুমেন্টারিটির সঙ্গে রহস্যময়ভাবে ব্যবহৃত ব্রাহ্‌মের সিম্ফনি আমাদের কুৎসিতভাবে মনে করিয়ে দেয় রাজকীয় ইউরোপীয় সভ্যতার কথা—যে সভ্যতা Les Hurdes-এর বিষাক্ত কলঙ্ক নিজের গর্ভে লুকিয়ে রাখে। 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' ও 'দি গোল্ডেন এজ'-এ উনিশ শতকের সঙ্গীত নাটকীয় উপাদান স্বরূপ—কখনো কখনো নিখুঁতভাবে মিশ্রিত, মুড-মিউজিকের প্রায় প্যারডি ; রোমান্টিক সিম্ফনিগুলি ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠেছে। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিতে Les Hurdes-এর ভয়ঙ্করতাই ব্রাহ্‌মের মহান সঙ্গীতকে অবক্ষয়ী ব্যঞ্জনায় কলুষিত করে।

নিরপেক্ষ ভাষ্যকারের আড়ালে থেকে বুনুয়েল তার ছবিতে আরেকটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আরোপ করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যখনই কৃষকের জন্য কিছু আশা সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনই সে সম্ভাবনাকে অনিবার্যভাবে পরবর্তী সংবাদ নষ্ট করে দেয়। ফল খেয়েই লোকেরা বাঁচে, আবার ফল খেলে আমাশয়ও হয়। তাদের গাছপালা আছে, কিন্তু পোকামাকড়ে সেগুলো খেয়ে ফেলে। তাদের তৈরি করা ক্ষেত সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট কিংবা অনুর্বর হয়ে যায়। সেখানে মৌচাকও আছে (অপেক্ষাকৃত ভালো অঞ্চল থেকে ধার করে আনা) কিন্তু মৌমাছিরা অত্যন্ত তেঁতো মধু তৈরি করে এবং প্রায়ই জন্তুজানোয়ারের মৃত্যুর কারণ হয়। আপাত-দৃষ্টিতে বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা সংগ্রহের বাইরে না গিয়েও দর্শকের বুর্জোয়াসুলভ আশাবাদ—সভ্য মানসিকতার 'স্বাভাবিক' দৃষ্টি-ভঙ্গি—সমূলে তিনি বিনষ্ট করেন।

কিন্তু বাইরের সাহায্য ? চার্চ সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তার ক্ষয়িত কীর্তি এখন বহুদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া প্রাচীন উপনি-বেশের ধ্বংসাবশেষের মত। চার্চই সমৃদ্ধির বাহক—এই দাবী যেন এক পরিহাস কারণ কৃষকদের জন্য মৃত্যুর অস্তিত্ব প্রকাশ করা ছাড়া চার্চ কিছুই করে না।

আধুনিক সমাজের সঙ্গে কৃষকদের অবশ্য একটি যোগসূত্র আছে—সেটি সদ্যগঠিত স্কুলবাড়ি। আমদানীকৃত এই শিক্ষাকে কৃষক জীবনে সম্ভাবনাপূর্ণ উন্নতি হিসেবে মনে করাই হচ্ছে উদার দর্শকের তাৎক্ষণিক অনুভূতি। কিন্তু সিকোয়েন্সটি একথাই প্রমাণ করে যে, উপবাসী শিশুকে অঙ্ক শেখায় যে শিক্ষাব্যবস্থা তা সম্পূর্ণ অক্ষম। আরো চিন্তার বিষয়, যে বুর্জোয়া শিক্ষা বস্ত্রহীন শিশুর পাঠ্যতে অষ্টদশ শতাব্দীর শৌখিন পোষাকপরিহিত মহিলার ছবি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এবং 'অপরের সম্পত্তি শ্রদ্ধা' করতে শেখায়, তা নিষ্ঠুর।

'এই নগ্নপদ জীর্ণ পোষাকপরিহিত শিশুরা পৃথিবীর অন্যান্য শিশুদের মত একই প্রাথমিক শিক্ষা পায়। এই বুভুক্ষু শিশুদেরও শেখানো হয় যে-কোন ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।' এটিকে বুনুয়েলের মন্তব্যহীন কথকের অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বলা যায়। যে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্ণনা করা হচ্ছে তারই অন্তর্গত বৈপরীত্যকেই ধারাভাষ্য, ছোট করে, স্পষ্ট করে তোলে। মানবতাবাদী সচেতনতা ('শিক্ষা সর্বত্র এক') আবছা জানে যে তা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (উপবাস, জীর্ণ পোষাক, নগ্নপদ), কিন্তু বৈষম্যটাকে কখনই প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।

অন্যান্য প্রধান দৃশ্যেও বুনুয়েল একই গঠনকৌশল ব্যবহার করেছেন। ম্যালেরিয়ার উপদ্রব সম্পর্কিত সিকোয়েন্সটি তথ্য-চিত্রের ভিতরে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে—পর্দায় পাঠ্য বইয়ের মশার ছবি, সঙ্গে ক্ষতিকর ও নির্দোষ মশার লক্ষণগুলি সাবধানে বর্ণনা করেন ভাষ্যকার। অন্তর-দৃষ্ট তথ্যচিত্রটি অবশ্য swamp রোগাক্রান্ত কৃষকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় কারণ, দর্শক ছাড়া তাদের উদ্দেশ্যেও যদি বলা হয়ে থাকে, তবু এবম্বিধ জ্ঞান কাজে লাগাবার মত বিজ্ঞান তাদের আয়ত্ত নয়। আর একটি সিকোয়েন্সে নির্মাতারা পথে পড়ে থাকা একটি ছোট মেয়ের সাক্ষাৎ পান। তিনদিন ধরে একদম নাড়াচড়া না করে মেয়েটি পড়ে আছে। তার যন্ত্রণা হচ্ছে, সম্ভবত সে অসুস্থ, কিন্তু তার অসুখটা আমরা ধরতে পারছি না। আমাদের একজন মেয়েটির কাছে গিয়ে তার গলাব্যথার কারণটা বার করতে চেষ্টা করে। তিনি মেয়েটিকে মুখ খুলতে বললেন, দেখা গেল তার মাড়ি আর গলা জ্বলছে।" ক্যামেরার নির্বিকার চোখের সামনে একজন মেয়েটির খোলা মুখটা ধরে থাকেন।

মশক সংক্রান্ত ইনসার্টটির মত বাইরে জগতের এই হস্তক্ষেপ—তাও অন্য কারোর নয়, ছবির নির্মাণদলের—অক্ষম মনে হয়। তার কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ঠুর যাই হোক না কেন। অপরিবর্তিত স্বরভঙ্গিতে বিবরণী চলতে থাকে "দুর্ভাগ্যবশত আমরা মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারি না। গ্রামটিতে দুদিন বাদে আমরা ফিরে এসেছিলাম। মেয়েটি কেমন আছে খোঁজ করায় জানতে পারলাম সে মারা গেছে।"

ক্যামেরা মেয়েটির খোলা মুখের ক্লোজ-আপ নিয়েছে বলেই যেমন আমরা তার অসুস্থতার কারণ বার করতে পারি না, তেমনি চিত্র নির্মাতারা যদি মেয়েটির মৃত্যুকে আটকাতে না-ই পারলো, তবে তাদের ছবি করার দরকারটা কি? বুনুয়েল তার তথ্যচিত্রটিকে সম্পূর্ণ সামাজিক দিক দিয়ে নিষ্ফল সংস্কৃতি ও মানবজাতির ঐতিহ্যের মধ্যে প্রকাশ করেন এবং তারপরই অলক্ষিতে স্পষ্ট করেন প্রতিপাদ্যটি—তথ্যচিত্রনির্মানসহ সমস্ত ঐতিহ্যটাই অক্ষম। ছবিটি প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব প্রেমিসটাকে ভেঙে ফেলে এবং সেটা করতে গিয়ে মানবতার আশ্রয়টাকে ধ্বংস করে।

স্পেন ও ইউরোপের সর্বত্র যখন সহিংস রাজনৈতিক অভ্যুত্থান চলছিল এবং বাম ও দক্ষিণপন্থীদের সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল ক্রমশ—সেই অবস্থার মধ্যে নির্মিত 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' সমাজের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চরিত্রটা ভেঙে ফেলে তার প্রাগৈতিহাসিক চেহারাটা—যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল মানুষের সর্বাত্মক কর্তব্য—পরিস্ফুট করে। তবু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই সমাজই, যার অ-সভ্য ভয়ঙ্করতা আমরা চেতনা থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছি, আমাদের সভ্যতারই অঙ্গ। কৃষকদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন মেলাতে গেলেই আমাদের যে বিচ্ছিন্নতা, অসহায়তা দেখা যায়, তার মধ্যেই বুনুয়েলের ছবির চূড়ান্ত বিভীষিকা। কৃষকরা আমাদের মতই মানুষ, অস্তিত্বের প্রাত্যহিকতায় ব্যস্ত। তবু প্রায় অবিশ্বাস্য কোন বন্য শক্তি তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেয়।

এসব সত্ত্বেও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিটির সমকালীন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—উদারপন্থী রাজনীতি সমেত বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রগতিবাদী বহিরঙ্গকে অস্বীকার করে ছবিটি র‍্যাডিকাল হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই বৈপ্লবিকতা ভুল করে স্পেনীয় রাজনীতিতে অসময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। একবছরের পুরনো, ভিতরে ভিতরে ছিন্ন ভিন্ন, প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধনে অপারগ, ক্ষমতার জন্য দক্ষিণপন্থী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত প্রজাতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল বটে। কিন্তু একটি অসাধারণ সংস্কারের কৃতিত্ব সে দাবী করতে পারে—দেশের অনুন্নত অঞ্চলে বহু ধমনিরপেক্ষ বিদ্যালয় স্থাপন। তবু এটি এমন একটি ছবি যা শুধু স্পেনকে সাধারণত অনাকর্ষক আলোকে দেখায় না। নতুন সরকারের অহংকারযোগ্য কীর্তিকেও আঘাত করে।

"স্পেনের পক্ষে অসম্মানজনক' আখ্যা দিয়ে জামোরা প্রশাসন বুনুয়েলের ছবিকে নিষিদ্ধ করে এবং অন্য দেশকেও ছবিটির প্রদর্শন না করতে অনুরোধ করেন। কেবলমাত্র ৯৯৩৭ সালে ফ্রান্সে ছবিটি মুক্তি পায়। স্পেনের পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো সরকারও নিষেধাজ্ঞাটা চালিয়ে যান।

এখান থেকে বুনুয়েলের অজ্ঞাতবাসের পালা শুরু হয়েছে। নিখুঁত সুররিয়ালিস্ট রীতিতে তিনি নিজের ভবিষ্যতের পায়ে কুঠারাঘাত করলেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক—এই অভিযোগে তার দুটি ছবি নিষিদ্ধ হল। নিজের ছবি প্রযোজনা করার সঙ্গতি তার ছিল না ('দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' একক পৃষ্ঠপোষকের অর্থানুকূল্যে নির্মিত)। সৃষ্টিক্ষম সাহায্যের উৎস হিসেবে দ্বিখণ্ডিত মগ্নচৈতন্যবাদী গোষ্ঠীর কাছে চাইবার কিছু ছিল না। কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র শিল্প ক্রমশ প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ হয়ে উঠছিল; চেষ্টা করেও বুনুয়েল ব্যবসায়িক পরিচালক হিসেবেও এমন কোন কাজ পেলেন না যা তার শিল্পীসুলভ নান্দনিক ও রাজনৈতিক সততাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অগত্যা বিভিন্ন ফিল্মশিল্পে ছোটখাট কাজ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। পনেরো বছরের আগে তিনি আর কোন ছবি পরিচালনা করেন নি।•

১৯৩২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্পেন, ফ্রান্স, নিউইয়র্ক ও হলিউডে, পরিচয় গোপন রেখে, পর্যবেক্ষক, কার্যকরী প্রযোজক কিংবা সম্পাদক হিসেবে ছবিতে কাজ করেছিলেন, কিন্তু কোন সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেন নি। এই যুগে তিনি কয়েকটি ছবি করেছিলেন, তবে সর্বদা অজ্ঞাত পরিচয়ে। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি যে চারটি স্বল্পায়ু কমেডি প্রযোজনা করেছিলেন তাতে পরিচালক হিসেবে অজ্ঞাত থাকাটা শিল্পীসুলভ অহঙ্কার হতে পারে; তবে প্রজাতন্ত্রপন্থী Spain 1937 ছবিতে নিরুদ্দিষ্ট ক্রেডিট নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক সুবিবেচনার ফল।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর পরে বুনুয়েল ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নির্দিষ্ট মার্কসবাদের আরো কাছাকাছি চলে আসেন। আমরা আগেই দেখেছি ১৯৩০-৩২-এর ঘটনার ফলে তাদের পরস্পর বিরোধীতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের সম্পর্কটা চিড় খাওয়া ছিল। ভাঙনের পরও এককভাবে সুররিয়ালিস্টদের অন্য শিবিরে যাতায়াত অস্বাভাবিক ছিল না (এদের মধ্যে এলুয়ার, বুনুয়েল, উনিক এমন কি ব্রেতঁও ছিলেন)। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর দুজন সহযোগী লোটার ও উনিক পার্টি সদস্য ছিলেন।

আগে আমরা আরো দেখেছি যে 'দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-ছবিতে অভিব্যক্ত বুনুয়েলের সমাজ ভাবনা, নান্দনিক অথবা ভাবগত বৈশিষ্ট্যে, মার্কসবাদের কাছে ঋণী নয় যদিও উভয় ছবিই মার্ক্সবাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক মাত্রায় সহাবস্থান করে। খারকভ ভাঙনের পরও কিংবা নিজে সুররিয়ালিস্টদের ত্যাগ করা সত্ত্বেও, তত্ত্বের দিক দিয়ে বিপ্লবী শিল্পী হবার জন্য একমাত্র মগ্নচৈতন্যবাদের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকা বুনুয়েলের প্রয়োজন ছিল। কোন সরকারী মার্ক্সবাদী রসতত্ত্ব—তা সে আইজেনস্টাইন বা সোস্যালিস্ট বাস্তবতার রসতত্ত্ব, যাই হোক

না কেন, কোনটাকেই তিনি অনুমোদন করতেন না—অনুসারে মগ্নচৈতন্যবাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। ১৯৩৫ সালে Nuestro Cine নামক সাম্যবাদী সাময়িক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে তিনিই এটা বোঝাতে চেয়েছেন :

আইজেনস্টাইনের মনটি এক বৃদ্ধ আর্ট অধ্যাপকের। তাকে আমি বুঝতে পারি না। তার সৃষ্টিকর্মে যেটি প্রশংসনীয় সেটি হচ্ছে এই যে শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে এমন এক জাতি দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক শিল্পে, এমনকি বিমূর্ততম শিল্পেও, একটি মতাদর্শ, নৈতিক ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ সিস্টেম থাকে। ১৯১৮ সালে ফিউচারিজম এবং দাদাইজম উভয়ই কলাকৈবল্যবাদ হিসেবে নিন্দিত ছিল। সময় প্রমাণ করেছে যে ফিউচারিজমের মধ্যেই ফ্যাসিস্ট শিল্পের বীজ লুকিয়েছিল এবং দাদাইজম (মগ্নচৈতন্যবাদের পূর্বসূরী) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রূপ নেয়।

প্রশ্ন : আপনার 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিকে আপনি কি হিসেবে দেখেন—রেক্টিফিকেশন না বিবর্তন ?

উত্তর : অবশ্যই আমি ছবিটিকে আমার কর্মজীবনের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখি।

কার্যত অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম। তখন হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতা পেয়েছেন এবং ১৯৩৬ সালে ফ্র্যাঙ্কো 'জেনারেলদের বিদ্রোহ' নেতৃত্ব দিলেন যার পরিণতিতে স্পেনে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এই হতভাগ্য দেশটি ফ্যাসিস্ট ও কম্যুনিস্টদের আসন্ন যুদ্ধের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়েছিল। ছ'বছর আগে নিঃসঙ্গ বামপন্থী মতাদর্শ হয়ত সুররিয়ালিস্টদের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারতো যদিও কম্যুনিস্ট পার্টিও তখন অন্য বক্তব্য রেখেছিল ; এখন এবম্বিধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতই অপ্রাসঙ্গিক ও সম্ভবত বিভেদ সৃষ্টিকারী।

তবে সুররিয়ালিজম যে স্বভাবতই মার্কসবাদে পরিণত হয় তা নয়—সুররিয়ালিস্টরা বা বুনুয়েল এ বিষয়ে যতই আপত্তি করুন না কেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সালভাদোর দালির কথা ধরলেই চলবে ; একদা বুনুয়েলের বন্ধু ও সহনির্মাতা দালি বিন্দুমাত্র কম সুররিয়ালিস্ট না হয়েও দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। (সুররিয়ালিস্টরা তাকে তার রাজনীতির জন্য বহিস্কৃত করেন)। এবং, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মত তার উদ্দীষ্ট হোক বা না হোক, বুনুয়েলের নিজের 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' কি রণক্লান্ত প্রজাতন্ত্রের ক্ষতি করেনি ?

আগে না হলেও অন্তত এই সংকট মুহূর্তে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী ছিলেন এবং তার কর্মজীবনে একমাত্র এই সময়ই তিনি নিজের শিল্প, নিজের মৌলিকত্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে বদলালেন। পার্টিকে অবশ্য নিজেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হল। স্প্যানিশ পার্টি অবশ্য পপুলার ফ্রণ্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ; ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পার্টি উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীকে দক্ষিণপন্থীদের থেকে সরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত যুক্তফ্রণ্ট-রাজনীতি সমর্থন করে কিছু সংসদীয় সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল—তার বিনিময়ে লড়াকু শ্রেণীচেতনার বিকল্পে 'বামপন্থী' জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হয়। ১৯৩৫ সালে নিজের সাধারণ পথের পরিবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নও ঐ নতুন রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে।

এই অস্পষ্ট যুগের প্রায় কোন ছবিই টিঁকে নেই। লিখিত বিবরণ অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী বলে এর অপ্রত্যক্ষ গুরুত্বও বিচার করা কঠিন। বুনুয়েল ভক্তরা দাবী করেন যে অজ্ঞাতভাবে যে সব বিভিন্ন ছবি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন সেগুলি তার নিজের সৃষ্টি হিসেবেই স্থান পাবার যোগ্য। বুনুয়েল অবশ্য বলেন যে ছবিগুলিতে তার ভূমিকা সৃজনধর্মী নয়, প্রশাসনিক। এবং এ কারণেই একটি টিঁকে থাকা ছবি 'স্পেন ১৯৩৭'-এর গভীর নিরীক্ষা প্রয়োজন—বুনুয়েলের সৃজনশীল নির্মাণের মধ্যে ছবিটার স্থান অতিরঞ্জিত না করেও একথা বলা যায়।

বুনুয়েলের দেশে তখন যে গৃহযুদ্ধের ঝড় বইছিল, তার উপর তথ্যচিত্র হচ্ছে 'স্পেন ১৯৩৭' (Espagne, 1937, France, 1937)। ১৯৩৭ সালেও, আমাদের স্মর্তব্য, স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের প্রকৃত ইস্যুগুলি সাধারণের গোচর থেকে অনেক দূরে। আক্রমণ সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে বিশ্বাস করানো যে কতটা কঠিন, তা অবিশ্বাস্য। জাতীয়তাবাদীদের অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করা বন্ধ না করেও ১৯৩৭ সালে জার্মানী ও ইটালী সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক অনাক্রমণ পর্যবেক্ষক প্যাট্রলে অংশ গ্রহণ করছিল। জোরিস ইভেন্স বলেছেন যে তার 'স্প্যানিশ আর্থ' নামক ছবি, ১৯৩৭ সালে নির্মিত, ইটালী ও জার্মানীর আক্রমণ সম্পর্কিত সমস্ত উল্লেখ ধারাবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ ছিল। বহু দেশের কম্যুনিস্ট এবং যুক্তফ্রণ্টের গোষ্ঠীগুলি এই 'নৈঃশব্দের চক্রান্ত' ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কম্যুনিস্টরা গৃহযুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের সংগ্রাম হিসেবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'স্প্যানিশ আর্থ' এর মত অজ্ঞাত পরিচয় 'স্পেন ১৯৩৭' ছবিটি স্পেনে নির্মাণ করেন।

বর্তমান ফুটেজ থেকে সম্পাদিত একটি সংকলন-চিত্র হচ্ছে 'স্পেন ১৯৩৭' (ভিন্নভাবে সম্পাদিত কিছুটা উপকরণ অবশ্য পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে সংকলিত Frederic Rossif এর 'টু ডাই ইন মাদ্রিদ' নামক ছবিতে)। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারী—এই একবছর ছবিটির ঘটনাকাল ; শুরু হয় পপুলার ফ্রণ্টের বিপুল জয় থেকে যার ফলে Manuel Azana-র শাসন Zamora প্রশাসনের স্থলে অধিষ্ঠিত হয়। ছবির বক্তব্য অনুযায়ী নতুন সরকারের উদারনৈতিক ও জনপ্রিয় সংস্কারগুলিকে দক্ষিণপন্থী প্ররোচনা খারাপ করে দেয়। এর

ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয় ১৯৩৬ সালে ফ্র্যাঙ্কোর Putsch-এর সন্ত্রাসবাদ। প্রজাতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাস্তার লড়াই ব্যাঙের ছাতার মত গৃহযুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থলযুদ্ধ পরিণত হয় আকাশ যুদ্ধে—গৃহযুদ্ধ হয়ে ওঠে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম যখন গণসেনার সংগঠন প্রতিহত করে ইটালী ও জার্মানীর তৈরি বোমার বর্ষণ। ১৯৩৬ সালে মাদ্রিদ অবরুদ্ধ হয়, প্রজাতন্ত্রীরা সেই অবরোধ কঠিন মূল্যের বিনিময়ে ছিন্নভিন্ন করেন। এই ঘটনাটিও ছবিতে বর্ণিত। সংঘবদ্ধ জনগণের ওপর সশস্ত্র সংগ্রামের পজিটিভ ফলগুলিও—শিল্পবাণিজ্যের রূপান্তর, শিক্ষা, সাম্য, স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি—বিশ্লেষণ করেছে। প্রান্তিক অঞ্চলে ফ্যাসিস্টদের ধ্বংসলীলা ও মাদ্রিদে নিরন্তর প্রতিরোধের বৈপরীত্য ছবিটির শেষ সিকোয়েন্সে ফুটে উঠেছে। ছবিটি শেষ হয় এক আকস্মিক প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিতে, যার ফলে গৃহযুদ্ধ প্রকৃত আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে স্থাপিত হয়। "বিমান ব্যবস্থা, পদাতিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ—এসবই এক বছরের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ইউরোপের শান্তি ও ভবিষ্যতের জন্য স্পেন রক্ত দান করছে।"

প্যারিসে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রী স্পেনের দূতাবাসের মাধ্যমে 'স্পেন ১৯৩৭' প্রযোজিত। ছবিটির তিনজন নির্মাতাই কম্যুনিস্ট কিংবা তাদের নিকট সমর্থক। সম্পাদক Jean-Paul Dreyfus পরে নিজ ক্ষমতায় Le Chanois নামে চিত্র পরিচালক হন। ১৯২৭ সালে Pierre Unik ব্রের্তর সঙ্গে পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর, বুনুয়েলের মত, তিনিও বোধ হয় উভয় তত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছিলেন। 'ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড' ও 'স্পেন ১৯৩৭', উভয় ছবিরই বিবরণী তিনি লিখেছিলেন।

ফ্রান্সে রিপাব্লিকান দূত ছিলেন Luis Araquistain, তিনি সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পপুলার ফ্রন্টের শরিক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার পার্টির সহযোগিতায় তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরে তিনি উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধী হয়ে পড়েন। ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে Araquistain দেখলেন যে প্রজাতন্ত্রের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সম্ভবত একারণে সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের আঁতাত সমর্থন করেছিলেন। এইজন্যই দূতাবাস ছবিটিকে স্পনসর করে।

'স্পেন ১৯৩৭' ছবির রাজনীতি যুক্তফ্রন্টের মতকে প্রতিফলিত করে; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন হিসেবে পপুলার ফ্রন্টকে প্রাধান্য দেয়। শ্রেণী সংগ্রামের থিমটিকে সতর্কতার সঙ্গে একটি বিশিষ্ট স্তরে উপস্থাপিত করা হয়। এই স্তরটিই ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণকে (ধারাভাষ্যকার অনুসারে, "ছাত্র, কেরাণী, ওয়েটার, চিকিৎসক, ড্রাইভার, লেখক, শিক্ষক, শ্রমিক, সব শ্রেণীর ও অবস্থার মানুষ") সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীল সুদ্ধবাজ থেকে আলাদা করে রাখে। দ্বিতীয়োক্তরাই জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের নামমাত্র সেবক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত। ("প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক" এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে। কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থই এই বাহিনী তৈরি করেছে......")

সংগ্রাম যখন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রসারিত, সমস্ত আবেদন থেকেই শ্রেণীসূচক শব্দসম্ভার এবং বস্তুত, জাতীয় পরিভাষাও ত্যক্ত হয়। রাজনৈতিক কারণে বিদেশী হানাদারদের কখনোই মৌখিকভাবে ইতালীয় বা জার্মান বলে চিহ্নিত করা হয় না। বরং 'স্পেন ১৯৩৭' 'দি স্প্যানিশ আর্থ'-এর অনুরূপ একটি সংক্ষিপ্ত এফেক্ট ব্যবহার করে। Guadalajara-তে উৎপাটিত শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রজাতন্ত্রীরা দখল করে নেয়। ভাষ্যকার বলেন "অবশ্যই সেগুলি বিদেশী অস্ত্র"। ক্লোজ-আপে দেখা যায় অস্ত্রের বাক্সগুলোর লেবেলগুলি ইতালীয় ভাষায় লেখা।

সে যুগের যুক্তফ্রন্টের জন্য প্রচারের সদৃশ দ্বৈত ভাষার প্রয়োগ আরো সাধারণ স্তরে প্রকাশিত। 'প্রগতিবাদী' শব্দটি উদারনৈতিক সংস্কার বোঝায় এবং এইজন্যই সহানুভূতিসম্পন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে না; আবার সংগ্রামীদের কাছে তার অর্থ ঐতিহাসিক ভ্যানগার্ড, কোয়ালিশনের বামপক্ষ। এমন কি 'প্রজাতন্ত্রী' শব্দটির দ্বৈত অর্থে সমৃদ্ধ—বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র অথবা তারই গর্ভস্থ সর্বহারার প্রজাতন্ত্র। পপুলার ফ্রন্টের সাধিত সংস্কার ও সাবিক শৈথিল্যগুলির সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে (যার মধ্যে বিশেষ ভাবে বলা হয়, "সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সরকার মেনে নেয়।") ধারাভাষ্যকার গুপ্ত ডায়ালেকটিক দিয়ে উপসংহার টানেন, "প্রজাতন্ত্র, যাকে সমগ্র স্পেনবাসীর সাংবিধানিক সরকার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃত প্রজাতন্ত্র হতে আরম্ভ করেছে।"

অবশ্য একই গোপনীয়তায় অধিকাংশ যুক্তফ্রন্টীয় প্রচার 'প্রগতিবাদী' বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র কখন বা কীভাবে সবহারার বিপ্লব সৃষ্টি করবে তা নির্দেশ করা এড়িয়ে যায়। বাস্তব ঘটনা থেকে সূত্র নিয়ে 'স্পেন ১৯৩৭' এমন এক কর্মপদ্ধতির চারপাশে গঠিত যার দ্বারা জনগণের গেরিলা যুদ্ধ এক অস্পষ্ট সাম্যবাদী সমাজের জন্ম দেয়। সংগ্রাম সৃষ্টি করে গণসংহতি যার সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা "সাধারণ মানুষের স্তর থেকেই আসেন।" Azana সরকারের 'প্রগতিশীল' নীতির অস্থির সমর্থক প্রারম্ভিক সিকোয়েন্সগুলির বিপরীতে শেষ সিকোয়েন্সগুলি সরকারী নেতৃত্বকে অবহেলা করে প্রকৃত নেতৃত্ব অর্থাৎ আসল প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রাধান্য সরিয়ে আনে। এরাই জনগণের মিলিশিয়া—একদিকে সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত, অন্যদিকে সুসম এক সমাজের স্রষ্টা।

তাদের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক কমিশনার যার ভূমিকা, "তাকে এ কাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে। তার দায়িত্ব হচ্ছে গণসেনার সচেতনতাকে তৈরী করা।" (কমিশার আন্তনকে নামে পরিচিত করা হয়, কিন্তু কম্যুনিস্ট হিসেবে নয়)।

আসলে এরকম একটা কিছু প্রজাতন্ত্রীদের দখলে থাকা মাদ্রিদে ঘটছিল। অবরুদ্ধ রাজধানী ত্যাগ করে প্রজাতন্ত্রী সরকার ভ্যালেন্সিয়ার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল; ইতিমধ্যেই সোস্যালিস্ট পার্টিগুলিকে লিবারালদের থেকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, তারা সক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রী স্পেনে বিপ্লবকে মন্থরগতি করতে চাইছিল এবং প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও জনপ্রিয়তা ভয়ানক কমে গিয়েছিল। কম্যুনিস্টরাই এখন কার্যকরী প্রশাসনিক রাষ্ট্রশক্তি—কেবল মাদ্রিদে নয়, সমগ্র স্পেনে।

'স্পেন ১৯৩৭' ছবিতেই 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর ইতিহাসনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর বিপরীতে অবস্থিত এক রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপস্থিত হই। এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি জন্ম নিয়েছে ও গঠিত হয়েছে একটি আদর্শ অনুযায়ী। এই আদর্শ বা প্রগতিবাদী রাজনীতি দ্বারা অস্পষ্টীকৃত মার্কসবাদী বিশ্লেষণ বুনুয়েলের আগের ছবিগুলিতে বাহ্যিক ব্যাপার ছিল।

তবু এছবিতে বুনুয়েলের সৃজনধর্মী ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ফুটেজ তিনিই নির্বাচন করেছিলেন। খুব খুঁটিয়ে সম্পাদনা, দেখাশোনা করেছেন, সঙ্গীত নির্বাচন করেছেন এবং তিনিই ধারাবিবরণীর সহ-লেখক। চূড়ান্ত ছবিটিতে (দশ বছর আগে যেটি পূর্বজার্মানীর আর্কাইভে আবিষ্কৃত হয়েছে) আগাগোড়া বুনুয়েলের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

যেটা বোঝা কঠিন সেটি হচ্ছে ছবিটির আপাত রাজনীতির সঙ্গে বুনুয়েলের সম্পর্ক। পরিহাসমূলক দূরত্বের বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা পরম্পরায় পরিপ্রেক্ষিতের অপ্রত্যাশিত মোচড় যোগ করার মধ্যেই ছবিটির প্রতি তার সিনেমাটিক অবদান নিহিত। যদিও এই টাংগুলি রাজনৈতিক বর্ণনার বিরোধিতা করে না কখনো, তবু ধারাভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক রীতি থেকে সেগুলি মাঝে মাঝে সরে আসে।

প্রাথমিকভাবে বুনুয়েল ঘটনার বিশৃঙ্খলায় প্রয়োজনীয় দূরত্ব নিয়ে আসেন। নীরস ধারাভাষ্যটি ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে কেবল ঘটনা বর্ণনা করে এবং 'স্পেন ১৯৩৭' কে 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' -এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিটি। অবশ্য বুনুয়েলের পূর্বসৃষ্ট তথ্যচিত্রে প্রযুক্ত নিষ্ঠুরতার মত অতটা তীব্র নয়। কারণ, যাই হোক না কেন, ছবিটির একটি রাজনৈতিক কর্তব্য আছে—গুপ্ত সংঘাতের প্রচার এবং প্রজাতন্ত্রীদের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও একতা আদায়। এক্ষেত্রে অস্পষ্ট ধারাবিবরণীই হচ্ছে যুদ্ধের রিয়্যালিটি ও তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

তবু মাঝে মাঝে বুনুয়েল আর এক ধরণের—আরো রুক্ষ আয়রনি—দূরত্ব সৃষ্টি করেন অপ্রত্যাশিত কাট্, ইমেজ বা বাগ্‌ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের কয়েকটি অসঙ্গতি আমাদের মধ্যে এই ধারণা তৈরী করে সম্পাদক ধারাভাষ্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে অন্য কিছু বলতে চাইছেন।

ভাষ্যকার জোর দিয়ে বলেন যে, নতুন পপুলার ফ্রন্ট সরকার প্রগতিবাদী—"প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতি আবার আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি দিন নতুন সমৃদ্ধি আনছে, স্পেনবাসীর জন্য খুলে দিচ্ছে নতুন ভবিষ্যতের দরজা।" অবশ্য 'নতুন ভবিষ্যতের' ব্যাপারে আমরা কেবল দেখতে পাই রাজনীতিকদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা ; এছাড়া সম্পাদকেরাও কয়েকটি জাম্পকাট রেখেছেন যার ফলে রাজনীতিকদের 'অধোগতি' অনন্ত মনে হয়। অনুরূপ কিছু এফেক্ট Azana-এর নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার সমালোচনাই করে। শেষে, যখন ভাষ্যকার আশাবাদের সঙ্গে জোর দিয়ে বলেন যে "নতুন রাষ্ট্রপতি পেয়ে প্রজাতন্ত্র গঠনমূলক কাজ করতে আরম্ভ করেছে....। সমস্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থায় জনগণ সরকারকে সমর্থন করেন", তখন অলঙ্কৃত ইউনিফর্ম পরা প্রহরী ও কূটনৈতিক পোষাক পরিহিত রাজনীতিকদের এক সিকোয়েন্সে ঘোড়ায় শহর পরিক্রমারত সম্পূর্ণ রাজকীয় চিহ্নসমেত পালকসজ্জাভূষিত অফিসারদের শটে শেষ হয়। একটাও প্রগতিশীল ব্যবস্থা চোখে পড়ে না।

এটা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত স্বাধীনভাষা যা যুক্তফ্রণ্ট তত্ত্বকে তুচ্ছ করে। এটা যেন যুক্তফ্রন্টের বামপক্ষ—তিনি কম্যুনিস্ট চিত্রনির্মাতা যার প্রতিনিধি—বুর্জোয়া পার্লামেন্টারিয়ানদের বিদ্রূপ করার সুযোগটা নিয়ে ফেলেছেন অথচ সাউণ্ডট্রাকে তাদের প্রগতিবাদী চরিত্রকে যথাবিহিত শ্রদ্ধাও দেখিয়েছেন।

ফ্র্যাঙ্কোর সন্ত্রাসের উত্তরে বিস্ফোরিত পথযুদ্ধের ভাবাবেগাবিষ্ট দৃশ্যের মধ্যে যে কৌতুহলোদ্দীপক ভাষার মোচড় লক্ষ্য করা যায়—এটাই কি তার কারণ? ব্যারিকেডের পিছন থেকে বন্দুকধারীদের গুলিছোঁড়ার উত্তেজিত যেমন সংক্ষেপে শহরের বাড়িগুলির (তাদের লক্ষ্য ?) শান্ত শটের সঙ্গে ইণ্টারকাট করা হয়, যেমনি উত্তপ্ত ধারাভাষ্য রহস্যময়ভাবে এক মুহূর্তের জন্য মৃদু হয়ে আসে, "ব্যারিকেড তৈরী হয়—প্রত্যেক যুগের সামাজিক সংগ্রামের মত।" এরকম সুদূর সরলীকরণের পক্ষে স্থানটি বেয়াড়া। তাছাড়া ব্যারিকেড 'প্রত্যেক যুগের' লক্ষণ নয়। দর্শক, বিশেষত মার্কসবাদী দর্শক, জানেন যে কেবল ১৮৪৮ থেকেই ব্যারিকেড ও সর্বাধুনিক ঘটনা অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার পুলিশের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমার্থক

হয়ে উঠেছে। বুনুয়েল তার অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন —এটা সম্ভব মনে হয় না। তাহলে কি তিনি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের আদর্শবাদকে প্যারডি করছেন? এই বৈশিষ্ট্যটি, অন্যান্য অসঙ্গতির মত, মার্কসবাদীদের প্রতি একটি স্বেচ্ছাকৃত গোপন ইঙ্গিত যে এই গৃহযুদ্ধ ১৮৪৮ সালের ব্যারিকেড ও প্যারী কম্যুনের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী এক শ্রেণী সংগ্রাম।

গেরিলাযুদ্ধ ও তার কৌশল ছবিতে ধরতে গিয়ে বুনুয়েল এমন চিত্রকল্প রচনা করেন যাতে সশস্ত্র প্রতিরোধের দায়িত্ব আর সভ্যতার প্রাত্যহিক কর্তব্য মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এক কৃষক এক হাতে কাপড় সামলায়, অন্য হাতে আঁকড়ে থাকে রাইফেল। ঘোড়ার পিঠেই লোক মেশিনগানে গুলি ভরে নেয়, অন্যমনস্ক, যেন থলেতে আলু ভরছে, তারপর পাথুরে প্রান্তর ধরে এগিয়ে যায়। এই হল গণযুদ্ধের প্রকৃতি; তবু, আদর্শবাদীর চোখে, সর্বত্র-উপস্থিত রাইফেলগুলি সেই হিংসার প্রতীক হয়ে পড়ে যে হিংসা সভ্যতারই অঙ্গ এবং সভ্যতাকে ধরে রাখার জন্য যার প্রয়োজন।

বুনুয়েলসৃষ্ট যুদ্ধের আয়রনির কয়েকটি ইমেজে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আছে। অতর্কিত বিমান আক্রমণে হতচকিত মানুষজন আশ্রয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে আর 'মডার্ন টাইমস'-এর পোস্টার থেকে উঁকি মারছেন ধাঁধায় পড়া চ্যাপলিন। Torija-তে মাদ্রিদের প্রতিরক্ষা বিষয়ে এই মন্তব্যেও একটি ব্ল্যাক হিউমার আছে: "সৈন্যরা রাগে কাঁদছে কারণ তাদের রক্তাক্ত ফোলা পা শত্রুর আরো পশ্চাদ্ধাবনে বাধা দিচ্ছে।" ফ্যাসিস্টদের Basqine অঞ্চল ধ্বংসের দৃশ্যের বিপরীতে সমান্তরাল সিকোয়েন্সে এক আশ্রয় শিবির দেখা যায় যেখানে জাতীয়তাবাদী মানুষের স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রজাতন্ত্রীদের বন্দী; এই সমান্তরাল সিকোয়েন্সেও একই বিকৃত ভাব বুনুয়েলকে প্রভাবিত করে— "প্রজাতন্ত্র তার শত্রুর সন্তানের জীবনের ওপরও লক্ষ্য রাখে।"

বুনুয়েলের জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে 'স্পেন ১৯৩৭' -এর বৃহত্তর মূল ভার্সানে পুরোহিত-শ্রেণী বিরোধী সিকোয়েন্স ছিল, কিন্তু বর্তমান ভার্সানে সেগুলি অদৃশ্য। এক দৃশ্যে ছিল বার্সেলোনার চার্চের লুণ্ঠি। বার্সেলোনার সংঘর্ষে চার্চের প্রতি স্পেনীয় জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণা তথ্যচিত্রে তুলে রাখার সময় তিনি নিশ্চয় খুশি হয়ে থাকবেন, কিন্তু ক্যাথলিক প্রজাতন্ত্রীদের চটাবার সময় সেটা নয় বলে সিকোয়েন্সগুলি বাদ দেওয়া হয়ে থাকবে।

বর্তমান ছবিটিতে বিমানবাহিনীর আক্রমণে পুড়ে যাওয়া চার্চের দৃশ্য আছে—চার্চটির ধ্বংসের রোমাঞ্চকর দৃশ্য ধীরগতি ক্যামেরা ও গম্ভীর নীচে চাপে পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীলদের দায়ী করে ধারাভাষ্য অবশ্য একটি নিরাপদ মন্তব্য করে। "যারা ধর্ম রক্ষক বলে নিজেদের দাবী করে তারাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে।"

কয়েকটি স্বেচ্ছাকৃত বিস্ময় প্রত্যক্ষতর মগ্নচৈতন্যবাদী প্রেরণা থেকে উদ্ভূত, যেমন মাদ্রিদের এক বুলেভার্ডের বৃক্ষ-শ্রেণীর নীচে—প্রতি গাছের নীচে একজন করে—যুক্তফ্রন্টের বিক্ষোভ দর্শনরত মানুষের শটগুলি। তারা ক্যাজুয়ালি দাঁড়িয়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যহীনভাবে নয়। অথবা তাদের বিপরীত শ্রেণীটির শট—চত্বরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া বিরাটাকার স্ট্যাচুর দৃশ্য। (এডিটিংয়ে এই শটটিকে বারান্দা থেকে বিক্ষোভ দর্শনরত কয়েকজন বুর্জোয়া রাজনীতিকের শটের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়)।

ছবির সঙ্গীতও এক সুররিয়ালিস্ট উপাদান। বুনুয়েল বিটোভেনকে ব্যবহার করেছেন। 'ফার্স্ট সিমফনি'র একটি ওয়ালটজ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে বাজে, ফ্যাসিস্টদের বোমাবর্ষণ জনসাধারণের প্রতি আক্রমণসহ ছবির অবশিষ্টাংশে শোনা যায় Egmont Overture। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবির মত Overture-কে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবেন না সঙ্গীতের প্রতীকী ভূমিকা দেবেন সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন— প্রায়ই সঙ্গীতকে হানাদারদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন (যদিও সর্বদা নয়)। এক দৃশ্যে দেখা যায় Overtureটি সাউণ্ডট্রাকে গণ-সেনার প্যারেডে ড্রামের কুচকাওয়াজের ছন্দের সঙ্গে সত্য সত্যই প্রতিযোগিতা করে (এবং ড্রামই জিতে যায়)।

ফ্যাসিস্টরা বোমা বর্ষণ ক'রে চলে: প্রজাতন্ত্রীরা ডিনামাইট ও রাইফেল দিয়ে তার উত্তর দেয়। বিস্ফোরণের মধ্যে ক্যামেরায় ধরা পড়ে পলায়নপর আত্মগোপনকারী ক্রন্দনরত স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর দল এখন আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ঘোষিত ধ্বংসের বাস্তব ও প্রামাণ্য আলেখ্য।

ভেঙে পড়া শহরের বৈপরীত্যে, যুদ্ধের মধ্যে আগাগোড়া, আর এক রূপ প্রকাশিত—মানবিক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নির্বিকার অথচ অবিচ্ছেদ্য এক নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি দৃশ্যগুলি সামনে ও পিছনে ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। ক্রাচধারী আহত সৈন্য স্যানাটোরিয়ামে আরোগ্যলাভ করছেন, তার পাশে আন্দোলিত হয় বৃক্ষপর্ণ, "যুদ্ধের মধ্যে শান্তির অস্তিত্ব", ভাষ্যকার মন্তব্য করেন। শেষ দৃশ্যগুলিতে দূরে ঋজু কালহীন বৃক্ষরাজি দোল খায়—সৃষ্টি করে আর এক ধরণের প্রতিরোধ যার কাছে জেনারেল মিয়াজা, কমিশার আন্তন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তেলিত মুষ্টিকেও অতি ক্ষুদ্র মনে হয়।

'দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিদ্বয়ে চিহ্নিত সভ্যতার ধ্বংস 'স্পেন ১৯৩৭'-এর অ্যাকচুয়ালিটি ফুটেজের সদৃশ চিত্রকল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বুনুয়েল মার্কসবাদের কাছে

তার মঙ্গলচৈতন্যবাদকে অপ্রধান করে রাখেন। জনগণ কেবল বিজিত নয়, বিজয়ীও বটে।

'স্পেন ১৯৩৭'-এর একটি ফরাসী ও স্প্যানিশ প্রিন্ট টিঁকে আছে। শোনা যায় মুক্ত মাদ্রিদে ছবিটি দেখানো হয়েছিল—যদিও মনে হয় প্রদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী দর্শক।

১৯৩৭ সালেই 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিটিও ফ্রান্সে প্রথম মুক্তি পায়। একটি প্রকট পরিবর্তন করা হয়েছিল ছবিটির। সমাপ্তিমূলক একটি টাইটেল যোগ করা হয়েছে যার বক্তব্য Les Hurdes-এর দারিদ্র দূর করা সম্ভব, ফ্র্যাঙ্কোর ক্ষমতা কাড়ার চেষ্টা পর্যন্ত স্পেনের জনগণ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে এবং বর্তমান ফ্যাসি-বিরোধী লড়াই ছবিতে প্রদর্শিত দারিদ্র দূরীকরণের সংগ্রামের সম্প্রসারণ।

অবশ্য, ছবির প্রেমিস-বিরোধী একটি সাম্প্রতিক টাইটেল-এর পক্ষে 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'কে 'স্পেন ১৯৩৭' ছবির মত এক যুদ্ধাস্ত্রে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। তাহলেও বোধ হয় বুনুয়েল পরিবর্তনটি অনুমোদন করেছিলেন।

১৯৩৭ সালের পর কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বুনুয়েলের যোগাযোগ শেষ হয়ে যায়। তখনও তিনি প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষেই কাজ করছিলেন। তাকে কয়েকটি চিত্র-প্রকল্পের জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়—সেগুলো অবশ্য বাস্তবে কোনদিন রূপায়িত হয়নি। ১৯৩৯ সালে ফ্র্যাঙ্কোর বিজয়ের ফলে তিনি বেকার ও নির্বাসিত হন। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কাজ করার সময় যে নৈরাশ্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, রাজনৈতিক ভাবে, প্রজাতন্ত্রের পরাজয় সেই নৈরাশ্যকেই দূর করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুনুয়েলের রাজনীতি ফ্যাসি-বিরোধী ছিল, তবে সে সময় নাৎসি-বিরোধিতার জন্য মার্কসবাদী হওয়ার প্রয়োজন হত না। শেষে নিউ ইয়র্কের ম্যুজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট-এর ফিল্ম বিভাগে তিনি যোগ দেন; 'ইণ্টার আমেরিকান অ্যাফেয়ার্স'-এর 'রকফেলার্স অফিস'-এর যোগাযোগে এই বিভাগটি যুদ্ধের সময় বিভিন্ন তথ্যচিত্রপরিচালককে নিযুক্ত করে। যে সমস্ত অ্যামেরিকান ও বিদেশী বাম-উদারপন্থী চিত্র নির্মাতা স্টুডিওর কাজ পেতেন না অথচ ফিল্মের মাধ্যমে ফ্যাসি-বিরোধী লড়াইয়ে অবদান রাখতে চাইতেন, এই বিভাগটি তাদের কাজ দিয়েছিল।

ম্যুজিয়মে বুনুয়েলের কাজ—সংগ্রহশালার দায়িত্ব, পূর্ণ সম্পাদনা, শিক্ষামূলক স্বল্পদৈর্ঘ ও সংবাদচিত্রের বিদেশী সংস্করণের দেখাশোনা করা—তার এগুলির কোন শিল্পগত বা রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। হারিয়ে যাওয়া এই সব ছবির একটির বর্ণনা থেকে অবশ্য আভাস পাওয়া যায় যে তখনো বুনুয়েলের ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিশ্রুতি ও মঙ্গলচৈতন্যবাদী ধারণার সহাবস্থান বর্তমান ছিল। প্রচলিত নাৎসী ফুটেজ থেকে একটি প্রতি-প্রচারমূলক ছবি নির্মাণের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়, তিনি 'ট্রায়াম্ফ অফ দি উইল' (প্রতিশ্রুতি) এবং 'ব্যাপ্টিজম অফ ফায়ার' (বাস্তব)—এর মধ্যে ইণ্টারকাট করে ছবিটি করেন। তবে সাধারণ্যে নিরীক্ষামূলক ছবিটি কখনো দেখানো হয়নি।

রাজনৈতিক হয়রানির ফলে ১৯৪২ সালে ম্যুজিয়মের কাজ তাকে ছাড়তে হয়। হলিউডে ছোটখাট কাজ নেন তিনি, তার কর্মজীবন তখন রাহুগ্রস্ত। তবে বুনুয়েল চলচ্চিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন—যে চলচ্চিত্রকে আমরা গণশিল্প হিসেবে জানি। যখন বিস্মৃতপ্রায় এই avant-garde পরিচালক পঞ্চাশের দশকে একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন পটভূমিটি হল অপ্রত্যাশিত ল্যাটিন আমেরিকার হলিউড মেক্সিকোর স্টুডিও জগৎ! দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র শিল্পে (B-movie industry) কাজ করার সময় বুনুয়েল মঙ্গলচৈতন্যবাদী ও একই সঙ্গে বস্তুবাদী হিসেবে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছিলেন—সাধারণ ছবিতে তির্যকভাবে, উল্লেখযোগ্য ফিচারে সোজাসুজি। পরে, চিরকাল যা তার সঙ্গে ছলনা করেছে, সেই সৃজনশীল স্বাধীনতা তিনি ফিরে পান।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মণিহারা

মূল গল্প 'মণিহারা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে পড়ে না, এবং অনেকটা সেই জন্যেও এটি বর্জিত হয়ে 'তিন কন্যা' ছবি 'দুই কন্যা' বা 'টু ডটারস' নামেই প্রথমে বিদেশে প্রকাশিত হয়—অবশ্য অন্য কারণও নিশ্চয় ছিল, যেমন এই ছবির বর্ণনায় এমন একটি রস আছে যা বিদেশী দর্শক শ্রেণীর কাছে ঠিকমত গ্রহণযোগ্য না হবার সম্ভাবনা। অবশ্য এই শেষোক্ত কারণটি বোধ হয় সঠিক নয়। আসল কারণটি ছিল ছবিটির দৈর্ঘ্য সংকোচন করা, কিন্তু তার জন্য অন্য ছবি দুটির তুলনায় 'মণিহারা'র প্রতি সত্যজিৎ রায় যে নির্মম হলেন তার মূল কারণ—এই ছবির বিষয়বস্তু তুলনামূলক ভাবে কম সর্বজনীন।

কিন্তু মূল গল্পটি তবুও বার বার পড়েও অফুরান তৃপ্তিলাভ হয়, তার কারণ গল্পটির অসাধারণ কথন ভঙ্গী। এমন সিরিওকমিক ভঙ্গীতে এমন বুদ্ধি উজ্জ্বল গল্প কখনো ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেন নি। গল্পটির আর একটি গুণ আশ্চর্য পরিবেশ চিত্রণ, তাছাড়া সন্তানহীন এক স্বচ্ছল-বিত্ত নারীর স্বর্ণালংকারের ওপর প্রবল লোভ বা Obsession-এর একটি মানসিক চিত্র ও সেই লোভের একটি মনোজ্ঞ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যা গল্পটির সম্পদ।

মূল গল্পটির মধ্যে আর একটি অসামান্য কৌতুক আছে, সেটি হচ্ছে ভূত-পরলোক ইত্যাদিকে নিয়ে আমাদের অনেকের মনে যে বিশ্বাস আছে সেটি নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা। গল্পে আছে, গল্পের কথক একজন মুগ্ধ গ্রাম্য স্কুল মাস্টার যিনি স্থানীয় সব ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তৎকালীন কাল ও নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ বিজ্ঞ ও বেশ রসবোধ সম্পন্ন। গল্পটি তিনি একজন আগন্তুককে বলেন, গল্প চলাকালীন জানতে পারি যে ভৌতিক কাহিনীটি তিনি বিবৃত করেন তার নায়কের নাম ফণিভূষণ সাহা, এবং সে তার মৃত স্ত্রীর প্ররোচনায় জলে ডুবে মারা গেছে বহু বৎসর আগে। এবং এও জানতে পারি তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মণি। গল্প শেষ হয় এক অনবদ্য ভৌতিক রহস্যের রসে। গল্প শেষ হবার পর গল্প কথক আগন্তুক শ্রোতাকে প্রশ্ন করেন এই ভৌতিক কাহিনীটি তিনি বিশ্বাস করেন কিনা। তখন শ্রোতা তার সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, গল্প কথক স্বয়ং এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন কি? গল্প কথক যে উত্তর দেন তা বিস্ময়ের, তিনি জানান তিনি নিজেও এটি বিশ্বাস করেন না, কেননা প্রকৃতি কখনো এমন ভূতের গল্প বানায় না—'প্রকৃতি ঠাকুরাণী উপন্যাস লেখিকা নহেন।' তখন শ্রোতা উত্তর দেন, তাছাড়া তাঁর নামই 'ফণিভূষণ সাহা।' গল্প কথক গল্পের সাক্ষাৎ নায়কের কাছেই তাকে নিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাবার জন্য লজ্জিত হতে পারতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, তাহলে আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। তাহলে আপনার স্ত্রীর কি নাম ছিল?" উত্তর এল "নৃত্যকালী"। গল্পের ওপর এখানেই যবনিকাপাত ঘটে।

সমস্ত গল্পটিতে আমরা জেনে এসেছি ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম 'মণি'। এবং সন্তানহীনা নিজের রূপে গর্বিতা, এবং কোমল স্বভাবের, স্বামীর ভালবাসায় অপরিতৃপ্তা এই নারী নিজের স্বর্ণালংকার পাছে স্বামীর ব্যবসায়ের লোকসানে নষ্ট হয় ভেবে, স্বামীকে লুকিয়ে সমস্ত অলংকার নিয়ে বর্ষার দিনে নদীপথে পালাতে গিয়ে জলস্রোতে ডুবে মারা যায়। তখন ফণিভূষণ হয়ে যায় মণিহারা—'মণিহারা ফণী' বাংলা ভাষায় একটা বিশেষ প্রবাদ—কেননা উপকথায় শোনা যায় কোন এক সর্পের (ফণীর) মাথায় মণি থাকে এবং তা খোয়া গেলে তার সর্বনাশ হয়। এক্ষেত্রেও হয়েছিল, মৃত মণির আত্মা আরো কিছু অলংকারের লোভে তার ঘরে আসত এবং একদিন সেই প্রেতাত্মার পিছু পিছু গিয়ে কাহিনীর ফণিভূষণও জলে ডুবে মারা যায়। গল্পের পরিবেশে মজে আমরা যখন এই ভৌতিক গল্পটি বেশ বিশ্বাস করে বসেছি, তখনই গল্পকথক ও শ্রোতার সংলাপ থেকে জানতে পারি কাহিনীটি সত্য নয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেত সম্পর্কীয় বিশ্বাস নিয়ে কিছুটা কৌতুক বা ঠাট্টা করেন। কিন্তু তাহলে কাহিনীর মধ্যে কি কিছুই বিশ্বাস্য বা সত্য নেই? এখানেই গল্পের শেষ সংলাপটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করি গল্পকথক কাহিনীটিতে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়েছেন, কিন্তু ফণিভূষণ নামটি তাঁর সৃষ্ট বা বানানো নয়, সত্যিই সেই লোক ছিলেন ও তার সামনেই বর্তমান, এবং তিনি সেটা কিছুটা আন্দাজও করেছিলেন। তিনি ফণিভূষণে ফণীর সঙ্গে তাৎ-

পর্যতা ও মিল রেখে তার স্ত্রীর নামটি বানিয়ে নিয়েছেন মণি। তার কথিত কাহিনীটির গঠন এবং পরিসমাপ্তিটিও এমনি মিল রাখা কাব্যের মত, অবশ্যই ভৌতিক কাব্য। কিন্তু যখনই তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে ফণিভূষণের স্ত্রীর আসল নাম জানতে চান, তখনই বোঝা যায় কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। এর ভৌতিক অংশটি অবশ্যই মিথ্যে, কিন্তু তার আগের ফণী ও তার স্ত্রীর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও স্ত্রীর স্বর্ণালংকারের প্রতি লোভ যে একটি ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলেছিল তার ভিতরকার সত্যতা ঠিকই। এবং কাহিনীর সেই অন্তর্সত্তাটি মিলরাখা ভৌতিক কাব্যের মত নয়—অর্থাৎ ঠিক যেমনটি গল্পে শুনতে আমরা ভালবাসি তেমন নয়—বরং সেটি রীতিমত গদ্যধর্মী রূঢ় বাস্তব। এবং তা পরিষ্কার হয়ে উঠে যখন স্ত্রীর মণি বা মণিমালিকার আসল নাম কি জানতে চাইলে উত্তরে শুনি একেবারে গদ্যময় একটি নাম 'নৃত্যকালী'। গল্পটি সেই মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে নিছক মনোমত ভূতের গল্প থেকে উত্তীর্ণ হয় একটি গভীর মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক বস্তুব্যপ্রধান গল্পে। রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে কলমের এক আঁচড়ে পারলৌকিক বিশ্বাসের ধোঁয়াটে জগৎ থেকে সরিয়ে আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন এক অসামান্য নব মহিমায়. এ কাজ রবীন্দ্রনাথের মত একজনের কলমের পক্ষেই সম্ভব।

এতো গেল মূল গল্পের সত্য। 'মণিহারা' ছবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি ভূতের গল্পই রয়ে গেছে, যদিও মূল গল্পের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিবেশ চিত্রণ ছবিতে অসাধারণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, সিনেমার নিজস্ব ভাষায় তা কিছু কিছু সিকোয়েন্সে অনবদ্য। কিন্তু যে অসাধারণ মুন্সীয়ানায় মাত্র শেষ কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে গল্পটির গুণগত চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে—ছবিতে সেটি ঘটেনি। ছবির শেষে অযথা দেখি শ্রোতা (সারাক্ষণ চাদর মুড়ি দেওয়া ছিল) নিজেকে গল্পের নায়ক ঘোষণা করার পর (আমিই ফণিভূষণ) ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং সেই দৃশ্য দেখে গাঁজাখোর গল্প কথক সোজা উঠে চম্পট দেয়—পড়ে থাকে তার লুণ্ঠিত গাঁজার কল্কেটি—ক্যামেরা সেটিকে ক্লোজ আপ করে। অথাৎ সমস্ত ঘটনাটি একটি গাঁজা প্রেমিক গল্পবাজ মানুষের স্বকল্পিত কিনা সেটাও সন্দেহ হয়। যাই হোক না কেন, এতে মূল গল্পের শেষ সংলাপের সেই অসামান্য দীপ্তি ও চমক প্রকাশিত হয় না।

অবশ্য সত্যজিৎ রায় এর জন্য ঠিক দায়ী কিনা, অথবা চলচ্চিত্র মাধ্যমে এই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য—তা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। সাহিত্যে ফণীভূষণকে চাক্ষুষ সামনে দেখান সম্ভব নয়, কয়েকটি লাইনে তার শারীরিক বর্ণনা করা হয়, তাতে ঠিক অবিকল সে কী রকম বোঝান সম্ভব নয়, এক একজন পাঠক এক এক ভাবে কল্পনা করে নেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে সে চাক্ষুষ বর্তমান। তাই এই গল্পে আগন্তুকটি যখন শ্রোতা হয়ে শোনে, তখন গল্পের সে যে ওই ভূতুড়ে কাহিনীর নায়ক ফণিভূষণ তা বোঝার উপায় থাকে না, কেননা কাহিনীর নায়ক বা আগন্তুকটি দুজনেরই শারীরিক চেহারা কি রকম সবই পাঠকের কল্পনা নির্ভর। কিন্তু ছবিতে যখনই ভূতুড়ে কাহিনী বলা শুরু হয়, তখনি ফণিভূষণকে চাক্ষুষ দেখি, এবং তখনি চিনতে পারি শ্রোতাই ফণিভূষণ। সুতরাং ছবির শেষে আগন্তুকের আত্মপরিচয় ঘোষণা "আমি ফণিভূষণ সাহা' বলার আর অবকাশ থাকে না। ততক্ষণে আমরা চাক্ষুষ দেখে জেনে গেছি। সুতরাং গল্পের শেষের চমক ছবিতে সৃষ্টি করা দুরূহ। তবে অসাধ্য ছিল কি? ছবিতে আগন্তুক শ্রোতাকে কম্বল জড়ান দেখান হয়েছে তাকে আরো একটু দুর্লক্ষ্য করলে হয়ত বা গল্পের শেষ রসটুকু ফোটান যেতে পারত, তবে আমি নিঃসন্দেহ নই।

যাই হোক, মোট কথাটা হ'ল গল্পের শেষে যে চূড়ান্ত এ্যান্টি-ক্লাইমেক্সটি আছে ছবিতে সেটি পরিহৃত হয়েছে, এবং তাতে কিছুটা রসহানি ঘটেছে। এটুকু বাদ দিলে মূল গল্পের বাকি অন্তর্নিহিত রস ও তাৎপর্য বড় অপূর্বভাবে ছবিতে ফুটে উঠেছে। এছবির অমূল্য সম্পদ পরিবেশ রচনা। ছবিতে যখন গল্পকথক গল্পটি চাদরমুড়ি দেওয়া এক আগন্তুককে বলছে—তখনকার শীতার্ত পরিবেশটি অনবদ্য। কাহিনীর প্রথমেই দেখি ফণিভূষণ ও তার স্ত্রী মণিমালিকা কলকাতা থেকে তাদের পল্লীগ্রামের বৃহৎ বাসভবনে এসেছে। এবং জানালায় দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী নদী দেখছে। আমরা শুনতে পাই কোথায় একটি পাখি ডেকে উঠল। মণি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে "ওটা কি পাখি ডাকছে" অপ্রস্তুত ফণিভূষণ উত্তর দেয় 'আমি জানি না, তুমি বরং ভগীরথকে (ওদের চাকর) জিজ্ঞেস কর"। এই সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গে এদের কোন সংশ্রব নেই, এবং ফণিভূষণ স্ত্রীর কৌতূহল মেটাবার দায়িত্বটা ভৃত্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। তাদের সম্পর্কটা যেন পারস্পরিক বোঝাপড়ায় নিবিড় নয়। দ্বিতীয়ত পাখির সম্পর্কে এদের কোন জীবন্ত কৌতূহল নেই সংলাপে তা জানানোর পরই—যখন একে একে এদের সাজান ঘর দেখান হয়, বিস্মিত হয়ে দেখি নানান ধরণের পাখির দেহ সংরক্ষিত অবস্থায় সাজান আছে কাঁচের জারের মধ্যে। অর্থাৎ এদের মধ্যে জীবন্ত কৌতূহল না থাক, সব কিছুকে নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষণ করা এদের স্বভাব, এটা এদের চরিত্রের 'পজেসিভ' দিকটিকে প্রকাশ করে। এরা সব কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়, এবং যা চায় তা সবই জীবনহীন, সুন্দরী মণি মালিকার মনের খোঁজ না নিতে চাইলেও তাকে স্ত্রী হিসেবে এক দুর্লভ সুন্দর সম্পত্তির মত পেতে চায় ফণিভূষণ; মণিমালিকাও

তার মৃত সম্পত্তি স্বর্ণ-অলংকারগুলির জন্য স্বামীকে ত্যাগ করে। ওদের ঘরে মৃত পাখির দেহ, পুতুল ইত্যাদি যা কিছু আছে সব বড় বড় কাঁচের বেলজার দিয়ে ঢাকা। যেন নিষ্প্রাণ হিসেবেই এরা সব কিছু সংরক্ষণ করে রাখে। খুবই চিত্তাকর্ষক যে এই পাখির মৃত দেহগুলি দিয়েই পরে প্রেতাত্মার আবির্ভাবের রহস্যঘন মুহূর্তে আশ্চর্য ভীতিজনক পরিবেশ রচনা করেছেন পরিচালক—অর্থাৎ যা প্রথম দিকে ছিল চরিত্রের প্রতীকী তাৎপর্যে ভাস্বর, পরে তাই রচনা করে অনবদ্য পারিবেশিক ডিটেল।

এই ছবিতেই প্রথম সত্যজিৎ রায় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার করেন—'বাজে করুণ সুরে'। মণিমালিকার প্রেমহীন নিঃসঙ্গতা তাতে বেশ ধরা পড়েছে।

মণিমালিকার নারী মনস্তত্ত্বটি গল্পের মতই ছবিতে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সরসিত মন্তব্যে উদ্ঘাটিত—গল্পের রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি প্রায়শঃই রক্ষিত হয়েছে। একজন নারী, যে সুন্দরী এবং সে সম্পর্কে বেশ সচেতন, যার কোন সন্তান হয়নি, হয় বন্ধ্যা না হয় পুরুষটি (স্বামী) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম—যার কোন আর্থিক অভাব দারিদ্র নিয়ে কোন চিন্তা নেই, যার স্বামী এমন কোমল স্বভাবের যে তার কাছে নিজের দেহের রূপের যৌবনের বা নারীত্বের মর্যাদা পাওয়ার জন্য কোন কৌতুহলদীপ্ত চেষ্টার দরকার হয় না, সুতরাং দাম্পত্যপ্রেমের লীলাটিও আকর্ষণহীন নিরুত্তাপ—তদুপরি সেই নারীর স্বভাবজ স্বর্ণালংকার প্রীতি একটু বেশি, এবং উপরিউক্ত কারণে ধীরে ধীরে তার মানসিক আগ্রহ শেষ পর্যন্ত স্বর্ণালংকার সংরক্ষণেই অভিনিবিষ্ট,—তার মানসিক অবক্ষয় ও ট্রাজেডি ভারী চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত। ছবিতে একটি নূতন উপাদান আছে, মণিমালিকার অন্য একটি প্রেমিক ছিল—গল্পে তা নেই। এটিতে মণিমালিকার মত নারীর স্বামী বিরূপতার কারণটি স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু ছবিতেও মণিমালিকার আসল প্রেম তার স্বর্ণালংকারের সঙ্গেই, প্রেমিক পুরুষটি তার বাহন মাত্র। এবং সেই প্রেমিক পুরুষটির আসল লোভ মণিমালিকার গয়নার প্রতি। মেঘভারাক্রান্ত সকালে যে ভরা নদীপথে সেই প্রেমিক পুরুষটির সঙ্গে মণি তোর বুকের ধন গয়নার বাক্সটি নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করল—তার ছবিটি অসামান্য ভাবে ফুটে উঠেছে ; এবং আসন্ন এক সর্বনাশের ইঙ্গিত দৃশ্যটি যেন মেঘাবৃত আকাশের মতই থমথমে।

মণিমালিকার প্রেতাত্মার আবির্ভাব দৃশ্যটি গঠিত হয়েছে, শব্দের, আলোক পাতের, ক্যামেরার গতি ও দৃষ্টিকোণের অনবদ্য নির্বাচনে এবং অপূর্ব পারিবেশিক ডিটেলের ব্যবহারে। এমন চমৎকার 'সাসপেন্স' ভারতীয় ছবিতে ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। সত্যজিৎ রায়ের নিজের সঙ্গীতের ব্যবহার সীমিত কিন্তু যথোপযুক্ত। অর্ধসুপ্ত ফণিভূষণের ক্লোজ শট......হঠাৎ প্রেতাত্মার স্বর্ণালংকারের ঝম ঝম শব্দের এগিয়ে আসা, ফণিভূষণের জেগে ওঠা। চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স রচিত হয় যখন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা থাকে ফণিভূষণের শয্যাপার্শ্বে স্ত্রীর আরো কিছু ফেলে রাখা গয়নার বাক্সটি। নেপথ্যে শুনি আগের শব্দটি হঠাৎ থেমে যায় কাছে এসে। ক্যামেরা স্থির, ধরে রাখে গয়নার বাক্সটিকে—হঠাৎ জাগ্রত ফণিভূষণ গয়নার বাক্সটি ধরতে চায়, তখনি ফ্রেমের মধ্যে ভীষণ ভাবে প্রবেশ করে একটি কংকালের হাত, অনেক গয়না পরা, এবং সেই হাত প্রচণ্ড লোভে ফণিভূষণের হাত থেকে গয়নার বাক্সটি কেড়ে নিতে চায়। ফণিভূষণ আর্তনাদ করে জ্ঞানহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে। মূল গল্পে ব্যাপারটা অন্যরকম, সেখানে দেখায় মন্ত্রমুগ্ধের মত ফণিভূষণ স্ত্রীর প্রেতাত্মার পিছু পিছু পশ্চাদধাবন করে, প্রেতাত্মা বাড়ীর খিড়কি পেরিয়ে ভরা নদীর মধ্যে নেমে যায়, ভূতে পাওয়া ফণিভূষণ জলে নামে এবং ডুবে মরে। ছবিতে এটি পরিবর্তিত হয়ে ভালই হয়েছে। ছবির শেষাংশ আগেই বিবৃত হয়েছে এবং তার সঙ্গে মূল গল্পের পার্থক্যটি।

ভূতের গল্প সর্বদেশে একটি জনপ্রিয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে অনেক মজার ও ভয়ের ভূতের গল্প শুনেছেন, গল্পকার হিসেবে একটি ভূতের গল্প রচনার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু 'মণিহারা' তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে হয়ে উঠেছে এক উচ্চস্তরের শিল্প। যদিও এর মধ্যে ভূতের গল্পের সব রহস্য রোমাঞ্চটুকুও ধরা পড়েছে, তবু কি আশ্চর্যভাবে অন্য এক গভীরতার স্তরে উন্নীত করেছেন—তার মুন্সীয়ানা সাহিত্যের ছাত্রদের বিস্মিত করে দেয় আজো।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে সেই বিস্ময়টি সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করতে পারেন নি—এটুকু বাদ দিলে 'মণিহারা' একটি অপূর্ব ছবি হয়েছে।

(চলবে)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটি নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবি নিয়ে বিদেশে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, যার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে (২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩, ফোন ঃ ২৩-৭৯১১) যোগাযোগ করুন।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৮৪

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

বায়েনপাড়ার বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় জগন নোটবুক হাতে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করছে। সঙ্গে রয়েছে যতীন।

জগন : এ ঘর কার ?

সতীশ : আজ্ঞে আথনার !

জগন : ফের গ্যাছে ?…বা বা বা…

একটা বাউড়ি মেয়ে ফ্রেমের মধ্য দিয়ে চলে যায়। তার মাথায় রয়েছে একগোছা টাটকা নারকেল পাতা।

জগন [illegible]কে নিয়ে এলি রে !

মেয়েটি বাঁধের গা থেকে।

জগন (যতীনকে) উঁ, ভাগ্যিস ঐ মান্ধাতার আমলের জমিদারী গাছগুলো ছিল !

কাট্ টু

দৃশ্য—২৮৫

স্থান—নদীর বাঁধ।

সময়—সকাল।

বাঁধের ওপর সারি সারি নারকেল গাছ। বাউড়িরা গাছে উঠে পাতা কাটে, মেয়েরা নীচে দাঁড়িয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে।

ভ্যাকা একটা গাছ থেকে নেমে বৌ সুন্দরীকে বলে—

ভ্যাকা : লে, চল্ !

হঠাৎ তারা ঘুরে কার যেন চীৎকার শুনে সেদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ভূপাল আরও চার-পাঁচজন সাকরেদকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে।

ভূপাল : খবদ্দা—র !…খবদ্দা—র !…এ্যাই— !

কাট্ টু।

সুন্দরী : অ-মা !

ভূপাল : খবদ্দার, একটা পাতাতেও হাত দিবি না !…চল্ আমাদের সঙ্গে—

ভ্যাকা : কুথাকে ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৬

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—ক্যামেরা ছিরু পালকে অনুসরণ করে। রাগ, বিরক্তি আর প্রতিশোধের চাউনি তাঁর চোখে মুখে। এক বোঝা নারকেল পাতার সামনে বাউড়িরা দাঁড়িয়ে।

ছিরু : কি রে ?…চণ্ডীমণ্ডপে নাকি ব্যাগার খাটবি না কেউ ?…ওগুলো কার ?…কার হুকুমে কেটেছিস্ ?

পাতু : ইয়ার আবার হুকুম কিসের মাশায় ? বরাবর বাপ-পিতেম'র আমল থেকে যা কেটে আসছি—

ছিরু : সেটা চুরি !…তোদের বাপ পিতেম' তো চোর ছিল রে ব্যাটা !…তাই বলে এখনো তাই করবি ?…আমার আমলে ?

ছিরু পালের এই কথায় বাউরিরা আঘাত পায়। গুন্‌গুন্ করে ওঠে তারা। এমন সময় দেখা যায় দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে জগন ডাক্তার।

দেবু : কি হয়েছে ছিরু ?

ছিরু : শুধোও !…শুধোও ক্যানে ?…পে-ঞ্চা-স-মি-তি !! (ভূপালকে) এ্যাই ! বেঁধে ফেল সব কটাকে !

দেবু : একে বোধ হয় ঠিক চুরি বলে না ছিরু ! আগে জমিদার আপত্তি করত না—ওরা কাটত। এখন তুমি গোমস্তা হিসেবে আপত্তি করছ… (বাউরিদের) ঠিক আছে…এরপর থেকে আর কাটিস না রে তোরা !

জগন : মানে ?…কাটবে না মানে ? তিন পুরুষ ধরে কেটে আসছে !…তিন বছর ঘাট সরলো, পারে কেউ সে ঘাট বন্ধ করতে—না পথ বন্ধ করতে ?

ছিরু : (হিসহিসে গলায়) বেশী বাজে বোকো না ! ও গাছতো দুরস্থান, নিজের বাগানে যে শখ করে গাছ লাগিয়েছে, শুধু ফলটুকু ছাড়া তার

আর কিছুতে হাত দিয়ে দেখো দিকি !...ফাঁকা কলসীর মতো বক্‌বক্ করতে শিখেছ !... জমিদারী আইন একেবারে ছেলের হাতের মোয়া—না ?

দেবু : ছিরু, আমি বলছি এবারকার মতো—

ছিরু : না খুড়ো ! বেধে যখন গ্যাচে তখন ভালো করে বাধাই ভালো ! ...ভূপাল !

দেবু : ধরো ওরা যদি দাম দিয়ে দেয়—

ছিরু : দাম ?

জগন : ঠিক আছে। তাই সই। (বাউরিদের) এ্যাই, শোন্ তো ! যার যার পাতা গুনে ফ্যাল তোরা।

বাউরিরা পাতা গুনতে শুরু করে।

হঠাৎ ছিরু গর্জন করে ওঠে।

ছিরু : বস ! রাখ তালপাতা। এক পা নড়বি না আমার হুকুম ছাড়া।...এ্যাই ভূপাল হারামজাদা !...আটক কর্ ব্যাটাদের।

ভূপাল ও চৌকিদাররা বাউরিদের দিকে এগিয়ে যায়।

দেবু : দাঁড়াও !

সবাই তার দিকে তাকায়। দেবু পায়ে পায়ে বাউরিদের দিকে এগিয়ে আসে।

দেবু : (বাউরিদের) ওগুলো পড়ে থাক্ ! আয় তোরা, উঠে আয় তোরা ওখান থেকে।...আমি বলছি, ওঠ্। আয় আমার সঙ্গে।

ছিরু : খুড়ো !

দেবু : (ছিরু পালের দিকে একবার তাকিয়ে) আমার গায়ে হাত না দিয়ে কেউ ওদের ছুঁতে পারবে না। চলে আয় !

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ। ছিরু পাল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। বাউরিরা।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ। দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

জগন : বলো, পেজা—সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !

জগন : পেজা-সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !!

জগন : পেজা-সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !!!

জগন বাউরিদের নিয়ে গাঁয়ের দিকে ধ্বনি দিতে দিতে যেতে থাকে। ক্যামেরা প্যান্ করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অনিরুদ্ধকে কম্পোজ করে। সে উল্লাসের হাসি হেসে চিৎকার করে ওঠে—

অনিরুদ্ধ : "হরি হরি বোলো
হরি হরি বোল্—"

কাট্ টু।

ছিরু পাল ও তার দল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : "ছি-হরি ছি-হরি বোলো
ছি-হরি ছি-হরি বোল্—

নাচতে নাচতে সে চলে যায় ফ্রেমের বাইরে।

জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত বাউরিদের দুটো দলে ভাগ করে দু-পথে নিয়ে যায়।

ছিরু : ষষ্ঠী !

ষষ্ঠী : এজ্ঞে !

ছিরু : এখুনি একবার কঙ্কনা যাবি ?...দাশজীকে বলবি—নাদের শেখের ছেলে কাছু শেখ আছে,—আমার চাই !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৭।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত একদল বাউরিকে নিয়ে এসে বাড়ির সামনে দাড়ায়।

দেবু : দাঁড়া তোরা, আমি আসছি—

দেবু পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৮।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বাড়ির উঠোনের এক কোণে ক্যামেরা। বিলু ঢেঁকিতে পার দিচ্ছে। দুর্গা একটা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ফোর-গ্রাউণ্ডে দেখা যায় দেবু পণ্ডিত উঠোনে ঢুকে বারান্দায় যাচ্ছে।

দেবু : বিলু!...বিলু...

বিলু সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে পার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় দুর্গাকে চুপ করতে বলে এবং লুকিয়ে পড়তে অনুরোধ করে। দুর্গা লুকিয়ে পড়ে।

বিলু শাড়ির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তাড়াতাড়ি ঘরে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৯।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

দেবু ঘরের চারদিকে তাকায়।

দেবু : বিলু!...বিলু!

বিলু ঘরে ঢোকে।

বিলু : কি গো?

দেবু : এই যে! বড় মুসকিলে পড়ে গেছি!

বিলু : কি হয়েছে?

দেবু : ঝড়ে ঘর পড়ে গ্যাছে—তাই ওরা বাঁধে পাতা কাটছিল।...ছিরু সে পাতা আটক করেছে। আমি ওদের উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন... ঘর ছাইবার একটা ব্যবস্থা না হলে তো—

বিলু দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দেবু : (বিপন্ন মুখে) আমার ওপর ভরসা করে উঠে এসেছে ওরা।

বিলু : (একটু থেমে) কতো?

দেবু : যা হোক্...চার...পাঁচ...হবে?

বিলু কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপর হেসে বলে—

বিলু : দাঁড়াও...

বিলু পাশের ঘরে চলে যেতে দেবু পণ্ডিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

দেবু : সত্যি, তুমি, নইলে...যখন তখন হুট্ হাট্ করে যা খুশী এসে—চাই, আর তুমি...

বলতে বলতে থেমে যায় দেবু পণ্ডিত। পাশের ঘরে বিস্ময়ের কিছু ঘটছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯০।

স্থান—বিলুর ঘর।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিতের ভিউ পয়েণ্ট থেকে দেখা যায় পাশের ঘরে বিলু ঘুমন্ত তার ছেলের হাতে থেকে সোনার বালাটা খুলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯১।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত বিলুর বালা খোলা দেখছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯২।

স্থান—বিলুর ঘর।

সময় দিন।

বালা খুলতে গিয়ে বাচ্চাটি জেগে ওঠে। পিঠ চাপড়িয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বিলু। তারপর বালাটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েই দেবু পণ্ডিতকে দেখে চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

বিলু কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে পড়ে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে।

বিলু : নাও, ধরো।

দেবু : না...না...বিলু...

বিলু : কেন?

দেবু : এ বালা...এ বালা আমি—

বিলু : ছি!...ওরা না তোমায় দেখে উঠে এসেছে! নাও ধরো!

দেবু : তাই বলে খোকার বালা—

বিলু : হ্যাঁ, খোকার বালা!...আবার যখন হবে তোমার, গড়িয়ে দেবে তুমি।

দেবু : সবই তো বোঝো বিলু। যদি আবার না হয়?

বিলু হেসে গর্বের সঙ্গে বলে—

বিলু : না হলে ছেলে আমার পড়বে না।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ আপ।

কাট্ টু।

ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতেই বিলু ছুটে যায়।

বিলু : ও-ও,...ও-ও...কি হয়েছে?...কি হয়েছে?

দেবু পণ্ডিত বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৩।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বাউরিরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দেবু পণ্ডিত সেখানে এসে সতীশ বাউরির হাতে বালাটা তুলে দেয়।

দেবু : নাও।...সবার চলার ব্যবস্থা করে নিয়ো।

কয়েক মুহূর্ত সতীশ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

নারাণ : (হঠাৎ, চেঁচিয়ে) বলে, পেঁজা-সমিতির—

বাউরিরা : জয়!

নারাণ : পেঁজা-সমিতির—

বাউরিরা : জয়!

নারাণ : আমাদের নেতা দেবু পণ্ডিতের—

বাউরিরা : জয়!

দেবু পণ্ডিতকে দরজার কাছে রেখে বাউরিরা সবাই চলে যায়।

কাট্ টু।

শ্লোগান দিতে দিতে চলেছে একদল বাউরি।

ভ্যাকা : আমাদের নেতা দেবু পণ্ডিতের—

বাউরিরা : জয়!

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ সে বাচ্চাটার কান্না শুনতে পায়। বিলু বাচ্চাটিকে কোলো নিয়ে ফোর-গ্রাউণ্ডে দেবু পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ায়। কান্না থামানোর চেষ্টা করে।

বিলু : কি হয়েছে?...খিদে পেয়েছে?...ও ও ও... আয়...পাখি...আয় পাখি—

কাট্ টু।

বাউরিদের মিছিল দূরে চলে যাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের ওপর চার্জ করলে বোঝা যায় সে দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তামগ্ন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৪।

স্থান—ছিরু পালের বাগান বাড়িতে একটা ঘর।

সময়—রাত্রি।

একটা হ্যারিকেনের ওপর থেকে ক্যামেরা লো এঙ্গেল শটে প্যান করে দেখায় ছিরু পালকে।

ছিরু : শালার পণ্ডিত...ঢ্যামনা সাঁপেরও ফণা গজাইছে!

গরাই এর দিকে একটা হিসাবের খাতা ছুঁড়ে দেয়। বলে—

ছিরু : শালার বকেয়া খাজনা কতো হইচে ছাকো তো?

কালু : (off) সালাম হুজুর!

ছিরু পাল ও গরাই দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দরজা। বিশ্রী চেহারার একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। সারা মুখে কাটা দাগ। সঙ্গে রয়েছে ষষ্ঠী।

কাট্ টু।

ছিরু : কে রে?

ষষ্ঠী : কালু এসেচে!

ছিরু : ও!...এসে গেছিস?...আয়, ভেতরে আয়!

কালু : (আসতে আসতে) বেপার কি?...বড়া জোর তলব? কুছু হাঙ্গামা উঙ্গামা নাকি?

ছিরু : তোর হাতে সব শুদ্ধু কতো লোক রে কালু?

কালু : ক্যানে? কতো চাই?

ছিরু : (এদিক ওদিক তাকিয়ে, চাপা গলায়) দোরটা দিয়ে দে!

কাট্ টু।

কালু ঘুরে দরজাটা বন্ধ করতে উদ্যত হয়। দূরে বাঁশির মত কিছুর শব্দ শুনে থমকে যায়।

কালু : কিসের আবাজ?

কাট্ টু।

(চলবে)

Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 January 1980 Vol. 13 No. 5

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutt.
2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র
ত্রয়োদশ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী '৮০
চিত্রবীক্ষণ
বিষয়সূচী
এই রাজ্যের ফিল্মসোসাইটি আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা / তিন
সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র : রবীন্দ্রসাহিত্যভিত্তিক / অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় / পাঁচ
এমিলি ডি আন্তোনিও : সাক্ষাৎকার / অ্যালান রোজেনথাল / বারো
তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার / একুশ
প্রচ্ছদচিত্র : মধু বসু নির্দেশিত 'আলিবাবা'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে
সম্পাদক : অনিল সেন

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বোবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গোহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৩
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি ৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুষ্পিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারি রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কেল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা

পশ্চিমবাংলায় সম্প্রতি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বিস্তার বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি নতুন নতুন সম্ভাবনার পথও এই আন্দোলনের সামনে ক্রমশঃই প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমে সমস্যা অনেক, বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সমস্ত ফিল্ম সোসাইটি নতুন কাজকর্ম শুরু করেছেন তাঁরা এখনো ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সদস্যপদ না পাওয়ায় নিয়মিত ছবি পাওয়ার ব্যাপারে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া এই নতুন সোসাইটিগুলির পক্ষে ছবির প্রদর্শনীর জন্য নিয়মমাফিক বিভিন্ন সরকারি অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটিও যথেষ্ট কষ্টকর।

নতুন সংস্থাগুলির যেমন বিশেষ সমস্যা রয়েছে তেমনি সাধারণভাবে ফিল্ম সোসাইটিগুলির সমস্যাবলী একই রকম রয়েই গেছে দীর্ঘদিন ধরে। ফেডারেশন থেকে পাওয়া ছবির সংখ্যা এমন নয় যা অবাধ এবং নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে এবং এই ব্যাপারে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির সমস্যা অনেক বেশী। বেশীর ভাগ জায়গায় রবিবার সকালে কোন সিনেমা হলে মর্ণিং শো করা ছাড়া ফিল্ম সোসাইটিগুলির পক্ষে বিকল্প কিছু নেই। এবং এজাতীয় প্রায় সব সোসাইটিই রবিবার ছবি দেখাতে চাওয়ায় কিছু বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবেই। বিশেষ করে মফঃস্বল সোসাইটিগুলির আর্থিক সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। একমাত্র আয় সদস্য চাঁদা থেকে ছবি দেখানোর খরচ সামলে উঠে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, যেমন সভা-সমিতি, আলোচনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা।

কলকাতা ও আশেপাশের সোসাইটিগুলির অবস্থাও কিন্তু সমস্যামুক্ত নয়। এখানেও ছবি দেখানোর হলের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। সন্ধ্যেবেলা ছবি দেখানোর জন্য যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যায় তা বিশেষ উপযোগী নয় এবং সব কটি সোসাইটি এই দু-একটি হলে শো করা ছাড়া বিকল্প কিছু পাননা বলে এখানে হল পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মর্ণিং শো করতে গেলেও নুন শো চালু হওয়ার ফলে শো-এর সময় খুব আগিয়ে দিতে হয় যার ফলে সদস্যদের যথেষ্ট অসুবিধা, এছাড়া কলকাতার সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রেও ছবি পাওয়ার সাধারণ সমস্যা তো রয়েইছে।

এছাড়া সর্বত্র সরকারি অনুমতির ব্যাপারে কিছু সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এখনো রয়ে গেছে। যদিও সাম্প্রতিক কালে কর্পোরেশন, পুলিশ বা কমার্শিয়াল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটি আগের থেকে যথেষ্ট সরল হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবুও কিছু কিছু অযৌক্তিক পদ্ধতি এখনো রয়ে গেছে, যেমন কমার্শিয়াল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিটি শো-এর কার্ড স্ট্যাম্প করানো, যে কার্ডগুলির কোন মূল্য নেই, কেননা সদস্য কার্ড দেখিয়েই ফিল্ম সোসাইটি সদস্যরা ছবি দেখে থাকেন। এ সমস্ত পদ্ধতিগুলির পুরো অবসান হওয়াই ভালো, না হলে অন্তত আরো সরলীকরণ প্রয়োজন। এছাড়া ভারতীয় ভাষার ছবির ক্ষেত্রে প্রমোদকর অব্যাহতির ব্যাপারটাও এখনো আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আদায় করে উঠতে পারিনি। এই সব প্রশ্ন নিয়ে ফেডারেশনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়া ফেডারেশনের সদস্যপদ পাননি এমন সমস্ত সহযোগী সংগঠনও যাতে সরকারী অনুমতি পেতে অসুবিধা বোধ না করেন সেটাও ফেডারেশনকেই দেখতে হবে। এটা ফেডারেশনের নৈতিক দায়িত্ব।

ছবির ব্যাপারে সর্বভারতীয় চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পূর্বাঞ্চলীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলি তুলনামূলকভাবে কম ছবি পাচ্ছেন। ছবির সুষম বন্টন এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রে ছবির সমস্যাকে কিছুটা সহজ করে তুলবে। ছবি বাড়ানোর ব্যাপারে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন মারফৎ ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্য বেশী সংখ্যক এবং উপযুক্ত মানের ছবি আমদানী করেন। ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভও যাতে এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্য বেশী সংখ্যায় ছবি যোগান দেন সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টির জন্য ফেডারেশনকে উদ্যোগী হতে হবে।

ফিল্ম সোসাইটিগুলির হল পাওয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করেও কিছু ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। কলকাতা এবং বিশেষ করে মফঃস্বলে সিনেমাহল মালিকদের সঙ্গে ই, আই, এম, পি, এ মারফৎ আলোচনা করে হলের ভাড়া কমানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। এছাড়া মফঃস্বল অঞ্চলে যেখানে যেখানে রবীন্দ্রভবন, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি আছে সেগুলিতে যাতে ফিল্ম সোসাইটিগুলি নামমাত্র ভাড়ায় ছবি দেখাতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে যেসব প্রোজেক্টর রয়েছে সেগুলি ঐ সমস্ত হলে বসানোর ব্যবস্থা করলে ফিল্ম সোসাইটিগুলি নিয়মিত ভিত্তিতে ছবি দেখাতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় একটি আর্ট থিয়েটার স্থাপন করছেন, এটা অত্যন্ত আশাপ্রদ ঘটনা। এই কাজকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটাও নিজস্ব প্রয়াসে কলকাতায় আর একটি আর্ট থিয়েটার গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সিনে সেন্ট্রালের এই প্রচেষ্টায় সমস্ত ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়।

বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলের ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত জরুরী। আমরা এর আগেও বলেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেডারেশনকে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য না দিয়ে সরাসরি ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে অর্থ সাহায্য দিন। যদি এব্যাপারে কোন টেকনিক্যাল অসুবিধা থাকে তাহলে এই ফেডারেশনের মাধ্যমেই এই সাহায্য বিতরণ করা হোক। এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ যদি সোসাইটি পিছু ৫০০ বা ১০০০ টাকাও হয় তাহলে এই আর্থিক সাহায্য নিয়ে ঐ সংস্থাগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন বা আলোচনা সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতে পারেন। তাহলে মফঃস্বল অঞ্চলের ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রম যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

আজকে পশ্চিমবাংলায় প্রায় পঞ্চাশটি ফিল্ম সোসাইটি, যার সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার; এই সংখ্যা খুব বেশী না হলেও এটি আজ অত্যন্ত সংগঠিত শক্তি। পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আগন্তুক হিসেবে না থেকে শরিক হিসাবে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে স্বাধীন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই রকম একটি সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি সর্ববিধ সমস্যার মধ্যেও বিদ্যমান। সুস্পষ্ট কার্যক্রম এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ই এই আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এবং এই ব্যাপারে আশু উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন একান্ত জরুরী।

এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা রয়েছে

চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কবিতা সরকার, ইকবাল মাসুদ, শান্তি চৌধুরী, জগন্নাথ গুহ, সত্যজিৎ রায়, (সাক্ষাৎকার), রেইনার্ড হুফ (সাক্ষাৎকার), উৎপল দত্ত, গৌতম কুণ্ডু ও অজয় দে।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমাপ্তি

'তিন কন্যার' ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ 'সমাপ্তি'। এই গল্পটিও নারীমনস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের অন্যতম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া ছবিটি মূল গল্পের অন্তর্সত্তাটি ঠিকই পরিস্ফুট করেছে। মৃণ্ময়ীর চরিত্রে কিশোরী অপর্ণাকে দিয়ে, এবং অপূর্বর চরিত্রে অপুখ্যাত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে পরিচালক দুটি অনবদ্য চরিত্রায়ণ করিয়েছেন। ছবিটি এমনই সুন্দর এবং এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চলচ্চিত্রীয় শিল্প কর্মে সমৃদ্ধ যে এর বিশদতর ব্যাখ্যা জরুরি, কিন্তু স্থানাভাবে ততখানি সম্ভব নয়।

ছবিটির একটি অসামান্য নূতনত্ব ঃ ছবিটির চেখভীয় স্বাদ। বিষয়বস্তুতে সম্পূর্ণভাবে রাবীন্দ্রিক হয়েও ছবির কথন ভঙ্গীতে যেন আন্তন চেখভের গল্প-কথন ভঙ্গী এসে মিশে গেছে। ফলে ছবিতে এসেছে নূতনতর স্বাদ; চেখভের মতই অনাসক্ত ভাবে বলা, অনুচ্চারিত বা স্বল্পোচ্চারিত ইঙ্গিত অপ্রত্যক্ষভাবে দু'একটি শব্দ ও চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু বলা এবং চরিত্রগুলির মানুষী দুর্বলতাগুলির ওপর তেমনি একটি চেখভ সুলভ হাস্য বিকিরণ। এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় নেই তা বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই, কিন্তু গল্প কথনের নিজস্ব ভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন কিছুটা বেশি প্রত্যক্ষ, গল্পের মধ্যে তাঁর নিজের অনন্য উপস্থিতিটি যেমন মাঝে মাঝে টের পাইয়ে দেন তাঁর অসামান্য মন্তব্যগুলির মাধ্যমে, চেখভের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্তটাই অ-প্রত্যক্ষ, চেখভের গল্পের চরিত্রগুলি যেন চেখভ ছাড়া, তারা তাদের নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, চেখভ শুধু নেপথ্য থেকে তাদের লক্ষ্য করেন ও প্রত্যক্ষভাবে দু'একটি ব্যঞ্জনায় নিজের মন্তব্যগুলি ইঙ্গিতে বোঝান। চেখভের অনাসক্তি (detachment) সুনাম বিদিত। (অবশ্যই এটা তাঁর পদ্ধতি, সুতরাং তিনি নিরপেক্ষ নন, সে বিষয়ে আগেই 'জলসাঘর' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।) চলচ্চিত্রে এই চেখভীয় অনাসক্তি বোঝাবার সুবিধে বেশি, এবং সেটি হয় ক্যামেরা নামক যন্ত্রের অনাসক্ত উপস্থিতি সম্ভব বলে; চলচ্চিত্রের ভাষা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখান হয় বলে চলচ্চিত্র রচয়িতার নেপথ্যবাসী হবার যে সুযোগ থাকে, (যা চেখভ তাঁর অনন্য পদ্ধতিতে তাঁর সাহিত্য মাধ্যমে দেখিয়েছেন) এখানে সেই গুণটি 'সমাপ্তি' ছবিতে এসে গেছে। যেমন নব্য শিক্ষিত অপূর্বর মানসিকতা দেখাতে তার দেওয়ালে 'নেপো-লিয়নে'র ছবি দেখান হ'ল—এটুকুতেই অনেক কিছুর ইঙ্গিত রয়ে গেল—এটি যেন চেখভীয় বলার রীতি। ফলে 'সমাপ্তি' ছবিটি যেন চেখভীয় পদ্ধতিতে বলা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্নিগ্ধ শ্রেষ্ঠ গল্পের ছবি হয়েছে নূতনতর নান্দনিক স্বাদে।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব রায়, নব্য যুবক, কলকাতা শহরে থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে গ্রামে ফিরছে, বিজয়ীর মত, কিন্তু তার এই আত্মস্ফীত গৌরব একটি সামান্য কিশোরীর হাতে পর্যুদস্ত হবে—এ ইঙ্গিত গল্পে ও ছবিতে প্রথমেই পাই অপূর্বর নদীপথে নৌকা থেকে গ্রামের মাটিতে অবতরণ মুহূর্তে। নব্য গ্রাজুয়েটবাবু (তখনকার দিনে আজ থেকে ৭০/৮০ বছর আগে গ্রাম্য সমাজে গ্রাজুয়েট একটা বিষম ব্যাপার) নৌকো থেকে কর্দমাক্ত জমিতে পা দিয়েই কুপোকাৎ, এবং তাকে ঠাট্টা করে একটি কিশোরীর অমল মধুর হাস্যধ্বনি। মেয়েটি দস্যি ছেলের মতই দুরন্ত, বেপরোয়া। সেই মৃণ্ময়ী।

কিছুকাল শহরে থেকে বাবু হবার পর অপূর্ব যেন নিজের গ্রামে নবাগত। তার স্বেচ্ছাসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির, কৃত্রিম পার্থক্য রচনার চেষ্টাগুলির প্রতি স্রষ্টা যেন চেখভসুলভ মৃদু হাস্য বিকীরণ করেছেন। চশমা পরা অতিশয় সুদর্শন আমাদের অপূর্ববাবু এখন গ্রামে চোঙা দেওয়া গ্রামোফোনে রেকর্ডে গান শোনে। যখনি বের হয় তার পায়ে চকচকে পামসু—এবং তার এই 'পদমর্যাদার', প্রতি সে বেশ সচেতন, নিজে এই গ্রামেরই সন্তান হলেও এবং পথ শত কর্দমাক্ত হলেও সে উজ্জ্বল জুতো ছাড়া পায়ে হাঁটে না। তার দেওয়ালে সযত্নে সজ্জিত হয় নেপোলিয়নের ছবি, কালী দুর্গা বা কোন অবতারের নয়। ক্যামেরার বিশেষ দৃষ্টিকোনে একই শটে অপূর্ব ও দেওয়ালে নেপোলিয়নের ছবির বিশেষ কম্পোজিশন আমাদের অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' ছবির কেরেনস্কি ও নেপোলিয়নের মূর্তির কথা। মারী সীটন তাঁর 'সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থে লিখেছেন "This (Apurba's) vision of him-self is summed up in the picture of Napoleon (Portrait of a Film Director—page 178). 'অক্টোবর' ছবিতেও নেপোলিয়নের মূর্তির ব্যবহার একই কারণে, তার

মধ্যেও কেরেনিস্কি তার আত্মস্ফীত ব্যক্তিত্বটির মূর্তি দেখেছিল। হতে পারে 'অক্টোবর'-এর এই দৃশ্যটি সত্যজিৎ-এর প্রেরণা। কিন্তু তাহলেও 'সমাপ্তি'তে নেপোলিয়নের ছবির ব্যবহার 'অক্টোবর'-এর অনুকরণ নয়, কেননা পদ্ধতিটি অনেকটা এক হলেও এবং নেপোলিয়নের ইমেজ দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও—ছবির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমটিতে কেরেনিস্কিকে তীব্র ব্যঙ্গ করার জন্য, আর দ্বিতীয়টিতে আমাদের অপূর্ববাবুর দুর্বলতার প্রতি মৃদু স্নেহার্দ্র কৌতুক বিকীর্ণ করার জন্য, কেননা আমাদের অপূর্ব প্রচুর কেরেনিস্কির মত কোন রাজনৈতিক বাসনা নেই, এবং একটু পরেই এই বন্য বাঙালী 'নেপোলিয়ন'টি একটি দুরন্ত কিশোরীর কাছে হৃদয়ের সবচেয়ে মনোরম আঘাতটি খাবে ও পরাভূত হবে।

অপূর্বর মেয়ে দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। এখানে অনবদ্য বহির্দৃশ্যের ব্যবহার আছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশের বর্ষণসিক্ত রূপটি তার শ্যামল সবুজ সজল ও প্রচুর পরিমাণে কর্দমাক্ত চেহারায় ধরা পড়েছে। সেই হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যেও সুদর্শন অপূর্ব কোঁচান ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে তার সযত্নে পালিশ করা পাম্পসু পরে মেয়ে দেখতে গেল। মেয়ে দেখার পর্বটি খুঁটিনাটিতে যথাযথ—একেবারে পুঁটলির মত জড় মেয়েটি থেকে ঘরের আসবাবপত্র মানুষজন সমস্ত কিছু। অবশ্য মূল গল্পেই ডিটেলের মজুত ভাণ্ডার আছে, তৎসহ সত্যজিৎ রায় সেকালটি কিছুটা চিহ্নিত করার জন্য এবং গ্রাম্য রুচির স্থূলত্ব বোঝাবার জন্য আরো কিছু ডিটেল যোগ করেছেন, যেমন দেওয়ালে পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ছবি। গল্পের মেয়ে দেখার কমিক দৃশ্যটি যেন হুবহু ছবিতে প্রতিফলিত, কিন্তু একটি ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় একটু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। গল্পে পড়ি, যখন সেই বিচিত্র জড়বস্তুর মত কন্যাটি দেখে অপূর্ব বেশ বিপদাপন্ন, তখন হঠাৎ দস্যি মৃণ্ময়ী অবিবেচকের মত কন্যার ভাই রাখালকে খেলার জন্য ডাকতে ঢুকল, অপূর্বর দিকে দৃকপাত না করে রাখালের হাত ধরে টানাটানি করেও রাখাল যখন উঠল না, রেগে কনের মাথার ঘোমটা টেনে খুলে ফেলল এবং সব কেমন লণ্ড-ভণ্ড করে চলে গেল। সত্যজিৎ রায় এখানে ছবিতে দেখিয়েছেন মৃণ্ময়ীর পোষা কাঠবিড়ালি 'চরকি' হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়ে, এবং তাকে খুঁজে ধরে নিয়ে যায়। 'চরকি'কে এই ভাবেই উপস্থাপিত করা হয় এবং এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পরে দেখব ছবিতে 'চরকি' কাঠবিড়ালীটির একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে, 'চরকি' মৃণ্ময়ীর বিবাহের পূর্বের জীবনটির সঙ্গে প্রতীকী তাৎপর্যে যুক্ত। নিজের জন্যে পাত্রী পছন্দের আসরে, ভাগ্য অপূর্বর জন্যে যে মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ঠিক করে রেখেছে—তাকে বিচিত্রভাবে ঢুকিয়ে তাকে দিয়ে 'বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের' মত কন্যাটির ঘোমটা খুলিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্পে যে কাব্যিক পূর্বাভাষের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, সত্যজিৎ তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন মৃণ্ময়ীর তখনকার জীবনের প্রতীকটিকে, যার সর্বনাশ সমাসন্ন। উপযুক্ত হাতে পড়লে সাহিত্যভিত্তিক ছবিতে চলচ্চিত্র ভাষার ব্যবহার মূল সাহিত্য অংশকে কেমন ঐশ্বর্যশালী করে দেয়—এটি তার প্রমাণ।

মেয়ে দেখার নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর প্রস্থানোদ্যত অপূর্ব বাইরে এসে দেখল তার সাধের 'বার্নিশ করা' জুতো জোড়া অদৃশ্য। অগত্যা সবাইকার সামনেই শহর ফেরৎ নব্য গ্রাজুয়েট অপূর্বকৃষ্ণ খালি পায়ে ক্রুদ্ধ মনে পদমর্যাদাহীন অবস্থায় গ্রাম্য পথে ফিরতে লাগল। এবং এখানেই সত্যজিৎ একটি অসামান্য রোম্যান্টিক সিকোয়েন্স রচনা করলেন : হঠাৎ কিছুদূর যেতেই একটি নির্জন স্থানে জুতোহীন ক্রুদ্ধ বাবুর সামনে গাছের আড়াল থেকে তার অপহৃত জুতো জোড়া এসে পড়ল। এবং চোরও ধরা পড়ে গেল। মৃণ্ময়ী ধরা পড়ে গিয়ে একে বেঁকে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু অপূর্ব এই দস্যি মেয়েটাকে আজ শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। তবু কী যেন ঘটে গেল। সেই সদ্যসিক্ত স্নিগ্ধ গাছপালা ঘেরা নির্জনতায় স্নিগ্ধ নরম আলোকে একটি দস্যি অযত্ন লালিত শ্যামা কিশোরীর অবাধ্য দুষ্টু কিন্তু আপাতত কাতর মুখের ও চাহনির মধ্যে আমাদের সুদর্শন নব্য গ্রাজুয়েট অপূর্ব কী দেখতে পেল? সেই দৃশ্যটির গঠন—নীচের দিকে মৃণ্ময়ীর দুটি বড় বড় কাতর চোখ এবং ওপরের দিকে অপূর্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—দুটি তরুণ মুখের একটি অনির্বচনীয় রোম্যান্টিক মুহূর্ত ধরা পড়েছে সেই আশ্চর্য শটগুলিতে। সমস্ত বর্ষণস্নিগ্ধ প্রকৃতি, ছায়াহীন নরম আলো, শব্দ, দুটি মানুষের দুজোড়া বাঙময় চোখ নিয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমটি যেন একটি যাদু রচনা করেছে। মৃণ্ময়ীর দুটি চোখে অপূর্ব জীবনে প্রথম এক অনির্বচনীয়তাকে দেখতে পেল, শাস্তি উদ্যত হাত দুটি শিথিল হয়ে পড়ল, বরং নিজেই এক মনোরম শাস্তি ও যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরল। আমাদের নব্য নেপোলিয়ন দুটি তরল চোখের চাহনির কাছে হল পরাভূত। এই সিকোয়েন্সটি যেন মোর্জার্টের ভালোবাসার ম্যাজিক ফ্লুটের বংশীধ্বনির মত।

ছবিতে কতকগুলি বিশুদ্ধ সত্যজিতীয় 'হিউমার' আছে। বিয়ের পাকা কথা স্থির হবার পর, দস্যি মেয়ের বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়ান বন্ধ করার জন্য মৃণ্ময়ীকে ঘরে তার মা বন্ধ করে রাখেন। 'বিবাহ' ব্যাপারটার প্রতিবাদে মৃণ্ময়ী নিজের চুলগুলি কেটে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল, নীচে বসে চুল কাটাচ্ছিল এক অশীতিবর্ষীয় ধবধবে পাকাচুল বুড়ো, কাটছিল আর এক সত্তর বছরের বুড়ো নাপিত। প্রথম বুড়োর সাদা চুলের ওপর হঠাৎ এসে পড়ল মৃণ্ময়ীর কালো কেশগুচ্ছ, সেই দেখে দ্বিতীয় বুড়োর (নাপিতের) সে কী বিভ্রম!

ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রে মৃণ্ময়ীর ঘর

থেকে প্রকৃতির বুকে পালানর সিকোয়েন্সটি—অসাধারণ কাব্যিক সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ—এমন রোম্যান্টিক দৃশ্য বোধকরি একমাত্র 'অপুর সংসার'-এর ফুলশয্যার রাত্রিটিতে ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের এযাবৎকালের কোন ছবিতে নেই। এবং এ দুটি ফুলশয্যার রাত্রির দুটি নায়িকার কত তফাৎ! রবীন্দ্রনাথ মৃণ্ময়ীর সম্পর্কে মূল গল্পে লিখেছেন, "যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ শিশুর মতই সে নির্ভীক।" ঠিক তাই। সে রাত্রে সবাই ঘুমুলে বস্ত্রালংকার সজ্জিতা নববধূ মৃণ্ময়ী শয্যাদ্বার খুলে বাইরে চলে এল, বাইরে তখন জ্যোৎস্নালোকে নিশীথ রাত্রি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মত। নির্ভীক হরিণীর মত মৃণ্ময়ী প্রকৃতির বুকে ছুটে চলল, এবং নদীতীরে সেই পুরানো মন্দিরের কাছে পৌঁছল। আমরা দেখলাম তার সেই পোষা কাঠবিড়ালীটি সেখানে একটি খাঁচায় লুকান, মৃণ্ময়ী তার পুরানো সঙ্গীটির কাছে ব্যক্ত করল অব্যক্ত ভালোবাসা। তারপর বরাবর সে যেমন করে এসেছে, আজ বিয়ের পরও, যেন তার বিবাহই হয়নি, তেমনি ভাবেই গাছতলার তার দোলনাটিতে বসে দুলতে লাগল। নিশীথ রাত্রিবেলা নববধূ সজ্জায় সজ্জিতা মৃণ্ময়ীর সেই মুক্তির আনন্দ, চারিদিকে অম্লান জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রির মুক্তির নিঃশ্বাস, প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে প্রকৃতির মেয়ের সেই অপূর্ব দোলা—সমস্ত গ্রামটি সুপ্ত, গাছপালা নদীতীর নিদ্রাভিভূত, শুধু জ্যোৎস্নালোকে জাগ্রত আকাশ লক্ষ্য করছে পৃথিবীতে একটি আশ্চর্য মেয়ে ফুলশয্যার রাত্রে তার ঘর থেকে বের হয়ে এসে জনহীন প্রকৃতির বুকে দোল খাচ্ছে। শয্যার নিশীথ রাত্রির সুরগুচ্ছ—'নকটার্ন'-এর দৃশ্যটি এক নিমেষে এক রোম্যান্টিক সর্বজনীন স্মিত আনন্দের অনির্বচনীয়তায় আমাদের হৃদয় মন ভরে দেয়।

এই জায়গায় ছবিটি তার মূল গল্প থেকেও উন্নত হয়ে গেছে। এই মুহূর্ত মূল গল্পে নেই। অথচ মূল গল্পের কাঠামোয় এবং ভয়মুক্ত মৃণ্ময়ীর চরিত্রের সঙ্গে এই দৃশ্য কী অপূর্ব সামঞ্জস্যে বিবৃত। প্রচণ্ড দুঃসাহসের সঙ্গে সত্যজিৎ মূল গল্পের এই পরিবর্তনে অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গাছ পালা, নদী, চন্দ্রালোক, আকাশ ও তার মধ্যে দোল খাওয়া একটি মেয়ে—এক অসামান্য হার্মনিতে ধরা পড়েছে তাঁর ক্যামেরায়।

কিন্তু মৃণ্ময়ীকে আবার ঘরে রুদ্ধ হতে হয়—সে এখন গৃহস্থ বাড়ীর বধূ, সুতরাং আগেকার বন্ধনহীন জীবন তার জন্য খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যেরা তাকে শুধরাতে চায় জবরদস্তি করে, স্বামী অপূর্বর পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, সে চায় তাকে শুধরাতে ভালোবাসার দ্বারা, সে চায় তার নারীত্বের বিকাশ। কিন্তু অক্ষম সে। তার নববধূটি এখনো মনে প্রাণে কুমারী, কিশোরী, এখনো তার বন্ধু বালক রাখাল ও কাঠবিড়ালী চরকি। সে এখনো থাকতে চায় গ্রাম প্রান্তর নদীতীরে অবাধ ভ্রমণ ও ছুটোছুটির খেলাধুলোর জগৎটি নিয়ে। স্বামী যে কী বস্তু তা সে বোঝে না, প্রেম ভালবাসা যে কী তাও তার অজানা। অক্ষম অপূর্ব অবশেষে, ব্যথিত মনে স্ত্রীকে মায়ের কাছে রেখে কলকাতায় ফিরে গেল। আমরা এরপর দেখলাম মৃণ্ময়ীর অতীত কিভাবে তার বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কিভাবে মনের অগোচরে তার মধ্যে নারীত্বের বিকাশ ঘটল।

ব্যক্তিগতভাবে 'সমাপ্তি' আমার কাছে সত্যজিৎ রায় রচিত সব রবীন্দ্র সাহিত্যভিত্তিক ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, 'চারুলতা'র চেয়েও—এমন অমল আনন্দ আর কোন রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক ছবি থেকে পাইনি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই ছবির একটি বিরাট ত্রুটি আমার গভীর বেদনারও কারণ। এই ত্রুটি ভয়ানক ত্রুটি। সেই প্রসঙ্গটি বিশদ আলোচনার যোগ্য, কেননা এই ত্রুটিই আজকের সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলির একটা দীন বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

Art is always and everywhere the secret confession, and at the same time the immortal movement of its time.

—*Karl Marx*

'কবিরা শুধু নিজেদের সঙ্গেই গোপনে কথা বলে, বাইরের জগৎ আড়ি পেতে তা শোনে,' বার্নার্ড শ-এর এই কথাটির মধ্যে আছে একটি স্পষ্ট বক্তব্য। সব কবিতাই কবির স্বগতোক্তি, কিন্তু বাইরের জগৎ আড়ি পেতে তা শোনে কেন? কেননা তার মধ্যে জগৎ তার নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়—সমকালীন তথা চিরকালীন হৃৎস্পন্দন। এখানে স্পষ্টত একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে 'সমকালীন' ও 'চিরকালীন' এ দুটি ধারণা (concept) একেবারে পৃথক কিছু নয়। প্রথমতঃ, যে চিরকালের মধ্যে সমকাল নেই তাকে কোন যুক্তিতেই চিরকাল বলা চলে না, সমগ্রের মধ্যে অংশের অস্তিত্বের মতই এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দ্বিতীয়ত মহৎ সমকালীন শিল্প সৃষ্টির মধ্যে চিরকালীনতা থাকেই, সেটাই তার মহত্বের ও শিল্পের প্রমাণ। যদিও এক ধরণের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার এদেশে চালান হয় যেন, সমকালীনতার চরিত্র বা কোন সমকালীন সমস্যার প্রতিফলন শিল্পে পড়লেই শিল্পের জাত গেল। তাঁদের মতলবটা কোন ক্ষমতাবাজ দক্ষ শিল্পী যেন, কিছুতেই সমকালীন সমাজের সমস্যার ছবি না তুলে ধরে। অতএব প্রচার চলে এই বলে যে, বড় শিল্পী সর্বদা চিরকালকে প্রতিফলিত করবেন তাঁর শিল্পে, সমকালকে নয়। এরা বহুল প্রচারের দ্বারা এমন একটা ধারণা চালু করতে চায় যেন সমকাল ছাড়া এক আজগুবি 'চিরকাল' সম্ভব। অথচ আমরা চোখ খুললেই দেখি মানব সভ্যতার প্রাঙ্গনে অ-বিমূর্ত শিল্পের চিরায়ত সৃষ্টিগুলির সবকটি হয় তাদের সৃষ্টিকালের সমকালীন সত্যকে প্রকাশ করেছে, পরে সত্যের ও শিল্পরূপের দীপ্তিতে যেগুলি 'চিরায়ত' শিল্প হিসেবে

পেয়েছে স্বীকৃতি, নয়তো তারা কখনো কখনো যে বিগত কালের ছবি এঁকেছে তার মধ্যে সমকালের সত্যও বিরাজমান।

মার্কস সেই জন্যেই বলেছিলেন শিল্প ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি—যেন তার 'গোপন স্বীকারোক্তি' কিন্তু সেই সঙ্গে তা তার সমকালের অমর গতিভঙ্গ। শিল্প যে ব্যক্তি মানুষের গোপন ধ্যানের ফল, সেটা মার্কস জানতেন, কিন্তু প্রথমতঃ ব্যক্তি মানুষটির সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা সবই তার সামাজিক সমকাল থেকে আহৃত, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি মানুষটি তার একক ধ্যানের মুহূর্তে যে শিল্প সৃষ্টি করেন, তার সার্থকতা তখনি যখন তার সামাজিক মূল্য থাকে—তাই যে সামাজিককালে সেটি রচিত হচ্ছে ও বহুজনের গ্রহণে সার্থকতা পাচ্ছে—সেই সামাজিক কালের অমোঘ পদচিহ্নগুলি তার শিল্পে পড়বেই। যেমন দর্পণের মধ্যে আমাদের মুখচ্ছবি যখন নিখুঁত ভাবে ধরা পড়ে তখনই দর্পণের সার্থকতা, তেমনি সে শিল্পকেই বহু জন অবিস্মরণীয় করে রাখে যার মধ্যে ধরা পড়ে তার সমকালের গতিভঙ্গ। বস্তুতঃ শিল্পের যতগুলি উপমা এযাবৎকাল মানুষ ব্যবহার করে এসেছে তার মধ্যে দর্পণের উপমাটি সবচেয়ে উপযুক্ত। তার কারণ একই, শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয় কালের মুখচ্ছবি। টলস্টয়ের সাহিত্যকে যখন লেনিন বলেছিলেন 'বিপ্লবের দর্পণ' তখনই টলস্টয় সাহিত্যের মূল্যায়ন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়েছে।

শিল্পের মধ্যে এই 'দ্বৈততা' একদিকে একটি শিল্পকর্ম একজন স্রষ্টা শিল্পীর 'গোপন আত্মকথন' অন্যদিকে সেটি একটি 'সামাজিক সত্তা'—তার সমকালের হয় সাক্ষাৎ নয় প্রক্ষিপ্ত গতিভঙ্গীর দর্পণ। আমার মনে হয়, শিল্পের নন্দনতত্ত্বের সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র বিবৃত হচ্ছে এই 'দ্বৈততা'র মধ্যে, যার কথা কার্ল মার্কস লিখে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর ছোট গল্পগুলি রচনার সময়, নিজের শ্রেণীগত দূরত্ব সত্ত্বেও, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও সর্বোপরি অসামান্য মানবিকতাবোধের শক্তিতে আশেপাশের সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতের মধ্যে যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন—তার থেকে চিহ্নিত করেছেন সমকালের ' মৌলিক সত্যগুলি, এবং অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে তার চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছেন তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোট গল্পে সেই সময়কার বাংলার সামাজিক সত্যের ছবিটি পাই আশ্চর্য সজীব সতেজতায়। এবং সেই 'সমকালীন' সত্যের এক একটি প্রকাশ এত বৎসর পরেও আজো আমাদের হতবাক করে দেয় সত্য উপলব্ধির তীব্রতায়। 'সমাপ্তি' গল্পের মধ্যে এর একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ আছে।

মূল গল্প 'সমাপ্তি'তে একটি চরিত্র আছে 'ঈশান', মৃণ্ময়ীর বাবা—ছবিতে সে চরিত্রটি একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ চরিত্রটি (১) ছবিটির শৈল্পিক গঠনের দিক থেকে, এবং (২) সমকালীন সত্যের দিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে সেটি বাদ দেওয়ার অর্থ মূল সাহিত্য কর্মটির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, সচেতন অথবা অসচেতন যে ভাবেই হোক। এবং মহৎ সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনীয় সর্বজন গ্রাহ্য সূত্র অনুযায়ী তা অবশ্যই অশ্রদ্ধেয়।

মূল গল্পে ঈশান কী ভাবে উপস্থাপিত তা লক্ষ্যণীয়। মৃণ্ময়ীর বিয়ের সম্বন্ধ যখন অপূর্বর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে স্থির হ'ল, তখনকার কথা লিখে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি স্টীমার কোম্পানীর কেরানিরূপে দূর নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদ বিশিষ্ট কুটীরে মাল ওঠানো নামানো এবং টিকিট বিক্রয় কর্মে নিযুক্ত ছিল। তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।....কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ঈশান হেড অফিসের সায়েবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষ্যটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন।"

এই শেষ একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের অমানুষিক অবস্থার এক যন্ত্রণার প্রেক্ষাপট এঁকে দিলেন। আজকের মার্কসীয় চিন্তার বিশ্লেষণের আলোকে জানি পুঁজিবাদের আরম্ভপর্বে, যখন বণিক সভ্যতা সবে গেড়ে বসেছে তখন যদিও সামন্ত যুগের একেবারে বেগার খাটার দিন কিছুটা পাল্টেছে, কিন্তু শোষণ অন্য চেহারায় আবির্ভূত—সে চেহারা মর্মান্তিক ক্রূর। পুঁজিবাদের সেই আদিপর্বে শ্রমিক কর্মচারীকে মালিকেরা তাদের মুনাফা লুণ্ঠনের 'যন্ত্র' ছাড়া আর কিছু ভাবত না, একটি যন্ত্রকে বা পশুকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। সে দিনের কথা মার্কস, এঙ্গেলসের লেখায় আছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে চার্লস ডিকেন্স থেকে এমিল জোলা সেই মর্মান্তিক ছবি এঁকে গেছেন। 'ছুটি দেওয়ার অধিকার' একমাত্র মালিকের প্রয়োজনে, ছুটি পাবার অধিকার কোন শ্রমজীবির নেই, সে কটি টাকা মজুরির বিনিময়ে 'মানুষ' হিসেবে বিক্রীত—এখন সে মালিকের হাতে মুনাফা লুণ্ঠনের 'যন্ত্র' মাত্র। এটা সর্বদেশে সে সময়ে ঘটেছে, তখন শ্রমজীবি মানুষ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। উপরন্তু যে দেশ বিদেশী শক্তির অধীন সে দেশের অবস্থাটা আরো মর্মান্তিক। শ্রমিক কর্মচারীর মানবিক প্রয়োজনগুলি আদৌ 'প্রয়োজন' বলে স্বীকৃত হ'ত না। সায়েব সুবারা নিজের মেয়ের জন্মদিনে কোম্পানীর ছবি রাখত, গড়ের বাদ্য বাজত, বাজি পুড়ত, উৎসব হ'ত—কিন্তু গরীব কেরানির একমাত্র সন্তান কন্যার বিয়েতে 'উপলক্ষ্যটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন।'

পুঁজিবাদের প্রারম্ভ পর্বের শোষণের এই মর্মান্তিক ছবিটি এঁকেই সমাজ সচেতন মানবতাবাদী কবি থামলেন না, তিনি শাসনের জবরদস্তির আর একটি দিকও দেখালেন নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে—এবং সেটি হচ্ছে আমাদের পুরুষ প্রধান সমাজের ভিতরকার শাসনের চেহারা। যখন সায়েব ঈশানের ছুটি নামঞ্জুর করে দিলেন, তখন ঈশান "পূজার সময় এক হপ্তার ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

যেহেতু আমাদের দেশে আজো পাত্র পক্ষই প্রায় ডিক্টেটার, তাদের ইচ্ছাই সব কিছুর নিয়ামক তাই পাত্রপক্ষও মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাপের (যে মেয়ে তার একমাত্র সন্তান) অনুপস্থিতিটা তুচ্ছ জ্ঞান করে বাপের আবেদন (অনেকটা সেই সায়েবের মতই) নামঞ্জুর করে দিল। বিদেশী শাসকের শোষণ ও নিজের সমাজের মধ্যে পাত্রপক্ষের শাসন, এদুটিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ অতএব পরের ছত্রেই সেই অবিস্মরণীয় লাইনগুলি লিখলেন, "উভয়তঃই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন ও টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।"

সমকালীন সত্যের এই জ্বলন্ত স্পর্শে 'সমাপ্তি' এক অসাধারণ মহৎ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এবং এছাড়াও গল্পটির শৈল্পিক গঠনের দিক থেকেও—বিশেষ করে মৃণ্ময়ীর মনস্তত্বগত পরিবর্তনই যখন গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়, সেদিক থেকেও ঈশান চরিত্রটি ও ঈশানের কর্মস্থান কুশীগঞ্জকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত কুশীগঞ্জ পর্বটি মূল গল্প থেকে অবিচ্ছেদ্য। গল্পে পড়ি মৃণ্ময়ীর মানস সত্তায় তার বাবা যতখানি স্থান নিয়ে আছে ততখানি আর কেউ নয়, গল্পে বারে বারে 'বাবার' উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ যখন যে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ কাতর তখনি সে বাবার কাছে পালাতে গেছে—একবার পালিয়েও ছিল, কিন্তু পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু পরে অপূর্ব যখন মৃণ্ময়ীকে তার মায়ের কাছে রেখে কলকাতা চলে গেল, সেই বিরহাবকাশে সেই কুশীগঞ্জের কটি দিনের স্মৃতিই যে মৃণ্ময়ীর সুপ্ত নারীত্বকে জাগরিত করার কাজে সবচেয়ে বড় উপাদান হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিতে বলেছেন। কুশীগঞ্জ পর্বের পরে অপূর্ব কলকাতায় চলে যাবার পর মৃণ্ময়ী তার বিরহাবকাশে যে পরিবর্তন অনুভব করেছিল, সে পরিবর্তন অগোচরে ঘটেছিল আগেই— সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়।" বিরহকালে যা ঘটেছিল তা ছিল এই নাড়া দেওয়া ও দুই অর্ধখণ্ডের ভিন্ন হওয়া, কিন্তু এই কল্পিত তরবারিটি চালিত হয়েছিল কুশীগঞ্জ পর্বে—যে কোন সচেতন পাঠকই তা অনুভব করতে পারেন। সুতরাং কুশীগঞ্জ পর্ব বা ঈশান গল্পের এপেনডিক্স নয়, এটি গল্পের কেন্দ্রীয় থীমের একটি অংশ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির সব কটিই অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, এগুলির কোন অংশই অতিরিক্ত নয়, প্রত্যেকটি এক অখণ্ড সামগ্রিকতায় বিধৃত। 'সমাপ্তি'-র কুশীগঞ্জপর্বও তাই।

এই পর্বটি ছবিতে বাদ দেওয়ায় পরবর্তীকালে মৃণ্ময়ীর পূর্ণ নারীত্বের উত্তরণ পর্বে যা ঘটেছে—তার মধ্যে অনিবার্যভাবে একটি 'ফাঁক' থেকে গেছে—সেটাও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ এড়াবার কথা নয়। এই ফাঁকটি হচ্ছে কারণ থেকে কার্যে রূপান্তরনের ফাঁক—Causation-এর ফাঁক। এই Causation প্রত্যক্ষ না হতে পারে, স্পষ্ট না হতে পারে—কিন্তু তার ক্রিয়া থাকবে, সেই কল্পিত তরবারির মত। তাই Causation-এর একটি সূত্র থাকা সঙ্গত ছিল। অবশ্য এই Causation শুধু দেহের স্তরেও হতে পারে, একটি কিশোরী মেয়ের নারীত্ব বিকাশের উত্তরণ পর্বে শুধু দৈহিক Causation থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কী ব্যাপারটা খুব মোটা দাগের হয়ে যায় না। একটি কিশোরী একজন তরুণ সুন্দর পুরুষের সঙ্গে ছিল, মানসিক দিক থেকে বিযুক্ত হয়েই ছিল, স্পষ্টতঃ তেমন কোন শারীরিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়নি (মৃণ্ময়ী অপূর্বকে চুম্বনটুকুও দেয়নি)। কিন্তু তবু কিশোরীটির দেহ তার মনের অগোচরে দেহের স্পর্শ নিয়ে থাকতে পারে এবং পরে স্বাভাবিক ভাবেই দেহে আসন্ন নবযৌবনের আবির্ভাবে একাকীত্বের মধ্যে সে যে একটা অভাব অনুভব করবেনা এমনও নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটির রূপান্তরের কারণ হয়ে যায় শুধুমাত্র দৈহিক—বিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে অমুক অমুক যৌন গ্ল্যাণ্ডগুলির রসসঞ্চরণ জনিত। এটি অবশ্য মৃণ্ময়ীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে, কেউই দেহের এই নেপথ্য প্রতিক্রিয়ার কথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৃণ্ময়ীর ক্ষেত্রে তাছাড়া যেটি ঘটেছে সেটি মানসিক—'সাইকিক' আর সেটিই এই গল্পের উপাদান। এবং সেই মানসিক রূপান্তরের ভূমিকা রচিত হয়েছিল কুশীগঞ্জ পর্বে, স্বামীর অকুণ্ঠ প্রেমধন্য বধূত্বের দিনগুলিতে, তার জীবনের প্রথম গৃহিনীপনার দিনগুলিতে। গল্পটিতে এটি এত বেশি স্পষ্ট যে এই নিয়ে বিশদতর ব্যাখ্যা ক্লান্তিকর।

ছবিতে মৃণ্ময়ীর রূপান্তর ঘটে যাওয়াটি দেখান হয়েছে অবশ্য অসামান্য চলচ্চিত্র ভাষার কুশলতায়, কিন্তু রূপান্তরের Causation-এর মূল মনস্তাত্বিক সূত্রটি না দেখানোতে যে ফাঁক রয়ে গেছে তা পূর্ণ হয়নি। মূল গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিটি

দেখলে বোঝা যায় এই রূপান্তর পর্বটি ছবিতে দরিদ্র হয়ে গেছে।

এবং সেই সমকালীন সত্যের জীবন্ত স্পর্শ, যা ছবিটিকে অসামান্যতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে তার দিক থেকে কুশীগঞ্জে তিন দিনের সেই আশ্চর্য দিনগুলি ফুরিয়ে যখন মৃণ্ময়ী অপূর্বর সঙ্গে ফিরে যায়, রবীন্দ্রনাথ তখনকার বর্ণনায় গল্পটির সমকালের হৃৎস্পন্দনটির অমর চিহ্ন রেখে যান। তিনি লিখছেন, "মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সঙ্গে বিদায় লইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।"

তিনটি মানবিক অমল আনন্দের দিন গত হবার পর, পুঁজি-বাদের আরম্ভ পর্বের এই শ্রমজীবিটি 'মানুষ' থেকে পুনশ্চ 'যন্ত্রে' পরিণত হল, বিদেশী কোম্পানীর মুনফা অর্জনের ওয়েইং মেশিন—ওজন করা যন্ত্র। (লক্ষ্যণীয় আগেও ঈশান সম্পর্কে এই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এবারে উল্লেখিত লাইনটিতে 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস' কথাকটি যুক্ত করে, এবং আগের মাল ওজন ও টিকিট বিক্রয়-এর শেষেরটি বাদ দিয়ে, ঈশানের সম্পূর্ণ যন্ত্রীকরণ সার্বিক যন্ত্রীকরণকে ভয়ানক ভাবে চিহ্নিত করেছেন)। এই অব্যর্থ অমোঘ লাইনটি লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের কার্ল মার্কস পড়ার দরকার হয়নি, অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ও গরীব মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা থাকলেই এটি লক্ষ্য করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ গল্পের সমকালের এই শাসন শোষণের ভিতরকার সত্যে আমাদের নিয়ে যান। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে একটা মানুষকে কিভাবে তার আপন সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য করা হয়, এবং তাকে ব্যবহার করা হয় যন্ত্রের মত—তার মর্মান্তিক সত্যরূপ এত ছোট পরিসরে এত কাল আগে বাংলা সাহিত্যে আর কে লিখেছিলেন? এই হচ্ছে নব্য পুঁজিবাদ পর্বের একটি মেহনতি মানুষের অসহায় 'বিচ্ছিন্নতা বোধ'—'এ্যালিয়েনে-শন', যার কথা তরুণ কার্ল মার্কস তত্ত্ব হিসেবে প্রথম উদ্ঘাটিত করেছিলেন তাঁর প্রথম মৌলিক থীসিসে Economic and Philosophic Manuscript 1884—'আপন শ্রমের ফল থেকে বিযুক্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ'—যা তাঁর পরবর্তী যুগান্তকারী অর্থনৈতিক চিন্তাগুলির উৎস বিশেষ। সেই সময়ের ভারতের শ্রমজীবির ছবিটি আমাদের কবি কী অসামান্য ভাষায় ঈশানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন—ঈশান "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।"

'সমাপ্তি' ছবি থেকে এই ঈশান পর্ব বাদ দেওয়ার কী যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু তাতে যে এমন অসামান্য সুন্দর ছবিটি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈশানপর্ব বাদ দেওয়ার পক্ষে দুটি যুক্তির কথা শুনে থাকি। দুটিই অক্ষম যুক্তি। (১) ছবিটি নাকি যে লিরিকাল সুরে বাঁধা তাতে ঈশানের প্রচণ্ড বাস্তবতার কর্কশ স্বর খাপ খায় না। প্রশ্ন তাহলে এমন লিরিকাল গল্পে রবীন্দ্রনাথ কি করে ঈশানের কর্কশ সত্যকে এনেছেন, এবং কেনই বা এই রূঢ় বাস্তবতার জীবন্ত স্পর্শে গল্পটি এতটুকু তরল হয়ে উঠতে পারেনি? (২) দ্বিতীয় যুক্তি, ছবি দীর্ঘতর হয়ে যেত। অবশ্যই যেত, কিন্তু অন্য কোন অংশকে কিছু সংক্ষিপ্ত করে সামান্য দশ মিনিটের দৃশ্য হলে সেটা কিছু মহাভারত অশুদ্ধ গোছের ব্যাপার হত না। ঈশান পর্বটি ইঙ্গিতময় করে যথাযোগ্যতার সঙ্গে সংক্ষেপে প্রকাশ করার ব্যাপারে, আর যার কোন সন্দেহ থাকুক, আমার কোন সন্দেহ নেই যে তা 'অপরাজিত'র স্রষ্টা পারতেন না। অবশ্যই পারতেন, যদি ইচ্ছা করতেন। কিন্তু গোলমাল হচ্ছে ওই 'ইচ্ছা'টি নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের সেই 'ইচ্ছার' অভাব তখন হয়ত বোঝা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আজ বোঝা যায় এই 'ইচ্ছা'র ও 'সচেতনতা'র অভাবই সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে আজ 'অপরাজিত' থেকে 'অশনি সংকেতে' নামিয়ে এনেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে কল্পিত তরবারির কথা লিখেছেন যারা দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করলেও মানুষ টের পায় না, সেই তরবারি চালনার কথাটি মূল গল্পে কুশীগঞ্জ পর্বে ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে আছে, এবং ছবিতে নেই—সেজন্য ছবির এই অংশ দরিদ্র হয়েছে। কিন্তু তার পর 'একটু নাড়া দিলেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হয়ে যায়'—সেই ভিন্ন হয়ে যাওয়াটি, মৃণ্ময়ীর বর্তমান থেকে অতীতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছবিতে শুধু তিনটি ডিসল্ভ-এর মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় বড় সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। এবং তার একটিতে কাঠবিড়ালি চরকি আশ্চর্য প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে।

ছবিতে দেখি, মৃণ্ময়ীর মধ্যে ভালবাসা ও নারীত্ব জাগ্রত না করতে পেরে অপূর্ব দুঃখে কলকাতায় ফিরে যায়। তখন সেই বিচ্ছেদের দিনগুলোয় মৃণ্ময়ী কি যেন অভাব অনুভব করে, অথচ ছবিতে তো কুশীগঞ্জ পর্ব নেই, স্বামীকে সে তো সখা বন্ধু হিসেবেও নিতে পারে নি, তাহলে হঠাৎ এই অভাব বোধ—কেমন যেন নিঃসঙ্গতা ও পরিবর্তন কোথা থেকে আসে? এই ফাঁকটি ছবিতে রয়ে গেছে। ছবিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে একটা বয়সের পর সব কিশোরীর মধ্যে এই পরিবর্তন আসবে, বিবাহিত কিশোরীর তো বটেই। গল্পে এই ধরে নেওয়াটি কোথাও নেই, গল্পে মৃণ্ময়ীর রূপান্তরের প্রতিটি মনস্তাত্ত্বিক ধাপ সুস্পষ্ট। ছবিতে তা নয়।

যাই হোক ছবির দর্শক হিসেবে আমরাও তা ধরে নিই। তারপর তিনটি অসামান্য ডিসল্ভের মধ্যে দেখি মৃণ্ময়ী তার অতীতটাকে

কিভাবে তার বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রথম দৃশ্যতে দেখি সে আর তার বাল্যবন্ধু রাখালের খেলার ডাকে সাড়া দিতে পারছে না, সে অনামনস্ক—কী যেন ভাবে। ডিসল্‌ভ। দ্বিতীয় দৃশ্য ফেড ইন করে দেখি—চরুকি কাঠবিড়ালি মরে গেছে তাকে একটা লাঠি ঝুলিয়ে এনেছে রাখাল মৃণ্ময়ীর কাছে। মৃণ্ময়ীর মধ্যে আগেকার ভাব আর নেই, তার আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়—সে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, "ওকে নদীর ধারে নিয়ে যা, নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দে।" ব্যস, এটুকুতেই চলচ্চিত্র ভাষায় যা বলা হল তা ঠিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ভাষায় ছিল এই রকম "গাছের পক্ক পত্রের ন্যায় আজ যে সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।" ডিসল্‌ভ। তৃতীয় দৃশ্য ফুটে ওঠে ঃ মৃণ্ময়ী চেষ্টা করছে অপূর্বকে একটি চিঠি লিখতে, সে সময়ে তার ভঙ্গীটির মধ্যে বেশ একটি নারীসুলভ রমণীয় ভাব আছে। সামনে শ্লেট, খাতা পত্রের ডিটেল—সে লেখা পড়া শিখছে। শটটির ফ্রেমের মধ্যে চোখে পড়ে মেঝেতে ছড়ান আছে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের কটি পাতা, স্পষ্ট ভাবে চোখে না পড়লেও লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে তাতে দুটি শব্দ মুদ্রিত 'রমণী' ও 'জননী'। অনবদ্য ও অব্যর্থ এ ডিটেল। বহিরঙ্গের ডিটেল নয়, অন্তরঙ্গের ডিটেল। মৃণ্ময়ীর পরিবর্তনের ওপর এ যেন একটি অনবদ্য মন্তব্য। এই তিনটি ডিসলভ কি অসামান্য ভাবে চেখভীয়। 'শত্রু' গল্পে চেখভ যে এমনি করেই একবার ডাক্তারটির কার্বলিক এসিডে পোড়া পরিশ্রমী রুক্ষ হাতের ছবিটি দিয়ে পরে যখন জমিদারের গোলাপী পরিচ্ছন্ন নরম আয়েসী হাতের বর্ণনার ইঙ্গিতটুকু দেন তখন কি তাদের শত্রুতার মূল উৎসটা আমরা বুঝে যাই না!

মূল গল্পে 'সমাপ্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আছে এই ভাবে, সদ্য বিবাহের পর বিদ্রোহিনী মৃণ্ময়ীকে বশ করতে না পেরে দুঃখিত হয়ে কলকাতায় চলে যাবার আগের রাতে নব বিবাহিত অপূর্ব তার জেদী কিশোরী স্ত্রীর কাছে একটি হাসিয়া স্বেচ্ছায় দেওয়া চুম্বন চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি, অবুঝ মৃণ্ময়ী এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে হাসির চোটে তা দিতে গিয়েও পারে নি। ছবির শেষে নারী মৃণ্ময়ী আনন্দাশ্রুধারায় সেই কাজটি সমাপ্ত করল।

ব্যাপারটি যখন 'চুম্বন' নিয়ে এবং যখন ভারতীয় সেন্সর প্রথা এব্যাপারে অহেতুক বিরূপ—অতএব গল্পের মত এমন আশ্চর্য 'সমাপ্তি'—Finale সত্যজিৎ রায় রচনা করতে পারলেন না, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তার পরিবর্তিত রূপ যা সত্যজিৎ রায় দিলেন তাও বড় অপরূপ। বৃষ্টিভেজা চশমাপরা অপূর্ব তার শোবার ঘরে যখন দেখল তার গ্রামাফোনের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে—তখন ক্যামেরা তার চোখে রূপান্তরিত। বাহ্য কারণ, অপূর্বর চশমায় জল, কিন্তু আন্তরিক কারণ—তার অন্তরের দুরু দুরু আশা ও আশাভঙ্গ জনিত ভয়। অপূর্বর এই মনোভাবটুকু কি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে—এই দৃশ্যে সফ্‌ট ফোকাস পদ্ধতির মধ্যে। পরে দ্বিধা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে (বাহ্যত চশমার জল মুছে ফেলার পর) সে দেখতে পেল তার সেদিনের দস্যি কিশোরী বিদ্রোহিনী মৃণ্ময়ী বাঞ্ছিতা নববধূ বেশে দেহ মনের সব আকুলতা নিয়ে স্বামীকে গ্রহণ করতে অপেক্ষমানা—আজ সে যুবতী, পূর্ণা নারী।

ছবিটি দেখার পর বড় দুঃখ থেকে যায়, এমন অসামান্য সুন্দর ছবিটিতে একটি বেদনাদায়ক অপূর্ণতা রয়ে গেল—কুশীগঞ্জ পর্ব বাদ দেওয়ায়।

'তিন কন্যা' ছবির মধ্যে সমাজ চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এখানে লক্ষ্যণীয়।

'তিন কন্যা' ছবিতে তিনটি কন্যা সমাজের শ্রেণীগত তিনটি স্তর থেকে নেওয়া—(১) 'পোস্টমাস্টার'-এ রতন দরিদ্র সর্বহারা শ্রেণীর মেয়ে, (২) 'মণিহারা'য় মণিমালিকা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রমণী, (৩) 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে। লক্ষ্যণীয় মূল গল্পে রবীন্দ্রনাথ এদের চরিত্রায়ণে এদের শ্রেণীগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কি রকম নির্ভুল! কিন্তু ছবি করার সময় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় রতনের ক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ।

পুরুষ চরিত্র তিনটির দুটিই—পোস্টমাস্টার ও অপূর্ব—মধ্যবিত্তশ্রেণীর। ফণীভূষণ উচ্চবিত্তশ্রেণীর। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একেবারে নির্ভুল। এখানেও যখন মধ্যবিত্ত চরিত্রটি তার স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে—তখন সত্যজিৎ রায় তাদের ঠিকই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু যখন সে বিবেকের সংকটে দ্বিধাবিভক্ত—যেমন 'পোস্টমাস্টার'-এ, তখন তার পলায়নপরতার বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায় একেবারে উদাসীন, নীরব। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের এখানেই পার্থক্য।

এমিলি ডি আন্তোনিও ঃ সাক্ষাৎকার

এ্যালান রোজেন্থাল

ডি আন্তোনিও আমেরিকার একজন ডকুমেণ্টারী ফিল্ম স্রষ্টা। নিক্সনের হোয়াইট হাউজ শত্রু তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তি তাঁকে বিরল সম্মান এনে দিয়েছে। তাঁর ফিল্মে ফুটে ওঠা রাজনৈতিক অভিমত অস্বাভাবিক রকমের তেজস্বী ও অকাট্য। তিনি অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলেন। তাঁর নেপথ্যের জীবন বিচিত্র সব ঘটনায় সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে ডকুমেণ্টারী ফিল্মের জগতে প্রবেশ করলেন? আপনার যাত্রা শুরু কোথা থেকে?

উত্তর ঃ ১৯৬১ সালে Point of Order ফিল্মের মাধ্যমে আমার যাত্রা শুরু। তার আগে পর্যন্ত অনেকটা আমার উইট (Wit) এর দ্বারা আমার জীবিকা চলতো। অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারের মত না হয়ে আমি ছিলাম একজন ইণ্টেলেকচুয়াল। আমি হার্ভার্ডে যাই এবং কলাম্বিয়ায় গ্রাজুয়েশন কোর্স করি। কলেজে আমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এবং জন রীড সোসাইটীতে যোগ দেই। আমি যতদূর পেরেছি রাজনৈতিক সব কিছুতেই যোগ দিয়েছি। পরে আমি দর্শন পড়ি, কিন্তু, আমার মনে হল এতে কোন ফায়দা নেই। সুতরাং আমি হয়ে গেলাম ওয়ান-ডে-এ-ইয়ার বিজনেস পার্সন। বছরে একদিন প্রচুর টাকা কামাই। পুঁজিবাদীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন মার্কসবাদী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আমার সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে অরাজনৈতিক করে তোলে। আমি এ্যালকোহল আর মেয়েমানুষে আসক্ত হয়ে পড়ি। আমি পাঁচ পাঁচবার বিয়ে করি। এ ছাড়াও অগুণতি মহিলার সাথে রাত কাটাই। আমি পড়াশুনা করি প্রচুর এবং সাধারণতঃ এলোমেলো বোহেমিয়ান জীবন যাপন করি।

পার্টির সাথে নিজেকে না জড়িয়েই ১৯৫৯ সালে আবার আমি কমিউনিস্ট হয়ে পড়ি এবং বরাবর আমি যা অপছন্দ করতাম—সেই চলচ্চিত্রের প্রতি ইণ্টারেস্টেড হই। মার্কস ব্রাদার্স, ডব্লিউ সি ফিল্ডস এবং গোড়ার দিকের সোভিয়েত সিনেমা আমার ভালো লাগতো। তবে আমেরিকানদের মত আমি সিনেমায় যেতাম না। এমনও হতো পুরো একটা বছর চলে যেতো অথচ একটাও ফিল্ম দেখা হতো না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫৯ সালে হঠাৎ আবার রাজনৈতিক হয়ে উঠলেন কেন?

উত্তর ঃ বাতাসে গন্ধ শুঁকে আমি টের পাই রাজনীতি আবার কাজ দেবে। আমি কেনেডীকে চিনতাম। আইজেন-হাওয়ার অথবা ট্রুম্যানের চেয়ে তার নির্বাচন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। রাজনীতিতে নবাগত তরুণ র‍্যাডিক্যালদের সাথে আমি বৈঠক শুরু করি। পঞ্চাশের দশকে আমার কিছু হোমোসেক্চুয়াল আভা-গার্দ বন্ধু ছিলো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল জন কেইজ, রজেনবার্গ এবং জ্যাসপার জোন্স্। তারা আমার গ্রামের বাড়িতে আসতো, ড্রিঙ্ক করতো আর বকতো।

প্রশ্ন ঃ ফিল্মের জগতে এসে শুরুতেই ম্যাককার্থীর ব্যাপারটি বেছে নিলেন কেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বিলীয়মান ওই দর্শকটির সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। শুনা-গর্ভ টিভি শো ছাড়া ফিল্মে তাক নিয়ে কিছুই করা হয়নি। আর শোগুলোও তৈরী হয়েছে তার বিদায়ের চার বছর পরে।

চরিত্র পছন্দের ব্যাপারটা ছিল পরিষ্কার। তারপর ভেড ফুটেজ নিয়ে কাজ করার আইডিয়া এলো মাথায়—এক ধরণের কোলাজ জাঙ্ক আইডিয়া, আমার পেইণ্টার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া।

সিবিএস টেলিভিশনকে প্রথম যখন ম্যাককার্থী ফুটেজের কথা বললাম, তারা জানালো এটা তাদের কাছে নেই। তারা মিথ্যে বলেনি। নিউ জার্সির ফিল্ম গুদামে একটার সাথে আরেকটা মেশানো, এলোমেলো প্রচুর ফুটেজ গুদামজাত করা ছিল যার কথা তারা ভুলেই গিয়েছিলো। যাহোক, সি বিএস-এ কর্মরত আমার বন্ধুরা অনেক খোজা-খুঁজি করে আমার জন্যে ১৮৮ ঘণ্টার কাঁচামাল উদ্ধার করে।

এবারে ফিল্মের কথা। আমার ইচ্ছে ছিল একটা রাজনৈতিক ডকুমেণ্টারী তৈরী করা। এর প্রাথমিক আইডিয়াটা এসেছিল ডন টলবোটের কাছ থেকে। ডন ছিল দি নিউইয়র্কার থিয়েটারের মালিক। তার প্রেক্ষাগৃহে ব্যতিক্রমী ধারার ফিল্ম প্রদর্শন করে সে মার্কিন দর্শকদের রুচি গড়ে তোলে। একদিন ডন বললো ঃ পঞ্চাশের দশকের টেলিভিশনে সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং বিষয় কোনটি? দু'জনই বলে উঠলাম "আর্মী-ম্যাককার্থী শুনানী"। ফিল্ম তৈরী ডনের উদ্দেশ্য ছিল না—সে চেয়েছিলো শুনানীগুলো অথবা তার সংক্ষিপ্তসার জড়ো করে ম্যাককার্থীর ওপর একটা প্রোগ্রাম তৈরী করতে।

ফিল্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, তবু আমি ফুটেজগুলো থেকে একটা ফিল্ম তৈরী করতে চাইলাম। ডন আমার চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ। সে বললো ঃ ফিল্ম সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। বরং অরসন ওয়েলসকে ডাকা যাক ফিল্মটি তৈরীর জন্যে, ওয়েল্‌সের কাছে সে তারবার্তা পাঠালো। ওয়েল্‌স এতে কোন আগ্রহ দেখালেন না। আমরা তখন একজন পেশাদার চলচ্চিত্রকার ডেকে আনলাম। সে কাজ শুরু করলো। পরে তাকে সরিয়ে আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম। ফিল্মটির ব্যাপারে মৌলিক আইডিয়া ছিল এতে কোন বর্ণনা থাকবে না। আমার মনে হয় এ ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, একবাক্যও বর্ণনা ছাড়া এটাই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য রাজনৈতিক ডকুমেণ্টারী ফিল্ম। ফিল্মটি পুরোপুরি অর্গানিক।

প্রশ্ন ঃ ডনেরও ফিল্মটি তৈরী করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এটা আপনার উপর বর্তালো কিভাবে?

উত্তর ঃ আমি ডনকে বললাম, হয় তুমি ফিল্ম তৈরী করবে নয়তো আমি। আমরা টস্ করবো। টসে যে জিতবে সে ফিল্ম তৈরী করবে। অন্য কেউ তাতে নাক গলাতে পারবে না। ফিল্মটি যখন শেষ হবে, তখন দু'জন একসাথে বসে দেখবো। শুনে ডন বললো ঃ এটা ঠিক নয়। আমি এটা করতে পারবো না। আমি এই থিয়েটারের মালিক। তা'ছাড়া আমার বউ-বাচ্চা রয়েছে। তখন আমি বললাম ঃ আমি এটি তৈরী করবো। ও কে। এই হল ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ টাকা জোগাড় করলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ টাকা জোগাড়ের ব্যাপারে আমি বরাবরই ওস্তাদ। বামপন্থী ফিল্ম তৈরীর জন্যে আমি দশ লাখ ডলারের বেশী অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম। আমি গরীব পরিবার থেকে আসিনি। বিত্তবানদের সাথে আমার বরাবরই জানাশোনা ছিল। এলিয়ট গ্র্যান্ট নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন লাখপতি, লিবারেল, এবং তিনি ম্যাককার্থীকে ঘৃণা করতেন। আমি তার সাথে দেখা করি। আমরা তার বাড়িতে, সেখান থেকে সেভেনটি থার্ড এবং থার্ড-এ এ্যাভেনুস্ নামক স্থানে মিলিত হই। হামবার্গার ও ড্রিঙ্ক নিতে নিতে আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। একটু ভেবে এলিয়ট বল্লেন ঃ এতে কত খরচ পড়বে? আমি বলি ঃ আমি জানি না। আমি কখনো ফিল্ম তৈরী করিনি। তিনি বল্লেন ঃ শুরুতে এক লাখ ডলার দিলে কেমন হয়? আমি বলি একটু সবুর করুন। আগে একটা করপোরেশন গঠন করে নিই। পরে খাবারের বিল এলে তিনি বয়কে টিপ্‌স্ দেন কুড়ি সেন্ট, আমাকে এক লাখ ডলার। শেষে অবশ্য ফিল্মটিতে অনেক বেশী খরচ হয়েছিল।

বিষয়বস্তুর কপিরাইট বাবদ সিবিএস পঞ্চাশ হাজার ডলার দাবী করে বসে (ফুটেজগুলো নষ্ট ও অকেজো হয়ে গেলো—এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই)। তাছাড়া লাভের পঞ্চাশ শতাংশ পাবে তারা। Point of Order থেকে আর কারো চেয়ে সিবিএস সবচেয়ে বেশী অর্থ কামিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ফুটেজগুলো কাটার শুরুতে আপনার লক্ষ্য অথবা নির্দেশক বিষয় কি ছিল?

উত্তর ঃ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু দুটোর ওপরই আমি জোর দিয়েছিলাম। আঙ্গিকগত দিকটি ছিল বেশী মুখ্যকর। খোলাখুলি-ভাবে আমি বাণিজ্যসফল ফিল্ম তৈরী করতে চেয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Point of Order-ই প্রথম রাজনৈতিক নন-টিভি ডকুমেন্টারী যেটা আর্থিক সফলতা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম বাইরের কোন শব্দ ছাড়া, কোন কিছু বর্ণনা ছাড়াই কাহিনীর কাঠামো হবে পরিপূর্ণ এবং সুসংহত। আমি চেয়েছিলাম বিষয়টি হবে সেল্‌ফ্-এক্সপ্ল্যানেটরি রাজনৈতিক বিবৃতি। বর্ণনার মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা আমার কাছে সহজাতভাবে ফ্যাসিস্ট বলে মনে হয়—এই অর্থে যে দর্শকরা যখন একটা জিনিস দেখছে তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা কি দেখছে। ফিল্মের যদি নিজস্ব আবেদন থাকে তাহলে বর্ণনার কোন দরকার নেই—সে নিজেই নিজের বর্ণনা দেয়।

প্রশ্ন ঃ সিবিএস যখন তাদের আর্কাইভের ফিল্ম দিতে সম্মত হয়, তখন তারা কি আপনার রাজনৈতিক পটভূমি অথবা ফিল্মগুলো যে কাজে ব্যবহার করবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমরা কারা এবং আমি একজন কমিউনিস্ট একথা জেনে সিবিএস এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, তাদের সাথে আমাদের চুক্তির ১৪ নং ধারায় লেখা ছিল সিবিএস-এর নাম যদি কোথাও উল্লেখ করি তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং পঞ্চাশ হাজার ডলারও গচ্চা যাবে। ফিল্ম যখন মুক্তি পেলো আর সব সমালোচকরাই পছন্দ করলো, 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখলো ঃ 'এ সাইকেডেলিক এক্সপেরিয়েন্স—' ইত্যাদি ইত্যাদি—সিবিএস তখন ওইসব সমালোচনা সংগ্রহ করে একখানা সুশোভন পুস্তিকা প্রকাশ করলো। আর সেটা হচ্ছে আমার জন্যে চূড়ান্ত অপমান। কারণ, সমালোচকরা এবং সিবিএস—কেউই আসল পয়েন্টটা ধরতে পারেনি। ফিল্ম দেখে, সে সময়ে নিজেদের ভূমিকার কথা ভেবে সহসা উক্তি করে ওঠা লিবারেলরাও পয়েন্টটি ধরতে পারেনি।

ফিল্মটি ম্যাককার্থীর ওপর আক্রমণ নয়। এটা মার্কিন সরকারের ওপর আক্রমণ। আমার যা অনুভব, মনোযোগ দিয়ে ফিল্মটি দেখলে ওয়েল্‌চ্‌কেও ম্যাককার্থীর মত অসৎ মনে হবে। সে একজন প্রতিভাধর, অশুভ, ধূর্ত আইনজীবী যে ম্যাককার্থীকে ধ্বংস করার জন্যে ম্যাককার্থীরই কৌশল অবলম্বন করেছে। ম্যাককার্থী বুঝতে পেরেছিলো সে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ম্যাককার্থীর ধ্বংস

চেয়েছিলাম, তবে এও চেয়েছিলাম যে পুরো সিস্টেমটা অনাবৃত হোক। আর তাছাড়া ফিল্মটি যারা দেখেছে তাদের খুব কম সংখ্যকই ছিল মার্কসবাদী। বুর্জোয়া সমালোচকরা ফিল্মটিকে পছন্দ করেছে এবং সাফল্য এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম ফিল্ম তৈরী করতে গিয়ে, ফিল্ম সম্পর্কে আপনার 'অজ্ঞতা' কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল? আপনি কি কি ভুল করেছিলেন?

উত্তর ঃ মোটের ওপর এটা ছিল একটা তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। এই প্রথম ফিল্মটিতে যা করেছি, তা থেকে ভিন্ন রকম কিছু করতে পারতাম না। তার পরে অন্য ফিল্মে অবশ্যই। জীবনে আমি এতো কঠোর পরিশ্রম করিনি। এটা ছিল আমার আসল কাজের ভূমিকা। মানে, আমি সব ধরণের দৈহিক পরিশ্রম করেছি এবং তা উপভোগও করেছি। কিন্তু সপ্তাহের প্রতিদিন ১০।১২ ঘণ্টা এবং এইভাবে পুরো দু'বছর ফুটেজের ওপর নজর বুলানো থেকে সেটা ছিল ভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি খুঁজছিলেন? ১৮০ ঘণ্টার ফুটেজ থেকে কি করে আপনার ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বেছে নিলেন?

উত্তর ঃ আমার কাছে ফিল্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এর কাঠামো। দেখার আগেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার ভালো জানা ছিল। কারণ, আমি শুনানী দেখেছিলাম আর এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর। শুনানীতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিলো। তবে মূল আইডিয়া ছিল কি ঘটেছে সে কাহিনীটা বলা এবং সিস্টেমের দুর্বলতা তুলে ধরা। কিভাবে একজন রাজনৈতিক নেতা একটা মেশিনের দ্বারা বন্দি হয়ে যায় সেটা তুলে ধরা। কারণ, সে কোন নিয়মবদ্ধ প্রতিরোধ অথবা নৈতিকতা কিংবা কোন প্রতিপক্ষের দ্বারা ধ্বংস হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয়েছে, ফিল্মটির শেষের দিকে আপনি ব্যাপকভাবে কথা ও ছবি ব্যবহার করেছেন।

উত্তর ঃ যথেচ্ছভাবে। উপাদান পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়েছে। সিনেমা ভেরিতে প্রথমতঃ একটা মিথ্যা, দ্বিতীয়তঃ ফিল্মের চরিত্র সম্পর্কে এটা একটা শিশুসুলভ ধারণা। সিনেমা ভেরিতে একটা তামাশা। অনুভূতিহীন অথবা দৃঢ় বিশ্বাস যাদের নেই কেবলমাত্র তারাই সিনেমা ভেরিতে তৈরীর কথা ভাবতে পারে। আমার তীব্র অনুভূতি আছে, স্বপ্ন আছে এবং আমি যা-ই করি তার সম্পর্কে আমার পূর্ব-ধারণা আছে।

প্রশ্ন ঃ সিনেমা ভেরিতে-র ওপর আপনি এত ক্ষ্যাপা কেন?

উত্তর ঃ প্রথমে ধরা যাক এই নামটা। সিনেমা ভেরিতের কারিগরি উপাদান, মানুষ যার উন্নয়নসাধন করেছে, যেমন—হালকা ক্যামেরা, সিনক্রনাইজড সাউণ্ড সিস্টেম—এসব আমি মেনে নিতে রাজি। কিন্তু এই নির্বোধ ভাণ—পূর্ব থেকে ধারণার অভাব—এই বিশ্বাস আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ক্যামেরা চালনা ছাড়া কোন ফিল্মই তৈরী হয়না। আর এই ক্যামেরা চালানো, এক অর্থে, অনুভবের পূর্ব ধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পূর্ব ধারণা ছাড়া এক টুকরো ফিল্মও কাটা এবং সম্পাদনা করা যায় না। সিনেমা ভেরিতের বিশ্বাসীরা অবশ্যই সুচতুর—তারা আসল মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে। কেউকি এখনো নিজেকে সিনেমা ভেরিতে বলে? না, বলে না। আমি মনে করি এটা এখন মৃত। লীকক আর ফিল্ম তৈরী করে না, পেনবেকার ব্যবসায়ে ব্যস্ত আর মেজলস বলে তাদের ফিল্ম ফিক্শন অথবা ডকুমেণ্টারীর চেয়েও ভালো। সুতরাং এদেশের কে সিনেমা ভেরিতে ফিল্ম তৈরী করে আমার জানা নেই। তবে ওইসব ভেরিতে ফিল্মের এমন একটাও নেই যার বিশ্বাস সিনেমা ভেরিতে ছিল বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আমি মনে করি, আমি কোন অবস্থানেই নেই এ ভাণ করার চেয়ে, সত্যি সত্যি যে অবস্থানে আছি সেখান থেকে ফিল্ম তৈরী করা অনেক ভালো। কারণ কোন অবস্থানেই না থাকাটা একটা দৈহিক অবাস্তবতা।

প্রশ্ন ঃ আপনি নির্দিষ্ট কোন দর্শকগোষ্ঠীর জন্যে ফিল্ম তৈরী করেন নাকি নিজের জন্যে, অথবা এ দুয়ের মিশ্রণই আপনার লক্ষ্য? আমরা কাকে দর্শক বলবো?

উত্তর ঃ আমি একজন মার্কসবাদী এবং একজন খারাপ মার্কসবাদী, কারণ, আমি দর্শকের জন্যে ফিল্ম তৈরী করি না—করি নিজের জন্যে। দর্শকের জন্যে ফিল্ম তৈরী করছি—এ ধারণা টেলিভিশনের মতই আমার কাছে ঘৃণাই মনে হয়। আমার কাছে কোন পরিমাপ যন্ত্র নেই এবং দর্শকের শ্রেণী মাপার যন্ত্রেও আমি বিশ্বাসী নই।

আমি সাধারণতঃ ক্রোধ অথবা সুযোগের কারণে ফিল্ম তৈরী করি। যেমন আমি Millhouse তৈরী করি কারণ ১৯৪৬ সালে নিক্সনের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই আমি তার ওপর ক্ষ্যাপা ছিলাম। কিন্তু সুযোগ না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করিনি।

প্রশ্ন ঃ কি সেই সুযোগ?

উত্তর ঃ আমি তখন মুক্তিল্যাবে কাজ করছি, এমন সময় ফোন এলো। ফোনের অজ্ঞাত কণ্ঠ জানালো ঃ শুনুন, নিক্সনের ওপর একটা নেটওয়ার্কের সবগুলো ফুটেজ আমি চুরি করে এনেছি। আপনি যদি তাকে নিয়ে ফিল্ম করেন তাহলে এগুলো আপনাকে দিতে পারি। বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। আমি বললাম ঃ এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারছিনে। আমাকে দশ মিনিট সময় দিন। সে আবার টেলিফোন করলে আমি বললাম ঃ ঠিক আছে, আমি নিক্সনের ওপর ফিল্ম তৈরী করবো, হাতের কাজ (Painters Painting) সরিয়ে রাখবো, তবে আমি আপনাকে দেখতে চাই না আর এজন্যে আপনাকে টাকা পয়সা দিতে পারবো না। সে বললো ঃ আমি টাকা-পয়সা চাই না।

আমি তখন বললাম : আজ মাঝ রাতে মুভিল্যাব ভবনে আসুন। আমার সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট আপনাকে ভিতরে নিয়ে আসবে। আপনার সব কিছু রুমের মাঝখানে রেখে যাবেন।

সকাল সাতটায় এসে দেখি—সে দুশো ক্যান ফিল্ম রেখে গেছে। এসব এখন বলতে আর কোন বাধা নেই, কারণ, আইনের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। এটা ছিল ১৯৭০ সালের ঘটনা।

আমিই একমাত্র চলচ্চিত্রকার যে ফিল্ম তৈরীর জন্যে নিক্সনের 'শত্রুর' তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। আমার ওপর দশ দশটি হোয়াইট হাউজ স্মারকলিপি রয়েছে যার শুরু এরকম : 'দি হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন ডিসি সাবজেক্ট : এমিলি ডি আন্তোনিও।' আমি যে সব পুরস্কার পেয়েছি তার চেয়ে ওই স্মারকলিপিগুলো আমার কাছে বেশী ইন্টারেস্টিং। ওই দশটি পৃষ্ঠাই আমার চরম পুরস্কার।

প্রশ্ন : ষাটের দশকে আপনার কি মনে হয়েছে আপনার ফিল্মের চরিত্রের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকার আপনার ওপর নজর রাখছে?

উত্তর : আমার দ্বিতীয় ফিল্মটিতে হস্তক্ষেপ হয়েছিল, তার আগে নয়।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় ফিল্ম মানে Rush to Judgement?

উত্তর : হ্যাঁ

প্রশ্ন : কি ঘটেছিল?

উত্তর : আমরা যখন ডালাসে শুটিং-এ যাই, শেরিফের বাহিনী রাইফেল আর পিক-আপ ট্রাক নিয়ে আমাদের অনুসরণ করেছিলো।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন ঘটনাটা রাজনৈতিক নাকি চলচ্চিত্রকারদের বেলায় সচরাচর এরকম ঘটে থাকে? আমার এক বন্ধু সাউথে শুটিং-এ গেলে তার ঠিক একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অথচ সেটা কোন রাজনৈতিক ফিল্ম ছিল না।

উত্তর : রাজনৈতিক কারণেই এরূপ ঘটেছিল। কারণ, ওখানেই সীমিত থাকেনি, আরো অনেক কিছু ঘটেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার দুটো মামলা রয়েছে—একটা এফ বি আই-এর বিরুদ্ধে, জর্জ সিক্সিকার কোর্টে এবং অপরটি সিআই-এর বিরুদ্ধে ব্রীয়ান্টের কোর্টে। এটা ছিল এফ বি আই এর কাজ। ওয়ারেন কমিশন খুঁজে পায়নি এমন অনেককেই মার্কলেইন আর আমি খুঁজে বের করেছিলাম।

তখনকার অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত দিই। কেনেডী গুলিবিদ্ধ হবার সময় জাঁ হিল সম্ভবত আর কারো মতই তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিল। এবং আমরা যেসব লোককে ডাকি সে ছিল তার অন্যতম। প্রথম যখন তাকে টেলিফোন করি, সে বলে : 'অবশ্যই, কেন নয়।' আমরা মিথ্যে বলিনি—বলিনি আমরা সি বি এস অথবা এনবিসি থেকে এসেছি। আমরা বলি : ওয়ারেন কমিশনের ধারণাকে সন্দেহ করে আমরা এমন একদল স্বাধীন লোক, আমরা একটা ফিল্ম তৈরী করছি।

আমরা যখন তার ছবি তুলতে গেলাম—দেখি সে সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেছে। তার সাথে আমাদের টেলিফোন ও আমাদের উপস্থিতির মাঝে স্পষ্টতঃই একটা শর্ট সার্কিট কাজ করেছে। এরকম ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। সে বললো 'দেখুন, আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমার দু'টো বাচ্চা আছে, আমি সরকারী স্কুলে পড়াই। আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের সাথে কথা বললে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। প্লিজ, আপনারা যান'। এরূপ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। লোক জানতো আমরা কোথায় যেতে পারি, জানতো আমরা কার কাছে যাচ্ছি। আর এটা কেবল টেলিফোনে আড়িপাতা অথবা আড়িপাতা ও অনুসরণ—এ দুইয়ের সমন্বয়েই সম্ভব।

ডালাসে আমার প্রথম রাতের ঘটনা। আমার দলবল এসেছে সানফ্রান্সিসকো থেকে। আমি একা তাদের ব্রীফিং করছি। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দুই সুদর্শন তরুণ এসে হাজির। পরনে স্টেটসন লাগানো স্যুট ও টাই। তারা হলুদ ভিজিটিং কার্ড বের করে দেখালো। দু'জনই ডালাস হোমিসাইড স্কোয়াডের সদস্য। অত্যন্ত ভদ্র। তখন মনস্থির করবার সময়—শাসনতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে শহর থেকে বিতাড়িত হবো নাকি তাদের সাথে বিশ্বস্ত আচরণ করবো। আমি বললাম : আমি জাজমেন্ট ফিল্ম কর্পোরেশনে কাজ করি (ওই ফিল্মটি তৈরী করবার জন্যে আমি কর্পোরেশনটি গঠন করেছিলাম)। তাদেরকে আমাদের আগ্রহের কথা জানালাম। তারা অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করলো যে পর্যন্ত না বেনেভাইড্‌সের নাম এলো। অফিসার টিপেট-এর হত্যার সময় সম্ভবতঃ বেনে-ভাইড্‌স তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল। এ প্রসঙ্গে পুলিশ বললো : তোমরা বেনেভাইড্‌সের সাক্ষাৎকার নিতে পারবে না। আমরা কখনো তা নেইনি। ভয় দেখিয়ে তাকে টাউন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকের বেলায়ই এরকম ঘটেছে।

প্রশ্ন : In the Year of the Pig-এর উৎস ও ফিল্ম তৈরীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? সে সময় পর্যন্ত মিডিয়া কি করেছে বা করেনি এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর : মিডিয়া কখনো স্বতন্ত্র বা সমালোচনামূলক কিছুই করেনি। মার্কিন জনগণ কদাচিৎ মিডিয়ায় ভুগেছে। প্রতিদিন আমরা যুদ্ধ দেখছি। প্রতিদিন দেখছি মৃত আমেরিকান, মৃত ভিয়েতনামী, বোমাবর্ষণ—বিভিন্ন ধরণের সব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কিন্তু কেন এইসব ঘটছে তার ওপর একটা প্রোগ্রামও তৈরী হয় নি। এর ইতিহাস নিয়ে কোন প্রোগ্রাম হয়নি, এটাকে তার প্রেক্ষিতে স্থাপন করার চেষ্টায় একটা প্রোগ্রামও তৈরী হয়নি। আমি চেয়েছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে

ফরাসী অভিজ্ঞতা হয়ে টেট আক্রমণ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটার একটা ইন্টেলেকচুয়াল ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে আমি খুব ক্ষ্যাপা ছিলাম এবং একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম। এমন সময় দু'জন ছাত্র এসে বললো: আমরা আপনার অন্যান্য ফিল্ম দেখেছি। আমরা মনে করি ভিয়েতনাম নিয়ে আপনার একটা ফিল্ম তৈরী করা উচিত। এসব আমাকে অকস্মাৎ কাজ শুরু করতে উৎসাহিত করলো। এন এল এফ (ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট) এবং ডিআরভি (ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম) উভয়ের সাথে এবং ইস্টার্ণ ইউরোপের সাথে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল। আমি দ্রুত প্রচুর অর্থ জোগাড় করে পুরো ইউরোপ সফর করি এবং সোভিয়েত ফুটেজ, ইস্ট জার্মান ফুটেজ, চেক ফুটেজ সংগ্রহ করি। তারপর আমি বিভিন্ন ধরণের লোক যেমন, জাঁ ল্যাকোতুর, ফিলিপ ডি ভিলারস এবং অনেক আমেরিকানের ছবি তুলি। সিনেটর মর্টনের মত কিছু ছিটগ্রস্তেরও ছবি তুলি আমি। মর্টন হো চি মিনকে ভিয়েতনামের জর্জ ওয়াশিংটন বলে অভিহিত করেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার ফিল্মে ইন্টেলেকচুয়াল অভিজ্ঞতার সাথে আপনার মানসিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন? যেমন, Year of the Pig ফিল্মে বরাবরই হো চি মিন ও ভিয়েতনাম ঈশ্বর ও ভাবী সাম্রাজ্যের মত এসেছে। কিন্তু আপনি কখনো উত্তর ভিয়েতনামে যাননি, প্রকৃত যোগাযোগের মাধ্যমেও সে সমাজকে আপনি জানেন না। আপনার কি মনে হয়, একদিকে আপনি সমাজ বা পুঁজিবাদী সমাজকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং অপরদিকে আপনার রাজনীতির কারণে উত্তর ভিয়েতনামের দোষত্রুটিগুলো খুব কম সমালোচনার চোখে দেখছেন? আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন?

উত্তর : এ যুদ্ধকে আমি গোড়া থেকেই ফ্রান্সের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে অন্যায় বলে অভিহিত করে এসেছি। পলিন কায়েল সমালোচনায় বলেছেন হো চি মিন ফিল্মের নায়ক। তিনি পুরোপুরি ঠিক। হো চি মিনই ফিল্মের নায়ক। এটা কোন উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি নয়—এটা মিথ্যাও নয়। যা নিয়ে কাজ করা যায় এবং যা বিশ্বাস করা যায় তার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া আর মিথ্যে বলার মাঝে তফাৎ রয়েছে। ফিল্মে কোন মিথ্যে নেই—সেখানে পক্ষপাত রয়েছে। "আমি চেয়েছিলাম ভিয়েতনামীরা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিক এবং তারা হারিয়েছে। ভিয়েতনাম সরকার দি ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম, নিখুঁত সরকার নয়। সচরাচর বিপ্লবোত্তর যে বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে তারা তা করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই নানা প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের দমন করাটা কঠিন কাজ। আমি যাকে জন্মাধিকার দিই সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিলাসিতার সাথে এটা খাপ খায় না—এতেও কোন সন্দেহ নেই।

মার্কস্ বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মার্কসবাদী নই।' একজন মার্কসবাদী হিসেবে মার্কসের এই কথায় আমি বিশ্বাস করি। কেউ নয়, এমন কি মার্কস, লেনিন কেউ-ই ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। স্থান, কাল, পরিবেশ ভেদে পরিবর্তনের ধারাও বদলায়। মার্কস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এটার প্রয়োগ এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এর পরিবর্তন সাধন আমাদের ওপর। আমার মনে হয় অধিকার আইন রদ না করেও যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত মার্কসীয় বিপ্লব সম্ভব। আমি গাস হল পার্টির অধীনে কমিউনিজম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজমের কথা বলছি না। প্রতিটি দেশের পরিবেশ ভিন্ন। আর্টের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবের পর থেকে আমি মনে করি, অন্য যে কোন মার্কসবাদী দেশের চেয়ে বেশী ইন্টারেস্টিং ফিল্ম সে তৈরী করেছে। প্রাচ্যে এমন কোন ফিল্ম নেই যা Memories of Underdevelopment এবং অন্যান্য কতিপয় কিউবার ফিল্মের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এবং এটা আকস্মিক নয়। আমি ওই প্রাচ্য দেশগুলোতে ছিলাম। সেগুলো খুবই কষ্টকর, পীড়াদায়ক, শ্বাসরুদ্ধকর।

প্রশ্ন : পলিন কায়েল বলেছিলেন, আমেরিকার মৌলিক পচনশীলতা দেখাবার উদ্দেশ্যেই আপনি ফিল্ম বাছাই করেছেন।

উত্তর : অবশ্যই।

প্রশ্ন : তিনি আরো বলেছিলেন পুরো পশ্চিম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে আপনি থিসিস পেশ করেছেন।

উত্তর : পশ্চিমে পচন ধরেছে। তবে ধ্বংস হওয়াটা তার কথা। আমার মনে হয় আমাদের জার্মান এবং জাপানী মিত্রদের নিয়ে আমরা বরং শক্তিশালী।

প্রশ্ন : আইভেন্সের কাজ এবং Newsreel-এর পাশাপাশি ভিয়েতনামের ওপর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি হচ্ছে In the Year of the Pig এবং পিটার ডেভিসের Hearts and Minds. আপনার এবং ডেভিসের ফিল্মের মাঝে প্রধান পার্থক্যগুলো কি?

উত্তর : পার্থক্য অনেক। প্রথম পার্থক্য তাদের নির্মাণকালে। যুদ্ধের পরে ভিয়েতনামের ওপর ফিল্ম তৈরী করা কিছুটা বিলাস এবং অনেকটা নিরাপদ। এটা ভিন্ন পরিবেশ এবং এটা ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থারও সৃষ্টি করে। তবে ডেভিসের ফিল্মের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নয়। কারণ, একটা যুদ্ধ শেষ হবার একশো বছর পরেও তার ওপর গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে এবং তা পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে। ফিল্মটির সবচেয়ে, বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর স্নাইডনেস (Snideness), যুদ্ধে অংশ

গ্রহণকারী হিসেবে নিউজ্যাসিরা জিনভেনের সেই পাইলটের ট্রিট-মেন্টের প্রতি আমি খুব একটা সহানুভূতিশীল হতে পারি না। পরিষ্কার ক্লাস রুম সিকোয়েন্স থেকে ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক বেভারলী হিল্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। যে লোকটি যুদ্ধে ফিরে গিয়ে আবার ভিয়েতনামে বোমা ফেলবে বলে জানায় তার মূর্খতাও আমাদের নজর এড়ায় না।

আমার কাছে ওই সিকোয়েন্সটি পুরো অভিযানের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং মানবিক শূন্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পতিতালয়ের দৃশ্যের মত Hearts and Minds-এর পোষাকী দৃশ্যগুলো নেহাতই সস্তা। এটা হচ্ছে ফিল্মের বদলে মানুষকে ব্যবহার করার পুরনো মানসিকতা। যেমন ফুটবল সিকোয়েন্স কোচ খেলোয়াড়দের কোন ধারণাই নেই তারা একটা ওয়ার ফিল্মে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। তাদের ধারণা তারা হাইস্কুল ফুটবল বিষয়ক কোন ফিল্মে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতি আমি নই। এগুলো বিশেষ ফলপ্রদ বলেও আমি মনে করি না।

প্রশ্ন : ঘটনা সংঘটিত হবার পরে অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন তা নিয়ে ফিল্ম তৈরী করার জন্যে আপনি পিটার ডেভিসের সমালোচনা করছেন। আপনার ম্যাককার্থী ফিল্মও কি অনেকটা তাই নয়? নাকি ম্যাককার্থীজম এবং অন্যান্য বাড়াবাড়িগুলো এখনো বজায় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আর্মী-ম্যাককার্থী শুনানীর সাত বছর পরে Point of Order তৈরী হয়। এটা তৈরী হয় কারণ, এর শিক্ষা সবাই ভুলে গিয়েছে; কারণ, এটা ছিল একটা নতুন বিষয়; টেলিভিশনের পুরোনো এবং ওয়েভী ইমেজ থেকে তৈরী এটাই প্রথম 'ফিল্ম'। Point of Order-এর আসল পয়েন্ট হচ্ছে শুনানীর একটা সমাপ্তি ঘটেছিল যা মার্কিন জনগণ কখনো দেখতে পারেনি। এর অর্থ ম্যাককার্থীর অন্তিম। কারণ, এস্টাব্লিশ্‌মেন্ট তার পায়ের তলা থেকে মই সরিয়ে নিয়েছিল।

Hearts and Minds সম্পর্কে আমার আপত্তি হচ্ছে যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন ফিল্মটি তৈরী হলেও মার্কিন টেলি-ভিশনের চেয়ে এর পারস্পেকটিভ বেশী নয়। এবং মার্কিন টেলিভিশনের পারস্পেকটিভ সামান্যই।

Hearts and Minds-এর পর্যালোচনায় আমি বলেছিলাম : ডকুমেন্টারীর ব্যাপারে নেটওয়ার্ক টেলিভিশন এবং হলিউড বরাবরই অস্বস্তি অনুভব করে। নেটওয়ার্কগুলো তাদের বমি করে এবং পরস্পরকে National 4-H Clubs, White Papers-এর মত পুরস্কার দেয়। ট্রটস্কির ডাস্টবিনে তাদের ঠাঁই এমন বিষয় বস্তু, এমন ধোলাইকরা জীবন। এদের বিষয়-বস্তু যথেষ্ট নির্বোধ, যাতে কোন বাবা মা অথবা তাদের নাতি নাতনিরা ক্ষুণ্ণ না হয়। হলিউডের অস্বস্তি আরো বাস্তব, সে এসব এড়িয়ে চলে। তার জন্যে Godfather, Airports, Poseidon জাতীয় ফিল্ম এবং ফিটজিরাল্ড, হেমিংওয়ে ও জেন গ্রে-এর রচনা বেশী লাভজনক। Hearts and Minds হচ্ছে ডকুমেন্টারীর Godfather। তবে আমার অনুমান, এর মাঝে একটা পার্থক্য হচ্ছে এটা কখনো দর্শক পাবে না। দু'টো ফিল্মকেই আমার মনে হয়েছে হৃদয়হীন এবং নির্বোধ। হৃদয়হীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভিয়েতনাম কাউকেই বুঝতে পারার অক্ষমতার কারণে। হৃদয়হীন কারণ, এটা মধ্যবিত্ত-সুলভ লিবারেল সুপিরিয়রিটি ও ঠাট্টামিশ্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—যা তার করা উচিত নয়, উচিত বিপরীত কিছু করা। বেভারলি হিলসের পশ্চাৎদেশ এবং নিউজ্যাসির লিণ্ডেন-এর মাঝে দূরত্ব অনেক। Hearts and Minds-এর স্রষ্টারা এটা বুঝতে অক্ষম।

প্রশ্ন : দীর্ঘ সতেরো বছর যাবৎ ফিল্ম তৈরীর পর আপনার কি মনে হয় এই সব ফিল্ম বা আপনার ধরনে তৈরী ফিল্মগুলো কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছে নাকি সেগুলো শুধু বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে? আপনি এ ব্যাপারে আশাবাদী নাকি সিনিক্যাল?

উত্তর : আমি মোটেই সিনিক্যাল নই। তবে একক ফিল্মের দুনিয়া বদলানোর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। এদেশে সংগঠিত ধর্মাচারণসহ কখনো কোন কিছু ছিল না যার সাথে মিডিয়ার তুলনা চলতে পারে। দিনের ২১ ঘণ্টা টিভি চালু রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জঞ্জাল কিভাবে আমাদের জনগণের মনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন : আমি যখন এখানে আসি আপনি তরুণ চলচ্চিত্র-কারদের বিকাশ সম্পর্কিত একটি রচনার ওপর নজর বুলা-চ্ছিলেন। মনে হয় তরুণ চলচ্চিত্রকারদের প্রতি আপনার যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। আপনি তাদের কি সাহায্য দিয়ে থাকেন?

উত্তর : রাজনৈতিক। Attica-এর স্রষ্টা সিণ্ডা ফায়ার-স্টোন প্রথম আমার সাথে কাজ করতো। আমার সাথে কাজ শুরু করেছিল, চলচ্চিত্র অঙ্গনের এমন অনেকেই এখন নিজেদের কাজ করছে। আমি নিজে নিজে কাজ করতে শিখেছি এটা তাদের জন্যে একটা উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা। অতীতে আমি এক জন কৌতূহলী নিয়োগকর্তা ছিলাম। আমার চারপাশের লোকজন কাজ করছে না। এটা আমি দেখতে পারতাম না। আমি বলতাম : তোমরা কেন সিনেমায় যাচ্ছো না অথবা বাড়ি যাচ্ছো না অথবা কিছু করছো না। তবে আমি চাইতাম তারা কাজ করুক, শনিবার, রবিবার কাজ করুক, সারারাত কাজ করুক—যদি অবস্থা ভালো থাকে।

প্রশ্ন : যে সব তরুণ চলচ্চিত্রকাররা টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেন? আপনি বলেছিলেন আপনি

একজনকে অন্ততঃ ৮৪ হাজার ডলার অনুদান পেতে সাহায্য করেছিলেন।

উত্তর ঃ পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস থেকে সে সেটা পেয়েছিল। এটা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং আরো কঠিনতর হচ্ছে। এদেশে র‍্যাডিক্যাল ফিল্ম-স্রষ্টাদের অর্থের উৎস হচ্ছে লিবারেল মুভমেন্ট যা এ ব্যাপারে উৎসাহী নয়। র‍্যাডিক্যাল এবং রাজনৈতিক ফিল্ম আগ্রহীদের পক্ষে অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। Hearts and Minds-এর মত ভুয়া রাজনৈতিক ফিল্মগুলোর বক্স অফিস ব্যর্থতা অন্যান্যদের জন্যে অর্থপ্রাপ্তি আরো কঠিন করে তুলেছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনার বেশীর ভাগ ডকুমেন্টারী তাদের খরচ তুলে এনেছে।

উত্তর ঃ খরচ ফিরিয়ে এনেছে এবং সেগুলো সীমিত সংখ্যক শহরে প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলো হাজার হাজার প্রেক্ষাগৃহ প্রদর্শিত হবে এমন উচ্চাশা আমাদের কখনোই ছিল না—যা ঘটেছে Hearts and Minds-এর বেলায়। Hearts and Minds ১৬ মিলিমিটারে তার খরচ ফিরিয়ে আনতে পারবে, তবে এর ক্ষতিপূরণ সময়সাপেক্ষ। Ophuls-এর Memories of Justice কোনদিনও টাকা ফেরৎ পাবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ডকুমেন্টারীতেই থেকে যেতে চান?

উত্তর ঃ ডকুমেন্টারীকে আমার বরাবরই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। তবে আমার নিজের জীবন নিয়ে একটি কাহিনী চিত্র তৈরীর ইচ্ছে আছে। এক অব্‌সেশন রূপে এর শুরু এবং Weather ফিল্ম তৈরীর আগে থেকেই আমি এ নিয়ে ভাবছি। Freedom of Information-এর অধীনে সরকারের বিরুদ্ধে আমার মামলা থেকে এর আরম্ভ। আমি তখন Weather ফিল্মে কাজ করছি। তখনো স্যুটিং শুরু হয়নি। হঠাৎ ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত আমার জীবনের উপর এফবিআই সংগৃহীত প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার এক দলিল এলো এফ বি আই-এর কাছ থেকে। অবশ্য তার পরে সংগ্রাম করা এবং দুইজন আইনজীবী নিয়োগ করা ছাড়া কোন দলিল পাওয়া যায়নি। সৌভাগ্যবশতঃ আইনজীবি দুজন ছিল আমার বন্ধু।

প্রথমদিনের পৃষ্ঠাগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। টেপরেকর্ডার এবং কম্পিউটারের সামনে সংগৃহীত তথ্যগুলো যখন আমি একাকী বসে পড়ি, আমার তখনকার অনুভব বর্ণনা করা কঠিন। তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে এফ বি আই-এর লোকেরা। তারা তাদের ছোট্ট সবুজ প্যাডে এগুলো লিখে হোটেলে গিয়ে পুরোটা টাইপ করেছে। ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি এবং কমিশনের জন্যে আমার আবেদন থেকে এর সূচনা। এবং এই কয়েকশো পৃষ্ঠা, অতীতে আমার বারো বছর বয়স, আমার প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা আমার মায়ের কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ এমিলি একজন নাস্তিক, কাজেই তার নৈতিক দ্বিধা সঙ্কোচের কোন বালাই নেই। একজন কর্ণেলের মুখেও ওই একই কথা শোনা যায়। এটা আমার ভিতরে এক ভুতুড়ে, এক ক্রুদ্ধ অনুভবের জন্ম দেয়। পরে ক্রোধ মিলিয়ে যায়।

অতএব, আমি এই গল্প-কাম-ফিল্মটি তৈরী করছি অত্যন্ত আবেগহীনভাবে এবং মানহানি মামলার কারণে করছি ফিক্‌শন হিসেবে। আমার উকিল আমাকে এভাবেই করার পরামর্শ দিয়েছে কারণ, আমার সম্পর্কে যারা বলেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধু। এখন অবশ্য এটা তার চেয়েও বৃহৎ। গোড়ায় আমি এর শিরোনাম দিয়েছিলাম ঃ "A Middle-Aged Radical as Seen Through the Eyes of the Government" কিন্তু এখন এটা প্রকৃতই আমার জীবন—দ্য হোল ড্যাম্‌ড্‌ থিং।

প্রশ্ন ঃ আপনার ফিল্মের একটা দৃঢ় বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি বলেছেন প্রথম দিকে আপনি মার্কস্‌বাদী ছিলেন। আপনি এখন কোথায় আছেন বলে মনে করেন? আপনি কি কোন স্বীকৃত দলভুক্ত?

উত্তর ঃ না, কৈশোর থেকেই আমি কোন স্বীকৃত দলভুক্ত ছিলাম না। এবং আমার মনে হয়, আমার জীবদ্দশায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে যেতে পারবো না, এরূপ ভাবার ব্যাপারে আমি এখন যথেষ্ট সিনিক্যাল। এদেশে পরিবর্তনের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন এবং সম্ভবতঃ আমি কতকটা নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠেছি। আমি তীব্র, হিংস্র সাড়ায় বিশ্বাসী। আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সবচেয়ে মৃতপ্রায় এবং অত্যাচারী। এখানে স্থানাভাব এবং এখানে নির্জনতা খুব বেশী। বামপন্থী রাজনীতি করে এমন লোক এখানে খুবই কম। জনসাধারণ Left-negativism-এর অংশীদার, এবং নেগেটিভিজম ও প্রকৃত বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য বিরাট। বাইরের মার্সিডিস-আরোহী তিনশো ডলারের জ্যাকেট গায় অনেককে আমি চিনি যারা পীনাট সম্পর্কে, এদেশ সম্পর্কে নাকসিঁটকানো মন্তব্য করবেন,—সেটা খুবই সহজ। আমার মনে হয় উপযুক্ত কারণে ওই একই মন্তব্য করা এবং তারচেয়ে বেশী কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। আর এখানে, এই ক্ষুদ্র নো-ম্যান্‌স্ নো-ওম্যান্‌স্-ল্যাণ্ড আটকে থাকে মানুষ, সেখানে খুব কম নারী-পুরুষই রয়েছে যারা প্রকৃতই কিছু ঘটছে দেখতে পায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার মতে এই মুহূর্তে একজন ডকুমেন্টারী নির্মাতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কি?

উত্তর ঃ আমার মতে টেলিভিশন নিয়ে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টারী হতে পারে। এটাই আমার চরম পলায়ন, তবে

এর কোন বাজার নেই। মনে রাখবেন এর জন্য কোন টাকা পাওয়া যাবে না। এটা প্রেক্ষাগৃহে চলতে পারে। কিন্তু কোন টিভি এটা কখনো দেখাবে না। কারণ, তাহলে এর প্রয়োগ, পরিকল্পনা, মিথ্যে প্রচার কঠিন হবে। এসবের তুলনায় Network কিছুই নয়। Network হচ্ছে পুরো বিষয়টির পরিহার : দরকষাকষি নিয়ে লড়াই, অর্থব্যয়ের পরিমাণ বারবারা ওয়াল্টারস এবং ছেলেমেয়ে ও নারীকল্পনা।

নারী আন্দোলন যদি একজন নারী হিসেবে পাঁচ মিনিটের জন্যে টেলিভিশনের দিকে তাকাতো, তাহলে তারা টিভি স্টেশনে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিত। আইডিয়াটা হচ্ছে নারীরা জড়বুদ্ধির মানুষ, সুতরাং সারাদিন গেইম শো, সোপ অপেরা এবং এই ধরণের কাজ তাদের। খবর প্রচারিত হয় ছ'টায়, বড় খবর সাতটায়, কারণ ঐ সময় পুরুষ ঘরে থাকে, ঐ সময় ক্রয়ক্ষমতাধারী এবং পরিবারের রাজা বাড়িতে।

খবর এখন ইন্ডাস্ট্রী হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয়েছে দেড় ঘণ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা। কারণ, অন্য কিছুর চেয়ে খবর এখন বেশী লাভজনক। আর একারণেই খবর কিছুই বলতে পারে না। খবর কাউকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। খবর কিছু বিশ্লেষণও করতে পারে না। খবর ঘষেমেজে এমন করা হয় যে শেষে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা ছাড়া তাতে আর কিছুই থাকে না। একারণেই ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের অভাব।

আপনি ২০৭৮ সালের জন্য ভূগর্ভে পুঁতে রাখার উদ্দেশ্যে একটি টিউব তৈরী করুন। আর এর সাথে সাকুল্যে আপনার যা দরকার তা হচ্ছে টিভি সরঞ্জামসহ এক সপ্তাহের 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স'-এর টিভি পৃষ্ঠা। আপনি এটা করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন কেন এই কালচার পাকা ফলের মত ঝরে যাবে, যদি গাছটাতে ঝাঁকি দেবার মত কেউ থাকে। বিষয়টি হচ্ছে আমরা এতই ফাঁপা যে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফলটি ঝেড়ে ফেলার সাহসটুকু আমাদের নেই। এটা বুড়ি গাছটাতে লটকেই আছে।

অনুবাদ : সুমন রহমান

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ প্রকাশিত 'ক্যামেরা যখন রাইফেল' থেকে

পত্র-পত্রিকা থেকে

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র 'চিত্রভাষ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যার সম্পাদকীয়

শিশুবর্ষ এবং ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ বিরাট এক দেশ এবং বিরাট এর জনসংখ্যা। স্বভাবতই এ দেশে শিশুর সংখ্যাও বেশী। ১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে সমগ্র জনসংখ্যার ৪২ শতাংশই ১৪ বছরের নীচে শিশু। বর্তমানে এই হার আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৯ সালকে শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে—উদ্দেশ্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সব শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পাকা ব্যবস্থা করা ; পরিবার বহির্ভূত দুর্গত পরিবারের শিশুদের ভার যাতে সমাজ ও রাষ্ট্র নিতে পারে তার বন্দোবস্ত করা ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহানিকর এবং নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী কোন কাজ যেন শিশুদের না করতে হয় এমন ব্যবস্থা নেওয়া ; এক কথায় শিশুকে 'জাতির ভবিষ্যত' হিসাবে গড়ে তোলার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা। যে দেশে অপুষ্টিতে ভোগে এমন শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ও বছরে মৃত্যুর হার ১ লক্ষ, দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে ১১ কোটি শিশু এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যার দিক দিয়ে যে দেশের স্থান প্রথম সে দেশে শিশুবর্ষের উদ্দেশ্যগুলো যে সহজে পূর্ণ হতে পারে না সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বলা হয়, ভারতবর্ষ উন্নতিকামী দরিদ্র দেশ ; এর সামনে সমস্যা অনেক। সেই কারণেই সমস্ত লক্ষ্য পূর্ণ করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এই কথাটা কি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ? সব কিছু একসঙ্গে হবে, এটা কেউই আশা করে না ; কিন্তু কিছু করার উদ্যোগ কোথায় ? বিরাট জনসংখ্যার নানা সমস্যা নিয়ে দু-একটা উদ্যোগ যদিও বা কোথাও দেখা যায়, শিশুদের কথা আলাদা করে কেউ ভাবে বলে মনে হয় না। এ দেশে শিশুদের নিয়ে যেখানে যতটুকু হয় ততটুকুর অংশীদার সেই সব শিশুরা যাদের জন্য রাষ্ট্রকে আলাদা করে কিছু ভাববার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের মত দেশে বিরাট সংখ্যক শিশুর আর্থিক উন্নতির প্রশ্নটাই প্রধান। এখানে মানসিক উন্নতির জন্য করণীয় ব্যবস্থাটা যে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র শিশুদের মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট এক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর দৃষ্টান্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশে অনেক এবং উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতেও এই দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। যদিও বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে বেশী চলচ্চিত্র তোলা হয়ে থাকে আমাদের দেশে তবু শিশুদের জন্য কোন ছবি এ দেশে তোলা হয় না বললেই চলে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের পুরো ব্যাপারটাই মুনাফাভিত্তিক। যেহেতু শিশু-চলচ্চিত্রে মুনাফার সম্ভাবনা কম সেহেতু শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড অনীহা। মিশ্র অর্থনীতির নামে শিল্প জগতের (Industry) কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত—সরকারের কিছু করণীয় আছে, হোক না কোটি কোটি টাকা ক্ষতি। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোটাই চলে বেসরকারী নিয়মে। শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারী উদ্যোগে গঠিত সংস্থা মাঝে মধ্যে দু-একটা চলচ্চিত্র অবশ্য নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু সে সব ছবির অধিকাংশই না হচ্ছে শিশু চলচ্চিত্র, না ব্যবসায়ী (!) চলচ্চিত্র, ফলে এই সমস্ত সংস্থার উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। আসল কথা, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে দু-একটা ছবি তৈরী করে অবস্থার পরিবর্তন আনা যায় না। আমাদের দেশে উন্নতির লক্ষ্য সমাজের শতকরা ১০ ভাগ লোককে সামনে রেখে, শতকরা ৯০ ভাগই থাকে বঞ্চিতের দলে। এই অবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন কার্যকর কোন কিছু হবে বলে মনে হয় না।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৯৫

নদীর ধারের বাঁধ।

সময়—দিন (?)

একজন দারোগা কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে হন্ হন্ করে আসছে। মাঝে মাঝে তাদের হাতের টর্চ জ্বলছে। দারোগাও বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা বেরিয়েছে অভিসারে। বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওদের দূরে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

দূরে টর্চের আলো জ্বলছে-নিবছে। হঠাৎ একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে দুর্গার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

উৎসুক দুর্গা কয়েক পা এগিয়ে লোকটাকে ভালো করে দেখে।

কাট টু।

লোকটা দুর্গাকে দেখে থেমে যায়। তার হাতে একটা দেশী রিভলভার। ডান হাত দিয়ে রক্তাক্ত বা হাতটিকে সে চেপে ধরে আছে।

হঠাৎ দুর্গাকে রাস্তার মাঝে দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত। এই লোকটির নাম বিশু।

বিশু : আঃ ও—।

শট্‌টি স্থির হয়ে যায়।

কাট্ টু।

দুর্গার প্রতিক্রিয়া সহ ফ্রিজ্ শট্।

কাট্ টু।

বিশুর ফ্রিজ্ শট্।

কাট্ টু।

দূরে পুলিশের গলা—

পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

বিশু : চুপ্! কোনও ভয় নেই—এ গাঁয়ে, এ গাঁয়ে যতীন মুখুজ্জে বলে কোনও নজরবন্দী থাকে? আমি তার বন্ধু।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—যতীন। দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলে—

যতীন : (অবাক হয়ে) একি!…তুই!!

কাট্ টু।

দুর্গা বিশুকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

কাট্ টু।

বিশু : সব বলছি!…দোরটা দিয়ে দে!

দুর্গা দরজা বন্ধ করে দেয়।

যতীন : কিন্তু এভাবে কোত্থেকে এলি তুই?

বিশু : (ফিরে) কুসুমপুর।

যতীন : কুসুমপুর?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৭

স্থান—কুসুমপুরের জমিদার বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

বিশু একদল চাষীর জমায়েতে বক্তৃতা করছে।

বিশু : হুঁশিয়ার ভাইসব! জমিদারের দল বেঁধে সরকারের কাছে আর্জি ধরেছে—প্রজাদের ওপর নতুন করে খাজনা বাড়াবার অধিকার চাই। কিন্তু, একেই তো দুবেলা খেতে পায় না গরীব মানুষ। তার ওপর নতুন করে খাজনা বাড়লে তারা বাঁচবে কি করে? তাই ভাইসব, যতক্ষণ না এ হুকুম রদ হচ্ছে—আমরা কেউ নড়বো না এখান থেকে!…ধর্মঘট!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

যতীন : তারপর?

বিশু : (চেয়ারে বসতে বসতে) তারপর…হঠাৎ…

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৯।

স্থান—কুসুমপুরের জমিদারের বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় কয়েকজন পুলিশকে নিয়ে একজন দারোগা ঐ জমায়েতের দিকে ছুটছে।

দারোগা : পাক্‌ড়ো—! পাক্‌ড়ো—!

হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। দুজন মুসলমান চাষী বিশুর কাছে ছুটে আসে।

রহম : —আপনি চলে যান—

বিশু : —এঁ্যা ?

রহম : আপনি চলে যান বাবু !

বিশু : কিন্তু…

ঈরশদ : কোন কিন্তু নাই। আমরা আছি !…আপনি ধরা পল্লে… (হাত জোড় করে) চলে যান বাবু।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০০

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

বিশু ছুটতে আরম্ভ করলে ক্যামেরা তার পা-কে অনুসরণ করে।

বিশু : (off) এ গ্রাম…সে গ্রাম…হন্যের মতো ছুটতে ছুটতে…শেষ অব্দি বল্লার জঙ্গলে এসে…আর উপায়—না দেখে—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০১

স্থান—বল্লার জঙ্গল।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে ঘন জঙ্গল।

বিশু ছুটে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে, একটা গাছের আড়ালে লুকোয়। পরের মুহূর্তেই রিভলভার থেকে গুলি ছোড়ে।

কাট্ টু।

লং শট্। দারোগা ও পুলিশরা ছুটে আসছে। তারাও গাছের আড়ালে লুকোয়।

কাট্ টু।

বিশু গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

দারোগাও নলা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ে।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

বিশুর রিভালভারটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে গুলি ছোড়ে।

কাট্ টু।

দারোগা।

কাট্ টু।

লং শট্। বিশু।

কাট্ টু।

পাখিদের লো-এঙ্গেল শট্।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

দারোগা।

কাট্ টু।

বিশু ঘোড়াকলে চাপ দিয়ে বুঝতে পারে পিস্তলের গুলি শেষ। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে উঁচু নীচু পথে দৌড়তে শুরু করে।

কাট্ টু।

দারোগা ও পুলিশরা তাকে তাড়া করে। বিশুর দিকে তাক্ করে দারোগা গুলি ছোড়ে।

কাট্ টু।

বিশু ক্যামেরার দিকে ছুটে আসছে। গুলির শব্দ হতেই সে বাঁ হাত চেপে ধরে।

বিশু : আঃ হ্—!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

বিশুর মুখের ওপর থেকে ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করে। সে যন্ত্রণায় কাতর। পকেট থেকে পিস্তলটি বার করে আনে।

বিশু : আমার যা হয় হোক্ ।…এটা বাঁচানো দরকার।…চলি

যতীন : কোথায় ?

হঠাৎ সবাই-ই জানলা দিয়ে কিছু পায়ের শব্দ ও বাঁশির আওয়াজ শুনে চমকে যায়।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

যতীন।

কাট্ টু।

দুর্গা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরেটা দেখে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—রাত্রি।

যতীনের ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় ও ছোট দারোগা কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ছুটে আসছে। অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়ায়।

বড় দারোগা : আশ্চর্য্য !…গেল কোথায় বলুন তো ?

কাট্ টু।

ছোট দারোগা অস্বস্তিতে পড়ে।

ছোট দারোগা : এক সেকেণ্ড !

সে যতীনের ঘরের বারান্দায় উঠে এসে কড়া নাড়ে।

ছোঃ দারোগা : যতীনবাবু !…যতীনবাবু !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

ছোট দারোগার গলা শুনে দুর্গা, বিশু ও যতীন সবাই-ই দরজার দিকে তাকায়।

হঠাৎ দুর্গা বিশুকে টেনে নিয়ে ঘরের একটা কোণে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে।

দুর্গা : থাকেন !

ছোট দারোগা : (off) যতীনবাবু শুনছেন ?

দুর্গা যতীনের কাছে ছুটে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে।

দুর্গা : কুনো ভয় নাই…

যতীন : কিন্তু—

দুর্গা : দেখি ! (বলে, হাত ধরে চৌকির কাছে টেনে নিয়ে দরজার দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে) নড়বেন না।

যতীনের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে তারই চোখ বন্ধ করে দেয়।

দুর্গা : শুধু চোখ দুটো খুলবেন না বাবু !

কাট্ টু।

দরজায় শব্দ হয়েই চলে।

দুর্গা : কে গো ?

দরজার দিকে অর্ধেক এগিয়ে হঠাৎ সে শাড়ি খুলতে শুরু করে। শাড়ি মাটিতে পড়ে যায়। ক্যামেরা দুর্গার—পা অনুসরণ করে দেখায় সে দরজা খুলছে।

দরজার বাইরে দেখা যায় দুজোড়া পুলিশের পা।

কাট্ টু।

ফোর গ্রাউণ্ডে দুর্গার অনাবৃত কাঁধ। ছোট ও বড় দারোগা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

বড় দারোগা : এ কি ?

কাট্ টু।

দুর্গা আবেশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। দু হাত দিয়ে বুক ঢাকে সে।

দুর্গা : হেই মা ! দারোগাবাবু, আপনি ইখানে ?

কাট্ টু।

ছোট দারোগা : আসুন…চলে আসুন !…ও কিছু নয়— বলছি আপনাকে—

তারা কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৫

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—রাত্রি।

ছোট দারোগা বড় দারোগার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি সব বলে। তারা দুর্গার দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা এই সময় গান গাইতে থাকে।

দুর্গা : "কচি ভাতার লাগর আমার
কচ্ কচ্ করে মাথা চিবাইছি—"

পুলিশ ও দারোগাকে আড চোখে চলে যেতে দেখে সে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট—সংবাদপত্রের শিরোনামা

কৃষককুল সাবধান
খাজনাবৃদ্ধি আসন্ন

কাট্ টু।

দেখা যায় জগন ডাক্তার একদল গ্রামবাসীকে কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। দলে আছে তারিনী, হেলারাম, মথুর, রহম আর ইরশাদ্।

জগন : "গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের ঢেউ"

রহম : আমাদের কুসুমপুরের নাম দিয়েছে ?

জগন : না। তা কিছু দেয় নাই।

ইরশাদ্ : দিবে দিবে, এইবার দিতে হবে !…কুসুমপুর, দেখুড়িয়া, মহেশপুর—সব জায়গায় আগুন জ্বলছে।—এখন আপনারা কি করবেন বলেন ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৮

স্থান—ছিরু পালের বাড়ির বারান্দা।

লং শট্। গরাইকে সঙ্গে নিয়ে ছিরু পাল ক্যামেরার দিকে আসছে। অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনের জমায়েতকে দুজনে বেশ গভীর ভাবে লক্ষ্য করে।

ছিরু : ব্যাপার কি ? জোটান কিসের ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

লং শট্। যতীন একদল গ্রামবাসীকে কি যেন বোঝাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১০

স্থান—ছিরু পালের বাড়ির বারান্দা।

সময়—দিন।

গরাই : (ছিরুকে) নজরবন্দী ভাষণ দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১১

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

যতীন : পড়শীর চালায় যখন আগুন, তখন তো আর চোখ বুজে থেকে লাভ নেই !…আজ হোক, কাল হোক—সে আগুন এখানেও জ্বলবে—

হেলারাম : কিন্তু ফের আবার হাঙ্গামা—

সতীশ : কিসের হাঙ্গামা !…ল্যাংটার আবার বাটপারের ভয় !

মথুর : এমনিতে শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খেত…তার চেয়ে না হয় আগুনেই পুড়ে মরব।…মরণ তো দুবার হবে না !

ইরশাদ্ : সাবাশ !

তারিনী : ঠিক !…সবই তো গেইছে, কি কত্তে হবে শুধু তাই বলেন।

সতীশ : ক্যানে ! তুর গলায় তো গান আছে রে ! গান বাঁধবি !

তারিনী : গান ?…ধন্মঘটের ?

ইরশাদ্ : হাঁা, এখন গান যে খুন একবারে টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ফুটবে !

ক্যামেরা এবার তারিনীর ওপর চার্জ করে।

তারিনী : ঠিক্ !…ঠিক্ বলছ ইরশাদ্ ভাই !…বাটি বাজিয়ে ভিক্ষের গান তো অনেক হল !…(অন্যান্যদের প্রতি) দেখিস…দেখিস তুরা কি গান বাঁধি ! (যতীনকে) আপনি শুধু এট্টু দেখে দিবেন বাবু !

ইরশাদ্ : আরে, যে গাঁয়ে দেবু ভাইয়ের মতো লোক আছে—কাউকে কিছু দেখতে হবে না।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত একটা কাঁথা নিয়ে এসে খাটে শুয়ে থাকা অসুস্থ বিলুর শরীর ঢেকে দেয়।

দেবু : ইস্ দ্যাখো দিকি ! (কপালে হাত দিয়ে) আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি জগনের কাছ থেকে।

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই বিলু বলে—

বিলু : বলছি তো কিছু হয়নি !…ম্যালেরিয়া।

দেবু : বাঃ !…সাত খুন মাপ !…খবদ্দার, আজ উঠবে না বিছ্‌না থেকে !…ঠিক তো ?

বিলু : (কাঁচুমাচু মুখে) আচ্ছা…

দেবু পণ্ডিত চলে যায়।

কুসুম : (off) বৌদি !…অ বৌদি !

কুসুমের গলা শুনে বিলু রি-অ্যাকট্ করে, আর ইঙ্গিতে কুসুমকে চুপ করতে অনুরোধ করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৩

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

কুসুম একটা ঝুড়ি নিয়ে বারান্দার দিকে আসে।

দেবু পণ্ডিত ক্যামেরার দিকে পেছন করে ফ্রেমে ঢোকে।

দেবু : কি রে?…বৌদির জ্বর?…যা না!

দেবু পণ্ডিত উঠোন পেরিয়ে দরজার কাছে যায়।

হঠাৎ কুসুম সামনে কিছু দেখে যেন রি-অ্যাকট্ করে।

কাট্ টু।

খাটের ওপর বিলু শুয়ে। সে ঠোঁটে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে বলে এবং ঘরে ঢুকতে অনুরোধ করে।

কাট্ টু।

কুসুম পা টিপে টিপে নীরবে ঘরে ঢোকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৪

স্থান—সজনে তলায় গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ভূপালের গতির সঙ্গে প্যান্ করে দেখায় অন্য দিক থেকে আসা দেবু পণ্ডিতের সামনে সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

ভূপাল : পেন্নাম গো!…আপনার কাছেই যেছিলাম।

দেবু : কেন?

ভূপাল : ঘোষ মশাই পাঠিয়ে দিলে। বল্লে, দু-সনের খাজনা বাকি, ওটা যদি এবার…

দেবু : (এক মুহূর্ত ভেবে) ঠিক আছে…দেখছি…

ভূপাল : আজ্ঞে আচ্ছা—

ভূপাল ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা যায় জগন ডাক্তার এগিয়ে আসছে।

জগন : আরে!…তুমি এখানে?…আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে—

দেবু : আমিও যাচ্ছিলাম তোমার কাছে—

জগন : তাহলে চলো!…ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার!

সে দেবু পণ্ডিতের হাত ধরে।

দেবু : কেন?

জগন : ধর্মঘট!…তুম্ তুমা তুম্…মরুক না ব্যাটারা, খাজনাবৃদ্ধি দিচ্ছেটা কে?…যতীন ভায়া বসে আছে তোমার জন্যে—

কুসুম : (off) পণ্ডিত দাদা—! পণ্ডিত দাদা—!

তারা দুজনেই ওদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

কুসুম ছুটে আসছে।

কুসুম : পণ্ডিত দাদা—।

দেবু : কি হয়েছে রে কুসুম?

কুসুম : শিগ্গির এসো! বৌদি বেহুঁস হয়ে পড়েছে!

দেবু : এ্যাঁ?

তারা সবাই দেবু পণ্ডিতের বাড়ির দিকে দৌড়ায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৫

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ঢেঁকি শালের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে বিলু। রাঙাদিদি সহ আরও কয়েকজন গ্রামের বৌ তার শুশ্রূষা করছে।

রাঙাদিদি দরজার দিকে তাকায়।

রাঙাদিদি এই যে!

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত, জগন ডাক্তার ও কুসুম দৌড়ে এসে ঢোকে।

কাট্ টু।

রাঙাদিদি : (উঠে দাঁড়িয়ে)…সাত পাকের সোয়ামী হইছে! ছ্যাখ্, ছ্যাখ্, ছ্যাখ্ কি হাল করেছিস বৌটার!

দেবু : কি হয়েছে?

রাঙাদিদি : কি হইছে!…অরে অ কাণ্ডা পণ্ডিত—নিজে না হয় বলে না, দুবেলা যে পিণ্ডি গিলিস,—একবারও ভেবে দেখেছিস, আসে কোত্থেকে—কে জুটায়? জেহেলে বসে কখনো ভেবেছিস—কি খেছে বৌটা?… ন্যাতা হইছে দেশোদ্ধারের 'ন্যাতা'!…ঘরের মাগ মুখের রক্ত তুলে পরের বাড়ির ধান ভান্বে…অদ্ধেক দিন উপোষ করবে …আর মদ্দ আমার সেই রোজগারের ভাত খেয়ে 'ন্যাতা' গিরি ফলাবে! থুঃ থুঃ তোর 'ন্যাতা' গিরির মুখে। তোর দেশোদ্ধারের মুখে থুঃ—থুঃ রে। একটা মেয়ের উদ্ধার যে করতে পারে না—সে করবে দেশোদ্ধার দে, দে, দে ক্যানে গলা টিপে—একেবারে জুড়োক।

রাঙাদিদি এবার বিলুর কাছে এগিয়ে যায়।

রাঙাদিদি : অ বিলু !…অ মা !…একবার চোখ খোল মা !…তাকা—

ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের মুখের ওপর চার্জ করে। তাকে খুব ছোট্ট আর নীচু মনে হয়।

কাট টু।

দৃশ্য—৩১৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে একদল গ্রামবাসীর জমায়েত।

ক্লোজ শট—যতীন।

যতীন : সে কি ?

কাট টু।

জগন : (হাঁপাতে হাঁপাতে) হ্যাঁ। এখন থেকে সে আর গাঁয়ের কোনও ব্যাপারে নেই।

সতীশ : কি বলছেন গো ডাক্তারবাবু ?

হরশাদ : দেবু ভাই এ কথা বলেছে ?

জগন : হ্যাঁ,…বলেছে, সে চাষীর ছেলে—মাস্টারী খুইয়েছে। এখন থেকে তার কাছে ঘর সংসারই বড়—

কাট টু।

দৃশ্য—৩১৭

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ক্ষেতজমি।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট। লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট-আপ করে দেখায় দেবু পণ্ডিতই চাষ করছে।

হঠাৎ দূরে কিছু শব্দ শুনে দেবু পণ্ডিত সেদিকে তাকায়।

কাট টু।

লং শট। কালুর লোকজন লাঠিসোঁটা কুড়ুল নিয়ে ছুটছে।

কাট টু।

দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসে।

কাট টু।

কালুর লোকজন চারিদিকেই ছুটছে।

কাট টু।

দেবু পণ্ডিত স্তম্ভিত।

কাট টু।

(চলবে)

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT

Chitra-Bikshan

(From No. IV/Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Cine Central, Calcutta, 2, Chowringhee Road, Cal-13
.	Periodicity of its Publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	Alok Chandra Chandra
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013
4.	Publisher's Name	...	Alok Chandra Chandra
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013
5.	Editor's Name	...	Anil Sen
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013
6.	Name & Address of the Owner	...	Cine Central, Calcutta, 2, Chowringhee Road, Cal-13

I, Alok Chandra Chandra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- ALOK CHANDRA CHANDRA
Signature of Publisher

Dated : 26-2-80

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 February 1980 Vol. 13 No. 5

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta
2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him a

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ '৮০

চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

সম্পাদক : অমিতাভ সেন

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

সিনেমা শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে

চিত্রবীক্ষণের এই সংখ্যা যখন বেরোচ্ছে তখন কলকাতা, শুধু কলকাতা কেন পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত সিনেমা হাউস বন্ধ। সিনেমা কর্মচারীরা বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগ্রামী পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন পরেই দাবী তুলছিলেন বন্ধ সিনেমাহলগুলি খুলতে হবে। এছাড়া মূল্যমান অনুযায়ী ডি, এ, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ইত্যাদির প্রসঙ্গও তাঁদের দাবী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে বোনাসের প্রশ্নটিও এখন দাবীর তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

এই দাবীগুলি নিয়ে সিনেমা কর্মচারীরা বেশ কিছুদিন আগে প্রতীক ধর্মঘটও করেছিলেন—তিনদিন ধর্মঘটের পরিকল্পনা নিয়েও তাঁরা এগোচ্ছিলেন আগস্ট মাসে। সরকারী হস্তক্ষেপে সে সময় সেই ধর্মঘটের আহ্বান শ্রমিক কর্মচারীরা ফিরিয়ে নেন। অথচ মালিকপক্ষ সম্পূর্ণ অনড় হয়ে বসে রইলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার কোনরকম উদ্যোগ দেখালেন না এবং সরকারের কাছে নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকেও পিছু হঠতে শুরু করলেন।

কাজেই শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলনা। সেই সংগ্রাম সেই আন্দোলনের পথেই শ্রমিক কর্মচারীরা এগিয়েছেন। আর মালিক পক্ষ বিরোধের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার জন্য লক-আউটের আশ্রয় নিয়েছেন। মালিক-পক্ষ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকটি হল বন্ধ রেখেছেন নানান অজুহাতে। ফলে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা এবং তাদের পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন ধরে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন, এছাড়া এই হলগুলি বন্ধ থাকার ফলে বেশ কিছু বাংলা ছবির রিলিজও আটকে রয়েছে, সরকারও প্রমোদকর পাচ্ছেন না। কাজেই বন্ধ হল খোলার দাবী শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থে, বাংলা ছবির মুক্তির প্রয়োজনেও বন্ধ হল খোলার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী।

মালিকপক্ষের একগুঁয়েমি, অর্থহীন আবদারকে উপেক্ষা করে সরকারকে দৃঢ় হাতে এগিয়ে আসতে হবে যাতে এই বন্ধ হলগুলি অবিলম্বে খোলা যায়। মালিকপক্ষের নপুংসক সংগঠন ই, আই, এম, পি, এ আলাপ-আলোচনায় কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতেই অপারগ কাজেই মীমাংসার আশু লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

শ্রমিক কর্মচারীদের এই ন্যায্য আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থনকে সংহত করার প্রয়োজন তাই আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা উপেক্ষিত অবহেলিত দাবী-দাওয়াগুলির আশু মীমাংসার প্রশ্নটিও আজ এই সংগ্রামের ফলে জনমানসের সামনে চলে এসেছে। মালিকপক্ষের খামখেয়ালি, একগুঁয়েমি বাংলা ছবির গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। পরিবেশক-প্রদর্শকদের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান একাধিপত্য বাংলা ছবির প্রযোজকদের ক্রমাগতই কোনঠাসা করে চলেছে। অথচ ই, আই, এম, পি-এর মধ্যে বিরোধের কণ্ঠস্বর কই ? সিনেমা কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে বাংলা ছবির প্রযোজকদের এগিয়ে আসতে অনীহা কেন ?

এই প্রথম সিনেমা হাউসের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগ্রামের সঙ্গে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীরাও এককাট্টা হয়ে লড়ছেন। এই সংগ্রাম মূলত পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে, কাজেই এই আন্দোলনের সমর্থনে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতিশীল অংশকে জমায়েত করতে হবে। বাংলা ছবির অসহায় প্রযোজকদের কালো টাকার আক্রমণের বিরুদ্ধে জড় করতে হবে এক, ব্যাপক ঐক্যের মঞ্চ তৈরী করতে হবে। আশার কথা একাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন সিনেমা হাউস ও পরিবেশন সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা। শিল্পী-কলাকুশলীদের সংগঠনসমূহ, চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে এসে সংগ্রামী দায়িত্ব পালন করতে হবে এই ঐতিহাসিক সময়ে।

আর রাজ্য সরকারকেও এই একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ থেকে চলচ্চিত্র শিল্প এবং এই শিল্পের সর্বস্তরে যে শ্রমিক-কর্মচারীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন তাদের রক্ষা করার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আসুন আমরাও সিনেমা শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি বন্ধ সিনেমা হল খুলতে হবে, নাহলে সরকারকে এই সব হল অধিগ্রহণ করতে হবে।

বোনাস, পে-স্কেল ইত্যাদি দাবীর সুমীমাংসা করতে হবে।

ওয়ার্কিং কণ্ডিশন সংক্রান্ত সরকারী সুপারিশকে আইনে পরিণত করতে হবে।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চারুলতা

'চারুলতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র, এবং তার কারণ যে সাহিত্য কর্মের ওপর ভিত্তি করে ছবিটি রচিত, সেই সাহিত্য-কর্মটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মূল গল্প 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, এবং বিশেষ করে এই গল্পের মধ্যে কবির নিজের জীবনের গভীরতম প্রণয় ইতিহাসের কিছু সত্যের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে, যে প্রণয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফসল কবির সারা জীবনের অজস্র গানে, কবিতায় পুষ্পিত যার আনন্দ বেদনার সৌগন্ধ শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে মননে অনুভূতিতে নানাভাবে সঞ্চরমান তাই 'নষ্টনীড়' আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান— অতি প্রিয় গল্প। অর্থাৎ কোন মতেই শুধুমাত্র 'গল্প' নয়, আরো অনেক কিছু। গল্পটি এমন এক রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং এমন একটি সামাজিক যুগে (১৯০১ সালে প্রথম প্রকাশ) এবং এমন একটি সামাজিক ভাবে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রচিত যে কবির পক্ষে তুলনাহীন পরিমিতি বোধ, রুচিশীল সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ছাড়া গল্পটি লেখা সম্ভব হ'ত না। ফলে গল্পটি কবির অন্যান্য অনেক গল্পের তুলনায় অনেক বেশী সংহত, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ধর্মী ও কাব্যিক; গল্পের একটি পরিচ্ছদ দূরে থাক একটি লাইনও বাড়তি নয় (যে ভুল সত্যজিৎ রায় স্বয়ং করেছেন, পরে যথাস্থানে আলোচিত)। এই সব কারণে 'নষ্টনীড়'-এর চলচ্চিত্রায়ন এক দুরূহ শিল্পকর্ম হতে বাধ্য। চলচ্চিত্র ভাষার ওপর অসাধারণ দক্ষতা, গভীর সাহিত্যবোধ, মানুষের মনস্তত্ব বিশেষত নারী মনস্তত্ব বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী না থাকলে এ ছবি ঠিক ভাবে রচনা করা সম্ভব নয়। এ ছবি সত্যজিৎ রায়ের কাছেও ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন তা আমাদের আলোচ্য।

বলা বাহুল্য মাত্র, যে গল্প আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রিয় মহান কবির ব্যক্তিজীবনের উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত যার মধ্যে এক ঐতিহাসিক সত্যের স্পন্দন, তার চলচ্চিত্রায়নের প্রথম কথা মূলানুগতা। অর্থাৎ গল্পটিকে শুধুমাত্র একটি 'স্প্রিং বোর্ড' মাত্র ভেবে কোন চলচ্চিত্রকার তাঁর নিজের মৌলিক সৃষ্টির খেয়াল চরিতার্থ করার মত কোন কাজ করবেন—তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম গ্রহণের কোন অধিকার তাঁর থাকবে না। শিল্পের কোন অসাধারণ মুন্সীয়ানাই তাঁকে সে অধিকার দেবেনা। সুখের বিষয় স্বয়ং সত্যজিৎ রায় নিজেই 'চারুলতা প্রসঙ্গে' নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন যে ছবিতে যে পরিবর্তন তিনি করেছেন তা "পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরী করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়। "(বিষয় ঃ চলচ্চিত্র," পৃষ্ঠা ৫৮)।

সুতরাং 'চারুলতা' প্রসঙ্গে যে কোন প্রশ্নের প্রথমটি হচ্ছে মূলানুগতা। এবং সুখের বিষয় এদেশে 'চারুলতা' প্রসঙ্গে যত তর্ক বিতর্ক হয়েছে তা এই মূলানুগতা নিয়েই। সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থের দীর্ঘতম নিবন্ধটিই এই মূলানুগতার স্বপক্ষে।

কিন্তু যেহেতু শিল্প প্রসঙ্গে যে কোন রকম যান্ত্রিকতাই পরিহার্য, এক্ষেত্রেও মূলানুগতার প্রশ্নটি এই ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে দেখা দরকার—

১। 'চারুলতা' 'নষ্টনীড়' গল্পের সারসত্তাটি রক্ষা করেছে কিনা —(যেমন 'পথের পাঁচালী' ছবি মূল উপন্যাসটির সারসত্তা রক্ষা করেছে)।

২। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রায়নের মাধ্যম পরিবর্তনের জন্য যে সব পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে সেগুলি কোন অনিবার্য নান্দনিক প্রয়োজনে সাধিত হয়েছে কি হয়নি। (যেমন 'পুনশ্চ' 'পথের পাঁচালী' ছবি)।

৩। মূল গল্পটির থীমের ভিন্নতাগুলি বা ভেরিয়েশনস্ কোন নূতন মাত্রা যোগ করেছে কিনা, যা মূলের সারসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই যার ওপর যুগোপযুগী নূতন আলোকপাত করেছে (যেমন কোজিনৎসভের 'ডন কুইকজোট' অথবা কুরোশোয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' বা 'ম্যাকবেথ')।

৪। মূল গল্পের সারসত্তার একটি অপরিণত দিক থেকে কিছু সরে এসে বা তাকে পরিবর্তিত করে এমন কিছু শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কিনা যাতে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র কর্মটি মূলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ (যেমন 'অপরাজিত' ছবি মূল উপন্যাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত)।

স্মর্তব্য, মূলানুগতার প্রশ্নে এখানেও ইভর মণ্টেগু লিখিত আইজেনস্টাইনের দিগনির্দেশক সূত্রের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

'চারুলতা' ছবির আলোচনায় সত্যজিৎ রায়ের নিজের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এ আলোচনায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হবে— সেগুলির উৎস তাঁর স্বরচিত নিবন্ধ 'চারুলতা প্রসঙ্গে' যা তিনি

লিখেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়, ১৩৭১ (বঙ্গাব্দ), এবং পরে তাঁর 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' নামক গ্রন্থে গ্রন্থবদ্ধ।[১] (বিষয় ঃ চলচ্চিত্র ; চারুলতা প্রসঙ্গে' পৃষ্ঠা—৪৩—৫৯)।

(ক) 'চারুলতা' ছবিতে মূল গল্পের সারসত্তা রক্ষিত হয়েছে কিনা।

সত্যজিৎ রায়ের দৃঢ় বক্তব্য—সারসত্তা রক্ষিত হয়েছে এবং যে পরিবর্তনগুলি মাধ্যমগত কারণে অপরিহার্য্য ছিল, শুধু সেই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। সেই কারণগুলির পিছনে, সত্যজিৎ রায়ের মতে সুদৃঢ় নান্দনিক ও চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমগত অকাট্য যুক্তি আছে। যথা—(১) গল্পে নির্বিশেষ দিন রাত্রির ছিন্ন ছিন্ন ঘটনার কথা অনায়াসে বলা চলে। কিন্তু চলচ্চিত্রে—সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, 'যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল—সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয় এবং একটা সময়ের সূত্র ধরে কাহিনীর সূত্র এগুতে থাকে"—সেখানে তা চলে না। (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা—৪৬) যুক্তিটি বলিষ্ঠ নয়, কেননা এ্যালান রেনে বা গোদারের অনেক ছবিতে সময়ের সূত্র ধরে ছবির কাহিনীর সূত্র এগিয়ে যায় নি। এটা বুঝেছিলেন বলেই সত্যজিৎ রায় তিনটি পৃষ্ঠার পরে তার পদ্ধতিকে 'চিরায়ত পদ্ধতি' বলে সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "মূল কাহিনীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা ও সংলাপের পরিবর্তে চিত্রনাট্যরচনার চিরায়ত পদ্ধতিতে গোটা গোটা দৃশ্য মারফৎ বিবৃত হবে" (পৃষ্ঠা ৪৯)। 'চিরায়ত পদ্ধতি' কথাটি লক্ষ্যণীয়। এখন অবশ্যই কথাটা ঠিক। এবং 'নষ্টনীড়' ধরণের গল্পের ক্ষেত্রে ছবির শৈলীটি চিরায়ত বা ক্লাসিক ধরণের হওয়া উচিত, সুতরাং যুক্তিটি গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় যুক্তিটি (২)—গল্পে যেখানে নির্বিশেষভাবে 'কোন ব্যক্তি' বা কোন আত্মীয়, ইত্যাদির উল্লেখ করা সম্ভব, ছবিতে তা নয়। "সিনেমায় এ ধরণের কোন অস্পষ্টতার কোন স্থান নেই" (পৃষ্ঠা ৪৫)। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য। এটিও সঠিক যুক্তি।

দুটি সাধারণ ধরণের যুক্তির পর সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় যুক্তিটি ঠিক যুক্তির আকারে দেননি, একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানের চেহারায় দিয়েছেন, এবং সেটি গল্পটির একটি বিশেষ জরুরি প্রশ্ন সংক্রান্ত। প্রশ্নটি হচ্ছে ; অমল কি ভূপতির বাড়ীতে আগে থেকেই থাকত, অথবা ভূপতি-গৃহে বধূরূপে চারুলতার আগমনের অনেক পরে অমলের আগমন ? রবীন্দ্রনাথ সঠিক জানান নি অমল ঠিক কখন থেকে ভূপতি-গৃহে আশ্রিত। কিন্তু গল্প পড়লেই বোঝা যায় অমল আগে থেকেই ভূপতির গৃহে থাকত। রবীন্দ্রনাথের অমল সংক্রান্ত প্রথম উক্তিটি এই রকম "ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িত।" এবং এটি আছে গল্পের একেবারে প্রথম দিকেই। তার আগের লাইন গুলিতেই অবশ্য আছে চারুলতার নিঃসঙ্গতার কথা—তার কোন 'কর্ম ছিল না' "ফল পরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া ওঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল"—একথাও আছে। এখন সত্যজিৎ রায় প্রশ্ন তুলেছেন—(ক) তাহলে কি চারুলতার এই নিঃসঙ্গতার পর্বে অমল ভূপতি-গৃহে ছিল না ? অথবা (খ) অমল তখনো ছিল, কিন্তু জনৈক নির্বিশেষ আশ্রিত আত্মীয়ের মত, অর্থাৎ চারুলতার কাছে অমল তখন একজন 'নির্বিশেষ' মানুষ, বাড়ীর একজন আশ্রিত আত্মীয় মাত্র। পরে অগোচরে সে 'বিশেষ' হয়ে ওঠে।

সত্যজিৎ রায় জানাচ্ছেন তাঁর মতে প্রথমটিই ঠিক, অর্থাৎ চারুলতার নিঃসঙ্গতার পর্বে অমল ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের যুক্তিটি হচ্ছে ঃ অমলের প্রথম উল্লেখের পরেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন চারুলতার ওপর অমলের কেমন 'স্নেহের দাবীর অন্ত ছিল না' চারুলতাকে অমলের 'কত রকম স্নেহের উপদ্রব সহ্য করিতে হইত' এবং এতে করে চারুলতার নিঃসঙ্গতা থাকত না, সুতরাং আগে অমল ছিল না। এই মনে হওয়াটা আমার মতে, যুক্তি-গ্রাহ্য নয় কেননা প্রথমতঃ (ক) অমল আগে থাকলেও তখন তার সঙ্গে চারুর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না হলে চারুর নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে—এক্ষেত্রে একটা কথা অনুমান করে নিতে হয় যে, অমল প্রথমেই চারুর কাছে 'বিশেষ' হয়ে ওঠে নি, হতে সময় লেগেছিল—এবং সেই সময়টুকুই চারু ছিল নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল বলেই পরে যখন অমল ঘনিষ্ঠ হ'ল, ঘনিষ্ঠতা হ'ল দ্রুত। এ রকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত ঃ (খ) যদি সত্যই চারুর নিঃসঙ্গতার পরে অমলের আবির্ভাব হত—তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় লিখতেন, যেমন মন্দার প্রসঙ্গে লিখেছেন। অমলের প্রথম উল্লেখের সময়, "ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িত" এই বাক্যটি থাকায় যেটা স্বাভাবিক অর্থ সেটি হচ্ছে, অমল ভূপতি-গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় কাল থেকেই

---

[১] 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থের উক্ত নিবন্ধটিতে জনৈক অশোক রুদ্রের নাম পাই যার প্রতি প্রচুর কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে, অথচ খুবই অসৌজন্যসূচক ভাবে তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উদ্ধৃত হয়নি। দুঃখের বিষয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বারো বছর আগের 'পরিচয়'-এর কোন এক সংখ্যায় উক্ত অশোক রুদ্র মশায় কী লিখেছিলেন যে সত্যজিৎ রায় তাঁকে 'রাম, শ্যাম, যদু' 'সিনেমার কিছু জানেন না' 'আসলে তার বাতিক লেখা' ইত্যাদি বলেছেন—তা জানার উপার নেই। অর্থাৎ আমরা দেখলাম না। সবটা দুর্ভাগ্যজনক।

গল্পের শুরু। এটা এত স্পষ্ট যে আমার মনে হয় না এ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ আছে। তাছাড়া অমলের উপস্থিতি যে আগে থেকেই ছিল, তার পিছনে আমার তৃতীয় (গ) যুক্তি হচ্ছে, গল্পটির পিছনের ঐতিহাসিক ঘটনা বা সত্য। আজ এটি সর্বজনবিদিত যে 'নষ্টনীড়'-এর নেপথ্যে কিশোর ও পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মেজবৌদিদি কাদম্বিনীর আত্মিক রোম্যান্টিক ও কাব্যিক সম্পর্কগত ঘটনার এক অনির্বচনীয় বেদনা বিধুর ছায়া প্রলম্বিত হয়ে আছে। এবং তার এক একটি মুহূর্তের উজ্জ্বল বেদনার ও আনন্দের চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়, গানে, 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র আত্মজীবনীমূলক রচনায়, চিঠি পত্রে ও ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের সঙ্গে কথোপকথনে (যা লিপিবদ্ধ) রয়ে গেছে। এগুলি থেকে (যেমন 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের অতুলনীয় 'শ্যামা' কবিতাটি এবং 'ছেলেবেলা'র নবম পরিচ্ছেদ) এটা জানা গেছে যে, কবি যখন কিশোর তখন নববধূরূপে কাদম্বিনী দেবী এলেন ঠাকুর বাড়ীতে, তখন তিনি 'নব কৈশোরের মেয়ে।' কিন্তু যেহেতু তিনি বাড়ীর বধূমাতা তাই সামাজিক সম্পর্কে গুরুজন—এবং শ্রদ্ধেয়। দূরত্ব ছিল অনেকখানি। প্রথম দিকে বালক ভেবে 'রবিকে' যে কাদম্বিনী দেবী 'বিশেষ' ভাবে দেখেন নি, বাড়ীর আর পাঁচটি 'বালকে'র মত দেখেছিলেন সে কথাও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি। "ও যে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।"('ছেলেবেলা' নবম পরিচ্ছেদ)। 'তার পর একদিন/চেনাশোনা হ'ল বাধাহীন' ('আকাশ প্রদীপ'—'শ্যামা')। সুতরাং মূল ঘটনাটা হ'ল এক আশ্চর্য নারীর নববধূরূপে গৃহে আগমন, যে গৃহে ছিল তার চেয়ে কিছু কম বয়সী ('কাছাকাছি বয়স') দেওর, সে ছিল হেলাফেলার মানুষ 'নিবিশেষ', ধীরে ধীরে বধূর জীবনের নিঃসঙ্গতার পটভূমিতে সেই নিবিশেষ মানুষটি তার সমরুচি, সমান আকৃতি ও একই ধরণের কল্পনাময় জগতের মধ্যে হয়ে ওঠে সেই শ্রদ্ধেয়া নারীর কাছে 'সবিশেষ'। এটাই হ'ল ঘটনা। সুতরাং এই ঘটনাটি হঠাৎ 'নষ্টনীড়' লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ একেবারে পাল্টে ফেলবেন এটা ভাবাও কষ্টকর।

ভূপতি-গৃহে অমলের উপস্থিতি যে আগেও ছিল, এই বক্তব্যের পিছনে আমার চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে: 'নষ্টনীড়' পড়লে বোঝা যায় এই গল্পের একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হচ্ছে কাহিনীর মধ্যে যা ঘটছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নাটক সৃষ্টি হচ্ছে যার পরিণতি এক অমোঘ ট্র্যাজেডিতে—তা চূড়ান্ত ভাবে স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিকতার অন্যতম কারণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত নাট্য উপাদানগুলির প্রত্যেকটি 'অন্তর্স্থায়িত', এর কোন একটিও 'বহিরাগত' নয়। যা গল্পের শুরু থেকে ছিল অর্থাৎ যে পরিস্থিতিটি তার মধ্যেই গোপনে লুকিয়েছিল ট্র্যাজেডির অমোঘ উপাদান। এক কাজপাগল অ-রোম্যান্টিক গৃহস্বামী যে তার সুন্দরী কল্পনাপ্রবণ স্ত্রীর সম্পর্কে ছিল অসচেতন (এবং সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম—যদিও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই সত্যিই কার অক্ষমতায় চারু ভূপতির সন্তান হয়নি, তবু যেন ভূপতির চারুর প্রতি প্রেমহীন মনোভাব ভূপতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে; তবে 'চারুলতা' ছবিতে এই নির্দেশ খুব সুস্পষ্ট, যখন সেই বিখ্যাত বাগানের দৃশ্যে দেখি দোলনা-দোলায়রত চারু তার বায়নাকুলারে চোখ রেখে একবার তরুণ অমলকে দেখছে ও পরে বাগানের অন্যত্র একটি শিশুকে দেখছে—এবং তখন তার মুখচ্ছবিতে সন্তান-আকাংখা, এর থেকে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে, চারুর সন্তানহীনতার কারণ ভূপতির অক্ষমতা।) এবং এক সুন্দরী আশ্চর্য কল্পনাশক্তি-সম্পন্না ব্যক্তিত্বময়ী গুণবতী নারী, শরীরে মনে যে পূর্ণ নারীত্বের আকাংখায় স্পন্দিত, এবং এক আশ্চর্য তরুণ, একদিকে মানসিক গঠনে যে উক্ত নারীর (যে সম্পর্কে বৌদিদি অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় গুরুজন,) সমমনোভাবাপন্ন, কিন্তু অন্য দিকে সেই নারীর স্বামীর (যে সম্পর্কে দাদা) প্রতি কর্তব্য-বোধে অচঞ্চল—এই পরিস্থিতি 'নষ্টনীড়' গল্পে প্রথম থেকেই ছিল—এর মধ্যেই রয়ে গেছে ট্র্যাজেডির উপাদান—গল্পটি আর কিছু নয়, সেই যা ছিল তারই ক্রমিক বিকাশ। এমনকি বাকি যে দুটি চরিত্র নাট্যগতিতে 'ক্যাটালেটিক' এজেন্ট রূপে কাজ করেছে তার মধ্যে প্রধান চরিত্রটি, উমাপতি, সেও গল্পের শুরু থেকেই আছে। শুধু মাত্র মন্দাই পরে এসেছে, এবং মূল গল্পে তার বিদায়ও অনেক আগে। মন্দাই সবচেয়ে অপ্রধান চরিত্র।

সুতরাং 'নষ্টনীড়' গল্পের অনিঃশেষ সৌন্দর্যের একটি প্রধান কারণই হচ্ছে, যা গল্পের প্রাথমিক পরিস্থিতির মধ্যেই লুকানো ছিল আপাত শান্তি ও সুখের শ্যামচ্ছায়ায়, তারই ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘনায়িত মেঘমণ্ডল সৃষ্টি করল, এবং কিভাবে সেই মেঘ-নিঃসৃত বজ্র নীড়টিকে করে দিল দগ্ধ বা 'নষ্ট'—তারই অপরূপ বর্ণনা। এর বিকল্প হিসেবে যদি দেখান হয় এক অমনোযোগী গৃহস্বামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভালোবাসা না পেয়ে তার সুন্দরী স্ত্রী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, এবং সেই অবস্থায় এক আসন্ন ঝড়ের ইংগিত নিয়ে গৃহে আবির্ভূত হল পরিবারের এর দূর সম্পর্কের তরুণ দেওর ইত্যাদি—তাহলে তা কি 'নষ্টনীড়'-এর মূলগত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে? মূল গল্পেও এমন কিছুর ইংগিত নেই, গল্পের নেপথ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনা আছে তাতেও এমন হওয়াটা অসঙ্গত। এবং আমার পঞ্চম যুক্তি (ঙ) আমাদের সমাজে দেওর-ভাজ সম্পর্ক যে-সব ক্ষেত্রে রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে (তার প্রেক্ষাপটে থাকে হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অনাদর অবহেলা, নয় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বয়সের অনেক পার্থক্য, নয় স্ত্রীর মানসিক গঠন ও মূল্যবোধের

জন্য দেওরের সঙ্গে মানসিক ভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি), অর্থাৎ যেখানে এই সম্পর্ক বিশেষ করে শরীর অবলম্বিত বা যৌন বিষয়ক নয় (নেপথ্যে শরীরের বৃত্তিগত ক্রিয়া অবশ্যই সর্বদা থাকবে, কিন্তু সেটাই মূল নিয়ন্ত্রক নয়)—যে সব ক্ষেত্রে যে দেওর গৃহে আগে থেকেই আছে এবং প্রথমে যাকে ছোট ভাই বা স্নেহের বন্ধুর মত মনে হয়েছে, কিভাবে সেই স্নেহের রঙ পাল্টে যায় প্রীতিতে ও পরে প্রেমে—সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ঘটনা। এখানেও হঠাৎ বাহির থেকে একদিন এক দেওর এল 'ঝড়ের ইংগিত সঙ্গে করে', এবং সেই দিন থেকে ট্রাজেডির জাল বোনা শুরু হ'ল—এটা বে-মানান।

বস্তুতঃ 'চারুলতা' ছবিতে এক 'ঝড়ো হাওয়াকে' সঙ্গে করে অমলের প্রথম আবির্ভাবের দৃশ্যটি মূল গল্পের দিক থেকে রীতিমত প্রক্ষিপ্ত ও গল্পের মূল সুরের পরিপন্থী। এটি সেই 'বহিরাগত একজন এসে সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করল'—ধরণের হয়ে গেছে। একটি পরিস্থিতির ক্রমিক বিকাশ নয়। লক্ষ্যণীয়, ওই দৃশ্যের ঝড়ো হাওয়ার প্রতীকী ব্যবহার পশ্চিমী সমালোচক দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, এদেশেও তার প্রতিধ্বনি মুখরিত। ব্যঞ্জনাটি হচ্ছে, চারুলতার জীবনে যে আত্মিক ঝড় উঠবে এ তারই পূর্বাভাস। ছবিতে যে মিশাঁসেন-এ এই ঝড়ো হাওয়ার দৃশ্যটি এবং 'হরে মুরারে' বলতে বলতে অমলের প্রবেশ ও চারুর উপস্থিতি উপস্থাপিত—তাতে একটা প্রচণ্ড ত্রুটি রয়ে গেছে—সেটা কেউ উল্লেখ করেন না এটা খুবই আশ্চর্যের! এখানে মনে হয়, চারুর জীবনে যে আত্মিক ঝড় উঠবে তার বীজ নিয়ে এল অমল, এবং শুধুমাত্র অমল। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনাটা হচ্ছে, এই ঝড় সৃষ্টিতে ভূপতির অগৌণ ভূমিকা আছে। ঝড়ের জন্য প্রয়োজন একটি নিম্ন চাপের প্রশস্ত অঞ্চল (আবহাওয়া বিজ্ঞান যা বলে), চারুলতার মনের বায়ুমণ্ডলে সেই নিঃসঙ্গতার নিম্নচাপ সৃষ্টি করে রেখেছে ভূপতি—নববধূর প্রতি অমনোযোগ ইত্যাদির দ্বারা। চারুলতার মনের নিম্নচাপের প্রশস্ত অঞ্চলটি এইভাবে ভূপতি অজ্ঞানতঃ সৃষ্টি না করে রাখলে, পরবর্তী কালে অমলের কাব্যিক ব্যক্তিত্বের ঘর্ষণে যে-বিদ্যুৎ-দীপ্ত ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল—তা হতে পারত না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুতরাং আলোচ্য দৃশ্যের ঝড়ো হাওয়াকে যদি পরবর্তীকালে চারুর জীবনের ঝড়ের পূর্বাভাস বা প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে সেই দৃশ্যে তির্যকভাবে কোথাও ভূপতির উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু দর্শকরা জানেন তা দৃশ্যে ছিল না।

(খ) পরিবর্তনগুলি নান্দনিক প্রয়োজনের ফল কিনা :

মূল গল্প থেকে ছবির কিছু পরিবর্তনের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে সত্যজিৎ রায়ের চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে তাঁর এই উক্তিটি "মূল গল্প 'নষ্ট নীড়'-এর নানান দুর্বলতা।" অর্থাৎ মূল গল্পের দুর্বলতাকে পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি নাকি সবল করেছেন ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের মতে এই দুর্বলতার প্রথম চিহ্ন আছে উমাপতির (বা উমাপদর) চরিত্রায়ণে। (মূল গল্পে চরিত্রটির নাম 'উমাপতি'—রবীন্দ্র রচনাবলী, প. বঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৩—৪৭৪। শুধু ৪৫৫ পৃষ্ঠার একটি জায়গায় 'উমাপদ' কথাটি আছে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ। কিন্তু সত্যজিৎ রায় ছবিতে এবং আলোচনায় সর্বত্র তাকে 'উমাপদ' বলে উল্লেখ করে গেছেন।) সত্যজিৎ রায় লিখেছেন যে মূল গল্পে উমাপতি (বা উমাপদ) বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা পড়েছে, সেটা এমন ভাবে করেছে যেন সে জানত সে ধরা পড়বে, "সে যেন তার জন্য প্রস্তুত ছিল। এতে তাকে মূর্খ বা নির্বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। অথচ সে যে শঠতার সঙ্গে তলায় তলায় কাজ গুছিয়ে নিয়েছে তাতে তাকে বোকা বলে মনে হয় না।" সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "মূল কাহিনীতে এই সমন্বয়ের (অর্থাৎ শঠতার সংগে নির্বুদ্ধিতার সমন্বয়ে) এই বিশেষ পর্যায়ে ভূপতি উমাপদকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্য রচনা করেছেন সেটা সজীব হতে পারেনি, উমাপদও একটি মেরুদণ্ডহীন মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।" (বিষয় : চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৪)।

সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য পড়লে বোঝা যায়, উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতা গল্পের নাট্যসংস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, কেননা "এই বিশেষ ঘটনাটি আশ্রয় করে এ কাহিনীকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" এবং তাঁর মতে, "এই ঘটনাটি আকস্মিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য—কারণ উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার কোন পূর্বাভাস গল্পের কোন ঘটনায় বা সংলাপে রবীন্দ্রনাথ দেননি।" (উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৪)।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির উমাপদ কেন 'নষ্টনীড়'-এর উমাপতির থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে তার পিছনে সত্যজিৎ রায়ের যুক্তি ওপরের কথাগুলি থেকে বোঝা গেল। এর পর এর ন্যায্যতা সম্পর্কে বিচার করা যাক।

প্রথমেই বলা যাক, উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু মূল গল্পে ও ছবিতে এই বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাত দুভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এটিকে কাজে লাগিয়েছেন, সত্যজিৎ রায় সেভাবে লাগান নি, অন্যভাবে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাজটি অনেক সঠিক ও সূক্ষ্ম। অভিঘাতটি যতটুকু দুটি ক্ষেত্রেই এক সেটুকু হচ্ছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে পর্যুদস্ত ও প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ফলে কাতর ভূপতি সান্ত্বনা লাভার্থে গৃহাভ্যন্তরে স্ত্রীর দিকে চায়, এবং তারই ফলে জানতে পারে ইতিমধ্যে তাঁর 'স্বর্ণলতা'ই (সম্বাদ) অপহৃত হয়নি, তার চারুলতাকেও সে প্রায় হারিয়ে বসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাছাড়াও দেখিয়েছেন, এই আঘাতে পর্যুদস্ত কাতর ভূপতির করুণ মুখচ্ছবির সামনে

দাঁড়িয়েই অমল যখন দেখতে পেল স্ত্রী হিসেবে চারুলতায় সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে অমলের প্রতি বেশি মনোযোগী তখনই অমল বুঝতে পারল চারুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোন বিপদ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই গভীর মুহূর্তটির অনবদ্য বর্ণনায় লিখেছেন, "অমল একবার তীব্র দৃষ্টিতে চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল, কি ভাবিল জানিনা। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় মেঘের কুয়াশা কাটিবা মাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্রহস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল" (রবীন্দ্র রচনাবলী, সরকারী শতবার্ষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, 'নষ্টনীড়' দশম পরিচ্ছেদ: পৃষ্ঠা ৪৫৮)। এর কিছু পরে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন, "অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল।" ভূপতি যে একলা কারুর কাছ থেকে সাহায্য ও সান্ত্বনা না পেয়ে একলাই আপন দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে লড়ছে, সে কথাও অমল ভাবল। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ সেই সাংঘাতিক কথাটি লিখেছেন, "তারপর সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল।" (উক্ত রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৪৬২)।

সুতরাং মূল গল্পে ট্রাজিক সত্য দর্শনের দিক থেকে ভূপতি ও অমলের ওপর এই উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'চারুলতা' ছবিতে এটা কি ততটা গুরুত্বপূর্ণ? ভূপতির দিক থেকে ছবিতে যা ঘটেছে তা অবশ্যই মূলানুগ। কিন্তু অমলের দিক থেকে? অমলের ট্রাজিক সত্য দর্শন, অর্থাৎ তার সঙ্গে চারুর সম্পর্ক কি স্তরে পৌঁছে গেছে, সে যে 'সহস্র-হস্ত গভীর গহ্বরে পা বাড়াইতে যাইতেছে'—এই অনুভূতিটি ছবিতে কখন প্রথম ঘটেছে স্মরণ করুন। এটি ঘটেছে অনেক আগে সেই প্রচণ্ড নাটকীয় দৃশ্যে, যেখানে চারুর প্রথম লেখা প্রকাশিত হবার পর সেই লেখা অমলের বুকে ছুঁড়ে ফেলে, স্বামীর জন্য তৈরি চটি জুতো অমলকে দিয়ে, মন্দার হাত থেকে পানের পাত্র ছিনিয়ে নিজে হাতে পান সেজে অমলকে দিয়ে প্রচণ্ড আবেগে অমলের বুকের ওপর পড়ে ও অমলের জামা আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে (জামাটি ছিঁড়ে যায় সেই প্রবল আবেগে)। পরে চারু সংবৃত হয়ে চলে গেলে, আমরা দেখি অমল স্তব্ধ, বিস্ময়াভিভূত, পাথরের মূর্তির মত বাইরে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সত্যজিৎ রায় স্বয়ং এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "মূলে অমলের উপলব্ধি—'গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'—এ দৃশ্য তারই চিত্র সংস্করণ।" (বিষয়: চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৪)। সুতরাং ট্রাজিক সত্য দর্শনের জন্য উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করতে অন্ততঃ ছবির অমলকে হয়নি। গল্পে যে ভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে করতে অমল এই সত্য দর্শনের উপলব্ধিতে পৌঁছেছে—তা ছবিতে করা কঠিন ছিল অবশ্যই, কিন্তু ছবিতে সেভাবে দেখালে তা যে 'Clairvoyance' বলে মনে হ'ত বলে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন (বিষয়: চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৫)—তা সত্য বলে মনে করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। মূল গল্পে অমলের এই উপলব্ধি এসেছে কোন Clairvoyance বা পরাদৃষ্টির ফলে নয়, অত্যন্ত বাস্তবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ কয়েকটি ঘটনার বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণ বস্তুটা 'পরাদৃষ্টি'র ফল বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই।

যাই হোক, এ থেকে বোঝা গেল উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাতের কার্যকারিতা ছবিতে কিছুটা লঘু হয়ে গেছে (যেহেতু অমল অন্যভাবে ট্রাজিক অনুভূতিতে পৌঁছেছে)। এবার চারুলতার দিক থেকে এর অভিঘাত মূল গল্পে এবং ছবিতে কি ভাবে পৃথক হয়ে গেছে লক্ষ্যণীয়। গল্পে যা আছে তা হচ্ছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটান হয়েছে যে চারুলতা বহুদিন তা জানতে পারেনি। অর্থাৎ যদিও তখন তার স্বামীর বিপর্যয় ঘটে গেছে, অথচ তা জানতে না পারায় চারুর অমল-মুখী মনের গতি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে, এবং এই দুটির বৈপরীত্যই অমলকে ট্রাজিক সত্য দর্শনে সাহায্য করে। (এই ভাবে ব্যাপারটা ঘটান খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, সে কথা পরে আলোচিত হবে)। কিন্তু ছবিতে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা এমন ভাবে ঘটান হ'ল যে, চারুলতা তৎক্ষণাৎ ঘটনাটা জানতে পারল এবং তবুও সেই বিষণ্ণ হতাশাগ্রস্ত রাত্রিতে স্বামীর জন্য দুর্ভাবনার চেয়েও সে অনেক বেশি করে ভাবল গৃহস্বামীর আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে আশ্রিত অমল যদি বাড়ী ছাড়া হয়—অমলকে হারাবার আশংকায় অর্থাৎ অমলের আসন্ন বিরহে কাতর চারু তখনি অমলের হাত চেপে ধরে ঠিক প্রেমিকার মতই বলে ওঠে "যাই ঘটুক না কেন, কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না।" (ছবিতে)

অর্থাৎ মূল গল্পে যেখানে উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, চারুলতার প্রেমের অসচেতন প্রকাশ, যা উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার পটভূমিকায় প্রথম উদ্ঘাটিত হল অমলের চেতনায়—সেখানে ছবিতে চারুলতার প্রেমের প্রকাশ আরো অনেক আগে (অমলের জামা আঁকড়ে ধরে চারুর কান্নার দৃশ্যে)—এবং পরে (ছবিতে) উমাপতির ঘটনার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বামীর সর্বনাশের খবর পেয়েও, ইতিমধ্যে যে বৌদি প্রেমিকা রূপে প্রকাশিতা, তার প্রেমের পাত্র অমলকে হারানোর আশংকার পূর্ণ প্রেমিকাসুলভ কাতর আচরণ। যার উত্তরে অমলকে কিছুটা রূঢ় ভাবে বলতে হয় "ছাড় বৌঠান, দেখি দাদার কি হ'ল?" প্রশ্ন, এটি কি মূল গল্পের সূক্ষ্ম রসের বিকৃতি নয়?

মূল গল্পে অমলের কাছে প্রেমের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের' অভিজ্ঞতা উদ্ঘাটিত হয়েছে অনেক পরে, এবং তার পরই দাদার প্রতি কর্তব্য বশতঃ আর সে সেই সংসারে থাকেনি, কিছুটা রূঢ় ভাবে চারুর কাছ থেকে সরে গেছে চিরতরে। কিন্তু ছবিতে যে

অমলকে দেখি সে অমল সেই প্রেমের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের' অভিজ্ঞতার পরও অনেক দিন সেই সংসারে থাকে, চারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, তাকে সঙ্গ দেয় (বিলেতের প্রসঙ্গে আলোচনার দৃশ্যটি ও 'ব'-অনুপ্রাসের খেলার দৃশ্যটি স্মরণ করুন) এবং সঙ্গ দিয়েছে সেই সময় পর্যন্ত যখন স্বামীর সর্বনাশের খবর পেয়েও স্বামীর জন্য না ভেবে চারু প্রায় একেবারে খোলাখুলি প্রেমিকার মত আচরণ করেছে। কেবল তখনি অমল দাদার প্রতি কর্তব্য বশতঃ গৃহত্যাগ করেছে। এতে কি ছবির অমল মূল গল্পের অমলের থেকে গুণগত ভাবে ভিন্ন হয়ে যায় নি? যে অমল ঐতিহাসিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজের তারুণ্যের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি! সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা প্রসঙ্গে' অলোচনায় একবার (১) অমলের জামা আঁকড়ে ধরে চারুর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্যে লিখছেন মূল গল্পের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের দিকে পা বাড়াইয়া দিতেছিল'—এই উপলব্ধির কথা। পুনশ্চ অনেক পরে ভূপতির সর্বনাশের রাত্রির দৃশ্যে চারুর অমলের হাত ধরে 'কথা দাও যাবে না' বলার সময়ও আবার বলেছেন চারুর প্রেমিকাসুলভ মনোভাবের কথা—আমাদের প্রশ্ন এর মধ্যবর্তী সময় কালটির মধ্যে তা হলে কী দেখান হয়েছে? আগেই প্রেম উদ্ঘাটিত, অমলের কাছে চারুর মনোভাবের রূপটি আগেই পরিষ্কার—অনেক পরে এবার দাদার সর্বনাশের পটভূমিকায় চারুর প্রেমিকা রূপটি আরো ব্যগ্র—এর মধ্যবর্তী অংশটি কি তাহলে প্রেমের বিস্তার পর্ব? অমলের চোখে প্রেমের উদ্ঘাটন শেষাশেষি (তুলনামূলক ভাবে) তাকে এতটা আগেই উদ্ঘাটিত করে সত্যজিৎ বাবু ছবিতে যা এনেছেন তা কি মূলানুগ? অবশ্যই নয়। এতে অমল চরিত্রটি পাল্টে যায়, চারুলতা তো অবশ্যই পাল্টে গেছে। এটি ফ্রয়েড সায়েবের মনোমত ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু গল্পটির মূলগত সত্য এত মোটা দাগের ফর্মুলা ধর্মী নয়, কিছুতেই নয়। এবং যেহেতু এই গল্পের পিছনে এক মহান কবির ব্যক্তি জীবনের কথা আছে—তাই এই চ্যুতি আমার মত অনেকের কাছেই অসহনীয়।

'নষ্টনীড়' গল্পটির আসল সৌন্দর্যটি হচ্ছে (১) চারুলতার মনে প্রেমের অসচেতন বিস্তার। চারুলতা যে সত্যই অমলের ভালোবাসায় পড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে তা সে অমল থাকার সময় নিজেও ততটা বুঝতে পারে নি, (২) পারলো যখন অমল আর কাছে নেই, প্রেমের সেই ভয়ংকর রূপটি ধরা দিল প্রচণ্ড বিরহ জ্বালার মধ্যে, এবং এই জন্যই চারুর বিরহ পর্ব মূল গল্পে এতটা দীর্ঘ, যার প্রত্যেকটি লাইন অব্যর্থ, প্রত্যেকটি শব্দ অপরিহার্য (শেষের ছয়টি পরিচ্ছেদ)। প্রেমের সেই 'অসচেতন' বিস্তারকে সংক্ষিপ্ততর করে, অমলের উপস্থিতিকালীন চারুর প্রেমকে সচেতন করে তুলে, মূল গল্পের সত্যটিকে পাল্টে ফেলা হয়েছে ছবিতে।

এটি হয়েছে যে ঘটনাটির বিশেষ উপস্থাপনার গুণে (ছবিতে), সেটি হচ্ছে উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার মেলোড্রামাটিক উপস্থাপন। উমাপতি একেবারে সিন্দুক ভাঙার মত রোমহর্ষক কাণ্ড করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে এমন একটি সোরগোল করল, যে ছবিতে চারুর অমলমুখী মনোভাবের ঘুমঘোর গেল কেটে এবং তখন আসন্ন সর্বনাশের ছায়ায় অসচেতন প্রেমিকা নয়, সচেতন প্রেমিকার মতই অমলের হাত চেপে ধরে বলল "কথা দাও, যাবে না" ইত্যাদি। মূল গল্পে উমাপতির চুরি নিঃশব্দ কোলাহলহীন—সে সময়ে অনেক অবস্থাপন্ন সম্পন্ন গৃহে গৃহস্বামীর উদারতার সুযোগে তার দুষ্ট আত্মীয় স্বজনেরা ঠিক যেভাবে চুরি করত এবং ধরা পড়ার পর শুধু গলার জোরে পার পেত, কেননা জানত তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উদার গৃহস্বামী আর কিছু করবে না—ঠিক উমাপতির চুরি সমাধা হয়েছে এমন ভাবে যে তার চুরির ইতিবৃত্ত বহুদিন ছিল শুধু ভূপতির গোচরে, ভূপতি তা চারুকেও বলে নি। ফলে সেই অজ্ঞানতার পরিপ্রেক্ষিতে চারুর অচেতন প্রেমের প্রকাশ আরো বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—অনেক বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে যা গল্পটির সম্পদ। ছবিতে তা অনুপস্থিত।

গল্পে উমাপতি 'মেরুদণ্ডহীন মাংস পিণ্ড' হয়ে গেছে বলে সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগের উত্তরে বলতে হয়, এই অদ্ভুত মন্তব্যের যে কারণ তিনি দেখিয়েছেন তাঁর নিবন্ধে ('চারুলতা প্রসঙ্গে') সেটি হচ্ছে 'শঠতার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতার সমন্বয়'—এই বক্তব্যটিই ভ্রান্ত। গল্পের উমাপতি কখনোই নির্বোধ নয়, তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে সে ভূপতির মনস্তত্ত্বটি ঠিক বুঝেছিল এবং জানত চুরি ধরা পড়বে, ভূপতি তিরস্কার করবে এবং সে চড়া গলায় 'সব শোধ দেব' বলে পার পাবে, ভূপতি আহত হবে কিন্তু বড় কুটুম্বটিকে আর কিছুই করবে না। যেখানে এত সহজেই চুরি করে পার পাবার পথ আছে, সেখানে সিন্দুক ভাঙার মত রোমহর্ষক কাণ্ড ও বৌকে নিয়ে রাতারাতি পলায়নের মত হঠকারিতা কোন মূর্খ করতে যায়? বরং ছবির উমাপদই তো বেশি নির্বুদ্ধি বলে মনে হয়। আমার ধারণা উমাপতির বুদ্ধির আসল দিকটিই সত্যজিৎ রায় লক্ষ্য করেন নি, সেটি হচ্ছে অন্যের অর্থাৎ আশ্রয়দাতা—আত্মীয় ভূপতির মনস্তত্ত্বটি বুঝবার ক্ষমতা, যাতে গল্পের উমাপতি ষোল আনা সফল। সুতরাং শঠতার সঙ্গে 'নির্বুদ্ধিতা'র নয় বরং 'বুদ্ধি'র সমন্বয়ই সাধিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ উমাপতির চরিত্রায়ণে, যে জন্য উমাপতি বাস্তবসম্মত হয়েছে, সেকালের এই ধরনের বিশ্বাসহন্তা আত্মীয়দের 'টাইপ' চরিত্র হয়েছে। এবং নষ্টনীড় গল্পের নাট্য ক্রিয়ার স্বাভাবিকতার ধারায় কোন মেলোড্রামার চড়া সুর এনে সুরচ্যুতি ঘটাতে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে। সত্যজিৎ রায় উমাপদকে করেছেন হঠকারী, ছবিতে অ-শৈল্পিক ভাবে এনেছেন মেলোড্রামা,

ঘটিয়েছেন সুরদ্যুতি। এবং তার পরেও অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের উমাপতি 'মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ড'। আশ্চর্য এবং অত্যন্ত অবিবেচকের মত উক্তি।

মূল গল্প থেকে ছবির পরিবর্তনের মূলে সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে যে যুক্তিটি প্রতিবাদযোগ্য সেটি হচ্ছে তাঁর মতে মূল গল্পের "নানান দুর্বলতা"—বলেছেন "এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে ·········যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভাবে লেখক ভূপতির উপলব্ধির মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছেন, বিশ্লেষণকালে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায়।" এই দুর্বলতাগুলি সত্যজিৎ রায় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। পাঠক 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থে 'চারুলতা প্রসঙ্গে' নিবন্ধের পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে ৫৯ পড়ে দেখতে পারেন। ভূপতির আর্থিক বিপর্যয়ের পর চারুর প্রতি মনোনিবেশ করার কালে চারুর হৃদয়ে স্থান পাবার চেষ্টাকে Poignant বলেছেন, কিন্তু সেটার প্রয়োজন যে গল্পে নেই তা প্রমাণিত করতে পারেননি, এ ব্যাপারে নীরব রয়ে গেছেন। সত্যজিৎ রায়ের মতে মূল গল্পের আর একটি ত্রুটি অমলের চিঠি ও তজ্জনিত চারুর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি। চারু কর্তৃক লুকিয়ে অমলকে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যাপারটা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য ঃ "অমল যে চিঠি লেখেনি তা নয়, তিনটি চিঠি লিখেছে এবং তাতে চারুকে প্রণাম পাঠিয়েছে—একবার নয়, তিন বার।" এবং চারু জেনেছে দু হপ্তার আগের চিঠিতে যে অমল ভাল আছে ও পড়াশুনায় ব্যস্ত। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "তা যদি হয় তাহলে চারু অমলকে প্রি-পেড্ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা করছে? অমলের ব্যস্ততার কারণ সে জানে। অমলের কুশল সংবাদ ভূপতিকে লেখা অমলের চিঠিতে পেয়েছে। প্রি-পেড টেলিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছুর ইঙ্গিতের আশা করে যে তার প্রতি অমলের আকর্ষণ অটুট রয়েছে? দাদার অনুরোধে বিয়ে করে এবং বিলেতে গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছে।" এই হচ্ছে সত্যজিতের বিস্ময়।

আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের এই বিস্ময়টিই বিস্ময়কর। প্রশ্ন, তিনি একজন সংবেদনশীল বড় মাপের শিল্পী হয়েও কি বুঝতে পারেননি যে চারুর সে সময়ের মনস্তত্ব কি ভাবে কাজ করছিল, চারুর মত বিচ্ছেদাতুর নারীর হৃদয় কি চায়? সত্যজিৎ রায়ের ভ্রান্তির একটি কারণ সহজবোধ্য, কিন্তু বাকিটা খুবই দুর্বোধ্য। সহজবোধ্য যে, সত্যজিৎ রায় বুঝে নিয়েছেন অমল থাকাকালীনই চারু ও অমল দুজনেই দুজনের প্রেমিক সত্তা উদ্ঘাটিত করে ফেলেছে, চারুরটা প্রকাশ্য, অমলেরটা প্রকাশ্য নয়, কিন্তু তবুও চারু দেখিয়ে ফেলেছে তার মনোভাব ও অমল যে তা বুঝেছে সেটাও চারু বুঝেছে। এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা—এবং ছবিতে এটা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটাই মূল গল্পে নেই, মূল গল্পে অমল থাকাকালীন চারু কখনোই বুঝতে পারেনি যে অমল চারুর স্নেহ প্রীতির আড়ালে তার প্রেমকে দেখে ফেলেছে, এমনকি তখন চারু নিজেও তার প্রেমের উপলব্ধি কতটা করতে পেরেছে—সেটাও অনুমানের। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে অমলের চলে যাওয়া ও পরে চারুকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি না দেওয়ার (স্মরণ রাখবেন অমল তিনটি বা দশটি চিঠি যাই দিক না, তার একটিও ব্যক্তিগত ভাবে চারুকে দেয়নি) এই পার্থক্যটি কেন যে সত্যজিৎবাবু বুঝতে পারলেন না, সেটাই বিস্ময়ের)। অর্থ একরকম। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (গল্পে যা আছে) তাতে এর অর্থ অন্য রকম। প্রথম ক্ষেত্রে, অমলের চিঠি না দেওয়ার অর্থ স্পষ্টই বোঝানো যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানতে চায় এবং চারুর সেটা না বোঝার কথা নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও অমলের মনোভাব বস্তুতঃ তাই, কিন্তু এক্ষেত্রে চারুর পক্ষে সেটা বোঝা একটু কষ্টকর, কেননা সে তো তখনো জানে না অমল সত্যিই চারুর প্রেমকে বুঝে ফেলে তবেই সরে যাচ্ছে। মূল গল্পে তখন পর্যন্ত চারু নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু ছবিতে সে তখন তার নিজের কাছে এবং অমলের চোখে পূর্ণ প্রেমিকা। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই মূল গল্পের যথেষ্ট বিকৃতি।

তাহলেও সত্যজিৎ রায়ের বিস্ময় বিস্ময়কর। কেননা প্রথমতঃ, তিনটি চিঠির ব্যাপারটি চারুকে ক্ষান্ত করবে এটা সত্যজিৎ রায় কি করে ভাবলেন। চিঠিগুলি তো একটাও চারুকে লেখা নয়, ভূপতিকে লেখা তিনটি চিঠিতে, বৌদিকে 'প্রণাম দেবার' মত একটা সামাজিক সৌজন্যমূলক মাত্র। এটাই তো নারীর পক্ষে অপমানজনক। বিরহাতুর নারী সব সহ্য করতে পারে কিন্তু উপেক্ষাকে নয়। অমলের চিঠিতে সেই চরম উপেক্ষা ও অবহেলা প্রকট। এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই 'উপেক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথচ সত্যজিৎ সেটা লক্ষ্য করলেন না চারুর চরিত্রটি কি? চারু, প্রথমতঃ, নিজের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, দ্বিতীয়ত অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদী রমণী—যখন অমলের সাহিত্যিক খ্যাতিই তার কাছে শত্রুরূপে দেখা দিল, চারু নিজে পাল্লা দিয়ে সেই খ্যাতিকে নিজের সাহিত্য খ্যাতির কাছে হার মানিয়েছে, যখন মন্দাকে শত্রু ভেবেছে তাকে নির্দয়ের মত বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য স্বামীর কাছে অভিযোগ করে সরিয়েছে। সুতরাং অমল চলে গিয়ে বিবাহিত হয়ে তাকে 'উপেক্ষা' করছে এটা সে কি করে চুপ করে মেনে নেবে, যখন ভূপতিকে লেখা চিঠিগুলি এক অর্থে তার প্রতি চরম ঔদাসীন্যসূচক। যে নারী খুব নিরাসক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা চালিত (সে রকম নারী কজন আছেন?) তাঁর ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু চারু এমন মেয়ে যার বুদ্ধির সঙ্গে আছে প্রবল আবেগ প্রচণ্ড হৃদয়ানুভূতি। এই রকম

প্রেমের অবস্থায় কোন মানুষ সম্পূর্ণ যুক্তি দ্বারা চালিত হয়, বিশেষতঃ কোন নারী? চারু তখন একটা প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের মধ্যে চলেছে, একটা ভয়ানক অনুভূতির ঘোরে আছে—যার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংযত লেখনীর সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন। এর পরেও 'কেন চারু প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠাল'—এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, অমল চলে যাবার পর তার বিচ্ছেদটাও চারু অনেকটা মানিয়ে এনেছিল—মূল গল্প—১৫ শ এবং ১৬ শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৭ শ পরিচ্ছেদে দেখা গেল—অমলের চিঠি এল কিন্তু ভূপতিকে লেখা, চারুকে একটিও নয়, ভূপতির চিঠিতে চারুর জন্য একটা সামাজিক 'প্রণাম' ছাড়া কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "প্রণাম জ্ঞাপন ছাড়া কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাস মাত্র নাই। চারু এই কয়দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিল, অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল।" 'উপেক্ষা' কথাটি লক্ষ্যণীয়। তখন নারীর অবস্থা কি রকম? রবীন্দ্রনাথই লিখছেন, "তাহার অন্তরের হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল।.... তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া গেল।" এই কথাগুলি কি সত্যজিৎ রায় লক্ষ্য করেন নি? ভূপতিকে লেখা চিঠিগুলিতে অমলের মনোভাব বুঝে চারু ক্ষান্ত হবে কি, এই চিঠিগুলিই তো চারুর জেদ্ অহংকারকে আরো জাগিয়ে তুলল, তাকে মানসিক ভাবে রণরঙ্গিনী করে তুলল। এবং সেটাই তো স্বাভাবিক। আশ্চর্য অমল যে ভূপতিকে তিনটি চিঠি লিখেছিল—তা গুনে গুনে সত্যজিৎ রায় উল্লেখ করলেন, কিন্তু এই চিঠির মধ্যে যে 'উপেক্ষা' আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন, তার প্রতিক্রিয়া চারুর মত নারীর মনস্তত্বে কি ভাবে কাজ করতে পারে সেটা লক্ষ্যই করলেন না! চারুর তখন মনোভাব কি হবে—কি হওয়া বাস্তবোচিত? চারু চাইবে, যে ভাবেই হোক অমলকে দিয়ে লেখাবেই একটা অন্ততঃ চিঠি বা টেলিগ্রাম, যা শুধু তাকে লেখা। কেননা, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে 'উপেক্ষার' জ্বালা নিবারণ করতে পারে না। চারুর মনোভাবের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, "অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি লেখে না। একেবারে এরকম নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া! একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র—পার হইবার পথ নাই।" এক্ষেত্রে চারুর মত গৃহবধূর পক্ষে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর মত একটা দুঃসাহসিক কিন্তু সম্ভাবনীয় কাজ করা ছাড়া উপায় কি? এই সব অংশে গল্পে বর্ণিত পরিচ্ছেদগুলিতে কোনমতেই 'নানান দুর্বলতার প্রকাশ' ঘটেনি। লক্ষ্যণীয় চারুর ওই মনোভাব, 'এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া' বলে বিস্ময় এই জন্যে যে, (মূল গল্পে) চারু তখনো নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে চলেছে, তখনো তার অনুভূতি যে প্রেম 'পসেসিভ' ভালোবাসা—তা সে নিজেও সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারে নি, এবং অমলের কাছে সে যে ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটিত—'এক্সপোজড্'—এটা সে একেবারেই জানে না। এবং এটাই মূল গল্পের সৌন্দর্য। যদি ভুল করে ধরে নেওয়া হয়, যেমন সত্যজিৎ রায় করেছেন, তখন চারু ও অমল পরস্পর পরস্পরের কাছে পূর্ণ উদ্ঘাটিত, তাহলে চারুর প্রি-পেড টেলিগ্রাম করাটার অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়—এবং গল্পের মূল ভাবধারা থেকে বিচ্যুত হয়। কিন্তু তবু সেটাও অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং 'চারুলতা' ছবির সবচেয়ে বড় ত্রুটি, যেখানে মূল গল্পের সত্যটি প্রায় নিহত হয়ে বসেছে—সেটি হচ্ছে—চারু অমলের প্রেমের পারস্পরিক উদ্ঘাটনকে গল্পের যেখানে যেভাবে করা হয়েছে ছবিতে তার অনেক আগে ও অন্য ভাবে (খোলা খুলিভাবে) ঘটানো হয়েছে। এতে গল্পের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল, তা বিঘ্নিত হয়েছে। ছবির চারু রবীন্দ্রনাথের চারুর চেয়ে যেন অন্য কারুর (সত্যজিৎ রায়ের না ফ্লবেয়ারের?) চারুতে পরিণত হয়েছে। চারুর অমলকে ভালোবাসা প্রচণ্ডভাবে বাস্তব, কিন্তু উদ্ঘাটন, প্রকাশ বৈচিত্র্য, গল্পের যা মূল সত্তা, তা ছবিতে ভয়ানক ভাবে গেছে পাল্টে।

অতঃপর সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগ মূল গল্পে শেষাংশে ভূপতির আচরণ নিয়ে। সত্যজিৎ রায় লিখছেন ভূপতির আর্থিক বিপর্যয়ের পর, "তার যেখানে কাজ নিয়ে মেতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না, চারুকে সঙ্গ দেবার জন্যই যখন সে ব্যস্ত এবং চারুর মনোভাব যেখানে তার আচরণে এতই স্পষ্ট যে 'লোকে' তার সম্পর্কে কানাকানি করে, সেখানে ভূপতির দীর্ঘকাল ব্যাপী এই marathon incomperhension-এর মনস্তাত্বিক ভিত্তি কোথায়?"

সত্যজিৎ প্রথমে ভুল করেছেন 'লোকের' উপলব্ধির সঙ্গে ভূপতির উপলব্ধির তুলনা করে। 'লোকে' অনেক কিছুই বুঝতে পারে, এবং অনেক সব ভুলই বোঝে, এটা 'লোকেদের' একটা কাজ। কেননা 'লোকেরা' অনেক বেশী কানাকানি নির্ভর। কিন্তু স্বামীর পক্ষে অতখানি কানাকানি নির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। আর ভূপতির আচরণের মনস্তাত্বিক ভিত্তি? সে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন গল্পের ১৩শ পরিচ্ছেদে: "বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্ত্রীর প্রতি অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুব তারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেভে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল, তখন অন্তঃপুরে কোন খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কিনা তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথা ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।" এরপর ভূপতির marathon incomprehension-এর মনস্তাত্বিক

ভিত্তি সম্পর্কে আর নূতন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি? অত্যন্ত ভালো মানুষ, কোথাও 'মন্দ' দেখলেও তাতে দৃষ্টি না ফেলা, তাকে বিশ্বাস না করা—এটা এক ধরণের স্বল্প সংখ্যক উদার স্বামীর স্বভাব—ভূপতি তাদের একজন। এটাই ভূপতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এবং এটাই গল্পের আর একটি সৌন্দর্য।

'চারুলতা' ছবির আর একটি বিশেষ দৈন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই—যেটি ছবির বোধ করি সবচেয়ে বড় দৈন্য। আমরা ছবিতে দেখি অমলের চলে যাওয়ার পরবর্তী অংশটি খুব সংক্ষিপ্ত ঃ ছবিতে তার পরবর্তী পর্বগুলি—চারু ভূপতির বিষণ্ণতা, চারু ভূপতির পুরী ভ্রমণ, সেখানে সমুদ্র তীরে ভূপতির নৈরাশ্য ত্যাগ করে আবার নূতন উদ্যমে নূতন কাগজ বার করার সংকল্প ঘোষণা—এবং তাতে এইবার স্বয়ং চারুলতাকে যুক্ত করা। চারুর সানন্দ সম্মতি। কিন্তু কলকাতায় স্বগৃহে এসেই অমলের চিঠি প্রাপ্তি, সেই চিঠি পেয়ে চারুর নির্জনে ভেঙে পড়া—ও অমলের উদ্দেশ্যে প্রেমিকার মত কাতর স্বগতোক্তি—ভূপতির দ্বারা সেই দৃশ্য দেখে ফেলা। ভূপতির ট্রাজিক সত্য-দর্শন, বাড়ী থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে চলে আসা, প্রত্যাবর্তন—চারুকে গ্রহণ করতে যাওয়া—সমস্তটা 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া—'নষ্টনীড়'।—এই হচ্ছে শেষাংশ।(১)

কিন্তু মূল গল্পে অমলের বিদায়ের পর ছয়-ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে। এবং যদিও সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "এই অংশটিকে প্রায় বলা যেতে পারে Variations on the theme of incompatibility। এই অংশের দরদ, এর কাব্যময়তা, এর আবেগ অনস্বীকার্য। কিন্তু.........বিশ্লেষণ করে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস মূলের হুবহু অনুসরণ করলে এ সব দুর্বলতা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠত।" মূলতঃ সত্যজিৎ রায় ভূপতির উপলব্ধিতে পৌঁছানর ঘটনার প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন—কিন্তু সেটি ছাড়াও এই ছয়টি পরিচ্ছেদে যেটি আসল থীম সেটির সম্পর্কে কিছুমাত্র ভাবেনও নি, এটাই বিস্ময়ের !!

আমার মতে 'নষ্টনীড়'-এর আসল সৌন্দর্যটি ধরা পড়েছে এই ছয়টি পরিচ্ছেদেই বিশেষ করে। সত্যজিৎ রায়ের এই ছয়টি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে অবজ্ঞা যতই বিপুল হোক না কেন, যে কোন সচেতন পাঠক বুঝবেন, চারুলতার বিশেষ একটি রূপ, তার চরিত্রের একটি বিচিত্র প্রকাশ—এই অংশে আছে, যা 'নষ্টনীড়'কে গভীরতর করেছে, অসামান্য করেছে। একে বাদ দিলে 'নষ্টনীড়' -এর একটি প্রধান দিকই বাদ চলে যায়। এ কথা কে বিশ্বাস করবে যে ছয় ছয়টি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ 'ফালতু' লিখেছেন? বরং প্রত্যেকটি লাইন অপরিহার্য—একটি শব্দ পর্যন্ত পাল্টানো যায় না!

এই অংশের মূল সারসত্যটি কি?(১) প্রচণ্ড বিরহজ্বালার মধ্যে চারুর প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি, (২) একদিকে সকালের গৃহস্থ-বধূর অপরিবর্তনীয় জীবন, অন্য দিকে এই ভালোবাসা, এ দুয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ চারু, (৩) কি ভাবে এক অসামান্য কল্পনা শক্তিসম্পন্না এই নারী এই দুয়ের মধ্যে একটি দুঃসাধ্য সামঞ্জস্য বিধান করেছিল, পরে অমলের চিঠির 'উপেক্ষা' যাকে ছিন্ন করে দেয়। বিশেষ করে এই তৃতীয়টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ—যার বর্ণনার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন, "এই ভাবে চারু তাহার ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরে.........সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল।....সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোসখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়া-কর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে উপস্থাপিত হয়।....এই ভাবে মনের সহিত দ্বন্দ্ব বিপদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে এক প্রকার শান্তি লাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল।" (পাঠক গল্পের ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও ১৬শ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ স্মরণ করতে পারেন)।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের যে সব বিবাহিত রমণীর জীবনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রেমের প্লাবন আসে এবং যার ছেদ হয় বিপুল বিরহে, তাদের অন্তরের চিত্র। এর সর্বজনীনতা অনস্বীকার্য। এখানে পুরুষ চরিত্র একই সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্র ও সেই সময়কার এই ধরণের গৃহস্থবধূর 'টাইপ' চরিত্র হয়ে ওঠে—পায় ঐতিহাসিক মাত্রা। চারু চরিত্রের অবিস্মরণীয়তার মূল ভিত্তি এখানেই।

(১) এখানে চলচ্চিত্র ভাষার এক অনবদ্য ব্যবহার আছে। সমুদ্রতীরে ভূপতি বলে তারা তিনজন, চারু ও বন্ধু নিশিকান্ত নূতন কাগজ বার করবে। ভূপতি তিনটি আঙুল দেখায়। দৃশ্য ফেড্ আউট। ফেড ইন করে একটি তেপায়া টেবিলের তিনটি পায়া। সমস্ত দৃশ্যে সেই টেবিলটি থাকে 'ফোর গ্রাউণ্ডে'। প্রথমে পা দেখায় তারপর টেবিলের ওপরের অংশ। 'ব্যাক গ্রাউণ্ডে' দেখি ভূপতি-চারু ফিরেছে, জিনিষ পত্র নামাচ্ছে, ঘরে ঢুকছে, কথা বলছে. ক্যামেরা ততক্ষণে একটু একটু করে টেবিলের ওপরে দৃষ্টি ফেলছে, এবং ব্যাক গ্রাউণ্ডে যখন শব্দপথে শুনছি ভূপতি-চারুর আনন্দিত কথাবার্তা, টেবিলের ওপরে দেখি পড়ে আছে একটি খাম—অমলের চিঠি, ভবিষ্যতের বিস্ফোরণের ইঙ্গিত। ক্যামেরা সেই ভাবে থেকে যায়। সামনে অমলের হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা খাম। পিছনে ভূপতি বের হয়ে যায়। দেখি চারুর একটা হাত এসে চিঠিটা তুলে নেয়, কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর নেপথ্যে চারুর ক্রন্দনের শব্দ।....অসাধারণ সিনেমার ভাষা।

এটি ছবিতে বেবাক বাদ। এ কথা অবশ্য ঠিক এটি সংক্ষিপ্ত করে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তার জন্য এই অংশটিকে অবজ্ঞা করা কোন চিত্র পরিচালকের বা ব্যাখ্যাকারের শোভা পায় না।

এতক্ষণ যা দেখা গেল, তাতে বলা চলে ছবির পরিবর্তনের পিছনে সত্যজিৎ রায়ের বেশির ভাগ যুক্তিই ধোপে টেঁকে না—এবং ছবিটি, সঠিক অর্থে, মূলানুগ হয়নি।

(গ) ছবির ভিন্নতা মূলের সারসত্তাকে রক্ষা করে কোন নূতন মাত্রা যোগ করেছে কিনা ?

বলাবাহুল্য মাত্র, যেখানে মূলের সারসত্তাই রক্ষিত হয়নি, সেখানে এ প্রশ্নই ওঠে না।

(ঘ) মূলের সারসত্তার অপরিণত দুর্বল অংশ থেকে সরে এসে, বা তাকে পরিবর্তিত করে মূলের চেয়েও উন্নততর শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কিনা !

এ ক্ষেত্রে মূলানুগতার প্রশ্ন কিছু কম। যেমন 'অপরাজিত' ছবি মূল উপন্যাসের অনেক দুর্বলতা—বিশেষত বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক মিস্টি ভাবধারাগুলি পরিহার করে অনেক উন্নততর শিল্প হয়েছে। কিন্তু 'চারুলতা'র ক্ষেত্রে তা কি বলা চলে ? অমলের প্রতি চারুর স্নেহ প্রীতি বন্ধুত্ব কি ভাবে ধীরে ধীরে রঙ পাল্টাল—এটাই বিষয়। কিন্তু সেই প্রেম দুজনের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবার আগেই (কেবল মাত্র যার পরের স্তরে দেহের সম্পর্ক স্বভাবতঃ আসেই) অর্থাৎ অমলের তার বৌঠানের প্রতি অনুরাগের চরিত্র বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে একতরফাভাবে রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ এবং চারু তখনো তার আত্মাকে ঠিকমত বুঝতে পারছে না—পরে প্রচণ্ড বিরহজ্বালার মধ্যে তার প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি—এটাই মূল গল্পের বক্তব্য। ছবিতে এই থীমটি পরিবর্তিত, সেখানে অনেক আগেই দুজনে দুজনের কাছে উদ্ঘাটিত 'এক্সপোজড' এবং তারপরেও অমলের ও চারুর এক সঙ্গে সহাবস্থান, পরে স্বামীর সর্বনাশের ভূমিকায় চারুর প্রেমিকাসুলভ আচরণ যখন বিসদৃশ একমাত্র তখনি অমলের গৃহত্যাগ—এটা মূল থেকে নিশ্চয় রীতিমত সরে আসা—এবং এতে করে কিছু মাত্র উন্নততর শিল্প সৃষ্টি হয়নি। বরং প্রবল বিরহজ্বালার মধ্যে চারুর প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি, একদিকে গৃহস্থবধূর জীবন, অন্যদিকে অশ্রুমালা সজ্জিত গোপন বিরহ মন্দিরে প্রেমের পূজা—এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা এক নারীর অনবদ্য যে 'ইমেজ' গল্পের ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদে আছে—যে 'ইমেজ' আমাদের দেশের এই ধরণের গৃহস্থবধূর সর্বজনীন 'ইমেজ' বা 'টাইপ' তা ছবিতে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ছবি যে নিশ্চিত নিকৃষ্টতর হয়েছে—এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যে যেমন সেই বাগানের অপূর্ব দৃশ্যে চারুর চরিত্রে কিছু নূতন আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন চারুর সন্তান আকাঙ্খা ইত্যাদি। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষতির পর স্থানে স্থানে আলোকপাতে মূল্য কতটুকু ?

নূতন আলোকপাত প্রসঙ্গে একটা কথা ব্রিটিশ 'সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার লেখক দ্বারা উচ্চস্বরে বিজ্ঞাপিত, এদেশেও এক ধরণের সমালোচকরা তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত। তাঁদের মতে, মূল গল্পে যেখানে 'তৎকালীন কাল'কে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখিয়েছেন, সত্যজিৎ রায় সেখানে নাকি সেই 'কাল'কে বিষয়বস্তু হিসেবে দেখিয়েছেন, অর্থাৎ সেই কালের বোধ, তার সামাজিক রাজনৈতিক বিস্তারকে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূপতির সঙ্গে তার বন্ধুদের নৈশ আড্ডাটির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়। সেই আড্ডায় রামমোহনের আলোচনা হয়, তাঁর গান গাওয়া হয়, বিলেতে নির্বাচনে গ্লাডস্টোন না ডিসরেলী, লিবারেল না টোরী কারা জিতবে এ নিয়ে তর্ক হয়—ইত্যাদি। জন রাসেল টেলর লিখেছেন "Charulata it is tempting to say, Ray's most Western film" (Directors & Directors—by J. R. Taylor, page 193) পেনেলোপ হাউস্টন, 'সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার সম্পাদিকা, উক্ত পত্রিকার ১৯৬৫/৬৬ সালের শীতকালীন সংখ্যায় 'চারুলতা' নামক নিবন্ধে শুরুতেই প্রবল উচ্ছ্বাসে লেখেন, যাঁর নাম 'সট্রোজিট রে' নয়, 'সাটোজিৎ রায়' ও নয়—অর্থাৎ যাঁর নামই 'Elusive'—তাঁর ছবি তো হবেই ইত্যাদি। যেন যে কোন বিদেশীর নাম এই রকম Elusive নয়। যেন একজন চৈনিক চিত্রপরিচালকের নাম তিনি সঠিক উচ্চারণ করতে পারবেন ! এ রকম ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসের কারণ কি ? সেটা তিনি লুকোন নি। এই বাংলা ছবিটির মধ্যে তিনি তাঁর স্বদেশের ভিক্টোরিয়ান যুগকে দেখতে পেয়েছেন—অর্থাৎ ছবিটিতে ভিক্টোরিয়ান সেট আপটি তাঁদের মনে এক গৌরবময় যুগের নস্টালজিয়া সৃষ্টি করে। ইংরেজদের যুগটি কি মহিমান্বিত রূপে সেই ১৮৮০ দশকের বাঙালীর জীবনে মননে, এমন কি দেওয়ালে, আসবাবপত্রে বিরাজ করত—তা দেখে তাঁরা পুলকিত, গর্বিত। এবং আপনি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখবেন সর্বত্র আনন্দ-উচ্ছ্বাস। "চারুলতা সবচেয়ে পশ্চিমী ছবি।"

শ্রীমতী মারী সীটনের 'সত্যজিৎ রায়' জীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি সত্যজিৎ রায় সেই ১৮৮০ দশকের কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'টি কি পরিমাণ গভীর যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। এবং তার তারিফ করার ব্যাপারে সায়েব মেমসায়েবদের উৎসাহের সীমা নেই। এবং সেটা নাকি 'নূতন আলোকপাত' ! কিন্তু আমার প্রশ্ন এই 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ' ব্যাপারটা কি ? এই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর 'সেট-আপ'টি কার চোখ দিয়ে দেখা, সে দেখার সত্যতা কতটুকু ?

স্পষ্টতঃ এটা দেখান হয়েছে এমন একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি এর উজ্জ্বল দিকই শুধু দেখেছেন, তাও দেশের সামগ্রিক তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে না মিলিয়ে—যেমন (ইংল্যান্ডের) গণতন্ত্র নিয়ে তর্ক, সাহিত্যচর্চা, সাংবাদিকতার চর্চা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি। এগুলির ভাল দিক নিশ্চয় আছে, কিন্তু এর প্রায় সমস্তটাই যে একই সঙ্গে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে (বৃটিশ শাসক কর্তৃক) একটা বিশেষ 'মর্য্যাদায়' বসাবার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত, যাতে একটি বিশেষ 'এলিট' শ্রেণী সৃষ্টি হয়, গ্রাম্য সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গেও তার কিছু পার্থক্য থাকে, জনগণকে শাসন শোষণ ও সামলে রাখার জন্য সামন্ত শ্রেণীর বেশে দক্ষতর শ্রেণী তৈরী হয়—যা বিশেষভাবে সে সময়ের বৃটিশ একাধিপত্যের তথা সাম্রাজ্য-শক্তির অনুকূলে যায়—এটাও বিস্মৃত হবার নয়। কেননা বাংলার 'নবজাগরণ' বলে 'বিরাট' একটা ব্যাপারকে ওষুধের পিলের মত শিশুকাল থেকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের গেলান হয়েছে, তার মধ্যে 'জাগরণ' কতটুকু ছিল এবং কতটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা কৌশলে একটা লেজুড় 'এলিট' শ্রেণী তৈরীর প্রচেষ্টা—তা আজ অনেক বেশী স্পষ্ট। সেদিন যে বাবুরা রামমোহনের গান গেয়ে, বিলেতের নির্বাচনে লিবারেলদের জয়ে বাগান বাড়ীতে ভোজ দিতেন, তাঁরা খবরও রাখতেন না,[১] ঠিক সেই সময়েই কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে বসিরহাট অঞ্চলে 'তিতুমীর' নামক এক দেশ-প্রেমিক মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে কৃষক বাহিনী তৈরী করে এক প্রশস্ত অঞ্চলকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং নানান কারণে পরে পরাজিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন—কলকাতায় যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কৃপালাভের জন্য রামমোহনের সম্বর্ধনা করার আয়োজন হচ্ছে সে সময়ে কলকাতায় বসে তিতুমীরের লড়ায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজের তোপধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেছে—অথচ 'বাবুদের' সংবাদপত্রে এক কোণে তিতুমীরকে "ধর্মান্ধ এক ব্যক্তি" বলে একটি টুকরো খবর ছাড়া কিছু বের হয়নি। শুধু তিতুমীর কেন তখনকার কলকাতার 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'-এর বাবুরা দেশের নীচের তলার সংখ্যাধিক্য মানুষের কোন খবরটা রাখতেন?

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা' ছবিতে কোথাও কিন্তু তৎকালীন 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'টির এই জনগণ বিমুখ চিন্তাধারার দেউ-লিয়াপনার এতটুকুও তুলে ধরে নি, চেষ্টাও করেননি—করলে শ্রীমতী হাউস্টনেরা এত পুলকিত হতে পারতেন না—অবশ্যই 'চারুলতার' জয়ধ্বনি কিছু স্তিমিত হত। অথচ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক গল্পেও এতটা সমাজ-অসচেতন নন। মূল গল্পে গল্পের শুরুতেই ভূপতির কাগজ বের করার বর্ণনায় একটা মক্-সিরিয়াসনেসের সুর পাওয়া যায়। যেমন গল্পের শুরুতেই আছে, "ভূপতির কাজ করিবার দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল—দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশতঃ তিনি কাজের লোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে একটি ইংরাজী কাগজ বাহির করিতে হইল।" এই কথা কয়টির মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা আছে, মৃদু বিদ্রূপ আছে তা চোখ এড়ায় না। ভূপতির সাহিত্য বোধ ছিল না, দেখা যাচ্ছে কোন দেশপ্রেম বা রাজনীতির তাগিদেও কাগজ সে বের করে নি, করেছিল একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য—এবং বের করেছিল এলিট শ্রেণীর জন্য ইংরাজী কাগজ। এই হচ্ছে সেকালের ভিক্টোরিয়ান সেট-আপের কাজের লোকের নমুনা। ঠাট্টাটা এইখানেই! এই মক-সিরিয়াস সুর গল্পের অন্যত্রও আছে। মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে, সামগ্রিক সামাজিক বিষয় তাঁর এই গল্পের বিষয়বস্তু নয়। ভূপতিকেও তাঁর কোন 'টাইপ' চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়োজন ছিল না। তবু যখনই ভূপতির কাজ কর্মের সামাজিক রাজনৈতিক দিকটি তির্যক ভাবে এসেছে, তখনি তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃদু ঠাট্টা করে গেছেন। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের জাদুতে তার মধ্যে সেকালের 'টাইপ' চরিত্র ফুটে উঠেছে। সেই ১৯০০ সালে কবি যা করেছেন, তার চৌষট্টি বছর পরে (১৯৬৪ সালে) যখন সেই পর্বটি অনেক বেশী বিশ্লেষিত, যখন সেই 'সেট-আপ'টি নিয়ে অনেক অনেক নিরপেক্ষ বস্তুবাদী বিশ্লেষণ হয়ে গেছে, তখনও সত্যজিৎ রায় এই সামান্য ঠাট্টার সুরও রাখেন নি। এবং তিনি এই 'সেট-আপ'টিকে তেমনি একটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন ও তুলে ধরেছেন, যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৃটিশ ভক্তরা দেখে থাকেন, সম্ভবতঃ তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রায় বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়ও এই যুগটিকে এই ভাবে দেখে থাকবেন!

সুতরাং যাঁরা স্বদেশে কি বিদেশে বলে থাকেন, 'চারুলতা'র কালটির ওপর সত্যজিৎ রায় আলোকপাত করেছেন, তাঁরা একটু দেশজ মৌলিক বাস্তববাদী আলোকে যদি সমস্তটা বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন সমস্তটাই ফাঁপা—অর্থহীন।

একজন সার্থক পীরিয়ড ফিল্ম রচয়িতার মত সেকালের কলকাতার পথ, তার সকাল দুপুরের শব্দগুলি, চরিত্রগুলির

---

[১] বিনয় ঘোষ লিখিত "তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ" দ্রষ্টব্য। 'এক্ষণ' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। তিনি লিখেছেন "শহর কলকাতার তোপধ্বনির সীমানার মধ্যে প্রায় অবস্থিত তিতুমিঞার বিদ্রোহাঞ্চল, অথচ কলকাতার নাগরিক জীবনে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি....যখন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের মত সমাজ সংস্কারের সম্ভ্রান্ত প্রবক্তারা কলকাতা শহরেই বসবাস করছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁদের খানাপিনা ভোজ সহ ইংরেজের শুভেচ্ছাশ্রিত সংস্কার কর্মে উৎসাহ আদৌ মন্দীভূত হয়নি।"

আচরণ, বেশবাস আসবাবপত্র—সব নিখুঁত ভাবে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু তাকে কাহিনীর ওপর নূতন আলোকপাত বলা চলে না। ক্লাসিক সাহিত্যের ওপর অতীত দিনের ওপর ভিত্তি করে রচিত চলচ্চিত্রের সেই বিগত কালের ওপর নূতন আলোকপাতের ব্যাপারে শিল্পের অন্যতম পরাকাষ্ঠা হয়ে আছে 'ম্যাকবেথ' নিয়ে রচিত কুরোশোয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' ছবি। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, এটা শুধু 'ম্যাকবেথে'র ওপর নূতন আলোকপাতই নয়, দেখান হয়েছে বিদেশী সাহিত্যের সত্যকে কিভাবে নিজের দেশের দ্বাদশ শতকের পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে কী অসামান্য বিশ্লেষণ করা যায়। এই দিক থেকে 'চারুলতা'তে সামান্যতমও আলোকপাত ঘটেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের উক্ত মক-সিরিয়াস ঠাট্টার সুরকে সূত্র করে নূতন আলোকপাতের সুযোগ যে ছিল না, তা কে জোর করতে বলতে পারে?

যদি আমরা একবার মূলানুগতার প্রশ্ন মন থেকে দূর করে ছবিটি দেখি, মনে হয় 'চারুলতা' সত্যজিৎ রায়ের অপুত্রয়ী পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ('জন-অরণ্য'কে বাদ দিয়ে)। এর অঙ্গে অঙ্গে এত শিল্পকর্ম, ক্ষণে ক্ষণে চলচ্চিত্র ভাষায় এমন বিস্ময়, প্রথম দিকের রোম্যাণ্টিক অংশটুকুতে অমল-চারুর মনোবিশ্লেষণের এমনই অমলিন স্বতোজ্জ্বল প্রকাশ—যে, সত্যজিৎ রায়ের কথাটি বারবার সমর্থন করে বলতে ইচ্ছা করে 'এ ছবিটি সত্যিই মোজার্টীয়'—কিন্তু যোগ করতে হয় আর একটি কথা, "এটি সিনেমার 'চেম্বার মিউজিক' মাত্র।" অপুচিত্রত্রয়ীর কোন একটি ছবিরও সেই বিশাল 'সিম্ফনিক' ব্যাপ্তি 'চারুলতা'য় নেই। এবং প্রশ্ন: মূলানুগতার প্রশ্নটি আপনি কি মন থেকে সরাতে পারেন? আমার উত্তর, তা সম্ভব নয়। এবং এই জন্যেই ছবিটি অদূর ভবিষ্যতে বিস্মৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা—যখন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁর এই গল্পটিকে আরো গভীরভাবে বারবার পাঠ করবে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—৩১৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পদ্ম বারান্দা থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামে। তার হাতে একটা থালা।

পদ্ম : ওরে ও উচ্চিংগে— ! উচ্চিংগে— !

উচ্চিংড়ে : কি ?

উচ্চিংড়ে তখন নতুন কামারশালের ভেতরে অনিরুদ্ধকে কাজে সাহায্য করছে।

পদ্ম : এদিকে আয়।

উচ্চিংড়ে : আমি এখন কাজ করছি।

পদ্ম একটু এগিয়ে আসতেই যতীনকে উঠোনে ঢুকতে দেখে।

পদ্ম : দেখি !

যতীনের কপালে আঙুল দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দেয় পদ্ম।

যতীন : কি ব্যাপার ?

পদ্ম : বা !…আজ না চন্দন ষষ্ঠী। তোমার মা-ও আজ ফোঁটা দেবে—তোমার নামে দরজার বাজুতে।

দুর্গা ছুটে এসে উঠোনে ঢোকে।

দুর্গা : শিগ্‌গির চলো !…উদিকে গণ্ডগোল !

পদ্ম : এ্যাঁ !

দুর্গা : হ্যাঁ !…ছিরে পালের পাইক—গাঁ শুদ্ধু সব্বার গাছ কেটে নিচ্ছে !

অনিরুদ্ধ } : সে কি ?
যতীন }

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৯

স্থান—গ্রামের বাগান (১)

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। কুড়াল দিয়ে কয়েকটি গাছ কাটা হচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২০

স্থান—গ্রামের বাগান (২)

সময়—দিন।

কালুর লোকজন ক্যামেরার দিকে আগুয়ান একদল গ্রামবাসীকে লাঠি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় কালুর লোকজনরা গাছ কেটে ফেলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২১

স্থান—সজনেতলায় গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

ফোর গ্রাউণ্ডে দেখা যায় চিন্তিত চৌধুরীমশাই এগিয়ে আসছেন। উল্টোদিক থেকে একদল গ্রামবাসী যাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাগান।

সময়—দিন।

শূন্য ফ্রেমে একটি উদ্যত কুড়াল গাছ কাটতে শুরু করে। দেবু পণ্ডিত চীৎকার করতে করতে ফ্রেমে ঢোকে।

দেবু : খবরদার !…এ আমার বাবার লাগানো গাছ !

কালু : আ বে হাট্ ! জমিদারের হুকুম !…সব গাছ কাটা যাবে—

দেবু : না—না—না

দেবু পণ্ডিত এগিয়ে এলে কালু তাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়।

কালু : হ্যা—ট্ !!

দেবু পণ্ডিত মাটিতে পড়ে যেতেই দ্বারকা চৌধুরী ঢোকে ফ্রেমে।

চৌধুরী : পণ্ডিত—

দেবু : দেখেন, দেখেন, কি চলছে—

কাট্ টু।

কুড়াল দিয়ে গাছ কাটা শুরু হয়।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত মাটি থেকে উঠে চলতে শুরু করে। চৌধুরীমশাই তাকে অনুসরণ করেন।

চৌধুরী : শোন, বাবারা—

চৌধুরীমশাইকে পেছন পেছন আসতে দেখে দেবু পণ্ডিত দাঁড়িয়ে পড়ে, বাধা দেয় তাঁকে।

দেবু : না—, আপনি যেয়েন না, আপনি—

আউট ফ্রেম থেকে একটা লাঠি এসে দেবু পণ্ডিতের মাথায় আঘাত করে।

চৌধুরীমশাই তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন।

চৌধুরী : পণ্ডিত— !

আরেকটা লাঠি এবার তারই মাথায় পড়ে। রক্তাপ্লুত মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে পড়লেন।

দেবু : চৌধুরীমশাই— ! চৌধুরীমশাই— !

চোখবোজা চৌধুরীমশাই আতঙ্কিত, ভীত, তিনি কাঁপা কাঁপা হাতটি দেবু পণ্ডিতের কপালে দিয়ে বিড় বিড় করে বলেন—

চৌধুরী : পণ্ডিত ! পণ্ডিত !…"য দা য দো হি ধ র্ম স্য গ্লানির্ভবতি ভয়ারতঃ—"

দেবু পণ্ডিত দূরে গোলমালের শব্দ শুনে সেদিকে তাকায়—

কাট্ টু।

বাউরি ও গাঁয়ের লোকরা ছুটে আসছে। লাঠি হাতে অনিরুদ্ধ সকলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

কালু গুণ্ডা ও তার লোকজন।

কাট্ টু।

বাউরি ও গাঁয়ের লোকরা ছুটে আসছে।

কাট্ টু।

কালুর দল একটু ভীত।

কালু : (গলা নামিয়ে, দলের লোকদের) এ্যাই !

চোখের ইঙ্গিতে সে সবাইকে পালিয়ে যেতে বলে।

কালুর লোকজন পালাতে শুরু করলে অনিরুদ্ধর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। কালু কোনমতে পালিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ কালুর পেছন পেছন দৌড়তে থাকে। এবং কিছুদূর দৌড়ে তাকে ধরে ফেলে। প্রচণ্ড জোরে লাঠির বাড়ি দেয় তার মাথায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৩

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। কালু রক্তাক্ত মাথা নিয়ে বসে আছে। আশপাশে তার লোকজন।

ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় ছিরু পাল গড়াই-এর কানে কানে কিছু বলছে।

ছিরু : শিগ্‌গির !…ওরা পৌঁছুবার আগেই ওকে নিয়ে থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে ফেল ! বলবে, অনে—কামার— !…যে কটা মাথা ফেটেছে, —সব অনে—কামার—বুঝলে ?

গড়াই : কিন্তু সে ব্যাটা তো শুনছি ফেরার !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৪

স্থান—জঙ্গলের মধ্যে একটি মন্দির।

সময়—দিন।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা ঘুরতে ঘুরতে টিল্ট-ডাউন করে দেখায় পদ্ম ফ্রেমে ঢুকছে। চারদিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগোতেই অনিরুদ্ধ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধ : কি রে ?

পদ্ম : নজরবন্দী ছেলে বল্লে, ক'টা দিন একটু সামলে। উদিকে আজ রাতে পেজাসমিতির মিটিন !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৫

স্থান—পুলিশ থানা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা টেবিলের সামনে বসা দারোগার মুখের ওপর থেকে পিছিয়ে এলে দেখা যায় সামনে বসে আছে গড়াই, কালু ও তার দুই সাকরেদ।

দারোগা : কোথায় ?

গড়াই : শুনছি তো কামারের বাড়ীর সামনেই।

দারোগা রি-অ্যাক্ট করতেই ক্যামেরা তার ওপর চার্জ করে।

দারোগা : I see !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—রাত্রি।

মিটিং চলছে। এক জমায়েতের সামনে গিরিশ বক্তৃতা দিচ্ছে। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে গিরিশকে ধরে।

গিরিশ দেবু পণ্ডিত আমাদের নমস্য লোক ! সে আমাদের সঙ্গে থাক্-না-থাক্—সে যা আমাদের জন্যে করেছে, তাতে সব সময় আমরা তাকে মাথায় তুলে রাখব। তার গায়ে যে লাঠি পড়েছে—সে লাঠি আমাদের গায়ে পড়েছে। চৌধুরীমশায়ের মাথায় যে লাঠি পড়েছে,…সে লাঠি আমাদের মাথায় পড়েছে !

কাট্ টু

দৃশ্য—৩২৭

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দারোগাবাবু আরামে বসে আছেন চেয়ারে। ছিরু পালের পকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে সে রাখালের দিকে তাকায়। রাখাল তখন হাঁপাচ্ছে।

দারোগা : বটে ! অনেক লোক জমেছে ?

রাখাল : আজ্ঞে হ্যাঁ।…সেই সঙ্গে ঐ নজরবন্দীবাবুও রইছে।

কাট্ টু।

দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করেন।

দারোগা : নজরবন্দীবাবু… !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৮

স্থান—ছিরু পালের বাগানের পেছনের গলি।

সময়—রাত্রি।

দুর্গাকে দেখা যায় ঐ গলি দিয়ে এগিয়ে আসতে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শোনে।

দারোগা : (off) তুই ঠিক দেখেছিস ?

রাখাল : (off) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছিরু : (off) উ নজরবন্দী ছোঁড়াই তো সব নষ্টের গোড়া ! তলে তলে কলকাঠি নাড়ছে।

দারোগা : (off) বটে ?

কাট্ টু।

দৃশ্য - ৩২৯

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দারোগা : (রাখালকে) তুই আবার যা !…যেই দেখবি নজরবন্দী কিছু বলতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমায় এসে খবর দিবি, বুঝলি ?

রাখাল : আজ্ঞে আচ্ছা—

সে ছুটে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩০

স্থান—ছিরু পালের বাগানের পেছনের গলি।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে। রাখাল ছুটে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে চলে যায়।

দুর্গা চট্ করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

দারোগা : (off) বোঝাচ্ছি মিটিং করার মজা। হাতে-নাতে যদি ধরতে পারি,—চার বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর জুম্ করে। কয়েক মুহূর্ত সে কি করবে ঠিক করতে পারে না। খিল্ খিল্ ও উচ্চকিত হাসির শব্দ শোনা যায় বাগান থেকে।

হঠাৎ যেন দুর্গা স্থির করে ফেলে কি করবে। শরীর দোলাতে দোলাতে মদির ভঙ্গি করে সে গুন্‌গুন্ করে এগিয়ে যায়।

"কাঁচা হাঁড়িতে
রাখিতে নারিলি প্রেমজল—"

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩১

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গার গুন্‌গুন্ গান শুনে দারোগা অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে বলেন—

দারোগা : কে ?…কে রে ?

কাট্ টু।

দুর্গা : আমি, দুগ্‌গা দাসী।

কাট্ টু।

দারোগা : দুগ্‌গা !…আরে শোন্ শোন্ শোন্ শোন্—

কাট্ টু।

দুর্গা থেমে দাঁড়িয়ে, কয়েক পা শঙ্কিতভাবে এগিয়ে আসে।

দুর্গা : আ—মরণ ! তাই বলি চেনা গলা মনে হচ্ছে ! কি ভাগ্যি আমার ! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো !

দারোগা : আরে বোস্ না !…নজরবন্দী ছোঁড়ার সঙ্গে… কি রকম ?

দুর্গা যেন খুব লজ্জা পেয়েছে। সে মুচকি হাসে।

দুর্গা : বকশিসের কথাটা মনে থাকে যেন !

দারোগা : (খোসমেজাজে) আরে বোস্—(তারপর ছিরু পালকে) কি হে,…একটা সিগারেট-টিগারেট ছাড়ো !

ছিরু পাল কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে।

দুর্গা : (আড় চোখে) মিতে আপনার আমার ওপর রাগ করেছে।

দারোগা : তা, রাগ হতেই পারে। পুরনো বন্ধুলোককে ছাড়লি কেন তুই ?

দুর্গা : বন্ধুলোক !…পাড়াকে পাড়া পুড়িয়ে সাফ করে দিলে !

হঠাৎ মুখ ফসকে ভুল কিছু বলে ফেলেছে এমনি ভাব করে জিভ কাটে দুর্গা, কথা বলে না আর।

কাট্ টু।

ছিরু পাল—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দারোগা—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দুর্গা—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দাসজী—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দারোগা গম্ভীরভাবে ছিরু পালের দিকে তাকায়। রাগী দৃষ্টি।

কাট্ টু।

ছিরু পাল। কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেটে একটা টান দেয় সে।

কাট্ টু।

দুর্গা : (উঠতে উঠতে) আমি যাই—

দারোগা : আরে শোন্ শোন্…কোথায় ?

দুর্গা : জানি গো জানি। "পড়ছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"…ঘাট থেকে আসছি ! তবে আজ কিন্তু ভালো খানা খাওয়াতে হবে।… পাকি মাল !…হুঁ !

দুর্গা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দারোগা উঠে দাঁড়ায়। ছিরু পালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—

দারোগা : ব্যাপার কি পাল ? দুগ্গা কি বলতে বলতে থেমে গেল ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫

স্থান—গাঁয়ের বিভিন্ন রাস্তা।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি। আধা-আলো আঁধারিতে গাঁয়ের পথ দিয়ে দুর্গা ছুটে যাচ্ছে অনিরুদ্ধ'র বাড়ীর দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা ছুটতে ছুটতে অনিরুদ্ধর বাড়ীর কাছে এসেছে। উল্টোদিক থেকে রাখালকে আসতে দেখে সে একটা ঝোপের পাশে লুকিয়ে পড়ে। রাখাল চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—রাত্রি।

যতীন জমায়েতের সামনে বক্তৃতা করছে।

যতীন : এখন কথা হচ্ছে, দেবুবাবু যদি আমাদের সঙ্গে না-ও থাকেন…তবে কি আজ বাদে কাল আমাদের যা লড়াই…ধর্মঘট…সেটা কি থেমে থাকবে ?

দুর্গা ছুটে এসে ফ্রেমে ঢোকে। গিরিশের মুখোমুখি হয়।

দুর্গা : গিরিশদা !

কাট্ টু।

(চলবে)

কার্ল মার্কস্

পরিচালনা : গ্রিগোরি রোশাল, পরিচালক ফটোগ্রাফী : লিওনিদ কসমাতোভ, সঙ্গীত : দিমিত্রি সোস্তাকোভিচ, চরিত্র চিত্রনে : ইগর কাভাশা (মার্কস্) আঁদ্রেই মিরোনোভ (এঙ্গেলস্) রুফিনা নিফোনতোভা (জেনী মার্কস্)।

মুখবন্ধ :

তাঁর প্রিয় প্রবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মার্কসের উত্তর : মানবিক যা কিছুই আমি তার পক্ষে।

'কার্ল মার্কস' ছবিটির নির্মাতাগণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস কে ঠিক ঐ মানবিক দৃষ্টিতেই দেখেছেন।

ছবিটির পরিচালক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার গ্রিগোরি রোশাল-এর বক্তব্য : আমরা চেষ্টা করেছি যেন একজন মানুষ এবং একজন প্রতিভা হিসেবে কার্ল মার্কস কে তুলে ধরতে পারি, যিনি প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড, জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক সবটাতেই মার্কসের প্রতিভার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্মাতাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ দুরূহ। কার্ল মার্কস-এর উপর চলচ্চিত্র নির্মাণের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা, এবং অন্ততঃ মার্কস সংক্রান্ত এই বিষয়বস্তুর শৈল্পিক উপস্থাপনা বেশ পরিশ্রমশীল কর্ম। এই জন্যেই নির্মাতারা মার্কসের জীবন থেকে ১৮৪৮—৪৯ এই বিশেষ স্বল্প কিন্তু ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক সময়টুকু বেছে নিয়েছেন। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে চলেছে। তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস্ পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা সঠিক পথই অবলম্বন করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই তখন অল্পবয়সী। বিপ্লবের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে তাঁদেরকে যেতে হত ব্রাসেল্স, প্যারিস, কলোন ও ভিয়েনাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সংগঠন করার জন্যে। যেখানেই শ্রমিক শ্রেণীর সরব হয়ে ওঠার সংবাদ পেতেন সেখানেই ছুটে যেতেন তাঁরা। ঠিক এ সময়েই বিপ্লবী ধ্যান ধারনাকে ছড়িয়ে দেয়ার এবং কর্মজীবি মানুষের সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা প্রকাশ করলেন 'নইয়ে রাইনিশে তসাইটুংগ' পত্রিকাটি।

চিত্রনাট্য

সরকারী সীলমোহর সম্বলিত একটি অফিসিয়াল চিঠির শট। সরকারী নির্দেশনামা—২৪ ঘন্টার ভেতর মার্কসকে ব্রাসেলস্ ছেড়ে যেতে হবে।

ঐ নির্দেশনামাটা মার্কসদের ফ্ল্যাটবাড়িতে জেনির (মার্কসের পত্নী) ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে। ঘর স্বল্লালোকিত। জেনি চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ এবং বইপত্র বাঁধছেন।

নার্সারীর খোলা দরজা দিয়ে কতকগুলো বিছানাপত্র দেখা যাচ্ছে। যাতে শুয়ে আছে শিশুরা। লেন্‌চনকে দেখা যাচ্ছে বেতের তৈরী জিনিষপত্র গোছগাছ করতে।

পড়ার ঘরে একটি ডেস্ক ঘিরে বসে আছেন মার্কস্, এঙ্গেলস এবং ইউনিয়ন অফ কম্যুনিস্ট-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে গিগাউদ, টেডেসকো এবং হানস্ আবেল। এই হানস্ আবেল দেখতে অনেকটা টিল উলেনস্পিগেল-এর মতো।

একটা সবুজ শেড দেয়া বাতি জ্বলছে। গিগাউদ মিটিং-এর বিবরণী লেখা শেষ করে তাতে সবার সই নিলেন। ভেজা কালি শুকোবার জন্যে গিগাউদ কিছু পাউডার ছড়িয়ে দিলেন।

গিগাউদ : এই তোমার ম্যাণ্ডেট, কার্ল। প্যারিসে গিয়ে তুমি নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে নাও।

টেডেসকো : কার্ল, তুমি চলে যাবার আগে হানস্ তোমাকে একটা কিছু উপহার দিতে চায়।

হানস্ উঠে দাঁড়ায়। দেয়ালের উপর হানসের লম্বাটে কোনাকুনি ছায়া এসে পড়ে।

বিব্রত কণ্ঠে হানস বলতে থাকলো :

ব্রাসেলস-এ আপনার বক্তৃতা শুনেছি। এবং আপনার 'ম্যানিফেস্টো' আমি অনেকবারই পড়েছি। আর, কিছু ড্রয়িং করেছিলাম।

হানস্ মার্কসের দিকে একটা এ্যালবাম এগিয়ে দেয়। মার্কস্ এ্যালবামটি খুললেন। বিশিষ্ট এবং প্রতিভাদীপ্ত ড্রয়িংগুলো 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-আবেদনটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

হা : আমি ফ্লেমিশ। অনেকেই বলে মুক্তি মানবের সরব যোদ্ধা টিল উলেনস্পিগেলের বংশধর আমরা। আমার ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঠাকুর্দা এই এ্যালবাম (ড্রয়িংগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে) এবং এই জিনিষটা (মার্কসকে হানস্ একটি ছোট বাক্স দেয়) আপনাকে দিতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। বাক্সটা আমিই তৈরী করেছি ... ..

মার্কস বাক্সটি খুললেন। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান সম্বলিত একটি গোলাকার মেডেল বাক্সটার ভেতর রাখা।

সবাই মেডেলটা দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন। বাতির স্বল্লালোকে সবাইকে গুরু-গম্ভীর এবং দৃঢ় চিত্তের দেখাচ্ছে।

অপরিচিত লঘু একটা শব্দের কারণে হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে পড়লো। জেনি শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েন। অনেকগুলো ভারী পদক্ষেপের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। জেনি ছুটে গেলেন মার্কসের কামরায়। দ্রুত ডেস্কের উপর থেকে মিটিং-এর বিবরণী লেখা কাগজপত্র ডুরিং ও মেজেল সবকিছু সরিয়ে ফেললেন। সবাই সতর্ক হয়ে উঠলেন। লেনের বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এঙ্গেলস্ ও অন্যান্যরা উঠে দাঁড়ালেন। মার্কসের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে এঙ্গেলস্ সঙ্গীদের নিয়ে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বেরুবার দরজার দিকে এগুলেন।

দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ।

এঙ্গেলস্, গিগাউদ, টেডেসকো এবং অন্যান্যরা পেছনের প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন।

দরজায় আঘাত আরো জোরালো হল।

এঙ্গেলস্ সঙ্গী সাথীসহ ছাদের চিলে কোঠা দিয়ে এগুচ্ছেন···

মার্কস্ জ্যাকেট খুলে ফেললেন। জেনি বাড়তি ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলেন। লেন্‌চেন দরজা খুলে দিলো।

ডজনখানেক সামরিক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার ভেতরে প্রবেশ করলেন।

বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওরা ভয়ে ভয়ে জেনিকে জড়িয়ে ধরেছে। লরা কাঁদছে। জেনি পুলিশ অফিসারের দিকে ঝুঁকে বলতে থাকেন :

কতবড় আস্পর্ধা আপনার আইন ভঙ্গ করছেন। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই সময়টুকুতে কাউকে বাসায় বিরক্ত করা যে আইনত নিষিদ্ধ তা নিশ্চয়ই জানেন।

অফিসার : আমরা কেবল আদেশ পালন করেছি।

এঙ্গেলস্, টেডেসকো এবং অন্যান্যরা চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ধোঁয়ার চিমনি বেয়ে নীচে নামছেন।

সামরিক পুলিশেরা ঘরময় ছড়িয়ে অনুসন্ধান চালাতে থাকল :

অফিসার : (পড়ার ঘর থেকে চিৎকার করে) অন্যান্যরা সব কোথায়? আমরা জানি, এখানে আপনার সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলো।

মার্কস (শান্ত স্বরে) আপনি দেখছি আমার চাইতে অনেক বেশী কিছুই জানেন। আপনি কি জানেন যে আমাকে ব্রাসেলস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আমার হাতে সময় নেই। এবং বাকী সময়টুকু আমি আপনার সঙ্গে বক বক করে নষ্ট করতে চাই না . . .

অ : পছন্দ করুন আর নাই করুন, বকবক আপনাকে করতেই হবে!

অন্যান্য কামরাগুলোতে অনুসন্ধান চলতে লাগল। একজন পুলিশ সদ্য গোছগাছ করা একটি ট্রাঙ্ক খুলে ভেতরের বইপত্র সব মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। সেক্সপীয়ার, জর্জেস, স্যাণ্ড, হাইনে, মার্কসের নিজের লেখা 'দি পভার্টি অফ ফিলোসফি' প্রমুখ রচনা পুলিশটির পদদলিত হচ্ছে। একের পর এক বই উল্টেপাল্টে দেখছে সে। ডুরিং-এর একটা এ্যালবামের ভেতর থেকে সদ্য ভেঙ্গে যাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এর বিবরণী লেখা কাগজ-গুলো বেরিয়ে পড়লো। অফিসার তখন মার্কসের পড়ার ঘরে চিঠিপত্র পরীক্ষা করছিলেন। পুলিশটি প্রায় দৌড়ে যেয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত লেখা মিটিং-এর বিবরণীটা অফিসারের হাতে দিল।

অফিসার চোখ বুলিয়ে চলেছেন।

অ : (বিজয়োল্লাসের ভঙ্গীতে মার্কসকে) আপনি একাই ছিলেন, তাই না! তা হলে এটা এলো কোত্থেকে? কালিতো এখনো শুকোয়নি! আপনাদের কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসিয়েছিলেন!

মার্কস্ : (তির্যকভাবে) আচ্ছা স্যার, আপনি তাহলে লেখাপড়া জানেন!

অ : (ক্রুদ্ধ) অপমান করবেন না।

মা : (সিদ্ধান্তগুলোর একটি প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে) তাহলে তো আপনি এটা বেশ পড়তে পারবেন, এবং বুঝতেও পারবেন যে ওতে কি লেখা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রাসে-লসে কম্যুনিস্টদের বিশেষ করে জার্মান কম্যুনিস্টদের ইউনিয়নের কি ভাবে মিটিং হতে পারে?—

(সিদ্ধান্তগুলো পড়ছেন) "কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্যারিসে স্থানান্তরিত করা হল—ব্রাসেলসের কেন্দ্রীয় কমিটি এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছে যে তিনি স্বাধীনভাবে এবং কার্য ক্ষমতাবলে প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করবেন।"— এখানটায় লেখা রয়েছে দেখুন, "ব্রাসেলস-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এখন থেকে লুপ্ত করে দেয়া হল।" আপনারা এর চাইতে বেশী কি কামনা করেন?"

অফিসার কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সুস্থির হলেন।

অ : আপনি কে তাই আমাদের জানার বিষয়।

মা : (বিস্মিত) কি?

জেনি : (ক্রুদ্ধ) উনি আমার স্বামী, ডঃ মার্কস্।

অ : ওটা এখনো প্রমাণ হয়নি।

মা : (পাসপোর্ট অফিসারের হাতে দিলেন) এই আমার প্রমাণপত্র। এবং এই হচ্ছে বিপ্লবী ফরাসী সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এম, ফ্যালকনের একখানা চিঠি।

অ : (এক সুরে পড়ে যাচ্ছেন) "দুঃসাহসী ও সৎ মার্কস্, স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী সকল বন্ধুদের আশ্রয়স্থল ফরাসী প্রজাতন্ত্র, মুক্ত ফ্রান্স, তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে।"
ঠিক আছে, পুলিশ এসব পরীক্ষা করবে।

মা : কিন্তু, আমি কোথাও যেতে রাজী নই।

কয়েকজন সামরিক পুলিশ মার্কস্ কে ঘিরে দাঁড়ালো।

অ : বেলজিয়ামের মহামান্য রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেফতার করলাম ...

... টাওয়ারের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ। এর মধ্যে প্রবেশ করলো পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়ে যাওয়া হাই হিল জুতোর ভারী, অস্থির এবং উদ্বিগ্ন খটখট শব্দ। একজন মহিলা দিক নিশানাহীন ভাবে দ্রুত ছুটে চলেছেন।

মাথার উপর থেকে কালো শাল গড়িয়ে পড়লো। চুল খোলা, বৃষ্টিতে ভিজছে। দুঃশ্চিন্তায় চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে, ঠোঁট পরস্পরকে চেপে আছে। ভদ্রমহিলা জেনি।

জেনি একটা সরু পাহাড়ী রাস্তা ধরে প্রাচীন গথিক স্থাপত্যের একটি বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। দ্বারঘণ্টা বাজালেন।

ইউনিফর্ম পরা দ্বাররক্ষী দ্বার খুললো।

রক্ষী : মাদাম, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

জে : পুলিশ অধিকর্তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আমার স্বামীকে ওরা গ্রেফতার করেছে। ওকে এখনই মুক্ত করতে হবে।

র : মাদাম, একটু বিবেচনা করুন। পুলিশ অধিকর্তারও নিশ্চয় বিশ্রামের অধিকার আছে। তাছাড়া, অফিসিয়াল কোন ব্যাপার নিয়ে তিনি বাসায় কাজ করেন না।

রক্ষী দ্বার বন্ধ করে দেয়। জেনি বিফলভাবে পুনরায় দরজা ধাক্কা-দিলেন।

...তিনি টাউন হলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা কুকুর ডেকে উঠলো। নিচের তলার একটা জানালা দিয়ে আলো চোখে পড়ছে। বৃষ্টিতে ঐ আলো নিবু নিবু মনে হয়।

জে : আমাকে ভেতরে যেতে দিন। মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বার-রক্ষী ভেতর থেকে গেটের লৌহদণ্ডের আড়াল দিয়ে জেনিকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

জে : আমার সত্যিই দেখা করা দরকার।
দয়া করুন মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করতেই হবে।

তরুণ দ্বাররক্ষী বিমোহিতভাবে জেনির জ্বলন্ত দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করছে। ভেজা পোষাক জড়িয়ে আছে জেনির শরীর। জেনির মুখমণ্ডলে এমন কিছু বিকশিত হয়েছিল যে দ্বাররক্ষী তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলোনা। সে জেনিকে অঙ্গনে ঢোকার দরজা খুলে দিল। সেণ্ট্রিরা ফায়ার প্লেসের পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। ওরা জেগে ওঠে বিস্মিত নয়নে এই আগন্তুক মহিলার দিকে চেয়ে রইলো।

দ্বাররক্ষী : (এম্পায়ার ক্যাবিনেটের সঙ্গে তারযুক্ত একটি মাউথপিসের ভেতর দিয়ে কথা বলছে) মাননীয় সেক্রেটারী।

নিদ্রাজড়িত অবস্থায় সেক্রেটারী রিসিভার তুলছেন।

জে : ওহ, স্যার, এক্ষুণি আপনার চীফের সঙ্গে আমার কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন! আপনি একটু এদের বলে দিন যেন ওরা আমাকে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যেতে দেয়।

সেক্রেটারী : আপনার পরিচয় মাদাম?

জে : মার্কস, জেনি মার্কস। আমাদের উপহাসের জন্যেই কি আপনাদের রাষ্ট্রে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন? আমার বিশ্বাস যে মাননীয় মন্ত্রী···

সেক্রে : (কর্তব্যরত অফিসারের প্রতি) এঁর মতো একজন মহিলা পুরো ব্রাসেলসকে নাড়া দিতে পারেন।
(জেনির প্রতি) ক্ষমা করবেন মাদাম। তিন দিন আগে মাননীয় মন্ত্রী এ শহর ত্যাগ করেছেন।
(কর্তব্যরত অফিসারকে) দেখ, ওনার জন্যে কি করতে পার।

দ্বাররক্ষী সম্মানের সঙ্গে জেনি মার্কসকে দরজা খুলে দিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভঙ্গী করলো যেন 'আর কি করার আছে?'

জেনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর ছায়া পাশের বৃষ্টিভেজা তরঙ্গের মতো ভেসে চলেছে।

অবসন্ন জেনি ঘরের দিকে ফিরছেন। একজন সামরিক পুলিশ তাঁর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে।

পুলিশ : (জেনিকে স্যালুট ঠুকে বিনয়ী কণ্ঠে বলল) মাদাম মার্কস্ আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।

জে : (আনন্দিত) ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম।

পু : সে আমি জানি না, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র।

জেনি এত দ্রুত হাঁটতে থাকেন যে পুলিশটির পক্ষে তাঁর সঙ্গে সমতালে দ্রুত চলা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। তখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

সম্মানিত কায়দায় পুলিশটি দ্বার মেলে ধরে। জেনি দ্রুত পুলিশ হেডকোয়ার্টারের একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। উজ্জ্বল আলোয় জেনির চোখে ধাঁধাঁ লাগে, তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। একটি ডেস্কের ওপাশ থেকে একজন লম্বা কর্ণেল উঠে দাঁড়ান।

কর্ণেল : (ঝুঁকে অভিবাদন করলেন) আপনিই ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন?

জে : (শঙ্কিতচিত্তে পিছিয়ে এলেন) আমি জেনি মার্কস।

ক : (সম্মানের সঙ্গে পুনর্বার) জন্মসূত্রে ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন?

জেনি নীরবে মাথা নাড়লেন। অকস্মাৎ কর্ণেল ডেস্কের উপর সজোরে মুষ্টাঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ক : আপনি অবশ্যিই ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন। আপনি একটি সম্মানিত পরিবারের উপাধি এবং কৌলিন্যকে কলঙ্কিত করছেন। আপনি একজন অপরাধীর স্ত্রী, যে কিনা আমাদের প্রিয় ব্রাসেলস নগরীর সকল জঞ্জাল শ্রেণীর লোকদের নেতা, যে কিনা সব বিদ্রোহী এবং দুঃসাহসী লোকদের অধিপতি! এ অসহ্য!

জেনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অস্থিরভাবে হাতের ভেজা গ্লাভস্ টানতে থাকেন।

জে : আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন……

ক : কোন কোন বেলজিয়ান নাগরিক মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাদের নাম বলুন। নইলে এর জন্যে আপনাকে পরে দুঃখ পেতে হবে।

জে : আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো এরকম একটা প্রতিশ্রুতি আমার কাছে করা হয়েছিল।

ক : (দাঁত চেপে) আর কখনোই আপনি তাকে দেখতে পাবেন না।

(কর্ণেল ঝুঁকে চোখ উপরের দিকে তুলে মোটা ভুরুর পেছন থেকে জেনির দিকে তাকিয়ে থাকেন।)

জে : (অবজ্ঞার সুরে) আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। আমার ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।
(জেনি দরজার দিকে এগোন।)

ক : দাঁড়ান মাদাম! আপনি এখন বন্দী!

জে : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) বন্দী! কি অপরাধে?

ক : আপনি একজন ভবঘুরে। একজন ভবঘুরে হিসেবেই আপনাকে গ্রেফতার করা হোল। আপনি……

কর্ণেলের কণ্ঠ ছাপিয়ে জেনির কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠে আদেশসূচক ভঙ্গীতে। কর্ণেল থেমে যান।

জে : ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন সম্বোধন করতে হলে উঠে দাঁড়াতে হয়। উঠে দাঁড়ান। যখনই আপনি……

কর্ণেল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।

জে : ……বলুন, মাননীয়া নাগরিক মার্কস্।

বন্দীশালার একটি কক্ষ। দেয়ালের পাশে জেনি দাঁড়িয়ে। ভিজে পোষাকে কাঁপছেন। তাকিয়াগুলোতে শুয়ে আছে যুবতী-বুড়ি, সুন্দরী-কুৎসিত অপরাধীরা। সব গণিকা নয়তো বা চোর। জীর্ণ কাঁথা বা কাপড়-চোপড় দিয়ে ওরা আধ-ঢাকা। কেউ ঘুমুচ্ছে, আবার কেউ কেউ এটা ওটা নিয়ে ঠাট্টা-ফাজলামো করছে। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস-চুল্লী থেকে অল্প-স্বল্প আলো এসে পড়ছে।

শীর্ণকায়া অর্ধনগ্ন ক্রুর চেহারার একজন গণিকা জেনির দিকে এগিয়ে আসে। জেনির হাত ধরে মেয়েটি তার নিজের তাকিয়ার দিকে জেনিকে নিয়ে যায়।

গণিকা : (খসখসে গলায়) মনে হচ্ছে জেলে তোমার এই প্রথম, তাই না? পোষাকগুলো খুলে ফেল। ভয় পেয়োনা, আমি তোমাকে কামড়াবোনা।

জেনি তাকিয়ায় বসলেন। চোখে মুখে মনোকষ্ট এবং যন্ত্রণার চিহ্ন। ব্লাউজ, মোজা এবং জুতো খুলে ফেললেন। মেয়েটি জেনির গা থেকে ভেজা স্কার্টটা হাত গলিয়ে বার করে নেয়ার সময় জেনির মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বেরিয়ে আসে। জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।

খোলা জানালা দিয়ে ঊষাকিরণ এসে পড়েছে। জেনি জেগে ওঠেন এবং ভীত চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। বন্দীকক্ষে

প্রাণ চাঞ্চল্য জেগে উঠছে। রুটি এবং পানীয় আসলো। গ্যাস শিখা নিভিয়ে দেয়া হল। একজন ক্ষুদ্রাকৃতি গণিকা আয়নায় নিজেকে খুঁটে খুঁটে দেখছে, এবং টুকরো টুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরছে। হাসাহাসি, গান, হৈ চৈ, কদাচার ইত্যাদিতে প্রকোষ্ঠের আবহাওয়া ঝাঁঝালো। জেনির কাছে এসব দুঃস্বপ্নের মতোই লাগছে, যেন গয়ার ধাতব চিত্রকলার সেইসব পৈশাচিক পরিবেশ। অধিকাংশ মেয়েরা তাকিয়ার উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। জেনিও উঠে দাঁড়ালেন।

জানালার নোংরা পরকলা কাঁচের ভেতর দিয়ে বিপরীত দিকের বন্দীকক্ষগুলোর দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের উপর বিভিন্ন অংশে লৌহদণ্ড বসানো—এগুলোর পেছনে সরু সরু ছিদ্রপথ, ঘুলঘুলি। পুরুষ বন্দীপ্রকোষ্ঠগুলির জানালা এগুলো। জেনি দেখছেন।

এই প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে রয়েছেন দু'জন বন্দী। একজন অস্থিরমতি এবং চঞ্চল। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটাছুটি করছেন এবং ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। অপরজন প্রথমজনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমজন দ্বিতীয়জনের কাছে ছুটে যাচ্ছেন, এবং চিৎকার করে বলছেন—

পাগল : ম্যাচ, ম্যাচ কোথায়? ম্যাচ আর কেরোসিন?

এবং তাঁর (দ্বিতীয় জনের) কাঁধ খামচে ধরেছেন।

দ্বিতীয়জন মুখ ফেরালেন। ইনি মার্কস্, কার্ল মার্কস্।

পাগল : (উচ্চস্বরে মার্কসের দিকে চেঁচিয়ে) সাগরের নীচে পড়ে আছে কয়েক হাজার ডলার। তিন শ' নিগ্রো ঘুমিয়ে আছে সাগরের তলে! আমার সাহসী নিগ্রোরা! নিউ-অরলিন্সের ঘটনা! শুধুমাত্র একটা নষ্ট তরণীর কারণে। কিন্তু কে ঐ জলযানটা তৈরী করেছিল? এ্যান্টওয়ার্পেরই জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলো! আমি ওদের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি! এবং তোমাকেও আমি আগুনে পোড়াবো! হাঁা, পোড়াবোই!

রাগের মাথায় সে একটা টুল হাতে তুলে নিল। মার্কস্ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তার হাত ধরে ফেললেন। আর্তনাদ করে পাগল টুলটা তুলে নিয়ে নিজের সামনে এনে ধরে রাখলেন। আগামী কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ সতর্কতা।

—এ : গথিক স্থাপত্যের বাড়ির ছাদের ওপাশ দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

অস্তগামী সূর্যের গোধূলি আভা এসে পড়েছে জানালার ধারে দণ্ডায়মান জেনির মুখে। দেখে মনে হচ্ছে যেন জেনির মুখমণ্ডলও ক্যারাভাগিও চিত্রকলার সেইসব অদ্ভুত মুখাবয়বগুলোরই একটি। জেনি নীচের বন্দীশালার উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছেন। আঙুলে ধরা জানালার শলাকাদণ্ড।

জে : (চেঁচিয়ে) কার্ল! (ভেতরে মেয়েরা তাঁর দিকে তাকায়।) কার্ল!

মার্কস্ পাহারাদার পরিবেষ্টিত হয়ে বন্দীশালার উঠোন অতিক্রম করছেন। জেনির কান্না-ভেজানো ডাক মার্কস্ শুনতে পেলেন না। বাতাসে উড়তে থাকা কাপড় চোপড় ঠিক করে নিচ্ছেন মার্কস্। ধীরে ধীরে বিরাট কালো পাথরের প্রশস্ত পথ দিয়ে মার্কস্ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সেই কক্ষ। মার্কস্ এবং কর্ণেল। কর্ণেল এখন অনেকটা ভদ্র এবং বিনম্র।

মার্কস্ আরাম চেয়ারে বসে। বিপরীত দিকের আরেকটি আরাম চেয়ারে কর্ণেল।

ক : হাঁা—আমি স্বীকার করছি—যে আমার অধঃস্তনেরা আপনার সঙ্গে মূর্খের মতো ব্যবহার করেছে। আপনার এখন বেলজিয়াম ছেড়ে যাবার কথা, অথচ আপনি এখানে বন্দীশালায়। এ অস্বাভাবিক, তাই না!
(কর্ণেল হেসে ওঠেন। অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকেন।)
আমার টেবিল আপনার বন্ধুদের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো প্রতিবাদলিপিতে ছেয়ে আছে। ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করতে পারেন। সবাই এও জানে যে বেলজিয়ামের রাজা কত হৃদয়বান মানবিক। কিন্তু এরকম ঘটে যাবে, এ অবিশ্বাস্য! যাকগে, আমি আশা করবো যে আপনি আমার পুলিশদের অতি উৎসাহকে ক্ষমা করবেন। আপনি এবং আপনারা উভয়েই এখন মুক্ত।

মা : (দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে) আমার পত্নী? তাঁকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল?

কর্ণেলও উঠে দাঁড়ান।

মা : (প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ) সেও গ্রেফতার হয়েছিল?

ক : মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে। এও এক মার্জনীয় ভ্রান্তি। কিন্তু এখন আপনি আপনার পুরো পরিবারকে নিয়ে নির্দ্ধারিত সময়ের ভেতর বেলজিয়াম ত্যাগ করতে পারেন।

মা : (ক্রুদ্ধ স্বরে) নির্দ্ধারিত সময়ের ভেতর?

ক : (অভিবাদন করছেন এবং হাসছেন) আপনার হাতে আর মাত্র দেড় ঘন্টা সময় রয়েছে। হিজ ম্যাজেস্টি আপনার জন্যে এর চাইতে বেশী সময় বরাদ্দ করতে পারলেন না।

মা : (তির্যক হাসি দিয়ে) রাজার কৃপাদৃষ্টিতে আমি প্রীত হলাম।

ব্রাসেলস-এর একটি রেল স্টেশন। ছেড়ে যাওয়ার ব্যস্ততা। মার্কস্ জেনিকে জড়িয়ে রেখে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন।

(আংশিক)

'পথের পাঁচালী'-র পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান নিয়ে সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। এই গ্রন্থে থাকবে 'পথের পাঁচালী' ছবির পটভূমি ও পরিকল্পনা নিয়ে বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য, দেশ বিদেশে এ ছবি নিয়ে আলোচনা ও আলোড়নের ব্যাপক ইতিবৃত্ত, বহু ছবি, স্কেচ ইত্যাদি। কুড়ি টাকা মূল্যের এই গ্রন্থটি বেরোবে ৩০শে ডিসেম্বর।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে ৩০শে নভেম্বর অবধি পনেরো টাকা জমা দিয়ে এই প্রামাণ্য গ্রন্থটির গ্রাহক হওয়া যাবে।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা

২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩

ফোন: ২৩-৭৯১১

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 March 1980 Vol. 13 No. 6

ফিল্ম সোসাইটির পত্রপত্রিকা পড়ুন

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার

চিত্রবীক্ষণ

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির

চিত্রপট

ক্যালকাটা সিনে ইন্সটিটিউটের

চলচ্চিন্তা ও মুভি মনতাজ

চন্দননগর সিনে সেণ্টারের

চিত্রণ

রাণাঘাট সিনে ক্লাবের

চলচ্ছবি

ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের

ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার

খড়দহ সিনে ক্লাবের

প্রেক্ষণ

নৈহাটি সিনে ক্লাবের

দৃশ্য

দমদম সিনে ক্লাবের

দৃশ্যশ্রব্য

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেলের

চিত্রকথা

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার

চিত্রকল্প ও কিনো

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির

চিত্রভাষ

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by h m at MUDRANEE. 131B. B. B. Ganguli Street. Calcutta-12.

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
এপ্রিল, '৮০

চিত্রবীক্ষণ

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : বাঁদিক থেকে ওপরে : 'ভারলোরেন মালহাপ' ও 'রাঁদেভু এ ব্রে'
বাঁদিক থেকে নীচে : 'বার্তা' ও 'লে ফিলস দ্য মর এজ মর্ট'

প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

বিষয়সূচী
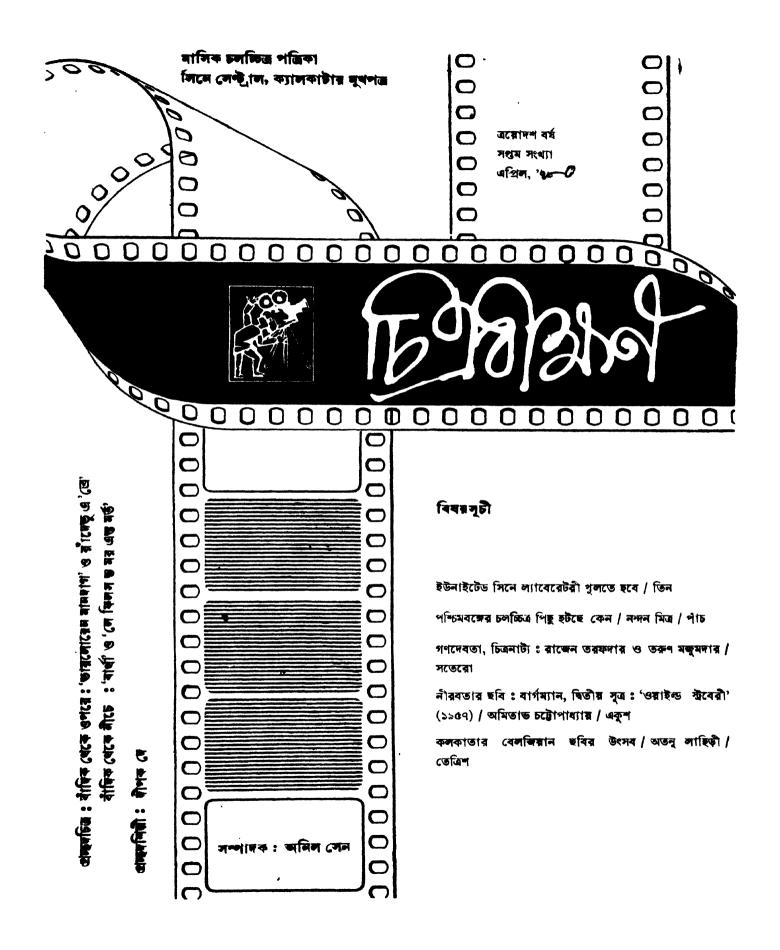
চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭১২১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।

* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ২, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী খুলতে হবে

দীর্ঘদিন হল ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী বন্ধ হয়ে রয়েছে। গত বছরের ১লা ডিসেম্বর থেকে এই ল্যাবরেটরীর মালিক শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়া একতরফাভাবে বে-আইনী ক্লোজার ঘোষণা করেছেন।

এই ল্যাবরেটরীতে কাজ করেন মাত্র বাইশ জন শ্রমিক-কর্মচারী। দীর্ঘদিন উপেক্ষা-বঞ্চনার পর এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যূনতম বেতনের দাবী জানাচ্ছিলেন সম্প্রতি। অন্যান্য স্টুডিও ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীদের মত তাঁরাও আন্দোলন সংগঠিত করার কথা ভাবছিলেন। মালিকপক্ষ এই দাবী পূরণে এগিয়ে না এসে বেছে নিলেন নিপীড়নের পথ। চারজন শ্রমিককে ছাঁটাই করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। স্বভাবতই শ্রমিক-কর্মচারীরা এই ছাঁটাই-এর আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে আন্দোলন সংগঠিত করে তুললেন। মালিকপক্ষ ঘোষণা করলেন ক্লোজার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ সালে স্টুডিও ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারী-দের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় দশবছর বাদে এই বেতনহারের জন্য ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীরা দাবী জানাচ্ছিলেন। এটাই তাঁদের অপরাধ। এই ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যূনতম বেতন যা পান তার পরিমাণ হল মাত্র ১৩৫ টাকা। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নেই, গ্রাচুইটি নেই—এই অসহনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন এটাই তাঁদের অপরাধ।

শ্রমিক-কর্মচারীদের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মালিকপক্ষ এই অন্যায় ক্লোজার চাপিয়ে দিয়েছেন যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাইশজন শ্রমিক-কর্মচারী তাঁদের পরিবার-পরিজন আর্থিক দিক থেকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের অর্জিত বেতন পাচ্ছেন না—প্রতিহিংসাপরায়ণ মালিকপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্লজ্জ-ভাবে শয়তানের মত ক্ষুধা-অনাহার ও নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে ঠেলে দিচ্ছেন—মালিকপক্ষের আশা এভাবেই কর্মচারীরা নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।

মালিকপক্ষের এই ঘৃণ্য ক্লোজার শুধু এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের বা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরই অসহনীয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলেনি এই ক্লোজার বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বহু নির্মীয়মান বাংলা ছবি এই ল্যাবরেটরীতে আটকে গেছে ফলে অনেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং এভাবে এসমস্ত ছবির প্রযোজক পরিচালক শিল্পী-কলা-কুশলীরা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারী-শিল্পী-কলাকুশলীদের সমস্ত সংগঠন সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ইউ-সি-এল-এর মালিক-পক্ষের এই অনমনীয় ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও শ্রম দফতরও এই শিল্পবিরোধে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু তবু শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়া অনড়, অপরিসীম ঔদ্ধত্য নিয়ে তিনি এই সম্মিলিত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে চলেছেন।

কাজেই ইউ-সি-এল-এর শ্রমিক-কর্মচারীদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাইশজন শ্রমিক কর্মচারীর পক্ষে মালিকপক্ষের এই অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্ত অংশের প্রতিনিধি-সংগঠনসমূহের এব্যাপারে মিলিত প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। ইউ-সি এল-এর শ্রমিক কর্মচারীরা একা নন সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে সেটা প্রমাণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের।

শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়ার মালিকানা ও পরিচালনাধীন উজ্জ্বলা, শ্রী ও উত্তরা এই তিনটি চিত্রগৃহের স্বাভাবিক প্রদর্শনসূচীকে ব্যাহত করার জন্য যৌথ কার্যক্রম নির্ধারণ করার প্রশ্নটিও আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এছাড়া অন্যভাবে শ্রীকান্‌কারিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার অন্য কোনো উপায় নেই। এব্যাপারে বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং সিনে টেকনিশিয়ান ওয়ার্কাস ইউনিয়নকে যৌথভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের দাবী ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী খুলতে হবে এবং এখনই।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভুপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০১৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র পিছু হটছে কেন ?

নন্দন মিত্র

এখানে শিল্প বলতে আমি শব্দটিকে Art ও Industry দুই অর্থেই ব্যবহার করতে চেয়েছি। বস্তুত বাংলা চলচ্চিত্রে যেমন শিল্প গুণসমন্বিত ছবি ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে তেমনি ব্যবসার বাজারেও বাংলা ছবি বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবিগুলির কাছে ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তা'হলে দেখা যাচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রে Art ও Industry এই উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই উভয়সঙ্কট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে প্রায় উপরোক্ত শিরোনামা দিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে কিন্তু বেশীরভাগ সমালোচকই এই সঙ্কটের গভীরে যাননি। এঁদের মধ্যে এক অংশের আলোচনায় মোটামুটিভাবে পরিবেশক প্রযোজক প্রদর্শক এই ত্র্যহস্পর্শের হাত থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের মুক্তির বিষয়ে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের-ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের উপর একের পর এক কর চাপানোর বিরুদ্ধে, দর্শন হিসাবে আদায়কৃত অর্থের সিংহভাগই যে প্রমোদকর হিসাবে রাজকোষে ও হল ভাড়া হিসাবে প্রদর্শকদের পকেটে চলে যায় এবং এই শিল্পে যে পুনর্নিয়োজিত হয় না সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল। তাঁরা প্রমোদকরের এক অংশ বাংলা ছবিকে ফিরিয়ে দেওয়া, সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি, ন্যূনপক্ষে একটা নির্দিষ্ট সময় হলগুলিতে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি দাবী জানিয়েছিলেন মাত্র, আলোচনাগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকটা গভীরভাবে আলোচিত হয়নি।

যদিও একথা ঠিক, যে ঐসব আলোচকরা সঙ্কটের যেসব দিক তুলে ধরেছিলেন তা যথার্থই ছিল তবুও বলতে হয় যে তাঁরা সমস্যার গভীরে যাওয়ার বদলে সমস্যাকে ওপর থেকে দেখেছিলেন কারণ তাঁরা শুধুমাত্র Industryর দিকটা নিয়েই ভাবিত ছিলেন ফলে সরকারি ভরতুকি ও রক্ষা কবচকেই সঙ্কট সুরাহার প্রধান পথ বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে Industry থেকে বেরিয়ে এলেও চলচ্চিত্র একটি Consumer Products (ভোগ্যপণ্য) নয়—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা হল একটি শিল্প মাধ্যমজাত পণ্য অতএব বাজারে ঘাটতি থাকলে যেমন নিম্নমানের ভোগ্যপণ্যও বিকিয়ে যায় চলচ্চিত্রের বেলায় তা সম্ভব নয় বরং বলা যায় কোনও চলচ্চিত্রের দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা না থাকলে কোনও প্রকার সাহায্য বা রক্ষাকবচই তাকে রক্ষা করতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি গত কয়েক বছরে বাংলা ছবির বিষয়বস্তু ও পরিচালনার দৈন্য সেই পর্য্যায়ে এসে ঠেকেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ও পরিচালনার মান উন্নত করাই মৌলিক প্রয়োজন। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যখন বাংলা ছবি তার মৌলিক সঙ্কট দূর করে আবার আগের মত দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হবে তখন ঐ পূর্বোল্লিখিত সরকারি ভরতুকি ও রক্ষাকবচ হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং হল মালিকদের শায়েস্তা রাখার ক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন হবে।

ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে আর এক অংশ 'চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মানের ক্রমাবনতির কথা লিখছিলেন, তাঁরা এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র Art এর সঙ্কট হিসাবেই দেখছিলেন—একে Industryর সঙ্কটের কারণ হিসাবে দেখেন নি। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য শিল্পের মত চলচ্চিত্রও একটি পণ্য সামগ্রীতো বটেই উপরন্তু অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের চেয়েও এই ব্যয়বহুল শিল্পমাধ্যমের পক্ষে এটি আরও বেশী করে সত্যি। অর্থাৎ বাংলার Film Industry রক্ষা না পেলে Art film ও পাওয়া যাবে না। আবার শুধু Art film করেও Industry টিঁকবে না কারণ আমাদের দেশে Art film দেখার দর্শক যে নগণ্য এটি একটি তিক্ত সত্য। যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, যেখানে আঙ্গিক সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের স্বাদ গ্রহণ করবার দর্শকের সংখ্যা খুব সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ ঐসব মননশীল সমালোচকরা দর্শকদের গাল পেড়ে এবং Art film না দেখার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সমাপন করছেন। এইসব সমালোচকরা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করার দিকেই বেশী মনোযোগী। এঁদের চিন্তাভাবনা গুটিকয়েক পরিচালকদের ঘরে ঘোরাফেরা করে। দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের শিল্পচেতনার এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোন্নয়নের ব্যাপারে এঁদের নীরবতার কারণ সাধারণ মানুষ থেকে এঁদের বিচ্ছিন্নতা।

এই আলোচনা থেকে এখানে Art film এর অথবা ভাল পরিচালকদের ছবির বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনার বিরুদ্ধে কোনও কটাক্ষ করা হচ্ছে না বরং বলা যায় চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোন্নয়নে আর্ট ফিল্মের ভূমিকা গাড়ীর স্টিয়ারিং এর মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র গুটিকয়েক পরিচালক বাদে অন্যসব পরিচালককে একই ভাবে নস্যাৎ করার যে ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে তারই বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা হচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ দর্শক চলচ্চিত্রের কোন ইতিবাচক দিকটা কতটুকু গ্রহণ করছিলেন,

সেই নিয়ে কোনও গবেষণামূলক আলোচনা প্রকাশের প্রয়োজন ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলি অনুভব করেনি।

তবে সাম্প্রতিককালে কলকাতা '৭৮ চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় সুধী প্রধান লিখিত 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট' প্রবন্ধে সঙ্কটের অর্থনৈতিক দিকটি গভীরভাবে আলোচিত। সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না করলেও তিনি এক জায়গায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের উল্লেখ করেছেন। ঐ পুস্তিকাতেই পরিচালক তরুণ মজুমদার ব্যবসাগত ও শিল্পগত এই উভয়সঙ্কটকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তবে আলোচনাটি অতি সংক্ষিপ্ত (এক পাতাও নয়) তাই এটি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমি পরবর্তী আলোচনাতে উপরোক্ত দুটি আলোচনা থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার করব।

সেন কমিশন রিপোর্ট

১৯৬৩ তে প্রদত্ত বহু উল্লেখিত সেন কমিশনের রিপোর্টে শিল্পের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত চেহারা পাওয়া গেলেও শিল্পগত সঙ্কটের সঙ্গে তাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি। রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে যেসব ছবির স্বাভাবিক পথে মুক্তি ঘটবে না সেগুলিকে 'অবশিষ্ট' ছবি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সেইসব ছবির মুক্তির ব্যাপারটি প্রদর্শকের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ নবাগতদের দ্বারা পরিচালিত বা অভিনীত আঙ্গিক সমৃদ্ধ ছবিগুলি মুক্তির ব্যাপারে বর্তমান অবস্থাটাকেই কার্যত সমর্থন করা হয়েছে। ঐ কমিশন যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেয় তাতেও ঐ সংস্থায় শুধুমাত্র চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে—ছবিগুলির মান রক্ষা বা উন্নত করার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

পরবর্তী আলোচনায় এটাই পরিষ্কার করার চেষ্টা করব যে বাংলা চলচ্চিত্রে শৈল্পিক মান উন্নত করতে না পারলে, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট মোচন হবে না। যদিও আমার আলোচনাটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কটের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবু এই সঙ্কটের গোড়াটা জানারও প্রয়োজন আছে! এই সঙ্কটের শুরু অবিভক্ত বাংলাতেই এবং সুধী প্রধানের আলোচনা থেকে যার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট

সুধী প্রধানের আলোচনা থেকে জানা যায় যে '৩৫ সালে ৭৭ টি (যার মধ্যে বাংলায় ১৯টি) '৩৬ সালে ৭১টি (বাং—১৯) বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে ভাল সময়। '৪১ সাল থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট শুরু হয়। ঐ সময় থেকেই অন্যান্য ভাষায় ছবির সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে এবং '৪৫এ গিয়ে যা ১৬তে দাঁড়ায়। এর কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বাইরে থেকে যেসব প্রযোজক কলকাতায় এসে ছবি করতেন তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং ঐ সময়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্টুডিওর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য যুদ্ধকালে কাঁচা ফিল্মের কোটা প্রথা চালু হওয়াও ছবির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ।

৪৭এ ৪১টি (বাং—৩২), '৪৮এ ৪৭টি (বাং—৩৭) ও '৪৯এ ৭৮টি (বাং—৬০) কলকাতায় (বিশেষতঃ বাংলা ছবি) নির্মাণের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াকে তিনি সংকট মোচনের লক্ষণ হিসাবে দেখেন নি (এখানে উল্লেখ্য যে বাজারি পত্রিকাগুলি '৪৯এর পরিসংখ্যানটি হাজির করে তাকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সুসময় বলে বর্ণনা করে থাকেন)। তাঁর মতে ছবি নির্মাণের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল বিক্রয়ের বাজারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কারণ সেই সময় দেশবিভাগ ঘটে গিয়ে পূর্ব-বাংলার বাজার নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধজনিত কালো টাকা চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত হওয়াতেই ছবির সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। "অপরপক্ষে ১৯৪৯ সালে যখন বাংলা ছবির উৎপাদন সর্বাধিক তখন তার সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। তখন থেকেই স্টুডিওগুলি বন্ধ হতে সুরু করেছে। কলা-কুশলী-শ্রমিক কর্মচারীদের বেকারী বৃদ্ধি পেয়েছে—নামকরা পরিচালকরা ১৯৫০ সালেই বোম্বাই মাদ্রাজ যাত্রা সুরু করেছে।"

তবে এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র বাজার জনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট হিসাবেই তিনি দেখেননি একে যুদ্ধকালীন সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করেছেন, "কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান সহরগুলির কাছে সৈন্য সমাবেশ করায় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য যে ধরণের ছবি বোম্বাই থেকে তোলা হয়েছিল তা বাংলা স্টুডিওর মালিক যাঁরা 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'উদয়ের পথে', 'ভাবীকাল', 'ডাক্তার' প্রভৃতি করেছেন তাঁদের পক্ষে তৈরী করা সহজ ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংকটও দেখা দিয়েছিল। উদয়শঙ্করের আলমোড়া কেন্দ্র রক্ষা করা যায়নি। হরেন ঘোষের মত ভারত বিখ্যাত ইমপ্রেসারিও এবং সতু সেনের মত নাট্য পরিচালক তাঁদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গানের দল নিয়ে বিভিন্ন সীমান্তে গিয়েছিলেন রোজগারের আশায়। সুস্থ সংস্কৃতির এই সংকট সূচনাকালের কথা মনে না রাখলে আমরা পরবর্তী অবস্থা বুঝতে পারবো না।"

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধকালীন সময় থেকে যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বোম্বাইতে নির্মিত হিন্দী ছবিতে ঘটেছিল তা দর্শকের রুচিকে পাল্টে দিল এবং কলকাতায় নির্মিত ডাবল ভার্সান ছবিগুলির সর্বভারতীয় বাজার-ও সঙ্কুচিত হতে থাকল। ক্রমে সেই বাজার দখল করে নিল বোম্বাইয়ে নির্মিত 'লারেলাপ্পা' মার্কা ছবিগুলি।

মূল আলোচনা

কিন্তু পঞ্চাশ দশকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প এই সঙ্কট অনেকটা কাটিয়ে ওঠে কারণ এই সময় পূর্ব বাংলার বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষ এপার বাংলায় চলে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সিনেমা দর্শক ছিলেন না; কিন্তু এখানে শহরাঞ্চলে বাস করবার সময় এঁদের অনেকেই সিনেমা দেখার অভ্যাস গড়ে তোলেন। এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্র তার হারানো বাজারের দর্শকদের কিয়দংশকে ফিরে পায়। অন্যদিকে আবার স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় মাঝারি ও ভারী শিল্প গড়ে ওঠায় এক বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরাও দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই নতুন দর্শকদের বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখতে যে শিল্পগত ও রুচিগত পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল বাংলার চলচ্চিত্র-নির্মাতারা সেই পরিবর্তন আনেন। এবং তা বাইরের অনুকরণে নয়। এই পরিবর্তন যে একই ধারায় হল তা নয় বরং এই পরিবর্তনকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চল ও সহরগুলিতে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এক শ্রেণীর উন্নত-মনা পরিচালক ও শিল্পীর 'উদয়ের পথে', 'ছিন্নমূল' ও 'নাগরিক'-এর মধ্য দিয়ে সমাজ সচেতন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তারই সফল পরিণতি ঘটল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'-তে। যদিও পূর্বোক্ত ছবিগুলির মত এই ছবিটির অত তীব্র সমাজ বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, তবুও 'পথের পাঁচালি' মাধ্যমে দর্শক ভেঙ্গে পড়া সামন্ত অর্থনীতির এক রূপ প্রত্যক্ষ করল। পরিচালক তাঁর মানবিকতাবাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের মানুষের কঠিন দারিদ্রের গল্প বললেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার প্রয়োগে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও উন্নত দক্ষতার ফলে ঐসব পুরানো যন্ত্রপাতির দ্বারাই অনেক উন্নততর কারিগরি কাজকর্ম বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা গেল। ক্যামেরাকে স্টুডিও-র বাইরে নিয়ে গিয়ে খরচ কমানো হল। সৃষ্টি হল নতুন অভিনয়ের ধারা যা নাটকীয় প্রভাব থেকে মুক্ত। এইসব পরিবর্তন এনে 'পথের পাঁচালি' বাংলা চলচ্চিত্রকে তার গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করল।

'পথের পাঁচালি'-র আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলা চলচ্চিত্রে আঙ্গিকের জোয়ার এনে দিল। সত্যজিৎ রায় এরপর তৈরী করলেন 'অপরাজিত' যাতে বিধৃত হল গ্রাম থেকে শহরে আসার কাহিনী—যা ধনতন্ত্র বিকাশের সময় সব দেশেই ঘটে থাকে। তার পরের ছবিগুলি 'পরশ পাথর', 'অপুর সংসার', 'দেবী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি তাঁকে শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতই করল না ইউরোপে বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় তাঁর ছবির সীমিত হলেও একটা বাজার সৃষ্টি করল।

সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি দেখা গেল ঋত্বিক ঘটকের মত শক্তিশালী একজন পরিচালককে। তাঁর 'অযান্ত্রিক' ও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মৃণাল সেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন 'বাইশে শ্রাবণ' এবং 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে। উপরোক্ত তিন পরিচালকের আঙ্গিকসমৃদ্ধ ছবিগুলি দেশের মননশীল সমাজে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু করল এবং এক নতুন চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করল। বাংলা চলচ্চিত্র শুধু দেশেই মর্যাদার আসন গ্রহণ করল না, বিদেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিখ্যাত সমালোচক জর্জ স্যাদুল লিখলেন, "And neo-realism may be dying in Rome or Tokyo but it's flourishing in Calcutta". . . . .

ঐ তিনজনের সমকক্ষ না হলেও ঐ সময় রাজেন তরফদার, বারীন সাহা, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অরূপ গুহঠাকুরতা প্রভৃতিদের মত আরও কিছু প্রথম শ্রেণীর পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা চলচ্চিত্র-ভাষার ব্যবহার জানতেন এবং ঐ শিল্পটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু তখনও একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ছবি ব্যতীত ('অভিযান'-এর সময় কাল থেকে) অন্য কোনও পরিচালকের ছবি উল্লেখযোগ্য বাজার সৃষ্টি করতে পারছিল না। আগেই বলেছি যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর যে দেশে এইসব ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঙ্গিকের কদর বোঝার মানুষের অভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব ছবিগুলি বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নত মান বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভের সুবাদে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেও এইসব ছবি দেখার ও আলোচনা করার প্রচণ্ড স্পৃহার সৃষ্টি হচ্ছিল।

পূর্বোক্ত এইসব পরিচালকদের সমক্ষমতাসম্পন্ন না হলেও এঁদেরই প্রভাবে তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর প্রমুখ কিছু পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁদের আমি আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করব। এদের ছবিগুলি পূর্বে সমাদৃত নিউ থিয়েটার্স-এর ছবিগুলির থেকে শুধু কারিগরি দিক থেকেই নয়, শিল্পগতভাবেও উন্নততর মানের ছিল। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও এসব ছবিতে অনেক আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সবের ফলে এঁদের সাহিত্য-নির্ভর পরিচ্ছন্ন ছবিগুলি সাধারণ রুচিবোধসম্পন্ন ও শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে একটা বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁদের সাহিত্যের মত করে (Verbally) গল্প বলার ভঙ্গী সাধারণ দর্শকদের কাছে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের অপেক্ষা অনেক সহজবোধ্য ছিল। অর্থাৎ যাঁরা চলচ্চিত্র বা শিল্পের চুলচেরা বিচার না করেও ভাল ছবি দেখতে চান তাঁদের জন্যই এই পরিচালকরা ছবি করতেন। আবার যাঁরা ছবির চুলচেরা বিচার করেন তাঁদেরও বৃহদংশ এই ধরনের ছবিরও দর্শক ছিলেন কারণ এইসব দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে উল্লিখিত পরিচালকদের ছবিও মাঝে মধ্যে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছিল।

প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা তাঁদের উন্নততর ছবির মাধ্যমে যেমন মননশীল দর্শকসমাজ সৃষ্টি করছিলেন তেমনি রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের ভূমিকা ছিল একই রকম। আবার এইসব রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের মধ্য থেকেই যে ক্রমে মননশীল দর্শক সমাজ সৃষ্টি হচ্ছিল তা বলাই বাহুল্য। এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের ও তার দর্শকের উন্নতমুখী মান সৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

ব্যবসায়িক ছবি

উপরোক্ত ছবিগুলি ছিল বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের একদিক কিন্তু যেসব ছবি বাজার দখল করেছিল সেগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের যাঁদের আমি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করব। এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকরাও নিউ থিয়েটার্স ও ম্যাডান থিয়েটারের রীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু এইসব পরিবর্তনগুলি ছিল বাহ্যিক যা ছবিতে চটক এনেছিল। কিন্তু তখন যে মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছিল তাঁরা এতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছিলেন অধিকতর আকর্ষণীয়, গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ ছিল আরও মিষ্টি, প্লে ব্যাকের ব্যবহার যেটাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল অনেক দুর্বল, গণিতের ছক অনুযায়ী। এইসব ছবিতে 'সাগরিকা' মার্কা উদাস করা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প থাকত; নায়ক ও নায়িকার ভুল বোঝাবুঝির বা স্মৃতিভ্রমের মাধ্যমে গল্পে জট সৃষ্টি করা হত এবং পরিশেষে দ্রুতগতিতে নাটকের জট খুলে মিলনান্তক পরিণতি দেখান হত। আর এই ভাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দ্রুতগতিতে দর্শক আকৃষ্ট হত এবং হাসি, কান্না, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ঘটত। তাছাড়া মধ্যবিত্ত দর্শককুল তাঁদের না পাওয়া-জনিত আশা-আকাঙ্খাকে এইসব সিনেমার মাধ্যমে চরিতার্থ করত (পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে) কারণ দর্শকরা অনেক সময়েই চরিত্রগুলির মনে নিজেদের একাত্ম করে ফেলতো। এছাড়াও বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা ছবি, বিভীষিকার ছবি এবং হাসির ছবি এখানে তোলা হত। এইসব ছবিতে যেসব তথাকথিত বক্স-অফিস উপকরণের সমাবেশ ঘটত তা এখানকার দর্শকের কথা স্মরণে রেখেই করা হত—বর্তমানের মত বোম্বাই ফর্মুলার অনুকরণে করা হত না তবে বেশিরভাগ ছবিই জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। পরিচালকরা তাঁদের নিজেদের পরিচালনা ও বিষয়বস্তুর দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই হোক অথবা এঁদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্যই হোক ঐসব নায়ক-নায়িকার চার-পাশেই ক্যামেরাকে যথাসম্ভব ঘোরাফেরা করাতেন। তবে ঐসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নিজেদের ঢংএই অভিনয় করতেন যেটা ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সৃষ্টি অথবা রঙ্গমঞ্চের প্রভাবপূর্ণ।

সেইসময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা যেসব নবাগতদের সুযোগ দিচ্ছিলেন তাঁদেরও অনেকে ব্যবসায়িক ছবিগুলিতে অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। আবার সে সময় ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ি সান্যালের মত বেশ কিছু চরিত্রাভিনেতাও ছিলেন যাঁদের অভিনয় সব ধরণের দর্শকই পছন্দ করতেন। এইসব অভিনেতাদেরও একটা বাজার ছিল।

ভালো গানের প্রতি ভারতীয় সিনেমা দর্শকদের বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে, এইসব পরিচালকরা সেটাও কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু সঙ্গীত পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা বাংলার লোকসঙ্গীত ও রাগ রাগিনীর ওপর নির্ভর করে তাদের সুর রচনা করতেন, গীতিকারদের গীত রচনায় প্রেমের উচ্ছ্বাস থাকলেও তাতে সংযম ছিল। আর এইসব গানগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যবসায়িক ছবিগুলি বাংলা ছবির বাজারে চল্লিশ দশকে যে ধর্মীয় ও পৌরাণিক ছবির স্রোত বইছিল তা রদ করতে পেরেছিল তার নিজস্ব বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চল্লিশ দশকের শেষে স্থানীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে যে ভয়াবহ সঙ্কট এসেছিল, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পরিচালকরাই পঞ্চাশ দশকেই তার মোকাবিলা করেছিলেন নিজের নিজের পদ্ধতিতে ফলে হিন্দী ছবির আগ্রাসন ব্যাহত হয়েছিল।

বাংলা ছবির চলচ্চিত্র-শিল্পে উপরোক্ত তিনটি ধারায় বিকাশের প্রথম দিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিগুলির জনপ্রিয়তা যার প্রমাণ বহন করছে।

সময়ের নিরিখে দেখা গেল যে (পাঁচ দশকের গোড়া থেকেই), তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকল। এর কারণ হল দর্শকের রুচি পরিবর্তনশীল। দর্শক যেমন শুধুমাত্র ভালো গানের জন্য একটা ছবি কয়েকবার দেখত অথবা বিষয়বস্তুর দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র অভিনয় দেখার জন্যই একটা ছবি বার বার দেখত—সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করল। দর্শক ভালো গল্প ও উন্নততর পরিচালনাও আশা করবে সাফল্যের। দর্শকদের রুচি যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সেই দর্শকদের মানের কথা জেনে পরিবর্তিত রুচি সৃষ্টির দায়িত্বও যে শিল্পীদের, এই সহজ সত্যটি ঐসব পরিচালকরা উপলব্ধি করলেন না। ফলে তাঁদের ছবি কিছুদিনের মধ্যেই দর্শকদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়ল। অথচ এঁদের সামনে অজস্র সুযোগ ছিল। হাসির ছবির কথাই ধরা যাক—আমাদের দেশের পরিচালকরা হাস্যরস সৃষ্টির নামে মেসবাড়ীর একটি দৃশ্যে কয়েকজন কৌতুকাভিনেতাকে জড়ো করে হাসি ঠাট্টা করানো অথবা অন্য কোনও দৃশ্যে দু-একজন কৌতুকাভিনেতাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভাঁড়ামো করানোই বোঝেন। সেই 'সাড়ে চুয়াত্তর' মার্কা ছবির সাফল্য থেকে এঁদের মাথায় এই যে ধারণাটা ঢুকেছিল তা আর কোনও দিনই বার করা যায়নি—এখনও সুযোগ পেলে এঁরা একই জিনিষ চালিয়ে যান।

এঁদের আর একটি দোষ হচ্ছে, এঁরা সবসময় একই কৌতুকাভিনেতাকে একই ধরণের অভিনয় করাতে চান। সেই মান্ধাতার আমল থেকে দেখে আসছি যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে বহুবার পূর্ববঙ্গীয় টানে কথা বলানো হয়েছে। অথচ এসব জিনিসের ক্রমাগত ব্যবহার দর্শকদের মধ্যে একঘেঁয়েমি আনতে বাধ্য। শুধুমাত্র কৌতুকাভিনেতাদের প্রধান ভূমিকায় রেখেও যে 'ভানু পেলো লটারি' অথবা 'পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছিল তার কারণ বাংলায় হাসির ছবির ভালো বাজার ছিল। অথচ এইসব উদাহরণগুলি এঁদের টনক নড়াতে পারেনি। তখন বাংলায় রবি ঘোষের মত শক্তিশালী এবং ভানু-জহর-এর মত জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা ছিল। তাঁরা ভানু-জহর জুটিকে দিয়ে বেশ কিছু নির্মল হাসির ছবি করতে পারতেন। এটা করতে তাঁরা এখানকার দর্শকের কথা মনে রেখেও লরেল-হার্ডির ছবির মত স্ল্যাপস্টিক অভিনয় ও দ্রুত ক্যামেরা সঞ্চালনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন। আসলে এইসব করতে যে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন আছে তারই অভাব এঁদের ঘটেছিল। সেই সময় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকরা কিন্তু তাঁদের মান অনুযায়ী 'একটুকু বাসা' ও 'বাক্স বদল'-এর মত নির্মল হাসির ছবি অথবা রবি ঘোষকে নাম ভূমিকায় রেখে 'গল্প হলেও সত্যি'-র মত ব্যঙ্গাত্মক ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এইসব পরিচালকেরা যে ধরণের ছবি করছিলেন তার মধ্যে অভিনবত্ব আনতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা নতুন বিষয়বস্তুও বেছে নিতে পারতেন যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা উপাখ্যান অথবা দেশ বিভাগ জনিত গল্প। পঞ্চাশ দশকে হেমেন ঘোষের 'ভুলি নাই' ও 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'বিয়াল্লিশ' অথবা সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি'-র মত ছবির উদাহরণ তাঁদের সামনে ছিল। কিন্তু সে সব পথে না গিয়ে ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে শিল্প-সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের ছবিকেও সেই পথে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ছবিতে নায়ক-নায়িকার বেলেল্লাপনা ও হোটেল নাচের দৃশ্য এবং চড়া সুরের মেলোড্রামা ঢোকাতে আরম্ভ করলেন যা পঞ্চাশ দশকের হিন্দী ছবিগুলিতে লক্ষ্য করা যেত। তবু এটাকে আমি হিন্দী ছবির অনুকরণ বলব না কারণ ঐরকম কয়েকটি দৃশ্য ঢোকানো ছাড়া এক্ষেত্রে মোটামুটি বাংলা ছবির নিজস্ব চরিত্র বহাল থাকত সেন্টিমেন্টের আধিক্যে। তবে এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় পঞ্চাশ দশকে হিন্দী ছবির সাফল্য যে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য সব দোষ পরিচালকদের দিলে ভুল হবে কারণ প্রথমত অদূরদর্শী প্রদর্শক-পরিবেশক-প্রযোজক গোষ্ঠীও এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় ইন্ধন জোগাতেন এবং দ্বিতীয়ত যে সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তাও এই প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করল। দর্শকদের একাংশ বিশেষতঃ ছাত্র ও যুব শ্রেণী এই ধরণের ছবিগুলির প্রতি তাৎক্ষণিক আকর্ষণ অনুভব করল। এইভাবে যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি আগেই হিন্দী ছবিতে অনুপ্রবেশ করেছিল বাংলা ছবিতেও তা ঢুকে পড়ল।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত 'সাগরিকা' মার্কা মোটা দাগের প্রেমের ছবিগুলি যা পঞ্চাশ দশকে সফলতা এনেছিল তা কিন্তু তখন থেকেই বাংলা ছবির দর্শকদের একাংশদের মধ্যে স্থূল রুচি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে ঐসব পরিচালকরাই যখন বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার পথ বর্জন করে ছবিতে অপসংস্কৃতি আমদানী করতে লাগলেন তখন দর্শকদের সেই রুচি স্থূলতর-রুচিতে পরিণত হল। আর এইভাবে সৃষ্ট স্থূলতর রুচিই দর্শকদের একাংশকে বিকৃত রুচির হিন্দী ছবির দিকে ঠেলে দিল। বিকৃত রুচি বলছি এই কারণে যে ষাট দশকের বোম্বাই থেকে নির্মিত হিন্দী ছবি লারে লাপ্পা মার্কা '৪২০' বা 'আওয়ারা'-র যুগ কাটিয়ে যৌনতা-হিংস্রতা মিশ্রিত 'জংলি'-'জানোয়ার'-এর রাজত্বে প্রবেশ করেছিল। এর ফলে এইসব ছবিগুলি স্থূলতর বাংলা ছবির চেয়ে ছিল অনেক প্রলোভনপূর্ণ তাই স্থূলতর রুচির বাংলা ছবির দর্শক পাশাপাশি হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাসও গড়ে তুলল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

দর্শকদের অধিকাংশের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁরা এইসব শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। তপন সিংহ-র ছবির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি সেইটাই প্রমাণ করে, 'অঙ্কুশ', 'কালা মাটি'র পথ বেয়ে তিনি করলেন 'কাবুলিওয়ালা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'নির্জন সৈকতে' ইত্যাদি। এঁদের উন্নতমুখী ছবির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের কদরও সাধারণ দর্শকদের কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে (শহরগুলিতে শিক্ষার প্রসারও এইভাবে সাহায্য করেছিল)। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' 'চারুলতা' ও ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' এবং অরূপ গুহঠাকুরতার 'বেনারসী' শুধু সংবাদপত্রের পাতাতেই নয় দর্শক কর্তৃকও উচ্চ প্রশংসিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকা দেখলেই পূর্বোক্ত উক্তির যথার্থতার বিচার হবে। ঐ বছরে 'আকাশ কুসুম', 'সুবর্ণরেখা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ও 'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর মত শিল্প গুণসমন্বিত ছবি মুক্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এইসব ছবি কলকাতা শহরেই সম্মিলিত ১৫ থেকে ২৫ সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল যা বর্তমানের বাংলা ছবির গড়পড়তা চলাকালীন সময়ের চেয়ে বেশী। ঐ বছরে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের যেসব ছবি মুক্তি লাভ করেছিল সেগুলি হল 'অতিথি', 'বাক্স বদল', 'একটুকু বাসা', 'রাজা

রামমোহন', 'আলোর পিপাসা' প্রভৃতি। এই ছবিগুলি তদানীন্তনকালে শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই সম্মিলিত ২৫ থেকে ৫০ সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল। এই সময় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবিগুলি বক্স অফিসের অনেক তথাকথিত দাবী মেটানো সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের ছবিগুলির পাশে দাঁড়াতে পারেনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ষাট দশকে বাংলায় যে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ছবি উঠত তাই নয়, শিক্ষিত ও রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ছবির স্বয়ংনির্ভর বাজারও গড়ে উঠেছিল। আর সেই সময় হিন্দী ছবির মান আগের চেয়ে আরও নেমে যাওয়ায় অবাঙালী রুচিবোধসম্পন্ন ও চলচ্চিত্রবোধসম্পন্ন দর্শকদের কাছেও এইসব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি বাজার পেতে থাকল।

কিন্তু এই অবস্থাতে ভাঁটা পড়ল। ষাট দশকের শেষ ভাগ থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বাংলা ছবির মানেরও ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা গেল এবং ফলশ্রুতি হিসাবে Industryতেও সঙ্কট দেখা দিল। অনেকেই তখন এই সঙ্কটকে রাজনৈতিক অস্থিরতা জনিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেটা আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু মূল কারণ নয়।

ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের প্রতিফলন

ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প তার দেশ বিভাগজনিত ও অন্যান্য কারণজনিত সঙ্কট যে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তা পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ধনতান্ত্রিক বিকাশ শৈশবাবস্থাতেই সঙ্কটে পড়ল এবং ঐ রাজনৈতিক অস্থিরতার এটিও একটি কারণ। গ্রামগুলিকে সামন্তশোষণ থেকে মুক্ত করার ব্যর্থতাই ছিল ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ।

চলচ্চিত্র-শিল্পে অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া বাংলার film Industryতেও পরিলক্ষিত হল। যে কোনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) একটি সাধারণ নিয়ম। এর ফলে বাংলা ছবির খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সঙ্কটের যুগে এই মুদ্রা-স্ফীতি আরও ব্যাপকহারে দেখা দিল। কয়েক বছরেই ছবি নির্মাণের খরচ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। 'অতিথি' নির্মাণ করতে যেখানে লেগেছিল আনুমানিক এক লক্ষ টাকা, কয়েক বছরে ঐ অঙ্কে ছবি করা হয়ে পড়ল কল্পনাতীত। এর সঙ্গে সরকারী কর ও হল মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধি যোগ হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাতে ছবির খরচ তোলাই মুস্কিল হয়ে পড়ল। আগে যে কালো টাকার খেলাটা চলছিল গোপনে ক্রমশঃ তা হয়ে পড়ল প্রায় খোলাখুলি (Open Secret)।

ঐ সময়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ গ্রামীণ শোষণ থেকে যদি গ্রাম বাংলার মুক্তি ঘটত তাহলে আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের উচ্চ খরচ মিটিয়ে শিল্পের সঙ্কট হ্রাস করা যেত। যে দেশের গ্রামের মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায় না, সে দেশের মানুষ সিনেমা দেখবে এমন আশা দুরাশা। অবশ্য এর সঙ্গে প্রয়োজন হত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার এবং ঐসব অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা কারণ সেই সময় গ্রাম বেষ্টিত ছোট ছোট শহরগুলিতেও বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সময় এর কোনটাই হবার ছিল না কারণ এইসব ব্যবস্থা তদানীন্তনকালের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

আর যে পথ খোলা ছিল তা অন্তত ভাল বাংলা ছবি নির্মাণের পথটি প্রশস্ত করতে পারত। ষাট দশকের গোড়া থেকেই যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারলাভের সুবাদে বাংলা ছবি সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও সংস্কৃতিবান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, তখন প্রয়োজন ছিল ডাবিং ও সাবটাইটেলের মাধ্যমে বাংলা ছবিকে ভারতের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়া যে পদ্ধতিতে আজ ইতালি ও ফ্রান্সের ছবিকে ইউরোপের বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

অবশ্য 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ও 'অতিথি' ইংরাজি সাবটাইটেল সহ ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু চিরাচরিত বাজারে অস্বাভাবিক সাফল্যের জন্যই প্রযোজকরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ঐ দুটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ধরণের প্রয়াসের ইতি ঘটেছিল। এই ব্যাপারটা যেহেতু বাজার সৃষ্টির (Sales Promotion) উদ্যোগ তাই সেটা সময়সাপেক্ষ ও পরিকল্পনামাফিক হওয়া প্রয়োজন কারণ রুচি সৃষ্টির এই প্রয়াসে প্রথম দিকে সফলতা নাও আসতে পারে। অতএব একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ষাট দশকের থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। শুধুমাত্র রাজ্য সরকার কর্তৃক 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে কি প্রচণ্ড জোয়ার এনেছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে অতএব সময় মত স্টুডিওগুলির আধুনিকীকরণ, সাবটাইটেলিং মেশিন ক্রয়, উন্নত মানের ছবিগুলি নির্মাণে এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সরকার তৎপর হলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এই দুর্গতি হত না। আর এটা ঘটলে যে বাইরে নতুন বাজারই সৃষ্টি হত তাই নয়, সেই সময় অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ সমাজে ও শিল্পে যে অবক্ষয় সুরু হয়েছিল উন্নতমানের ছবিগুলি তার পাশে চ্যালেঞ্জস্বরূপ কাজ করত এবং দর্শকের সচেতন অংশের কাছে সমাদৃত হত; সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের ছবিগুলির বেলায় যা ঘটেছিল (পরে আলোচিত)।

যাই হোক, উপরোক্ত পন্থাগুলির কোনটাই কার্যকরী না হওয়ায় এই সঙ্কট ঘনীভূত হল। ছবি তোলার খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রযোজকরা শিল্পগুণ-

সমন্বিত ছবি করার ঝুঁকি নিলেন না। ফলে একমাত্র সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ব্যতীত অন্য প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা কাজ পেলেন না। সত্যজিৎ রায় তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে দেশে বিদেশে যে বাজার সৃষ্টি করেছিলেন তার জোরে টিঁকে গেলেন। মৃণাল সেন বাংলায় ছবি করার সুযোগ না পেয়ে অন্য ভাষায় ছবি করে পরিচালক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। 'ভুবন সোম'-এর অস্বাভাবিক সাফল্যই তাঁকে আবার বাংলার চিত্রজগতে ফিরিয়ে আনল। আর ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৩-র পর থেকে ('সুবর্ণরেখা'র নির্মাণ কাল) ১২ বছরে মাত্র ২টি ছবি করার সুযোগ পান—একটি এফ, এফ, সি-র পয়সায় অন্যটি বাংলাদেশে। অন্যরা সেই সুযোগও পেলেন না। এইভাবে শিল্পগুণসমন্বিত ছবির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায়, ঐসব ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে উন্নত মান বজায় রাখতে এবং দর্শকদের মধ্যে ভাল ছবির প্রতি স্পৃহা সৃষ্টিতে যে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছিল তা গুরুতররূপে ব্যাহত হল। এটা প্রশংসনীয় যে প্রথম শ্রেণীর কোনও পরিচালক যে (একজন বাদে) যে এই সঙ্কটের মুখেও তাঁদের নিজস্ব মান থেকে নেমে শুধুমাত্র পরিবেশক, প্রদর্শক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য ছবি করেননি; এজন্য তাঁরা সুস্থ ও সচেতন সংস্কৃতিপ্রেমী প্রতিটি মানুষের ধন্যবাদার্হ।

সাংস্কৃতিক সঙ্কট

কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট তো একা আসে না, ভারতে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক বিকাশও ক্রমাগত ব্যাহত হচ্ছিল এবং যেটুকু বিকাশ ঘটছিল তাও আবার নয়া সাম্রাজ্যবাদী ইয়াংকি কালচার দ্বারা দূষিত হচ্ছিল। এইভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছিল তার কিছু পূর্বাভাষ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের দেউলিয়াপনার মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের যুগে সেই একই লক্ষণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবিতেও পরিলক্ষিত হল। সঙ্কটের যুগে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের যখন করবার কিছুই ছিলনা তখন একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরাই এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারতেন কারণ সেই সময় জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁদের ছবিগুলিই ছিল শীর্ষে। কিন্তু দেখা গেল, অসিত সেন-এর মত দুএকজন পরিচালক ভালো সুযোগ পেয়ে বোম্বাই পাড়ি দিলেন। যাঁরা রইলেন তাঁরা বুঝলেন না যে তাঁদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁদের গল্প বলার সহজ ভঙ্গী, পরিচ্ছন্নতাবোধ ইত্যাদি যা হিন্দীছবির বিকল্পরূপে পরিগণিত হচ্ছে এবং উন্নতমানের ছবি নির্মাণের মাধ্যমেই তাঁরা বাজার রক্ষা করতে পারবেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটজনিত সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়া তাঁদের ভাবনা চিন্তার দেউলিয়াপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল।

ঐ সময়ে তরুণ মজুমদার 'বালিকা বধূ' নির্মাণ করলেন। ঐ ছবি সফল হওয়াতে আরও কয়েক জন পরিচালক 'বালিকা বধূ' ফর্মুলা প্রয়োগ করে ছবি করলেন। এর পরে 'নতুন পাতা' বা 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিতে যখন আবার সেই একই জিনিষ অর্থাৎ কিশোরের সলজ্জতা, কিশোরীর ডানপিটেমি অথবা বাচ্চাদের মুখে পাকা পাকা কথার পুনরাবৃত্তি ঘটল তখন তা দর্শকদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়ল।

পরবর্তীকালে একদা সুফল তরুণ মজুমদারও যখন ঐ একই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' করতে গেলেন, তখন তাঁর পেশাদারী যোগ্যতাও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বহীনতাকে ঢাকা দিতে পারল না। ছবিটি প্রমোদকর মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং ছবিটিকে ছোটদের ছবি বলে প্রচার চালিয়েও, 'বালিকা বধূর' অর্দ্ধেক সাফল্যও অর্জন করা গেল না।

তপন সিংহও উচ্চ খরচ মেটাবার জন্য তাঁর নিজস্ব পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বোম্বাই থেকে চিত্রতারকা আনিয়ে হিন্দী মিশ্রিত বাংলা গঠন ও সংলাপের জগাখিচুড়ি ব্যবহার করে ভারতের হিন্দীভাষি অঞ্চলের বাজার ধরবার প্রয়াস চালালেন। এই ছবি করতে গিয়ে তিনি হিন্দী ছবির বাজারী রুচির প্রলোভনকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারলেন না। তিনি বিস্মৃত হলেন যে অবাঙালী দর্শকদের রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে বাংলা ছবির কদর উন্নতমানের বিষয়বস্তু, অভিনয় ও পরিচালনার জন্য। অন্যদিকে তিনি হিন্দী ছবির বাজারী রুচির দর্শককেও তুষ্ট করতে পারলেন না কারণ তিনি চিরাচরিত রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের বাজার ও জাতীয় স্তরে তাঁর খ্যাতিকে পুরাপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত না থাকায় তাঁর ছবিগুলি হিন্দী ছবিগুলির মত পরিপূর্ণভাবে বিকৃত রুচিকে গ্রহণ করতে পারছিল না। তাঁর মনোভাব ছিল শ্যামও রাখি ও কুলও রাখি ফলত তাঁকে দু-কুলই হারাতে হয়েছিল। তা ছাড়া হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঐভাবে বাংলা ছবি করতে গেলে যে অর্থলগ্নী করার ক্ষমতা ও রিলিজ চেন পাওয়ার প্রতিপত্তির প্রয়োজন হয় তাও তাঁর ছিল না।

এতদসত্ত্বেও পূর্বভারতে 'হাটে বাজারে' ও 'সাগিনা মাহাতো'-র সাফল্যের মূল কারণ হল যেসব বাঙালী দর্শক হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাও ছবি দুটি দেখেছিলেন। বোম্বাইয়ের চিত্রতারকাদের নাম দেখে বেশ কিছু অবাঙালী দর্শকও যে এই দুটি ছবি দেখেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐসব তারকাদের উচ্চ অঙ্কের টাকা ও তদুপরি তারিখ দেওয়ার অসুবিধা এই প্রয়াসে বাদ সাধল। লাভের মধ্যে এটাই হল যে ঐ পরিচালক বৃহত্তর হিন্দীভাষী অঞ্চলে বাজারী রুচির কথা মনে রেখে ছবি করার ফলে তাঁর ছবির মানের অবনতি ঘটল। 'কাবুলিওয়ালা', পরবর্তীকালে 'নির্জন সৈকতে'-র পরিচালককে 'রাজা'-র মত নিকৃষ্টমানের ছবি করতে দেখা গেল, এর ফলে রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে থাকল। তাঁর শেষ কটি ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্য যে ছবির গুণগত অবনতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা বাংলা ছবির

দর্শক মাত্রই স্বীকার করবেন, তরুণ মজুমদার দেরীতে হলেও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ'-এর পুনরাবৃত্তি না করে তিনি 'সংসার সীমান্তে' ও 'গণদেবতা'র পথ বেছে নিলেন।

অসৎ উদ্দেশ্যের ছবি

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকালীন ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাতে ভীত হয়ে এক ধরণের প্রযোজকদের প্ররোচনায় কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালক এমন সব ছবি নির্মাণ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে রাজনীতিগতভাবে বিভ্রান্ত করা। সমসাময়িক ছবি করবার অছিলায় তাঁরা কিছু উপরিবাস্তবতা (কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সৃষ্টিতে) দেখিয়ে মূল বাস্তবকে বিকৃত করছিলেন যেমন যুব সমাজকে দেখাবার নামে লুম্পেন চরিত্রদের হাজির করছিলেন। এইসব ছবি নির্মাণে সম্ভবত টাকার অভাব হত না কারণ বাস্তবের বিকৃতীকরণ ছাড়াও ছবিগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যও থাকত। ঐসব পরিচালকদের কাছে তখন বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থ গৌণ হয়ে পড়েছিল।

সংকটের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

ইতিমধ্যে সংকটের যুগে তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের অযোগ্যতা আরও প্রকট হয়ে উঠল, দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনা এমন স্তরে পৌছাল যে সফল সাহিত্যও ব্যর্থ চলচ্চিত্রে পরিণত হল। দু-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে ছবি তোলার যে অভ্যাস কয়েকজন পরিচালক গড়ে তুলেছিলেন, তা সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করল, এইভাবে গুরুত্ব পেয়ে ঐসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তারকায় পরিণত হলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তারকাদের নির্দেশেই এসব পরিচালকরা কাজ করতে লাগলেন। পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করে বলেছেন, "তারকারা যখন সাধারণ লেভেল থেকে উঠে অসাধারণ হয়ে উঠল, তখন ছবির আর সব অংশীদার নিজেদের অপ্রয়োজনীয় মনে করতে লাগলেন। তাদের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ছবিরও সামগ্রিক দাম শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে কমে গেল।" তরুণ মজুমদার অবশ্য এই স্টার সিস্টেম গড়ে ওঠার জন্য প্রদর্শকদের দায়ী করেছেন। এটা নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতেও যে এইসব তারকাদের ব্যবহার করতেন তাও সমানভাবে সত্য কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পরিচালকই তো স্টার সিস্টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তাই বলে কি তাঁদের ছবি মুক্তি পেত না আসলে প্রদর্শকরা এই দুই শ্রেণীর পরিচালকদের তফাৎটা বুঝত।

সেই সময়ে (সত্তর দশকের গোড়া থেকেই) তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা সংকটের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ভুলের পর ভুল করে যেতে লাগলেন। হিন্দী ছবির সাফল্যে প্রলোভিত হয়ে তাঁরা হিন্দী ছবিকে অনুকরণ করতে বসলেন। এইভাবেই বাংলা ছবিতে মোটা দাগের প্রেমের গল্পের যে ধারা ছিল তার অবসান ঘটল এবং তার জায়গায় এল ষাট দশকের হিন্দী ছবির অনুকরণে যৌনতা সর্বস্ব ও প্রতিহিংসামূলক ছবিগুলি। এই অনুকরণ-ছবিগুলিও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না কারণ প্রথমত যেসব স্থূল রুচির দর্শক যারা বাংলা ছবিতে চড়া সুরের মেলোড্রামা, অতিনাটকীয়তা অথবা ভারাক্রান্ত সেন্টিমেন্ট ভালবাসতেন অথচ বিকৃত রুচির নাচ-গান পছন্দ করতেন না সেইসব দর্শক এই ধরণের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করতেননা; অন্যদিকে বাংলা ছবির সেইসব দর্শক যাঁরা আগে থেকেই বিকৃত রুচির হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ছবির দর্শকে পরিণত হয়েছিলেন এইসব ছবি তাঁদেরও তুষ্ট করতে পারলনা কারণ সত্তর দশকে হিন্দী ছবিতে বিকৃতির মাত্রা অনেক পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল—'সঙ্গম'-এর যুগ পার হয়ে ক্রমে তা 'ববি'-র যুগের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যখন আর 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি' প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না বরং সরাসরি বললেই চলত 'হাম তুম এক কামরা মে বন্ধ হো'। অর্থাৎ যৌনতা ও নগ্নতা প্রদর্শনের ব্যাপারে এবং অশ্লীল গান ও সংলাপ ব্যবহারে তৎকালীন হিন্দী ছবি যেরকম নির্লজ্জতা দেখাতে পারছিল এখানে তৈরী সেই অনুকরণ-ছবিগুলি সেই অনুপাতে ছিল অনেক রক্ষণশীল; ফলে 'প্রেম করেছি বেশ করেছি' গানের মধ্য দিয়েও বিকৃতির চাহিদা মিটছিল না। অবশ্য এই সব চিত্র নির্মাতাদের অন্য পথও খোলা ছিল না কারণ মানের অবনতিও ধাপে ধাপে করতে হয়, হঠাৎ করায় অনেক অসুবিধা ও ঝুঁকি থাকে বিশেষত পশ্চিমবাংলার মত স্থানে যেখানে ঐতিহ্য-শালী সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং যেখানে প্রচুর রাজনীতি-সচেতন মধ্যবিত্ত মানুষ আছেন। এই ভুল পথে পা বাড়ানোর আগে ঐ পরিচালকদের এসব চিন্তা করা উচিত ছিল।

ভায়োলেন্স দেখাবার ব্যাপারেও হিন্দী ছবি ছিল বাংলা ছবির চেয়ে অনেক পটু কারণ অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে এটার প্রদর্শন হিন্দী ছবির আয়ত্তাধীন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যেখানে 'ফরিয়াদ' মার্কা অনুকরণ-গুলিকে Amatuerish মনে হোত। একজন দর্শক বাংলা ছবির নায়কের অসি চালনাকে ডাব কাটার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

হিন্দী ছবির ক্রমাগত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

ষাট দশকে যেখানে উন্নতমানের বাংলা ছবি অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলের উন্নতরুচির দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, সেখানে সত্তর দশকে এসে ঠিক উল্টো এক স্রোত দেখা গেল—হিন্দী ছবি বাংলা ছবির দর্শকের অন্য এক অংশকে টেনে নিচ্ছে আগের চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে। শুধু বাংলা ছবিগুলির নেতিবাচক ভূমিকাই যে দর্শককে হিন্দী ছবিগুলির দিকে ঠেলে দিয়েছিল তাই নয়, হিন্দী ছবির কর্ণধাররাও দর্শককে টেনে নেওয়ার জন্য

যথেষ্ট ব্যবসায়িক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। আর এইভাবে নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমেই হিন্দী ছবি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য এই সঙ্কট থেকে হিন্দী ছবিও রেহাই পেতনা যদি না আগে থেকেই তার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে বৃহত্তর বাজার থাকত। ভারতে হিন্দীভাষী মানুষের সংখ্যা সর্ববৃহৎ হওয়ায় গোড়া থেকেই হিন্দী ছবির এই প্রাথমিক সুবিধা ছিল। আবার পশ্চিম ও উত্তরের অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী সহজবোধ্য হওয়ায় তার বাজার বাড়াবার বিশেষ সুবিধা ছিল।

আর এই বৃহত্তর বাজার থাকার ফলে হিন্দী ছবিগুলির আঞ্চলিক ছবিগুলির চেয়ে অর্থলগ্নী করার অনেক বেশী ক্ষমতা ছিল, তাই হিন্দী ছবিকে সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারের অঢেল সুযোগ এনে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত বাদে ভারতের অন্যান্য স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় ছবি নির্মিত হতনা বললেই চলে সেইসব স্থানে হিন্দী ছবি প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে যেসব স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় ছবির বাজার ছিল, সেইসব স্থানেও হিন্দী ছবি আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলির বিনিময়ে কিভাবে নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল তা পরবর্তী আলোচনায় প্রকাশ পাবে।

এঁরা ধর্মীয় ছবি নির্মাণ অব্যাহত রেখেছিলেন যেহেতু এঁরা জানতেন ভারতের বৃহৎসংখ্যক মানুষ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হওয়ায় নানারকম অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে ভুগছে। ফলে ঐসব ধর্মীয় ছবিতে যখন দেব-দেবীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ট্রিক শটের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থিত করা হত তা তাদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত এবং স্বাভাবিক কারণেই এইসব ছবির বাজার ছিল। অবশ্য হিন্দী ছবির কর্ণধাররা এটাও জানতেন যে এইসব ছবির যাঁরা প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাঁরা যে শুধু অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত তাই নয়, তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকেও পেছিয়ে পড়া শ্রেণী। অন্যদিকে যাঁদের নিয়মিত সিনেমা দেখার সঙ্গতি আছে শহরের সেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে এইসব ধর্মীয় ছবি সেরকম আমল পাবেনা কারণ তাঁরা যে শুধু অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাই নয়, বড় শহরে বাস করার ফলে তাঁদের মধ্যে এক ভিন্ন মানসিকতা কাজ করছে। তাই ধর্মীয় ছবি করা ছাড়াও এর পাশাপাশি এঁরা মূলত শহরের মানুষদের অন্য ধরণের হিন্দী ছবির প্রতি আকর্ষিত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং তা করতে প্রচণ্ড ব্যবসায়িক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

১) এঁরা ভাষার গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন। এঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের জনপ্রিয় গানের সুরকে ও সফল আঞ্চলিক ছবির গল্প কিনে নিয়ে হিন্দী ছবিতে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন ফলে এঁদের অর্থলগ্নী অনেক নিরাপদ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ব্যবসায়িকভাবে সফল পরিচালকদের নিয়ে আসার মত আর্থিক ক্ষমতা এঁদের বরাবরই ছিল। এইভাবে বিভিন্ন স্থানের একটা পাঁচমিশেলি কৃত্রিম সংস্কৃতির উদ্ভব এঁরা ঘটিয়েছিলেন যাকে আমি এখানে হিন্দী ফিল্ম কালচার বলে অভিহিত করছি। এই কালচার শহরের ও শিল্পাঞ্চলের পেছিয়ে পড়া শ্রমিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসাদ লাভ করেছিল। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বিবিধ ভারতীর মাধ্যমে হিন্দী ফিল্মের গানের অবাধ প্রচারের যে সুযোগ করে দিলেন তা সমস্ত ব্যাপারটাকে সাহায্য করল।

২) যে কোনও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখেই পুঁজিবাদীরা কারিগরি উন্নতির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্কট কাটায়। এক্ষেত্রে বৃহত্তর বাজার থাকার জন্য রঙিন ছবি করার অধিক খরচ বহন করবার সামর্থ হিন্দী ছবির ছিল। ফলে বেশীরভাগ হিন্দী ছবিই রঙীন হয়ে নির্মিত হতে থাকল। তার সঙ্গে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও ব্যয়বহুল সেট-সেটিং ব্যবহারের ফলে হিন্দী ছবি মানুষের কাছে অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। দর্শক যে পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে এইসব মেক-বিলিভ ছবিগুলি দেখতে যেত উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি ছিল তারই আবশ্যিক পরিপূরক। এখানে অবশ্য এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে ও কালার র-স্টক দেওয়ার ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের হিন্দী ফিল্মের কর্ণধাররা আঞ্চলিক ছবিগুলির থেকে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেত। এমন কি, সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালককে পর্যন্ত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র জন্য কালার র-স্টক পেতে প্রচণ্ড বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৩) কোনও শিল্পমাধ্যমে যখন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন উচিত সেই শিল্পের মানকে স্থিতাবস্থা থেকে বার করে এনে, তার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে দর্শকের রুচির মানোন্নয়ন ঘটানো অন্যথায় মানের অবনতি ঘটে দর্শকের রুচিও বিকৃত হয়ে যায়। বোম্বাই মার্কা ছবিগুলি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিল কারণ তারা জানত যে ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে সৃষ্টি অবক্ষয় দর্শকদের বৃহদংশকে এই সব বিকৃত রুচির ছবির প্রতিই আকর্ষিত করবে। সেটা করতে গিয়ে হিন্দী ছবির কর্ণধাররা সমস্ত রকম পিছুটান বর্জন করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে হিন্দী ছবিতে সেক্স ও ভায়োলেন্সের প্রাধান্য এনেছিলেন যার সম্বন্ধে পূর্বে উদাহরণ সহ কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। দেশের ছাত্র, কিশোর, তরুণ, যুবক ইত্যাদিদের মধ্যে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তার ফলে এরা সহজেই হিন্দী ফিল্মের শিকার হয়ে পড়ল, হয়ে পড়ল হিন্দী ফিল্ম কালচারের বশবর্তী। এইভাবে ঐ ধরণের হিন্দী ছবি এক শ্রেণীর 'Ready Made' দর্শক সৃষ্টি করল।

৪) হিন্দী ছবির কর্ণধারদের হাতে (সাদা ও কালোয়) অনেক অর্থ থাকার ফলে তারা দাদন দিয়ে এবং বেশী ভাড়া দিয়ে যেসব হলে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষার ছবি প্রদর্শিত হত সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে কব্জা করে

ফেললেন। যার ফলে আঞ্চলিক ছবিগুলি মুক্তি পেতে বহু বিলম্ব হতে লাগল এবং অর্থ বিনিয়োগ বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে গেল। এইভাবে তাঁরা আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলিকে কোণঠাসা করে ফেললেন।

৫) এইসব হিন্দী ছবির বাজেটের একটা বড় অংশ ছবির প্রচার ও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়িত হয়। এইসব প্রচারের উদ্দেশ্য ছবির অন্তঃসার-শূন্যতা ঢাকা দিয়ে ছবি দেখার আগেই দর্শকদের সামনে গ্ল্যামারের এক কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, এমন একটা Craze সৃষ্টি করা যাতে ছবি মুক্তির কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোটা টাকার অংশ তুলে ফেলা যায়।

যাই হোক, এই সঙ্কটের যুগেও হিন্দী ছবির কর্ণধাররা তাদের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল কারণ এইসব বুর্জোয়াসুলভ ব্যবসায়িক তৎপরতার ফলে আসমুদ্র-হিমাচলে তারা নতুন বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আর বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির সঙ্কটের বোঝা বইতে হল ক্ষুদ্র ব্যবসার আঞ্চলিক ছবিগুলিকে।

বাংলা ছবির মানের চরমাবনতি

বাংলা ছবির কথায় ফিরে আসা যাক। হিন্দী ছবির সফলতার পেছনের সমস্ত কারণগুলি না বুঝে, শুধু সেক্স ও ভায়োলেন্স ঢুকিয়ে অন্ধ অনুকরণের ফল দাঁড়াল যে সেন্সরের তারিখ অনুযায়ী নিয়ম করে যেভাবে বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছিল দর্শক সমাগম না হওয়ার জন্য ঠিক তেমনি নিয়ম করে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলি উঠে যেতে লাগল তখন ঐসব পরিচালকদের উচিত ছিল ঐ আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরে আসা কিন্তু তবু এই ধরণের বেশ কিছু ছবি নির্মিত হতে থাকল।

যদিও প্রথমদিকে হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই এই ধরণের ছবি নির্মিত হয়েছিল কিন্তু প্রদর্শক-পরিবেশক-প্রযোজকদের প্ররোচনায় অসদুদ্দেশ্যে এই ধরণের ছবি নির্মিত হতে থাকল। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের পরবর্তীকালের এক অংশ যেমন প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য সমন্বিত বিভ্রান্তিকর ছবি নির্মাণ করছিলেন (পূর্বে যার উল্লেখ করেছি) ঠিক তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের এক অংশ অপসংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে লাগলেন যার উদ্দেশ্য ছিল যাঁরা হিন্দী ছবি দেখেন না তাঁদের রুচিকেও বিকৃত করে দিয়ে অবক্ষয়কে দ্রুততর করা। এর জন্য কালো টাকার অভাব হতনা। আর এটা ছিল তদানীন্তন কালের (সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়) অসুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ।

সেই সময় সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির মান এত নেমে গেল যে জাতীয় স্তরে গৌরবের আসনটি কানাড়ি ও মালয়ালাম ছবি দখল করে নিল। এক বছর তো বাংলা ছবি আঞ্চলিক ভাষার পুরস্কারটি পর্যন্ত পেল না।

সঙ্কটের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা সঙ্কট নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে দুটি ভুল করেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা ভাবেননি যে বুর্জোয়া অবক্ষয়ের চলচ্চিত্র নির্মাণে বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত অর্থ সংস্থান বা বাজার কোনটাই তাঁদের নেই ; দ্বিতীয়তঃ তাঁরা দেখেননি যে অর্থনৈতিক সামাজিক অবক্ষয়ের দরুণ যদিও এক ধরণের বিকৃত রুচির দর্শক সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবিকে অনেক আকর্ষণীয় মনে করছিলেন কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে এক বিরাট সংখ্যক উন্নত রুচির দর্শকও সৃষ্টি হচ্ছিল যাদের আমি পূর্বে মননশীল ও রুচিবোধ সম্পন্ন বলে অভিহিত করেছি। তাঁরা এটাও বিস্মৃত হয়েছিলেন যে দেশের মানুষ রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন ; যাঁরা মাইকেল, নজরুল, সুকান্ত রচিত কাব্যের অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা বহু বছর ধরে বাংলার নাট্য আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন এবং সর্বোপরি যাঁরা সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণালের ভিতর দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রম বিকাশ দেখেছেন— তাঁদের সকলেই বিকৃত রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষের পক্ষে এটা আরও বেশী করে সত্য। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এটা দেখা গেছে যে মুহূর্তে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, যে মুহূর্তেই তাঁদের ছবির জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছিল। এই বিষয়ে সবচেয়ে নিরাশ করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা কারণ তাঁদের কোনক্রমেই অযোগ্য বলা চলে না।

উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টি

উন্নত রুচির দর্শক যে সৃষ্টি হচ্ছিল তা সেই সমাজে যে দুজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি থেকেই বোঝা যায়। সত্যজিৎ রায় খুবই উন্নতমানের ছবি করার ফলে পঞ্চাশ দশকে সাধারণ দর্শকের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য ছিলেন কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ষাট দশকেই সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তীকালে সামাজিক অবক্ষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করাতে ঐ গতি অব্যাহত রইল এবং সত্তর দশকে তাঁর সবকটি ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সেই কথাই প্রমাণ করে। মৃণাল সেনও তাঁর ছবির বিষয়বস্তুতে সমসাময়িক ঘটনাবলীকে স্থান দিয়ে ও নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে বাংলা চলচ্চিত্রের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। মৃণাল সেনের ছবিতে সোচ্চার রাজনৈতিক বক্তব্য থাকার ফলে ক্রমেই তাঁর ছবি রাজনীতি-সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এইভাবে তিনি নিজের ছবির বাজারই শুধু বাড়ালেন না, তিনি অর্জন করলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই সময়ে বাজারে ঋত্বিক ঘটকের নতুন কোন ছবি না থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল, তাঁর পুরানো ছবিগুলি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কোনও বক্স অফিসের উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও অগ্রদূতের 'স্বাতী' অস্বাভাবিক সাফল্য

অর্জন করল। এই সময়ের ভেতর এক শ্রেণীর দর্শকের রুচি কি পরিমাণ উন্নত হয়েছিল তা ঋত্বিক ঘটকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, "দর্শকের ক্ষেত্রেতো নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন এসেছে, ভালো ছবি সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেড়েছে বিশেষ করে কমবয়েসী ছেলেদের মধ্যে………"(সাক্ষাৎকার/চিত্রবীক্ষণ আগস্ট-সেপ্টে, ৭৩সং)। এই প্রসঙ্গে উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেনের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখও তিনি করেন।

ঐ দুই পরিচালকের উন্নত মানের ছবিগুলির জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কটের মুখে ওটাই ছিল সঠিক পথ। আর এটা শুধু বাংলা ছবির পক্ষেই সত্য নয়, বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির চাপপিষ্ট প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার ছবির পক্ষেই সত্য।

কানাড়ি ছবি

এই মানোন্নয়নের মাধ্যমে যখন কানাড়া ও মালয়ালম ভাষায় নির্মিত ছবিগুলি শুধু জাতীয় পুরস্কারগুলিই দখল করছিলনা, ঐ দুই ভাষাতে ছবি নির্মাণের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে মালয়ালাম ছবি 'চেম্মিন' দিয়ে এই ঝোঁকের সূচনা হয়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছে কানাড়ি ছবিগুলি। 'বেলমোড্ডা', 'সংস্কারা' 'ঘটশ্রাদ্ধ' 'বংশবৃক্ষ' প্রভৃতি কানাড়া ভাষায় নির্মিত ছবিগুলি চলচ্চিত্র-সচেতন মানুষের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রাখেনা। আর ১৯৫৯ সালে যেখানে মাত্র ৫ খানি কানাড়ি ছবি তৈরী হয়েছিল, ১৯৭১এ তা বেড়ে দাঁড়াল ৪৪ খানায়, '৫২তে স্টুডিও যেখানে ছিল একটি সেখানে '৭১এ স্টুডিও বেড়ে হল চারটি—সবমিলিয়ে ফ্লোরের সংখ্যা ১২টি। আর এখানে পঞ্চাশ দশকে যে কটা স্টুডিও ছিল, সত্তর দশকে এসে তার বেশ কটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মানের অবনতি ঘটেছিল। অতএব পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের উভয়সঙ্কট যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা চলচ্চিত্রে পরিচালকদের সংকট নির্ণয়ে ব্যর্থতা ও মান অবনমনের অন্যতম আর একটি প্রধান কারণ হল যে বাংলা চলচ্চিত্রে নবাগতদের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজও পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে শিল্পগুণসমন্বিত ছবি করার দিক থেকেই হোক অথবা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ছবি করার দিক থেকেই হোক, তা এখনও পঞ্চাশ দশকে কাজ শুরু করা মানুষগুলির মধ্যেই আবদ্ধ।

ছবির খরচ অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় আগে প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন পরিচালক খুব অল্প খরচে ছবি করে যে ভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছিল। অন্য দিকে ধনতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতে একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল ফলে ষাট দশকের শেষ থেকে কোনও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকের সমাগম ঘটেনি। দু-এক জন সম্ভাবনাময় পরিচালকদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হবার স্বপ্ন দেখে নিজেদের ক্ষমতার বাইরে ছবি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন অথবা ব্যবসায়িক চাপে আপোষ করেছিলেন। বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যাবার ফলে, প্রযোজকরাও তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের মধ্যেই পুরোনো মুখ পছন্দ করতেন।

এর সঙ্গে নতুন এক উপসর্গ দেখা গেল। সঙ্কটকালে ছবি নির্মাণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় স্টুডিওতে নিযুক্ত কর্মীদের কাজ দেওয়াই মুস্কিল হয়ে পড়ল। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই কর্মীদের Protection দেওয়ার জন্য নতুন কর্মী নিয়োজনের প্রশ্নে বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। এমন কি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালকদের নিজেদের সহকারী নিয়োগের ব্যাপারেও স্বাধীনতা খর্ব করা হল। যদিও একথা ঠিক যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না, তবু film industry যেহেতু অন্য industry থেকে আলাদা চরিত্রের তাই প্রতিভাবানদের আসার ব্যাপারে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। অথচ এর পাশাপাশি নবাগতদের আগমন অব্যাহত থাকার ফলে পশ্চিম বাংলাতে নাট্য আন্দোলন ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছিল এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল।

এই সময়ে চলচ্চিত্রের মত ব্যয়বহুল একটি শিল্প মাধ্যমে নবাগতদের আগমন অব্যাহত ও প্রতিভাধরদের সুযোগ দান করবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। তদানীন্তন মহীশূর রাজ্যে সরকারের অর্থ সাহায্যের ফলেই বহু নবাগত পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এর ফলেই কর্ণাটকে আজ শুধু ভাল ছবিই নির্মিত হয় না, বেশী সংখ্যক ছবিও নির্মিত হয় যদিও কানাড়ি ভাষায় কথা বলেন এমন মানুষের সংখ্যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের চেয়ে অনেক কম।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুর্বলতা

এই সময়ে ফিল্ম সোসাইটিগুলির উচিত ছিল রুচিবোধসম্পন্ন ও মননশীল ছবিগুলিকে প্রচারের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা কিন্তু কলকাতার অদূরে মফঃস্বল সহরের একটি ফিল্ম সোসাইটি ব্যতীত অন্য কোনও সোসাইটিই এই গুরু দায়িত্ব পালন করেনি। তাঁরা যেভাবে নিজ অঞ্চলে কয়েকটি ভাল ছবি দেখবার জনমত গড়ে তোলেন তা সব সোসাইটির অনুকরণীয় হওয়া উচিত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ধনতন্ত্রের ঐ সঙ্কট চলচ্চিত্র আন্দোলনকেও স্পর্শ করেছিল।

পূর্বতন রাজ্য সরকারগুলির নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

রাজ্য সরকার কর্তৃক 'পথের পাঁচালি' নির্মাণ বাংলা চলচ্চিত্রে যে জোয়ার এনেছিল তাতে ঐ শিল্পের নাব্যতা যে বহুদিন বজায় ছিল তা পূর্বের আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে, অথচ এরপরেও রাজ্য সরকারগুলি চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। পূর্বালোচিত ১৯৬২তে

নিয়োজিত সেন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেও কোনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অবশ্য ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়োজিত চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করেন কিন্তু সেই সরকারের পক্ষে বিশেষ কাজে আর এগোনো সম্ভব হয়নি।

পূর্বতন রাজ্য সরকারের নৈরাজ্যজনক ভূমিকা

পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলেই বাংলা চলচ্চিত্রের মান সবচেয়ে নেমে যায় এবং সংকট গভীর থেকে গভীরতর পর্য্যায়ে প্রবেশ করে। বাংলা চলচ্চিত্রের মান নেমে যাওয়ার ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করতে তদানীন্তন কালের বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়াও একটি উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। সেই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রায় বিনা বাধায় অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছিল। একদিকে যখন মাননীয় মন্ত্রী 'ববি'র পার্টিকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আপ্যায়ন করতেন, 'বারবধূ'কে (নাটক) সার্টিফিকেট দিতেন অথবা পুরস্কার বিতরণী সভায় পরিচালকদের আরও 'অমানুষ'-এর মত ছবি করার উপদেশ দিতেন তখন বোঝাই যায় যে তাঁরা দেশে অমানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের উন্নতি নয়।

পূর্বতন রাজ্য সরকার চলচ্চিত্রকে কোন দিনই শিল্প মাধ্যম হিসাবে ভাবেন নি বরং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে পণ্য হিসাবেই ভেবেছিলেন নতুবা বোম্বাই থেকে নায়ক আনিয়ে কলকাতায় বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবি তোলার কথা ভাবতেন না—সৌভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়নি। বাংলা ছবি প্রদর্শনের জন্য অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ সময় বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব অথবা ছবি নির্মাণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার revolving fund গড়বার প্রতিশ্রুতি, সোনার বাংলা গড়বার আর সব কটা প্রতিশ্রুতির মত বক্তৃতার জালেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। অবশ্য কিছুই করেনি বললে মিথ্যা হবে—সোনার বাংলা গড়তে না পারলেও, 'সোনার কেল্লা' নামে একটি ছবি তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এবং 'পথের পাঁচালি' যে জোয়ার ১৯৫৫র পরবর্তী বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এনেছিল, এক 'সোনার কেল্লা'-র সে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ছিল না। সেই সময় প্রয়োজন ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য অর্থলগ্নীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাংস্কৃতিক মানের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু সেরকম গঠনমূলক ব্যাপার তো দূরের কথা ঐ সরকার মেয়াদের শেষদিনগুলিতে হঠাৎ বাংলা ছবির ভালোবাসায় গদগদ হয়ে ব্যাপকভাবে করমুক্তির আদেশ দিলেন। বাংলা ছবির স্বার্থ নয়—ঐ সরকারের শেষদিনগুলিতে রাজ্যের অর্থকোষকে শূন্য করে দেওয়ার যে বৃহত্তর পোড়া মাটি নীতি অবলম্বিত হয়েছিল, এই বদান্যতা ছিল তারই অংশ বিশেষ।

বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা

বর্তমান সরকার যে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচনে আগ্রহী, সেটা তাঁদের কাজকর্মে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছেন যে এই সংকট শুধুমাত্র Industry-রই নয়, Art এরও বটে এবং এই দ্বিমুখী সংকট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই বর্তমান সরকার নিজস্ব ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীরূপে উল্লেখিত পরিচালকদেরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সরকারের প্রযোজনায় মৃণাল সেন তাঁর 'পরশুরাম' ছবি শেষ করেছেন এবং উৎপল দত্তের 'ঝড়' সমাপ্তির মুখে, তা ছাড়া সত্যজিৎ রায় ও রাজেন তরফদারও সরকার কর্তৃক প্রযোজিত ছবি পরিচালনা করতে রাজী হয়েছেন। তবে অনেক প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যখন অলস দিন কাটাচ্ছেন তখন একজন সফল নাট্যকারকে দিয়ে ছবি করানোর ব্যাপারটায় সঙ্গত কারণেই অনেক সম মত পোষণ করছেন না।

তাছাড়া সরকার শিশুদের জন্য আলাদা ছবি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এই বছর পাঁচটি শিশুচিত্র নির্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে শিশুচিত্র করার সময় সরকারকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে যে ঐসব চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিরোধী অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনও ধারণা যেন শিশুদের মগজে প্রবেশ না করে এমন কি সে ছবি খুব বড় কোনো পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয় তবুও যেমন অন্যান্য ছবি প্রযোজনার সময় সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত সেইসব ছবিতে 'শিল্পের জন শিল্প'র কচকচানি না থাকে তাতে যেন মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কথা শিল্পসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর ছবি নির্মিত হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে হল মালিকরা যাতে অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে সেইজন্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি আর্ট থিয়েটার গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন।

আবার ভাল ছবি মুক্তি পেলেই তো হবে না তাকে ব্যবসায়িকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চাই সত্যিকারের ভালো দর্শক, কেউ যদি শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠি দিয়ে এঁদের সংখ্যাকে বিচার করেন তবে তিনি ভুল করবেন কারণ এঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে দর্শকের এমন এক অংশ এঁদের ছবি দেখতে ভীড় করেন, রাজেন তরফদারের ছবি মুক্তি পেলে যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা যাঁরা হরিসাধন দাশগুপ্তের নাম পর্যন্ত শোনেননি।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল, তা ঐ ধরণের দর্শক সৃষ্টি হওয়াকে গুরুতররূপে ব্যাহত করেছিল। সুখের কথা এই যে, রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টি হওয়ার

(শেষ অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়)

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

চৌধুরী মশাই ও ছিরু পাল

ছবি : ধীরেন দেব

গণদেবতা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মিশ্র।

দৃশ্য—১৬

(গ্রহণ করা হয়নি)

দৃশ্য—১৭

(বিলুর সংস্কৃত বই পড়ার দৃশ্য দিয়ে বদলানো হয়েছে)

দৃশ্য—১৮, স্থান—ভাঙা কালীমন্দিরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

মন্দিরের মধ্যে কালী মূর্তির ক্লোজ শট্। পুরোহিত আরতি করছেন। ঘণ্টার শব্দ জোরে শোনা যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—১৯, স্থান—পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা ভাঙা কালীমন্দির থেকে প্যান্ করে দেখায় একদল গ্রামবাসী ঠাকুর প্রণাম করছে। দূরে চণ্ডীমণ্ডপ। বিভিন্ন দিক থেকে লোকরা চণ্ডীমণ্ডপের চাতালে জড়ো হচ্ছে। কারো হাতে রয়েছে লণ্ঠন। একটা বড় কেরোসিন ল্যাম্প ঝুলছে মণ্ডপের সিলিং থেকে। মাদুর পাতা হয়েছে চাতালে। অনেকে বসে পড়েছে, কেউ কেউ বসার তোড়জোড় করছে।

নীচু জাতের অচ্ছুৎরা জড়ো হয়েছে নীচে একটু দূরে ষষ্ঠীতলায়। একদল বাউড়ির ছেলে সেখানে ছুটোছুটি চিৎকার করে খেলা করছে। ভূপাল চৌকিদার তাড়া করছে তাদের।

ভূপাল : এ্যাই! এ্যাই ছোঁড়ারা!…যা পালা! যা ঘরকে যা!

হঠাৎ সে দেখতে পায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী আসছেন। খণ্ডগ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ তিনি। হরিজনরা একটু দূরে দাঁড়িয়েই মাথা নীচু করে নমস্কার জানায়।

ভূপাল : (হাত জোড় করে) আসেন…আসেন এজ্ঞে—

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ভবেশ পাল, হরিশ মণ্ডল, মুকুন্দ, বৃন্দাবন এবং আরও অনেকে। সবাই-ই বলে।

সবাই :—আসেন!

—আসেন চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী মশাই চটি ছেড়ে মণ্ডপের সিঁড়িতে উঠে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলেন—

চৌধুরী : ব্রাহ্মণদিগে প্রণাম…আপনাদিগে নমস্কার…

ভবেশ : নমস্কার, নমস্কার—

চৌধুরী : ছিরু কোথায়, আমাদের শ্রীহরি?

লোকেরা মাঝখানটা ফাঁকা রেখে বসে পড়েছে। চৌধুরী মশাই এক কোণে গিয়ে বসেন।

কাট্ টু

দৃশ্য—২০

স্থান - ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য পথ।

সময় – রাত্রি।

ঘর্মাক্ত ছিরু পাল হাঁপাতে হাঁপাতে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে side track করে। ছিরু পালের হাতে একটা কঞ্চি মাঝে মাঝে সে ভীত চোখে পেছনে তাকাচ্ছে।

দূরে 'বায়েন পাড়ায়' কার যেন কান্না শোনা যায়, ঝাঁঝানো স্বরে একজন অন্যজনকে শাপান্ত করছে।

ছিরু পাল ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২০ (ক)

স্থান—বায়েন পাড়া

সময় রাত্রি।

পাতু : (দুর্গার বন্ধ জানালার উদ্দেশ্যে) মর্-মর্-মর্ তু…বুন্ হইচে… সোহাগের বুন্.. গলায় দড়ি দে!

কাট্ টু

দৃশ্য— ২১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল ক্যামেরার বাঁ দিক দিয়ে ঢোকে। ঝোপ ছেড়ে এখন সে রাস্তায়, হাঁপাচ্ছে, ঘাম ঝরছে শরীরে। শেষবারের মত বায়েন পাড়ার দিকে তাকিয়ে হাতের কঞ্চিটা ফেলে দেয়।

ক্যামেরা ট্রলি করে ছিরু পালকে অনুসরণ করে চলে। পুকুর ধার থেকে বাসনের শব্দ পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, খিড়কি পুকুরের দিকে তাকায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২২

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পানা আর শ্যাওলায় ঢাকা খিড়কি পুকুরটা বেশ বড়। পুকুরের অন্য পাড়ে পদ্ম বাসন মাজছে। একটা কুপি জলছে পাশে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৩

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল পদ্মর দিকে পশুর দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৪

স্থান অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

কুপির আলোয় পদ্মর মিড্ ক্লোজ শট্। বাসন মাজার তালে তালে পদ্মর শরীরে ঢেউ উঠছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল চারদিকে তাকিয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে নেয় এবং সেটিকে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৬

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময় রাত্রি।

পদ্ম বাসন মাজতে মাজতে জলে ঢিল পড়ার শব্দ পেয়ে তাকায়।

কাট্ টু

জলের কতগুলো গোলাকার ঢেউ।

কাট্ টু

বিস্মিত পদ্ম এবার পুকুরের ওপারে তাকায়। তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৭

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিরু পাল।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৮

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির পাশের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম বাসনপত্রগুলো তাড়াতাড়ি হাতে গুছিয়ে নেয়। তারপর কুপিটাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

কাট্ টু

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৯

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩০

স্থান—পুরানো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দিরতলা।

সময়—রাত্রি।

চণ্ডীমণ্ডপে এখন দলবদ্ধ হয়ে নানা আলোচনা চলছে। হঠাৎ সবাই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা থামিয়ে দেয়।

কাট্ টু

ছিরু পালকে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসতে দেখা যায়। ভূপাল হাত জোড় করে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে।

কাট্ টু

একদল লোক চণ্ডীমণ্ডপের ওপর বসে আছে।

কাট্ টু

ছিরু পাল সিঁড়ির তলায় জুতো জোড়া খুলে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। ভিড়ে বসা একজনের গায়ে পা লাগলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্যামেরা জুম্ করে একটা খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেবু পণ্ডিতের ওপর এগিয়ে যায়।

কাট্ টু

ভবেশ: এসো বাবা...ছিরু এসো—

ছিরু পাল হরেন ঘোষাল ও নিশি মুখার্জির পাশ দিয়ে চলে আসে। ওদের দুজনের গায়েই পা ঠেকে। তাঁরা মুখভঙ্গী করে। ছিরু আরও এগিয়ে এসে সোজা মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে বসে পড়ে। তারপর চারদিক তাকিয়ে পরিবেশটা যেন আঁচ করে নেয়।

কাট্ টু

হরেন: সোয়াইন।

নিশি: মানেটা কি হ'ল?

হরেন : (চাপা গলায়) শুকর শাবক !
নিশি : তার মানে ?
হরেন : শুয়োরের বাচ্চা।

নিশি সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

ছিরু পাল নিশির দিকে তাকায়। Close shot

কাট্ টু

নিশি হাসি থামিয়ে ফেলে। Close shot

কাট্ টু

ছিরু পাল Close shot

কাট্ টু

ভীত সন্ত্রস্ত নিশি Close shot

কাট্ টু

ভয় দেখানোর দৃষ্টি নিয়ে চোখ ঘোরায় ছিরু পাল। ভূপালের দিকে তাকায় এবার।

ছিরু : ভূপাল !
ভূপাল : (হাত জোড় করে) এজ্ঞে ?
ছিরু : কি রে ?...তোদের সেই মানিক জোড় কোথা ?

কাট্ টু

দৃশ্য—৩১
স্থান : নদীর পাড়ের বাঁধ।
সময়—রাত্রি।

প্যানিং শটে আমরা দেখতে পাই অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বাঁধের ঢাল দিয়ে নেমে আসছে। অনিরুদ্ধ হাতের টর্চ জ্বালায়। দূরে ময়ূরাক্ষীর ওপরে দেখা যায় জংশন স্টেশনের খুদে আলো।

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বালিভর্তি পাড়ের ওপরই জুতো দুটো ফেলে।

অনি : একটা সিগ্রেট দে তো!

গিরিশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে অনিকে একটা দেয়। অনি সিগারেটটা ধরাতে যাবে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে থমকে যায়।

কাট্ টু

সাইকেলে করে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ।

কাট্ টু

সাইকেলের সেই ছায়ামূর্তি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ তাকে চিনতে পেরে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে।

অনি : ডাক্তারবাবু নাকি গো ?

লোকটি সাইকেল থেকে নামে। নাম জগন ঘোষ, গাঁয়ের ডাক্তার। তাঁর চোখে চশমা, মাথায় টুপি, হাতে একটি স্টেথিস্কোপ,

জগন : এই যে !...জোড়া পাঁঠা !...চল্লি বুঝি ?
গিরিশ : এজ্ঞে ?
জগন : যা ! এক কোপে ঘচাং !

জগন ডাক্তার এগিয়ে যান।

অনিরুদ্ধ : আপনি ? আপনি যাবেন না ?
জগন : (চকিতে ফিরে তাকিয়ে) আমি !!...ঐ ছিরে পালের পোঁ ধরতে ?
...হঃ...কি ভাবিস, এই জগন ঘোষকে ?...যাবো, বুঝলি, যাবো ! যেদিন ঐ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ও শালার বিচার হবে—সেদিন যাবো, তার আগে নয়।

জগন ডাক্তার এগিয়ে যান। চোখের আড়ালে যাবার আগে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলেন—

জগন : এ শালা দুনিয়াটাই টাকার গোলাম !

কাট্ টু

দৃশ্য—৩২
স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।
সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা এক পাশ দিয়ে ট্রলি করে দেখায় উপস্থিত লোকদের অনেকেই যেন অধৈর্য, বিরক্ত, চঞ্চল।

ভবেশ পাল ও হরিশ মণ্ডল ফিস্ ফিস্ করে ছিরু পালের সঙ্গে কথা বলছে। ক্যামেরা হরেনের ওপর আসতে দেখা যায় সে ষষ্ঠীতলার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে—

হরেন : লুক্...কামিং !

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ ষষ্ঠীতলা দিয়ে মণ্ডপের দিকে আসছে। অনি শেষ টান দিয়ে ঝোপে সিগারেটটা ফেলে দেয়।

কাট্ টু

ছিরু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

হরেন ঘোষাল এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু

দেবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ সোজা মণ্ডপে উঠে আসে। এবং বসে পড়ে।

অনিরুদ্ধ: কৈ-গো, কি বলছেন বলেন। অ.মরা খাটি খুটি খাই—আজ আমাদের এ বেলাটাই মাটি!

বলার স্বরে অতিরিক্ত ধৃষ্টতার আভাস পেয়ে সবাই-ই ভুরু কোঁচকায়।

ছিরু: মাটিই যদি ভাবিস তো আসবার কি'দরকার ছিল? ..না এলেই পারতিস।

হরিশ: আর এসেছিস তো ঘোড়াজুটো বাঁধ!

ভবেশ: অনেক নালিশ আছে তোদের নামে। বিচের হবে।

অনিরুদ্ধ: অ!···তা, বিচেরটা কে কইরবে?···আপনারাই?

ভবেশ: মানে?

অনিরুদ্ধ: নালিশও আপনাদের, বিচেরও আপনাদের—কেমন বিচেরটা হবে?

ছিরু: হারামজাদা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা –

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ছুটে এগিয়ে যায় সে অনিরুদ্ধর দিকে।

অনিরুদ্ধ: খবদ্দার!···খবদ্দার বুলছি—

ছিরু পাল অনিরুদ্ধর জামা চেপে ধরে। সবাই হুড়মুড় করে দাঁড়িয়ে যায়।

ছিরু: জুতিয়ে মুখের চামড়া একেবারে—

অনিরুদ্ধ: এঁ—! জুতো দেখাইছে!···জুতো! এই সিদিন অব্দি তো খালি পায়ে মাঠে লাঙল ঠেলতে! নতুন মোড়ল হয়েই বুঝি—

ছিরু: কি বল্লি!

অনিরুদ্ধকে প্রায় মারতে শুরু করে ছিরু পাল। অনিরুদ্ধ বাধা দেয় ভবেশ, হরিশ, মুকুন্দ, গিরিশ, মথুর ও আরও সবাই চিৎকার করে ওঠে।

চৌধুরী: (অসহায়ভাবে) পণ্ডিত? পণ্ডিত কোথা গেলে গো?

কাট্ টু

দেবু কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এগিয়ে আসে।

দেবু: (সজোরে) থামেন তো! থামেন আপনারা?

সবাই চিৎকার থামিয়ে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকায়।

দেবু: বসেন! বসেন সবাই!···অনি ভাই, গিরিশ—তোমরাও বোসো! —এমনি করলে কোন জিনিষের মীমাংসা হয়? (ছিরুকে) —তুমিও বোসো ভাইপো!

ছিরু: কেনে?···আমি এসব কেনে?···হারামজাদাদের—

দেবু: ছি:!···কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছ, একটু হিসেব করে দেখো!··· বোসো!

ছিরু প্রতিবাদের ভঙ্গীতেই বসে পড়ে।

ছিরু: বেশ, তবে তুমিই বলো।

চৌধুরী: হাঁ্যা হাঁ্যা সেই ভালো।

বৃন্দাবন: তুমিই বলো, তুমিই বলো পণ্ডিত—

হরেন: সাইলেন্স! সাইলেন্স!···নো টক্। ওয়ান ম্যান! (দেবুকে) বলো! ওয়ান টাইম টক্।

পরিবেশটা শান্ত হয়। দেবু পণ্ডিত কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বলতে শুরু করে—

দেবু: দ্যাখো অনি ভাই, গিরিশ!···তোমরা ভালো করেই জানো··· আজ থেকে প্রায় চার পুরুষ আগে···আমাদের এই শিবকালী পুরে কামার, কুমোর, ছুতোর কি তাঁতী এসব বলতে কিছু ছিল না। এটা ছিল আমাদের সদ্গোপদের গাঁ···চাষীদের গাঁ... অবিশ্যি দু-এক ঘর বামুনের কথা আলাদা। আমাদের কত্তারা···গাঁয়ের সব্বার সুবিধের কথা ভেবে ..প্রথম তোমাদের পূর্বপুরুষদের এখানে নিয়ে আসেন—

কাট্ টু

দৃশ্য ৩৩

স্থান—চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির। ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য

সময়—দিন।

পঞ্চাশ বছর আগের চণ্ডীমণ্ডপ। একদল কামার, ছুতোর, তাঁতী পরিবার পরিজন নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে একটু দূরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

গাঁয়ের মাতব্বর বৃদ্ধ রামনিবাস ঘোষ তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলছেন—

রামবাবু: ভালো করে ভেবে দ্যাখ—সবচ্ছর গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের লোকের সব কাজ করে দিতে হবে তুদিগে।

হৃদয়: আজ্ঞে আচ্ছা।

রামবাবু: হুট বলতে গাঁয়ের বাইরে যেতে পারবি না কিন্তু—

হৃদয়: আজ্ঞে ঠিক আছে

রামবাবু: মুজুরী হিসাবে ধান পাবি—ধান—যার যার হিসেব মতো—

(শেষ অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়)

নীরবতার ছবি ঃ বার্গম্যান

দ্বিতীয় সূত্র : 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' (১৯৫৭)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

"আত্মমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে"
—রবীন্দ্রনাথ

ইতিপূর্বে ১৯৭৭ সালের শারদ সংখ্যা 'চিত্রবীক্ষণে' আমি উল্লেখ করেছি বার্গম্যানের 'সেভেন্থসীল', 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' এবং 'সাইলেন্স'—এই তিনটি শ্রেষ্ঠ ছবির ঐক্যসূত্র হচ্ছে **নীরবতা**। 'সেভেন্থসীল' ছবির ব্যাখা সেই সংখ্যায় করা হয়েছে, খৃস্টীয় তত্ত্বে সামূহিক বিনাশের আগের যে 'নীরবতা'—সেই সময়টুকুর একটি ছবি—সুইডেনের বারোশ শতকের সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে—বার্গম্যান দিয়েছেন। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বার্গম্যানের নিজের শিল্পীচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দেখা যাচ্ছে যখনই খ্রীস্টীয় ধর্মীয় প্রসংঙ্গ ছেড়ে 'মানবিক' চরিত্র বা প্রসংগে তিনি এসেছেন তখন তাঁর এক অসাধারণ মহিমা—যার প্রকাশ 'সেভেন্থসীলে'র স্কোয়ার-এর চরিত্রে।

বার্গম্যান 'সেভেন্থসীলে'র মধ্যযুগীয় পরিবেশ থেকে আমাদের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী'র আধুনিক যুগে নিয়ে আসেন—প্রথম ছবির মত গুরুত্বপূর্ণ ছবির মাত্র আটমাস পরে রচিত এই দ্বিতীয় ছবিতে—যা এক অসামান্য চলচ্চিত্র প্রতিভার পরিচয়। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' ছবিতে তিনি এক প্রাক্-বৈনাশিক নীরবতাকালীন বৃদ্ধের অবস্থা থেকে আমাদের নিয়ে আসেন আইস্যাক বোর্গ নামক এক প্রবীন বৃদ্ধের মানসলোকের নীরব এক সত্যান্বেষণের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত সংগ্রামে।

আইস্যাক বোর্গ (যার চরিত্রে সুইডেনের বিগত কালের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক ভিক্টর সীস্ট্রম অসামান্য অভিনয় করেছেন) বুদ্ধিজীবী জীবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছেন এমন একজন পণ্ডিত ডাক্তার হিসেবে যেদিন দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবেন, তার আগের রাত্রি থেকে স্মৃতি ও মনের মধ্যে তিনি নিজের সত্যিকার মূল্যায়ন করতে চাইলেন—আত্মানুসন্ধান। চেখভের পাঠক এই থীমটির সংগে 'A Dull Story from a Note Book of an Old Man'—নামে চেখভের গল্পের থীমের মিল খুঁজে পাবেন। এই গল্পের বৃদ্ধ নায়ক প্রোফেসার স্টেপানোভিচ, তিনিও দেশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আত্মানুসন্ধান রত। যদিও দুজনের আত্মানুসন্ধানের রূপ এক নয়। কিন্তু দুজনেই কর্মজীবনের সফলতার প্রান্তে এসে অনুভব করলেন, তাঁরা এক মৃত আইসবোর্গ বা মৃত প্রোঃ স্টেপানোভিচকে বহন করছেন। বাইরের সাফল্য ও অসংখ্য মানুষের কাছে লব্ধ বুদ্ধিজীবী জীবনের কীর্তির উজ্জ্বলতার আড়ালে তাঁদের আত্মা মৃত বা মৃত প্রায়, কেননা তাঁরা যা কিছু করেছেন তা কীর্তি স্থাপনের লোভে, এক শুষ্ক আত্মতৃপ্তির তাড়নায়, প্রেমহীন বুদ্ধিবাদের ঝোঁকে, মানুষকে ভালোবাসতে পারেন নি। জীবনে একদিকের সাফল্যের চূড়ায় বসে লক্ষ্য করছেন আসল জায়গাটা শূন্য। "আমি ভাবছি আমি কে—কেন এখানে বসে আছি।...আমার খ্যাতি ও সমাজে আমায় উচ্চ সিংহাসন টিঁকিয়ে রাখতে? আজ আমার উত্তর হচ্ছে আমারই বিদ্রূপের হাসি!...যৌবনে কী ভাবে নিজের যশ, খ্যাতি, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমার স্থান ইত্যাদি ব্যাপারকে কত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখেছি!...আর আজ...অন্য আর কারুর দোষ নেই—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, আজ আর আমার যশের প্রতিও কোন ভালোবাসা নেই। এই সবই তো আমাকে ঠকিয়েছে।"..."আমি হেরে গেছি।"—এই হচ্ছে চেখভের বৃদ্ধ নায়কের আত্ম উপলব্ধি। চেখভ ইঙ্গিত দিয়েছেন এতবড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্টেপানোভিচের জীবনের শেষ কটি দিনের একমাত্র আলোকিত দিক হচ্ছে পালিতা কন্যা কাটিয়ার প্রতি তাঁর মানবিক স্নেহ ও প্রীতি। অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা যদি চলে যায়, সমস্ত কীর্তি, পাণ্ডিত্য নিয়েও মানুষ মৃত।

বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' বৃদ্ধ নায়ক বোর্গ সেই একই উপলব্ধির মধ্যে আমাদের নিয়ে চলেন। কিন্তু চিত্রময়তায়, 'মেটাফর'গুলির বিশেষ চয়নে, যুক্তির বিন্যাসের ধারায়, পার্শ্বস্থ চরিত্রগুলির চিত্রায়নে—নাটকীয় পরিস্থিতির বিন্যাসেও চেখভের গল্প এবং বার্গম্যানের ছবির স্বাদ অবশ্যই ভিন্ন। এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, চেখভ যেখানে কাটিয়ার প্রতি বৃদ্ধনায়কের মানবিক স্নেহ ও প্রীতির মধ্যে মুক্তির ইশারাটুকু ফুটিয়ে গল্পকে যেন 'ওপেন এণ্ডেড' অবস্থায় শেষ করেছেন, বার্গম্যান সেখানে বোর্গের পরিপূর্ণ মুক্তির চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন।

এই ছবিতে বার্গম্যানের পরিচালক হিসেবে কৃতিত্ব দুটি ক্ষেত্রে—চলচ্চিত্রে এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকল্প সৃষ্টির জাদু—এবং স্বপ্নের ব্যবহারের মধ্যে যুগান্তকারী প্রথাভঙ্গকারী সৃজনশীলতা। প্রথমেই বোর্গ যে দুঃস্বপ্ন দেখেন, যেখানে কয়েকটি 'প্রতীক'কে চাবির (key) মত আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করে বোর্গের অন্তর্লোকের গহন-প্রদেশে বার্গম্যান নিয়ে যান—এক জনশূন্য নগরপথ, মধ্য দুপুর তবু জনশূন্য—(এবং মধ্যরাত্রি হলে বোর্গের খ্যাতিময় জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে এটি এত তীব্র হতনা) একটা ঘড়ি তার কাঁটা নেই (মৃত্যুর ইঙ্গিত), একটা চোখে ঠুলি বাঁধা চলমান ঘোড়া (বোর্গের প্রেমহীন জীবনের কর্মধারা?) এবং সেই ভাঙ্গা ঘোড়ার গাড়ী থেকে পড়ে যাওয়া শবাধার, তার মধ্যে একজন মৃত মানুষের হাত, মৃতের হাতের মধ্যে বন্দী বোর্গের হাত, তীব্র ভীতি ও সেই নাটকীয় চরম উদ্ঘাটন—মৃত মানুষটি আসলে বোর্গ নিজে—এ তাঁর আত্মার মৃত দেহ—যা তিনি শরীরে বহন করে চলেছেন। সমস্ত পরিবেশে ছায়াহীন আলো, শব্দ ও ক্যামেরাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশ ত্রিশ দশকের বিখ্যাত জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালকের সাধ্য ছিল না। ঘুমন্ত বোর্গ

যে-কিনা পরের দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নিতে যাবে, তার এক ভয়ংকর আত্মদর্শন !

এই মৃত আত্মার দর্শনের পর তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর আসল স্বরূপ। গাড়ীতে পুত্রবধূর সংগে যাত্রাকালীন, পুত্রবধূর মুখে তাঁর সমালোচনায় রাত্রের দুঃস্বপ্নের মর্ম কিছুটা বুঝতে পারেন। পুত্রবধূ বলে বোর্গ একজন অহংবাদী, শুধু বোর্গ নিজে নয়, বোর্গরা সবাই, তাঁর পুত্রও—যে চায় না তার স্ত্রী পুত্র লাভ করে। তাদের গাড়ী পথপার্শ্বে সেই গ্রামটিতে পৌছায়, যেখানে বোর্গ তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন, যেখানে ঘটেছে তাঁর প্রথম প্রেম। গোটা সিকোয়েন্সটি একটি 'মেটাফর' সদৃশ, শুধু দূরবর্তী স্বপ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ খেতাব নেবার পথের মধ্যেই নয়, যেন জীবনের চরম প্রান্তে পৌছবার পথেও বোর্গ হঠাৎ একবার দেখে নিতে চাইলেন জীবনের যাত্রাপথের আদি দিকচিহ্নগুলি। গাড়ী ঢুকল ঘন গাছ গাছালির মধ্যে। যেখানে বসে দিবা স্বপ্নে দেখলেন সেই লুপ্ত শেষ-কৈশোরকালের বন্ধুদের বান্ধবীদের আত্মীয় স্বজন, সেই কৈশোরের পরিবেশ 'সেদিনের খুঁটিনাটি এবং সারা'কে—তাঁর প্রথম প্রেম। অবিকল সেই পঞ্চদশী বা যোড়শীর চেহারায়। দেখলেন কেমন করে সারা তখন তরুণ বোর্গকে ভালবাসত, আর বোর্গ তাকে তার শীতল হৃদয়ের ঔদাসীন্য দিয়েছে, কেমনভাবে এই ঔদাসীন্য সারাকে দুঃখ দিয়েছে, এবং ঠেলে দিয়েছে সারাকে বোর্গের অন্য ভাইয়ের কাছে, সারা যাকে ভালবাসেনি। সারা আহত, সারা সমগ্র পরিবারের উপহাসের বস্তু, কাঁদছে দরজার বাইরে। এবং বোর্গ, আজকের বৃদ্ধ বোর্গ যেন দেখছেন তাঁর পাশে সেদিনের সারা কাঁদছে—আজকের প্রাজ্ঞ বোর্গ সমবেদনায় কাতর, চাইছেন সান্ত্বনা দিতে এই দুঃখী মেয়েটিকে, ঝুঁকে পড়ছেন কিছু বলতে……কিন্তু হায় মাঝখানে এক অসীম ব্যবধান, কালের ব্যবধান—প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। এই সিকোয়েন্সটি, উক্ত শট্‌টি বিশ্বচলচ্চিত্রের এক-চিহ্নদণ্ড মাইলস্টোন। ইতিপূর্বে এমন স্মৃতি বা স্বপ্নের দৃশ্যের যুগান্তকারী দিক চলচ্চিত্রগত ব্যবহার কেউ করেন নি (যদিও বিগতকালের একটি সুইডিশ ছবি 'মিস জুলি'তে এই ধরণের একটি ব্যবহার ছিল, কিন্তু সেটি যেন নিতান্তই প্রকরণগত, প্রথম শৈল্পিক ব্যবহার বার্গম্যানের—একথা বলেছেন বেশির ভাগ চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক।)

এই ব্যবহার পরম আশ্চর্যের এই জন্যে যে এটাই স্বপ্ন দৃশ্য গঠনের একমাত্র চেহারা হওয়া উচিত ছিল—অথচ এটাই কেউ এতকাল করেন নি। বস্তুতঃ আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমরা আমাদের বর্তমান মানসিকতায় (তা চেতন অবচেতন যাই হোক না) মধ্য দিয়েই দেখি। পঞ্চদশ বছরের প্রথম প্রেমের নায়িকাকে তার ফ্রক পরা চেহারায় দেখলেও, যদি আমার বয়স হয় বর্তমানে পঁয়ত্রিশ, আমি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছরের বয়সের অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, মূল্যবোধ ও পরিপক্কতা দিয়েই স্বপ্নে তাকে দেখব। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখাকালীন 'এই আমি'কে যদি চলচ্চিত্রে 'externalise' করতে হয়, এই স্বপ্ন দেখা আমাকে যদি দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত করতে হয় তবে আমাকে আজকের পঁয়ত্রিশ বছরের মানুষ হিসেবেই দেখাতে হবে। যেমন পঁয়ত্রিশ বছরের কোন স্বপ্নে আমার অবচেতনা কিছুতেই আমার সতেরো বছরের অবচেতনায় ফিরে যেতে পারেনা, তেমনি এই বর্তমানের কোন রাত্রির দেখা স্বপ্নে যে-আমি স্বপ্ন দেখছি সে-আমি কিছুতেই আবার কিশোর হয়ে যেতে পারিনা। অথচ এতকাল ধরে চলচ্চিত্রে স্বপ্নদৃশ্যগুলিতে এই অযৌক্তিক কাণ্ডই হয়ে এসেছে—দুজন সুইডিশ চলচ্চিত্রকার (প্রথমে মিস্ জুলি-তে Alf Sjoberg ও পরে যথার্থ শৈল্পিক ভাবে আলোচ্য ছবিতে বার্গম্যান) এতদিনের একটি ভ্রান্তিকে এত সহজে নিরাকরণ করলেন।

আমরা এই ছবিতে আইস্যাক বোর্গ দৃষ্ট স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের সংগে (যেটি লুপ্ত প্রেম সম্পর্কিত) রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গদ্যকাব্যের একটি রচনার গভীর মিল লক্ষ্য করি, শুধু সেখানে যে চিত্রকল্পগুলি আছে তার সংগে মিলই নয়, সেখানেও দেখি কবি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পচিশ বছর বয়সের একটি অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছেন এবং আমরা দেখছি এখানে কবি নিজে বৃদ্ধই, কিন্তু তাঁর সেই পঁচিশ বছরের 'অভিজ্ঞতা'টি তেমনি তরুণী। বোর্গের দুটি স্বপ্নের দৃশ্যেই দেখি (প্রথমটি দিবাস্বপ্ন) বোর্গ তাঁর কৈশোরের লীলাভূমি যে বাসস্থানের দিকে যাচ্ছে তা আজ গাছ গাছালিতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের লিপিকার সেই রচনা—'প্রথম শোক"—এর প্রথম ছবিটি হচ্ছে, 'বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, আজ সে ঘাসে ঢাকা।' স্মৃতির রাজ্যে যাত্রায় এদুটি ছবিই নস্টালজিয়া উদ্রেক করে—যেন ঘাস বা গাছগাছালি নয়, কালের বিস্তৃতিকে মাড়িয়ে চলা। রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাটি, রবীন্দ্রপাঠক জানেন, তাঁর বৌঠান কাদম্বরীর অকালমৃত্যুর শোকের স্মরণে লিখিত, যখন বৌঠানের বয়স ছিল পঁচিশ ছাব্বিশ, কবির বয়স পঁচিশ। কবি যখন কবিতাটি লিখছেন তখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ, 'প্রথম শোকের' মূর্তিতে কিন্তু সেই পঁচিশ বছরের যুবতী অসামান্য মহিলাটি মূর্তি হচ্ছেন। কবি লিখছেন, 'আমার তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার পঁচিশ বছরের যৌবন তো ম্লান হয়নি।'…সে বলল "আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি—আমাকে বরণ করে নাও।" কবিতায় আমরা যে ছবি পাচ্ছি, সেখানে দেখি বৃদ্ধ কবি যেন তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের চেনা-জানা সেই তরুণী কাদম্বরী দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে, যার বয়স যেন পঁচিশ ছাব্বিশে এসে থমকে গেছে। কবি কিন্তু বৃদ্ধ।

আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে বার্গম্যান স্বপ্নদৃশ্য গঠনে চলচ্চিত্র ভাষায় যে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নূতন

মাও সে তুং বলেছেন, "মানুষ যখন শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তখন সে একা, যখন সে তার পরিবারের পাঁচজনকে ভালোবাসে তখন সে একাই পাঁচজন, যখন সে গ্রামের একশ মানুষকে ভালোবাসে তখন সে একাই একশ, যখন সে সমগ্র জনগণকে ভালোবাসে, তাদের জন্য ভাবে—তখন সে একাই অসংখ্য। মানুষের স্বার্থপর না হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

কিন্তু তবু দেখা যায় একালে মানুষের স্বার্থপরতাই বরং স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা শোষণ ভিত্তিক সমাজে মানুষ বোঝে নিজের কড়ি নিজে বুঝে না নিলেই ঠকবে, এই সমাজ ব্যবস্থা একটা মানুষকে শুধু অন্য মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এবং এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজের উপরি সৌধে জমে ওঠে স্বার্থপরতা ও আত্মমগ্নতার রূপ চর্চা। ইদানীং দেখা গেল, এমন কি বিপ্লবের পরেও, নূতন উপরি সৌধেও, আগেকার উপরি সৌধের আত্মমগ্ন স্বার্থপরতার ভূতগুলি আবার জেগে উঠতে পারে, সুতরাং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের বহুকাল পরেও দরকার পড়ে নূতন বিপ্লবের, আত্মিক নৈতিকতার ভিতটিকে বারবার নাড়া দিয়ে বৃহত্তর মানবমুখী করার, যার নাম 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'।

এবং তখন মনে হয়, 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী'র আইসাক বোর্গ যে সহজ শিক্ষাগুলি লাভ করেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাময় আত্মানুসন্ধানের মধ্যে সেগুলি খুবই প্রাসংগিক। বিনয়, মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা, মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত শক্তি—এগুলি আজো মৌলিক মানবিক নীতি।

অবশ্যই এছবি একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। কেন আইসক বোর্গের মত এত বড় পণ্ডিত ডাক্তার এত স্বার্থপর হয়, তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বার্গম্যান বিশ্লেষণ করেন না।

কিন্তু বার্গম্যানের কাছে কি এতটা আশা করা দুরাশা নয়? এবং তারই মধ্যে যা পাওয়া যায় তাও কি অনেক নয়, যেহেতু যেটুকু বলা হয়েছে তা এমন শৈল্পিক ভাবে সার্থক যে আমাদের মর্মে প্রবেশ করে। এ ছবির কাব্যিক সুষমা ও সাংগীতিক গঠনের কী কোন তুলনা সম্ভব!

'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' বার্গম্যানের শ্রেষ্ঠ মানবিক ছবি।

'নীরবতা পর্যায়ের তৃতীয় ছবি 'সাইলেন্স' নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা রইল॥

গণদেবতা (চিত্রনাট্য)

(২০ পৃষ্ঠার পর)

হৃদয় : যে আজ্ঞে.........

রামবাবু : না না, ভালো করে ভেবে দ্যাখ্—পরে আবার কথা ওলটাস নি যেন !

হৃদয় : আজ্ঞে ছি ছি, তা কি হয় বলেন !

রামবাবু : তাহলে নে, এইখানে পেন্নাম কর্—আজ থেকে এই নিয়ম বহাল রহিল।

হৃদয় এবং তার দলবল এগিয়ে এসে চণ্ডীমণ্ডপের একটি পাথরের ওপর প্রণাম করে। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে দেখায় সেই পাথরের ওপর খোদাই করা আছে।

"যা ব চ্চ ন্দ্রা র্ক মে দি নী"

দেবু : (off voice) চণ্ডীমণ্ডপের সেই পাথরটা আজো তেমনি আছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির। ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড।

সময়—রাত্রি।

দেবু—কিন্তু নিয়মটা তোমরা দুজনে মিলে ভেঙে দিলে। কি করলে—নিজেরাই ভেবে দেখো।......আজ তোমরা ভাঙলে......কাল আরেকজন......পরশু আরেকজন...... তারপর আরেকজন......এই কত্তে কত্তে একদিন দেখবে চণ্ডীমণ্ডপের বনেদটা শুদ্ধু ভেঙে চৌচির হয়ে গ্যাছে !··· কিন্তু তাতো আর হতে দেওয়া যায় না ! গাঁয়ে তোমাদের পাট রাখতেই হবে !

হরেন : হিয়ার—হিয়ার !···হিয়ার—হিয়ার !

দেবু বিরক্তির দৃষ্টিতে হরেনের দিকে তাকায় আর হাত তুলে তাকে থামতে বলে।

হরেন থেমে যায়।

দেবু : (বসতে বসতে) এই আমাদের কথা !

হরিশ : ঠিক !

ভবেশ : এই কথা !!

অনিরুদ্ধ : (এক মুহূর্ত থেমে) ও !···তাহলে আমাদের কথাটাও বলি ?

চৌধুরী : বলো !—নিশ্চয়ই বলবে !

অনিরুদ্ধ : দেখেন,—কাজের বদলে ধান—সেকথা আমরাও জানি। কিন্তু ···সে ধান যদি না পাই ?

ছিরু : 'না পাই' !···না পাই মানে ?

অনিরুদ্ধ : পাই না !···বাকি পড়ে থাকে ! শেষবেশ 'বলোহরি হরিবোল' হয়ে যায় !

ছিরু : কে ? কে দেয় না, শুনি ?

অনিরুদ্ধ : কেনে ? নাম বুলতে হবে ?

ছিরু : আলবাৎ হবে ! সভার ভেতর কথাটা তুললি—নাম বলতে হবে না মানে ?

অনিরুদ্ধ : বেশ, তাহলে বুলছি ! (হঠাৎ ছিরুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে) এই তুমি দাও নি !

ছিরু : এ্যাঁ ?

অনিরুদ্ধ : বলো !···বুকে হাত রেখে বলো—দিয়েছ তুমি গেল দু'সন ?

ছিরু : আর সেবার যে তুই ঘর ছাইবার লেগে তু হ্যাণ্ডনোটে আমার কাছ থেকে টাকা ধার লিলি—তার ক' টাকা উশুল দিয়েছিস শুনি ?

অনিরুদ্ধ : তারও তো একটা হিসেব আছে !···ধানের দাম হ্যাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে হবেতো,—না কি ? (সবার দিকে চেয়ে) কি বলেন আপনারা ?···বলেন !

দেবু : ঠিক কথা ! (ছিরুকে) আগেই করা উচিত ছিল !

চৌধুরী : বাবা ছিরু, এ কিন্তু তোমার মেনে নেওয়া উচিত বটে !

ছিরু : (রুষ্ট স্বরে) ঠিক আছে, ঠিক আছে !

দেবু : (অনিরুদ্ধকে) আর কোথায় কি পাবে বলো আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করে দেবো।

ভবেশ : ব্যাস্, আরতো কোনও কথা নাই ?

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ কোন উত্তর দেয় না।

হরিশ : কি রে ?

হরেন : স্পীক্......স্পীক্......

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ এক মুহূর্ত দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

অনিরুদ্ধ : আজ্ঞে আমাদের মাপ কত্তে হবে !

এই কথা শেষ হতে না হতেই চিৎকার শুরু হয় চারি দিক থেকে

—কেন ?

—হোয়াই ?

—বোসো ! বসে কথা কও ?···

চৌধুরী : আহা আস্তে,......আস্তে......

হরেন : (লাফিয়ে উঠে) দিস্ ইজ ব্যাড ! —অত্যন্ত ব্যাড্ ! কি ভাবিস তোরা আপনাদিগের ?

অনিরুদ্ধ : (হাত তুলে) তাহলে শোনেন !

হরেন : কি ? কি হুজুর ?

মুকুন্দ : শোনবার আছেটা কি ?

অনিরুদ্ধ : (গলা চড়িয়ে) শোনেন শোনেন···বুলছি। ধার নিয়ে কাজ ···আর আমাদের পোষাইচে—নাক !

সভা বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ে।

—হোয়াট ?

—কেনে ?

—হঠাৎ একথা ?

রমেশ : আপনাদের চোদ্দ পুরুষের যা পুষিয়েছে হঠাৎ আপনাদের পোষাইছে না কেনে ?

অনিরুদ্ধ কথা বলতে শুরু করলে ধীরে ধীরে ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

অনিরুদ্ধ : দিন কালটা ভাবেন ! জিনিষপত্তর কতো আক্রা হইছে সেটা ভাবেবন তো ? আগে আগে গাঁয়ের সব কাজ করতাম—আপনারাও আমাদিগে সব কাজ দিতেন !...... আজকাল দ্যান্ ? যখন যেখানে যেটা সস্তা পান অমনিতো শহর থিকে কিনে নিয়ে আসেন ! কৈ সে বেলাতো অনিরুদ্ধ গিরিশদের কথা মনে পড়ে না ! ইদিকে গাঁয়ের জমি...... দিনকে দিন গিয়ে ঢুকছে কঙ্কনার বাবুদের গভ্ভে !...... আমাদেরও কাজ কমছে !......

(off voice) এই তারিনী দাদা—এই সিদিন অব্দি ছিল চাষা ! আর আজ...... ?

কাট্ টু

ক্যামেরা জুম্ করে এগিয়ে যায় একটু দূরে বসা তারিনীর দিকে। তারিনীর পাশে উচ্চিংড়েও আছে। এতক্ষণ সে সভার কাজ দেখছিল নীরবে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৫

স্থান—একটি জংশন স্টেশন।

সময়—দিন

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় তারিনী স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গান করে ভিক্ষে চাইছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৬

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির

সময়—রাত্রি

অনিরুদ্ধ : (বলে চলে) তাহলে ? তাহলে আমরা কাদের কাজ করব ? পেটে দোবো কি ? বলি। আমাদেরও তো নিজেদের কিছু চাই—না কি ?

ছিরু : (উপহাস করে) হেঁ হেঁ, তাতো চাই-ই ! আজকাল জুতো চাই,......

বাবু কাট্ জামা চাই—

ভবেশ : সিগরেট্ চাই—

ছিরু : তারপর ধর্ পরিবারের লেগে সেমিজ চাই, বডিস চাই—

ভবেশ আর হরিশ বিদ্রূপের সুরে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ : (গর্জে ওঠে) ছিরু মোড়ল ! ! হিসেব করে কথা কল্লো বলে দিলাম !

ছিরু : হেঁ হেঁ, হিসেব আমার করাই আছেরে বাপ্ ! (পকেট থেকে হ্যাণ্ডনোটের কাগজটা বার করে)—পঁচিশ টাকা ন' আনা তিন পয়সা। আসল দশ, বাকিটা সুদ। বিশ্বেস না হয় তো দেখে নিতে পারিস। বলি, শুভংকরী টুভংকরী জানিস তো ?

ভবেশ আর হরিশ আবার হেসে ওঠে সশব্দে।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়।

ছিরু : (দাঁড়িয়ে) এ কি ? চলে যেচ্ছিস যে !

চৌধুরী : (ছিরুর হাত ধরে) বাবা ছিহরি—

চকিতে ছিরু পাল কুৎসিৎ চিৎকারে ফেটে পড়ে যেন, বৃদ্ধ চৌধুরী মশাইকে বলে—

ছিরু : আপনি থামেন তো ! তখন থেকে খালি 'ছি-হরি' ছি-হ রি' 'ছি-হ রি' (সামনের দিকে চেয়ে) অনিরুদ্ধ !

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ ক্যামেরার দিকে পেছন করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধর যাবার পথে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ছিরু পাল। তারপর দ্বারকা চৌধুরীর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলে ওঠে—

ছিরু : যত্তো সব......বুড়ো হাবড়ার......

বাকি কথাগুলো বিড় বিড় করে বলে।

ছিরু : (বলতে বলতে) কি বলবেন, ...বলেন !

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্, দ্বারকা চৌধুরী স্তম্ভিত।

কাট্ টু

ক্লোজ শট্। ছিরু পাল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দ্বারকা চৌধুরী।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। হরেন, শম্ভু ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। ভবেশ ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—গিরিশ, হীরা ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—তারকা চৌধুরী স্তম্ভিত, পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অপমানটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ধীরে ধীরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান। হাতজোড় করে সভার উদ্দেশ্যে বলেন।

চৌধুরী : ব্রাহ্মণদিগে প্রণাম······আপনাদিগে নমস্কার······

তারপর ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করেন। এবং একটু এগিয়ে অফ ভয়েসে ডাক শুনে থেমে দাঁড়ান।

দেবু : (off voice) দাঁড়ান!

কাট্ টু।

দেবু ভিড়ের মধ্য দিয়ে চৌধুরি মশাই এর কাছে এগিয়ে আসে। ছিরুর দিকে তাকিয়ে তাকে তিরস্কার করে, বলে—

দেবু : ছি ছি ছি,—কি ভেবেছ তুমি? —যাকে যা খুশি তাই বলছ! (চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে) আপনি যেয়েন না,······আমি হাত জোড় করছি···

চৌধুরী মশাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েন যেন। চোখ ভিজে ওঠে; ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

চৌধুরী : না বাবা!···এ বুড়ো হাবড়াকে আর······

চৌধুরী মশাই কথা শেষ করতে পারেন না। মাথা নাড়তে নাড়তে মণ্ডপ ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান।

দেবু পণ্ডিত অসহায় ভাবে দাঁড়িয়েই থাকে।

এই কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। বিপরীত দিক থেকে শোনা যায় জোর কান্নার আওয়াজ।

কাট্ টু।

আমরা দেখতে পাই পাতু বায়েন আর তার বৌ দুজনেই বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

পাতু : শোনেন!···শোনেন বাবুরা! দ্যাখেন···দ্যাখেন আমার কি

পাতু বায়েন ক্যামেরার দিকে পিঠ ফেরালে দেখা যায় তার পিঠ ভর্তি কালশিটে আর ঘা। কেউ বুঝি তাকে প্রচণ্ড মেরেছে।

সভায় ঐ দৃশ্যের মৃদু প্রতিক্রিয়া হয়।

—এ কি!

—কি করে?

—কি করে হল, পাতু?

—এমন করে মারলে কে?

ক্লোজ শট্।

পাতু : দোষের মধ্যে দোষ। শুধু বলেছিলাম—"আপনারা ভদ্দরলোক, আপনারা যদি এমন করে আমাদের ঘরের মেয়্যাদের দিকে নজর দ্যান—"

পাতুর বৌ : সব ঐ সব্বনাশী কালামুখীর নেগে গো—

পাতু : (ধমকে) এ্যা-ও ও!··· চোপ···যা ঘর যা। এক সাপুটে খুন করে ফেলে ডুবো বল্‌লাম—

পাতুর বৌ : (নির্ভয়ে) উ—খুন করে ডুবা···কৈ, তাকে পারিস না? নিজের বুন? যখন সন্‌জেবেলা পাছাপেড় শাড়ি পরে··· ঠোঁটে অং মেখে···ঘরের দোর বন্ধ করে নিত্যিদিন ছুম্··· ছুম্···ছুম···

পাতুর বৌ কোমর দুলিয়ে তার ননদকে নকল করতে চায়। ক্যামেরা চার্জ করে ওর ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৭।

স্থান—দুর্গার ঘরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

ফ্ল্যাশ ব্যাক।

এক জোড়া রঙিন মল্ পরা পায়ের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে দেখায় মেঝেতে ছিরু পাল মাতাল হয়ে বসে। মল পরা পা দুটো হচ্ছে দুর্গার। পাতুর বোন। একটা মনভোলানো গানের কলি শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে যে গাইছে।

ছিরু পালের এক হাতে মদের গ্লাস। কামার্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে দুর্গার দিকে, মাঝে মাঝে তার পাটা ধরতে চাইছে ছিরু পাল। দুর্গা পাটা সরিয়ে নেয়। ছিরু পাল যখন পুরো মাতাল হয়ে পড়ে, দুর্গা পা দিয়ে তার কাঁধে ঠেলা দেয় আর হেসে ওঠে।

দু-তিনবার চেষ্টার পর এক সময় দুর্গার পাটা ধরে ফেলে ছিরু পাল। আর ঝুঁকে পড়ে পায়েই চুমু খেতে থাকে। দুর্গা চিৎকার করে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

লো অ্যাঙ্গেল ক্লোজ শট্। বুক পর্যন্ত খোলা দুর্গা।

দুর্গা : (খিল্ খিল্ করে) এ্যাই! ······সুসসুড়ি লাগে! এ্যাই!

কাট্ টু

ছিরু দুর্গার পায়ে চুমু খেতে খেতে ওপরে ওঠে।

কাট্ টু

দুর্গা একটু পিছু হঠে রসিকতা করে বলে

দুর্গা : হ্যাৎ!······জানোয়ার কুথাকার!

দরজার বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়।

পাতু : (off voice) এ্যাই···এ্যাই দুগ্‌গা···দরজা খুল্—

দুর্গা : কে?

পাতু : হারামজাদী। আবার ঘরে লোক ঢুকায়েছিস .

ছিরু : এ্যাই! ...কোন্ শালা চ্যাঁচায় রে

পাতু : আমি শালা চ্যাঁচাই রে!......ক্যানে?

ছিরু : (টলতে টলতে উঠে) হারামজাদা!......

দুর্গা : শোন...যেয়োনা...শুনছ...

ছিরু : ছেড়ে দে!...রোজ শালা হুমকি বাধাইছে! দেখাইছি মজা!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৮

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির

সময়—রাত্রি

ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড।

পাতু : ইখানে সক্কলে রইছেন!...বলেন,...বলেন ইয়ার কি বিচের হবে?

মুহূর্তের জন্য সবাই নীরব হয়ে যায়।

ছিরু পাল যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে।

দেবু : এসব বিচার এখানে হয় না পাতু! নিজের ঘর শাসন করনা কেনে?

পাতু : করব!...লিচ্চই করব!...কিন্তু পণ্ডিত ঠাকুর

পাতু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছিরু পালের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পালের ক্লোজ-আপ শট্। ওর মুখের ওপরই পাতু বায়েনের কথা শোনা যায়।

পাতু : (off voice) ভদ্দরলোকের শাসন কইরবে কে?

কাট্ টু।

পাতু : আমার বুন লচ্ছার...বজ্জাত...ঠিক আছে! কিন্তু যখন তখন ছুতোয় নাতায় গরীব গুব্বোদের ঘরে ঢুকে ফষ্টি...নস্টি...

এই সময় দেখা যায় অনিরুদ্ধ আবার ফিরে আসছে। পাতুর কথায় কান না দিয়ে সে সোজা এসে হাজির হয় ছিরু পালের সামনে এবং একমুঠো টাকা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে।

অনিরুদ্ধ : এই নাও!...পঁচিশ টাকা দশ আনা!...এক পয়সা বেশি রয়েচে—পান কিনে খেয়ো! আর দাও আমার হ্যাণ্ডনোট।

এই বলে সে হ্যাণ্ডনোটটা ছোঁ মেরে নেয় এবং গিরিশের দিকে তাকায়—

অনিরুদ্ধ : এসো মিতে

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত এসে তার পথ রোধ করে।

দেবু : এ কি? চল্লে নাকি?

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ!...যে মজলিশ (ছিরুকে দেখিয়ে) উয়ার মতন লোককে শাসন কত্তে পারে না—সে মজলিশের সঙ্গে আমার কুনো সম্পক্ক নাই!

সে দেবুকে ঠেলে বেরিয়ে যায়।

দেবু : অনি!

যেখানে মাটিতে বাউড়িরা বসেছিল সেই ষষ্ঠীতলায় গিয়ে অনিরুদ্ধ চিৎকার করে বলে—

অনি : এই, ওঠ্...ওঠ্ সব!...ভদ্দর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি কইরে ভদ্দরনোক হবার সাধ হইছে—না? ভদ্দরনোক!

পাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ! ইখানে কুনো বিচের হবে না! উঠে পড়!

কয়েকজন বাউড়ি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। কয়েকজন আবার তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করে। একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়।

কাট্ টু

চণ্ডীমণ্ডপের লোকজনের শট্।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ফিরে চিৎকার করে, রেগে মুখ ভেঙিয়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : হায় হায় মজলিশ রে!...ছিরে পালের গোয়াল! ধুনো দাও... ভালো করে ধুনো দাও—

সে মাটিতে থুতু ফেলে এবং সঙ্গীদের ছেড়েই চলে যায়।

কাট্ টু

সবাই হতচকিত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অভাবনীয় ধৃষ্টতা দেখে সবাই হতবুদ্ধি যেন! দেবু নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম্ করে এগিয়ে যায় ছিরু পালের ওপর। রাগে জ্বলছে তার চোখ। প্রতিহিংসার দৃষ্টি তার চোখে।

ওর মুখের ওপর একটা শব্দ ভেসে ওঠে।

থীশ্-শ্!...থীশ্-শ্!.. থীশ্-শ্!

কাট্ টু।

(চলবে)

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র পিছু হটছে কেন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জন্য যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা এই সরকারের সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর কর্মসূচীর সম্পূরক। নগ্ন দৃশ্য ও ক্যাবারে নৃত্য সম্বলিত চলচ্চিত্র ও নাটকের যে জোয়ার কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিকে কলুষিত করছিল, বর্তমান সরকারের প্রচারাভিযানের ফলেই তাতে এখন ভাঁটা দেখা দিয়েছে।

শুধমাত্র রুচিবোধসম্পন্নই নয় চলচ্চিত্রের সমঝদার দর্শক সৃষ্টিতেও বর্তমান সরকার সচেতন। Calcutta Film Festival '78 সংগঠিত করা, ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংস্থার ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজকে অর্থ সাহায্য দান এবং ফিল্ম সোসাইটি পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশনার জন্য অনুদান সরকারের এই প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করছে।

পূর্বতন রাজ্য সরকার বছরে ১২টি ছবির জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বর্তমান সরকার তার পরিবর্তে বছরে ৩০টি ছবিকে (সাদা কালোর জন্য ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং রঙীনের জন্য ১.৫ থেকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান দেবেন বলে স্থির করেছেন, এই অনুদান তাঁদেরই দেওয়া হবে যাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন যে একটি ছবির খরচের শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ ব্যয় তাঁরা করে ফেলেছেন।

তাছাড়া দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেকনিশিয়ান ২নং স্টুডিও আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হয়েছে। এ ছাড়া বেলেঘাটায় একটি শিশুচিত্র প্রদর্শন-প্রেক্ষাগার নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা, কালার ফিল্ম লেবরেটরি নির্মাণ করা এবং টেকনিশিয়ান ১নং স্টুডিও অধিগ্রহণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্য ভিত্তিতে একটি ফিল্মস ডিভিশন গঠনের জন্য যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছেন।

তবে সরকারকে সেই সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পরিচালক ও কলাকুশলীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেবার ব্যাপারে নজর রাখতে হবে কারণ নবাগতদের স্রোত অব্যাহত না থাকলে যে কি হয় তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে এব্যাপারেও সরকার উদাসীন নয় বলেই মনে হয় কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই নবাগতদের দ্বারা নির্মিত বেশ কিছু শর্ট ফিল্ম কিনে নিয়েছেন যদিও শর্ট ফিল্ম কেনার ব্যাপারে মতান্তরও আছে। আশা করব যে গঠিতব্য রাজ্য ফিল্মস ডিভিশনকে নবাগতদের জন্যই সাধারণভাবে সংরক্ষিত রাখা হবে। শ্যাম বেনেগাল ও সথ্যুকে এখানে ছবি করার জন্য আমন্ত্রণ একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কারণ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের যে অভাব দেখা দিয়েছে এঁরা তা পূরণে সমর্থ হবেন। তবে এইগুলি সাময়িক ব্যবস্থা হওয়া উচিত কারণ নবাগতদের আগমন ঘটলেই স্থানীয়ভাবে বহু প্রতিভার সন্ধান মিলবে যা আবার পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রমোদকর অব্যাহতি

বর্তমান সরকারের এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। যেসব বাংলা ছবি চেতনা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকাশে সহায়তা করবে সেইসব ছবিগুলিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কোন ছবি এই অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত তা বিবেচনার ভার একটি স্থায়ী কমিটির উপরে ন্যস্ত করা যেতে পারে। ইদানিং কালে কর্ণাটক সরকার যেসব অঞ্চলে কুড়ি হাজারের কম মানুষ বাস করেন সেইসব অঞ্চলে সমস্ত কর্ণাটকী ছবিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অথবা যেভাবে মহারাষ্ট্র সরকার মারাঠি ছবিকে প্রমোদকরের একাংশ ফিরিয়ে দিচ্ছে এখানে তার কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখা উচিত। আর সরকার প্রযোজিত সমস্ত ছবিই প্রমোদকর মুক্ত হওয়া উচিত।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য

শুধুমাত্র সরকারী অর্থ সাহায্যেই এই শিল্পের সংকট মোচন হবে এরকম আশা করা বিরাট ভুল। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগও নিতে হবে। কর্ণাটকে যেভাবে পরিচালকরা সমবায় গঠনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করেছেন, সেই দৃষ্টান্ত এখানেও অনুসরণ করা যেতে পারে। এটা বিশেষভাবে নবাগতদের ভেবে দেখা উচিত। তবে সঙ্কটের মূল কারণগুলি উপলব্ধি করে হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সমস্ত রকম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাই হবে তাদের প্রাথমিক কর্তব্য এবং সেটা করতে বেশ কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে।

রঙীন ছবির নির্মাণ প্রসঙ্গে

ইদানিংকালে বাংলা ছবিতে রঙ ব্যবহারের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। এর ফলে ছবির খরচ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উচ্চতর ব্যয়ভার বাংলা ছবি তার সীমিত বাজারে কতটা বহন করতে পারবে তা নির্মাতাদের ভেবে দেখা উচিত। এক্ষেত্রেও পূর্বের সেই হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার মানসিকতা কাজ করছে বলে মনে হয় যেটা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক।

'স্ট্রাইকার' ছবিটি রঙীন হয়ে নির্মিত হলেও তা ভাল চলেনি। 'দেবদাস' রঙীন হয়ে নির্মিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এই ছবিটি যাঁরা দেখতে যাবেন তাঁদের বৃহদংশই শরৎচন্দ্রের কাহিনীটির চলচ্চিত্ররূপ অথবা তাঁদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখতে যাবেন। আর শুধুমাত্র রঙীন হবার আকর্ষণে যাঁরা যাবেন তাঁদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাঁরা ছবির ঐ দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ খরচ পুষিয়ে দিতে পারবেন না।

অবশ্য আঙ্গিকের প্রয়োজনে যদি কোনও ছবি রঙীন হয়ে নির্মিত হয় তা ভিন্ন কথা। এটা বুঝি যে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' রঙীন হয়ে নির্মিত হওয়াই উচিত হয়েছে তার সঙ্গে এও বুঝি যে 'পথের পাঁচালি' বা 'কলকাতা ৭১' সাদাকালোয় নির্মিত হওয়াই সঠিক হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেক প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদেরও রঙীন ছবি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

অতএব যান্ত্রিক ভাবনা পরিত্যাগ করে দর্শকদের মধ্যে যে রুচির polarisation ঘটে গেছে (পূর্বে আলোচিত) তা উপলব্ধি করতে হবে, কারণ এই ধরণের ছবি ক্রমাগত নির্মিত হতে থাকলে তা বাংলা ছবির দর্শকদের optical habit এ পরিবর্তন আনবেই এবং তা ভবিষ্যতে কম বাজেটে সাদা কালোয় ছবি নির্মাণের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। যাঁরা রঙীন ছবি করে সাময়িক সফলও হচ্ছেন তাঁদেরও ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়েও সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে শিল্পে সংকট দেখা দিলে তা কাউকেই ছাড় দেয় না, নামী-দামী সকলকেই তা স্পর্শ করে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালকদের নজরে রাখতে হবে যে সেগুলি যেন মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের সহায়ক হয় কারণ এইভাবেই বাংলা ছবির মানোন্নয়ন অব্যাহত থাকবে এবং তা হিন্দী ছবির বিকল্প হিসাবে গণ্য হবে।

চলচ্চিত্রের ভাষার সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

পরিচালকদের গল্প বলার সময় মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একটি জনপ্রিয় সাহিত্যকে শটের পর শট্ সাজিয়ে হুবহু চলচ্চিত্ররূপ দিলেই জনপ্রিয় সিনেমা হয় না। সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রেরও একটা নিজস্ব গল্প বলার ভঙ্গী আছে। একটি দৃশ্য কোন angle থেকে নিলে তা দৃশ্যের মুডকে প্রতিফলিত করবে অথবা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময় তা কতটা ম্যাচ্ করল—এইসব পরিচালককে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। সাধারণ দর্শক এসবের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবেনা, কিন্তু সমস্ত ছবিটা দেখার পর ভালো লাগা না লাগার অনেকটা এর ওপর নির্ভর করবে। সাহিত্যের পাঠক যেভাবে তাঁর কল্পনার জাল বিস্তার করেন অথবা নাটকে দর্শক যেভাবে সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেন সিনেমার দর্শকের সেরকম দায়বোধ থাকে না তাই সমগ্র ব্যাপারটা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থিত করাই পরিচালকদের মূল দায়িত্ব। আর এই ব্যাপারে আলোকচিত্র শিল্পী, সম্পাদক থেকে শিল্পনির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রত্যেকেরই যৌথ দায়িত্ব আছে।

বিজ্ঞাপন

এই ব্যাপারেও হিন্দী ছবির মত গ্ল্যামারের রাজ্য গড়ে তোলার নীতি পরিহার করে বাংলা ছবির দর্শকের কথা মনে রেখেই প্রচার নীতি ঠিক হওয়া উচিত।

বাংলা চলচ্চিত্রের একজন দর্শক হিসাবে সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করলাম। সবশেষে এই আশা করব যে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আরও অনেকেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রণী হয়ে সংকটের গভীরতর দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির উৎসব

অতুল লাহিড়ী

এপ্রিল মাসে কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির এক উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার কর্মচঞ্চল ফিল্ম সোসাইটি সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা, সহযোগিতায় ছিলেন নয়াদিল্লীর বেলজিয়ান দূতাবাস।

এই উৎসবকে উপলক্ষ করে সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে বেলজিয়ান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মাদাম ক্রিস্টিনা ফুনেস-নোপেন বক্তব্য রাখলেন। প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্য দিয়ে জানা গেল মোটামুটি বেলজিয়ান চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সূচনা ১৯৫২ সাল থেকে যখন বেলজিয়ান সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পকে উদার অনুদান দিতে এগিয়ে এলেন সক্রিয়ভাবে। এই কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করল ১৯৬৪ সাল থেকে যখন ফরাসী এবং ফ্লেমিস সাংস্কৃতিক মন্ত্রক আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলেন চলচ্চিত্রশিল্পকে সহায়তা করতে। বছরে কাহিনীচিত্রের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে দাঁড়াল ছ-সাতটিতে। বেলজিয়ান চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এ তথ্যটিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, কারা ও সমষ্টি-উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদাম ক্রিস্টিনা ফুনেস-নোপেন। তিনি ভাষণ দিলেন বাংলা ভাষায় এবং বললেন বেলজিয়ান দূতাবাস সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা আয়োজিত এই উৎসবের জন্য ব্রাসেলস্ থেকে ছবিগুলি বিশেষভাবে আনিয়েছেন।

উৎসবে ছটি ছবি দেখানো হয় 'বার্থা,' 'রঁদেভু এ'ব্রে', 'ভারলোরেন মানদাগ', 'লে ফিলস্ দ্য মর এন্ত মর্ত', 'ভক্তি' ও 'মালপারতুস'।

'বার্থা' ছবিটি গী দ্য মোপাসাঁর কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কুড়ি বছরের তরুণী বার্থা শৈশব থেকেই মেনেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার সূত্রে এক ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়। বার্থার অবশ মানসিকতা ও বিচিত্র আবেগ ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। বার্থার মার উপরোধে তাদের বিবাহ—পরবর্তীকালে তাদের বিবাহিত জীবন বিচিত্র জটিলতার শিকার। বার্থার ডাক্তার স্বামী ক্লান্ত জীবনের সন্ধানে বাইরের জগতে সময় কাটায়। অসহায় বার্থা অসহায় প্রতীক্ষায় রাত কাটায়। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা তীব্র বিচিত্র আবেগে ভরপুর অথচ স্বামী তার প্রতি কোনো আকর্ষণই অনুভব করেনা। এবং একদিন ডাক্তার বার্থাকে ছেড়ে চলে যায়। বার্থার প্রতীক্ষার শেষ নেই, অর্থহীন ?ীন প্রতীক্ষা। এ প্রতীক্ষা যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা যা আত্মহননের মতো।

পরিচালক পি, লেদ্যুক্স অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে বার্থার যন্ত্রণাময় জীবন তুলে ধরেছেন। ধূসর কাব্যের মত এ ছবি তুলে ধরেছে বার্থার তরুণী জীবনের জটিল ব্যর্থতা।

আন্দ্রে দেলভ্যু বেলজিয়ামের সবচেয়ে নামী পরিচালক। তাঁর রঁদেভু এ 'ব্রে' ছবিটি এর আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এক কল্পকাহিনীর আবরণে ছবিটি তুলে ধরেছে ছায়াঘেরা রহস্যময়তা যা পরিচালনার আশ্চর্য কুশলতায় দর্শককে ধরে রাখে সহজেই।

১৯১৭ সালের ঘটনা। লুক্সেমবার্গের জুলিয়েন প্যারিসে বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্র বাজনা শিখছেন। একদিন তার পুরানো বন্ধু জ্যাক তাকে আমন্ত্রণ জানায় ব্রে নামক এক ছোট্ট জায়গায় নতুন বছর কাটানোর জন্য।

জুলিয়েন উপস্থিত হয় ব্রে-তে। সেখানে তার বন্ধু জ্যাকের দেখা নেই। তাকে আমন্ত্রণ জানায় এক মহিলা। তারা দুজনে একসঙ্গে রাত কাটায়। পরের দিন সকালে মহিলারও দেখা মেলেনা। জুলিয়েন তার বন্ধুকেও খুঁজে পায়না। জিনিষপত্র গুছিয়ে জুলিয়েন ব্রে-র বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এই হলো ছবির কাহিনী।

'ভারলোরেন মানদাগ' ছবিটির পরিচালক এল, মনহেইম। পোল্যাণ্ডের এক তরুণ টমাস দেশ ছেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসে বেলজিয়ামে। সে খুঁজে বেড়ায় এক মহিলাকে যে মহিলা তাকে এবং তার মাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। এই অনুসন্ধানের পথ বেয়ে সে হাজির হয় আন্টওয়ার্প শহরে সেখানে তার সাথে এক মহিলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরিচয় হয় কিছু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যাদের মধ্যে রয়েছে খুচরো চোর, ভাড়াটে সৈন্য এবং মাতাল লোকজন। ওদের সঙ্গে পরিচয়ই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। অবশেষে টমাস দেখা পায় সেই মহিলার যার খোঁজ সে এতদিন করে চলেছে। কিন্তু তখন টমাসের বেরোবার জায়গা নেই।

'লে ফিলস দ্য মর এন্ত মর্ত' পরিচালনা করেছেন আন্দ্রিয়েন। সালাবেন আহমদ এরবাই দক্ষিণ তিউনিশিয়া থেকে এসেছিলেন ব্রাসেলসে। ব্রাসেলসে একমাত্র তাকে চেনে তার বন্ধু পিয়ের। এরবাই বিচিত্র পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করে। পিয়ের এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত।

পিয়ের বুঝতে পারে যে সে তাকে চেনার চেষ্টা করেনি। তাঁর টিউনিশীয় বন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানেনা। পিয়ের তার বন্ধুর মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করার জন্য হাজির হয় দক্ষিণ টিউনিশিয়ার সেই গ্রামে। পিয়ের সম্ভবত তাঁর বন্ধুর অভিজ্ঞতাকে বুঝতে চায়, যেন বিনিময় করে নিতে চায় পারস্পরিক অস্তিত্ব।

এইচ, কুমেল নির্দেশিত 'মালপারতুস' ছবিটিও এর আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এছবিটিও বিচিত্র রহস্যময়তা তুলে ধরেছে কাহিনীর বিস্তারে। এছবির নায়ক জন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে পতিতালয় থেকে তুলে আনা হয়েছে তার বাড়ীতে। তার পুরানো ঘরে ঘুম থেকে উঠে সে দেখে যে তার ঐ পুরানো ঘর অবিকল রূপান্তরিত হয়েছে তার কাকার প্রাসাদে। এই প্রাসাদের নাম মালপারতুস। জন ভাবে সে পালিয়ে যাবে কিন্তু তার বোন তাকে বোঝায় যে তার কাকা মৃত্যুশয্যায় এবং তাদের উপস্থিতি সম্পত্তি পাবার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা যায়; জন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু অন্য সকলেই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উইল অনুযায়ী এই প্রাসাদে বসবাস করার অধিকারী সম্পত্তি ভোগের জন্য। এরপর বিচিত্র সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে এবং একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। জনের বোন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়। জন মালপারতুসের রহস্য উন্মোচন করতে চেষ্টা করে—জন এদিকে আবার প্রেমে পড়ে যায় ইউরেলিয়া নামে একটি মেয়ের। যখন তারা দুজনে দুজনকে সোহাগে চুম্বন করতে থাকে তখনই আমরা দেখি জন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে যিনি বলছেন জন হাসপাতালে যে ডায়েরী লিখেছে তার প্রশংসার কথা। জনের স্ত্রী তাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায় বাড়ীতে। জন বাড়ীতে আসে, ঘরে প্রবেশ করে, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়—তখন জন দেখে সে সেই মালপারতুস প্রাসাদের পুরানো বারান্দায়—তার সামনে মুখোমুখি হেঁটে আসছে জন স্বয়ং নিজে।

মরিস বেজার্তের ছবি 'ভক্তি' ১৯৬৯ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। পূর্ণাঙ্গ এই ব্যালে-ছবিতে বেজার্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং পশ্চিমে দুনিয়ায় বাজারী সভ্যতার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। তিনটি কাহিনীর সূত্র ধরে ছবিটি এগিয়েছে—রাম-সীতা, শিব-শক্তি এবং কৃষ্ণ-রাধা। একজন পশ্চিমী শিল্পীর চোখে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ—বিষয়টি ভারতীয় দর্শকের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণপূর্ণ। এবং এব্যাপারে কৃতিত্ব পরিচালক সহজেই দাবী করতে পারেন।

চিত্রবীক্ষণে
লেখা পাঠান।
চিত্রবীক্ষণ
আপনার লেখা চাইছে।
চলচ্চিত্র-বিষয়ক যে কোনো
লেখা।

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 April 1979 Vol. 13 No